একাত্তরের রণাঙ্গন

একাত্তর আমাদের বেদনা ও গৌরবের ইতিহাস, তিরিশ লাখ বাঙ্গালীর রক্ত দানের ইতিহাস, এক কোটি বাঙ্গালীর সীমান্তের আশ্রয় শিবিরে দুঃসহ জীবন যাপনের ইতিহাস, ছ' কোটি বাঙ্গালীর হানাদার কবলিত বাংলাদেশে শ্বাস রুদ্ধকর জীবন যাপনের ইতিহাস, বাংলার শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবিদের হত্যার ইতিহাস এবং একলাখ মুক্তিযোদ্ধার ত্যাগ ও বীরত্বের ইতিহাস। সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর সেদিনের সৃষ্ট ইতিহাসের ফসল—স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

সেদিনের সেই বেদনাময় ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসেরই কিছু তথ্য নিয়ে প্রণীত হয়েছে—'একাত্তরের রণাঙ্গন'।

1971 was a year of great sacrifice and glory in the War which brought about an independent sovereign Bangladesh. The War cost about 3 million lives while another 10 million were uprooted from their homes to flee to safety across the border. Many distinguished intellectuals were ruthlessly murdered as sixty million Bengalees faced the guns of the occupation forces. But from the heroic fight and numerous sacrifices of 0.1 million honoured Mukti Bahini—Freedom Fighters—the Nation of Bangladesh emerged.

This book EKATTARER RANANGAN (The War-field of Seventy One) attempts to unfold the background and some of the events and tales of the War of Independence.

একাত্তরের রণাঙ্গন

শামসুল হুদা চৌধুরী
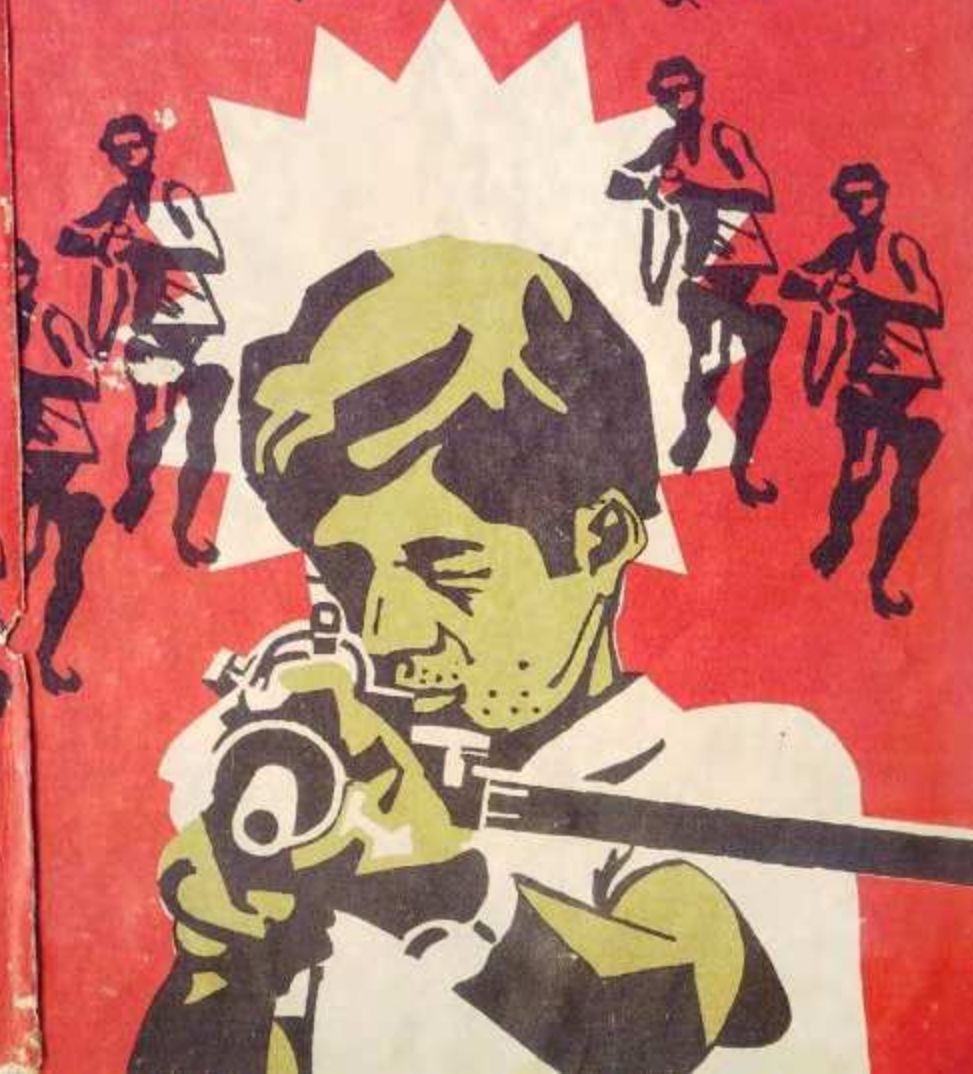
একাত্তরের রণাঙ্গন

শামসুল হুদা চৌধুরী

একাত্তরের রণাঙ্গন

শামসুল হুদা চৌধুরী

পরিবেশক :

আহমদ পাবলিশিং হাউজ

৭, জিন্দাবাহার প্রথম লেন

ঢাকা-১

একাত্তরের রণাঙ্গন
শামসুল হুদা চৌধুরী
প্রথম সংস্করণ :
৭ই আষাঢ়, ১৩৮৯
২২শে জুন, ১৯৮২
দ্বিতীয় মুদ্রণ :
২৬শে মাঘ, ১৩৯০
১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪

প্রচ্ছদ :
কাইয়ুম চৌধুরী
আলোক চিত্র :
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, বেতার বাংলা ও
লুতফর রহমান (প্রতিচ্ছবি)—এর সৌজন্যে
মুদ্রণ :
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-২
প্রকাশক :
সায়িদ হাসান চৌধুরী
৪০৭/১-সি, পূর্ব মনিপুর, মীরপুর, ঢাকা-১৬
মূল্য : একশত কুড়ি টাকা মাত্র
EKATTARER RANANGAN
THE WAR FIELD OF SEVENTY ONE
BY SHAMSUL HUDA CHOWDHURY
Published by Sayeed Hasan Chowdhury
407/1-C, East Monipur, Mirpur, Dhaka-16

DISTRIBUTOR: AHMED PUBLISHING HOUSE
7, Zinda Bahar, First Lane, Dhaka-1
First Edition :
22nd June, 1982
Reprint : 10th February, 1984
PRICE : TAKA ONE HUNDRED TWENTY ONLY

উৎসর্গ

**বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে**

বাংলার হাজার বছরের সংগ্রাম
পূর্ণতা লাভ করল যাঁর প্রেরণায়, যাঁর নেতৃত্বে
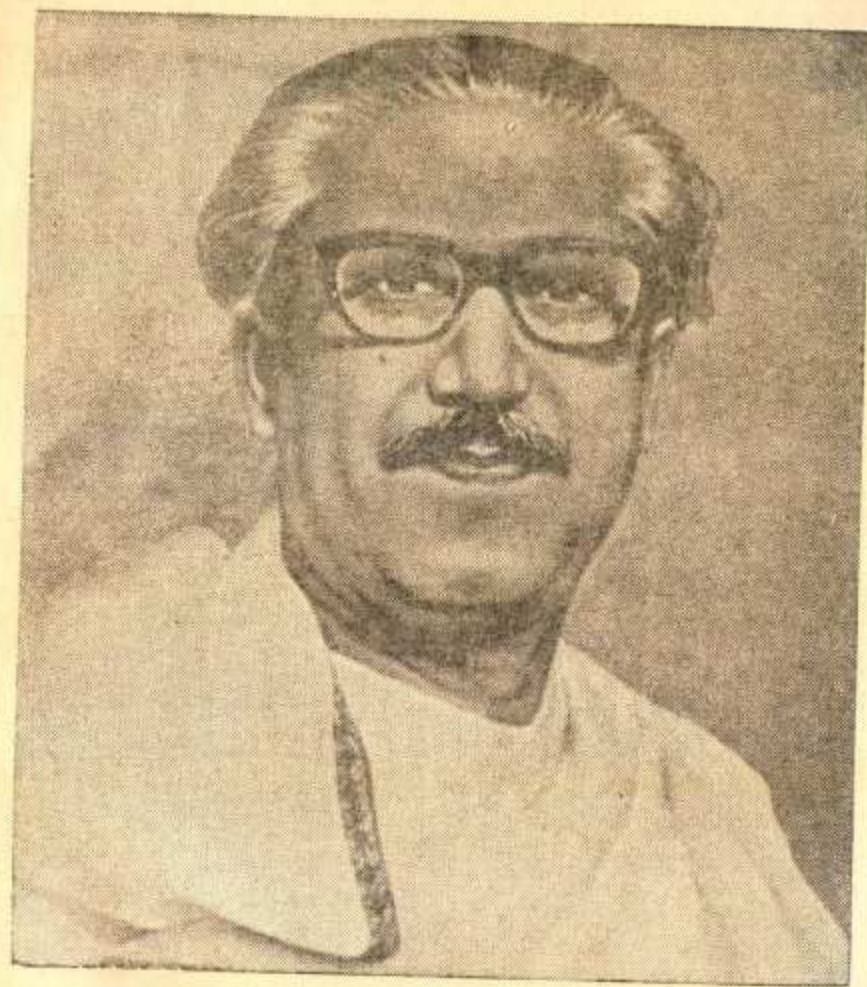
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মুক্তিযুদ্ধ : একটি মন্তব্য

—জেনারেল এরশাদ

(লে: জেনারেল হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ, এন ডি সি, পি এস সি কর্তৃক গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে ২৪শে মার্চ '৮২ জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণ থেকে)।

"মুক্তি যুদ্ধের মহান আদর্শ ও অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এ দেশের জনগণ ধর্ম, বর্ণ ও দলমত নির্বিশেষে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। স্বাধীনতার আদর্শে দিক্ষীত প্রতিটি নাগরিক সেদিন জীবন পণ করে এগিয়ে এসেছিল একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম স্বদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। আপনারা জানেন শুধুমাত্র একখণ্ড জমি অথবা একটি পতাকার জন্যই মুক্তিযুদ্ধ করা হয়নি। এটা করা হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশে একটি শোষণহীন, দুর্নীতি-মুক্ত সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের উদ্দেশ্যে— আমাদের নিজস্ব কৃষ্টি, শিল্প, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য স্বাধীনভাবে লালন করার জন্য। আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে ধর্মের প্রতিফলন সুনিশ্চিত করাও ছিল এই মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম লক্ষ্য। চরম আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বহনকারী আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধারা কিছু পাবার আশায় মুক্তিযুদ্ধ করেনি, বরং সব কিছু উজাড় করে দিয়ে একটি সত্যিকারের স্বাধীন ও সার্বভৌম, শক্তিশালী এবং আত্ম-নির্ভরশীল দেশ গঠনের জন্যই তারা মুক্তিসংগ্রামে অংশ নিয়েছিল। তাদের সে স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে আজ আমাদেরকে নতুন করে শপথ নিতে হবে এবং প্রয়োজন হলে সব রকমের ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে আমি দ্ব্যর্থহীন ভাবে ঘোষণা করতে চাই যে কৃতজ্ঞ জাতি তার বীর সন্তানদের প্রতি স্বাদের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে।"

EMBASSY OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
P. O. Box 135
CAIRO
CABLE : BANGLADOOT, CAIRO

December 2, 1981

AMBASSADOR

আমি ইতিহাসবিদ বা রাজনীতিজ্ঞ কোনটাই নই। আমি একজন সৈনিক এবং সৈনিক পরিচয়েই আমি গর্ববোধ করি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পেরেছিলাম বলে আমি আল্লাহ্‌তা'লার কাছে হাজার শোকর জানাই। ১৯৭১ সাল বলেই নয়, যে কোন যুদ্ধেরই ইতিহাস রচিত হওয়া আবশ্যক। তবে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এদিক দিয়ে অবশ্যই ব্যতিক্রম। এ যুদ্ধ বাঙ্গালী জাতিকে, আজকের বাঙ্গালী জাতিকে এনে দিয়েছে স্বাধীনতা। অতীত ইতিহাসের ধারাবাহিকতা খুঁজে বের করা খুবই কঠিন। এই অপবাদ থেকে আমাদের মুক্তি পাওয়া আবশ্যক। একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসও এদেশের ইতিপূর্বকার শত বর্ষের সংগ্রামের ইতিহাসের ন্যায় হারিয়ে যাচ্ছে। এদেশের যুদ্ধের ইতিহাসকে কোন প্রকারেই হারিয়ে যেতে দেওয়া জাতির জন্য মঙ্গলজনক হতে পারে না। কারণ এমনি ধারা চলতে থাকলে ভবিষ্যতে এ দেশের জন্য কেউ যুদ্ধ করতে চাইবে না।

একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের ন্যায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দ সৈনিকদের অবদান সমান তাৎপর্যবাহী। বরং তাঁরাই আমাদের এ পথে উদ্বুদ্ধ করেছেন, যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করেছেন। সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীকে প্রেরণা দিয়েছেন। ঐতিহ্যবাহী এই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রধান অনুষ্ঠান সংগঠক জনাব শামসুল হুদা চৌধুরী একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের সঠিক তথ্যাদি জন সমক্ষে তুলে ধরার যে উদ্যোগ নিয়েছেন আমি তাঁর উদ্যোগকে স্বাগতম্ জানাই।

আল্লাহ্‌তা'লার কাছে মোনাজাত করি, জনাব চৌধুরী সত্যনিষ্ঠ থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সঠিক তথ্য জাতিকে উপহার দিতে সক্ষম হউন।

লেঃ জেনারেল (অবঃ)
মীর শওকত আলী, বীর উত্তম, পি এস সি

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

একাত্তরে আমরা ছিলাম রণাঙ্গনে। মাত্র ন'মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে আমরা বিজয়ী হয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায়। একাত্তরের পূর্বে সত্যিকার অর্থে আমরা স্বাধীন ছিলাম কি? এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূত্রপাত ১৯৪৭ পরবর্তী কালে? ১৭৫৭ সাল থেকে? নাকি তারও আগে? এসব অনেক ধারাবাহিক ইতিহাস আমাদের পূর্ব পুরুষগণ ধরে রাখতে পারেন নি। তাইত আমাদের দেশের মাত্র হাজার বছর আগের ইতিহাস জানতেও আমরা হিমসিম খেয়ে যাই।

যথার্থই বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস কেবলমাত্র '৭১-এর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে সীমিত নয়। বহু ব্যাপক এবং বিস্তৃত এ ইতিহাস। তবে নিঃসন্দেহে একাত্তরের ন'মাস ছিল আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রান্তিকাল। একাত্তর পেরিয়ে বর্তমানে আমরা উত্তরণ করেছি বিরাশিতে। কালের চক্রে বিরাশিও হারিয়ে যাবে। এমনি ভাবে অতীতকে পেছনে ফেলে আমরা চলছি অনাগত ভবিষ্যতের পানে। কিন্তু একটি জাতি হিসেবে বাঁচতে হ'লে যে আমরা অতীতকে বিস্মৃত হতে পারি না, এ বোধ, এ ইতিহাস সচেতনতা আমাদের মধ্যে আজো তেমন জন্মেছে বলে মনে হয় না। একাত্তরে যে ছেলেটির বয়স ছিল মাত্র সাত বছর, আজ সে আঠার বছরের যুবক। কিন্তু আজো তার জানার সুযোগ হ'ল না আমাদের শেষতম রণাঙ্গনে বাঙ্গালী (বাংলাদেশী) জাতির আত্মত্যাগ এবং অবদানের কথা। অথচ এই রণাঙ্গনই জন্ম দিয়েছে, একটি জাতি, একটি দেশ—স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। এ রণাঙ্গনেই আমরা লাভ করেছি জাতি হিসেবে আমাদের বাঁচার অধিকার এবং প্রথম স্বীকৃতি। যে স্বাধীনতা ছিল আমাদের হাজার বছরের স্বপ্ন, যে স্বাধীনতার জন্য অকাতরে প্রাণ দিয়েছেন আমাদের বহু পূর্বপুরুষ, সেই স্বাধীনতার স্বপ্নকেই আমরা বাস্তবে রূপ দান করেছি এক সাগর রক্তের বিনিময়ে—উনিশ শ' একাত্তরের রণাঙ্গনে। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলেও সত্য যে এই শেষতম রণাঙ্গনের অনেক তথ্য ইতিমধ্যে হারিয়ে গেছে লোক চক্ষুর অন্তরালে। দেরীতে এমনি আরো অনেক মূল্যবান তথ্য থেকে জাতি বঞ্চিত হবে চিরদিনের জন্য। স্বদেশের ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের প্রতি এ জাতীয় অনীহা এবং ঔদাসীন্য বোধকরি অন্য কোনও জাতির মধ্যে এত বেশী নেই। যথার্থই এ ধরনের মনোভাব একটি সুখী এবং সমৃদ্ধ জাতি গঠনের অন্তরায়।

অবশ্য বিগত বছরগুলিতে '৭১-এর রণাঙ্গনের কিছু তথ্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া ব্যক্তিগত উদ্যোগে দু'একখানা তথ্যবহুল গ্রন্থও ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে মেজর রফিকুল ইসলাম রচিত 'লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে' (এ টেল অব মিলিয়নস) এবং মেজর এম. এস. এ. ভুঁইয়া রচিত 'মুক্তিযুদ্ধের ন'মাস'। তাঁদের এই উদ্যোগকে আমরা স্বাগতম জানাই। জাতি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

বিগত কয়েক বছর ধরে সরকারী পর্যায়ে "বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস প্রকল্প" নামে একটি প্রতিষ্ঠান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণ, গবেষণা ও প্রকাশনার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং কবি হাসান হাফিজুর রহমান এই প্রকল্পের দায়িত্বে আছেন। আশা করি, এই প্রকল্প মুক্তিযুদ্ধের তথ্যাদি সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ ছাড়াও জাতিকে একটি নিরপেক্ষ ইতিহাস উপহার দিতে সক্ষম হবে।

একটি জাতির ইতিহাস কোনও দল বা গোষ্ঠির ইতিহাস নয়। এ ইতিহাস সার্বিক। সার্বিক এ ইতিহাসেরই এক অতি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন একাত্তরের রণাঙ্গন। এই রণাঙ্গনের একজন শব্দ সৈনিক হিসেবে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রধান অনুষ্ঠান সংগঠকের দায়িত্ব পালনের সুযোগ আমার হয়েছিল। এজন্য ব্যক্তিগত ভাবে আমি গৌরবান্বিত। কিন্তু রণাঙ্গন পেরিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে উত্তরণের গৌরব সমগ্র বাঙ্গালীর (বাংলাদেশীর)। কাজেই এই যুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণ, গবেষণা ও রচনায় মূল দায়িত্ব অবশ্যই সরকারের। কিন্তু তাই বলে আমরাও আমাদের স্ব স্ব দায়িত্ব থেকে (তা যত সামান্যই হোক না কেন) মুক্তি পেতে পারি না।

স্পষ্টতঃই কোন জাতির ইতিহাস একদিনে রচিত হয় না। কিন্তু ইতিহাসের উপকরণ একবার হারিয়ে গেলে সেই শূন্যতা আর পূরণ সম্ভব নয়। বলাবাহুল্য, ইতিহাস নয়, রণাঙ্গনের কিছু তথ্য জাতির হাতে তুলে দেবার নৈতিক দায়িত্ব বোধই আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে এই গ্রন্থ রচনার জন্য। আশা করি, আমার উপস্থাপিত তথ্যাদি আমাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক এবং গবেষকগণের উপজীব্য হবে। এতে তাঁরা খুঁজে পাবেন বাঙ্গালীর শেষতম রণাঙ্গনের কিছু মূল্যবান উপকরণ।

যাঁদের সহযোগিতা এবং পৃষ্ঠপোষকতায় আলোচ্য গ্রন্থটির প্রকাশ সম্ভব হয়েছে, তাঁদের প্রত্যেকের কাছে জানাই আমার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা। যে সব প্রতিষ্ঠান এই গ্রন্থ প্রকাশে অকৃপণভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, সেসব প্রতিষ্ঠানের একটি তালিকা গ্রন্থের শেষে মুদ্রিত হলো। এ ছাড়াও কিছু প্রতিষ্ঠান এবং সুধী ব্যক্তি গ্রন্থটি প্রকাশে উদারভাবে সহযোগিতা প্রদান করেছেন। এসব প্রতিষ্ঠানও সুধী জনকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। বেতার প্রকাশনা সহ যে সব পত্র-পত্রিকা এবং লেখকের সৌজন্য সমৃদ্ধ ছবি ও তথ্যাদি গ্রন্থটির এলবাম এবং তথ্যাদি পরিপূর্ণ করেছে, সে সব পত্র-পত্রিকার সম্পাদক এবং বই-এর লেখককে জানাই বিশেষ কৃতজ্ঞতা। বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার একাডেমীর শ্রদ্ধেয় জনাব আনিসুজ্জামান চৌধুরী মিসেস সুফিয়া খানম, সহকর্মী সর্ব জনাব এম. মোহাদ্দেস, কেরামত মাওলা, আব্দুল আজিজ এবং মনোরঞ্জন দাশ, রেডিও বাংলাদেশ-এর বহির্বিশ্ব কার্যক্রমের উপ পরিচালক জনাব আব্দুল মালেক খান, সহকারী পরিচালক জনাব মেসবাহ্ উদ্দিন আহমদ, রেডিও বাংলাদেশ, ঢাকার সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক জনাব ফজল-এ খোদা, সাপ্তাহিক নতুন বাংলার প্রাক্তন সম্পাদক জনাব শফিকুল মাওলা প্রমুখের নিঃস্বার্থ, সহযোগিতা এ গ্রন্থ প্রকাশকে সহজতর করেছে। তাঁদের সবাইর প্রতি জানাই অন্তরের নিবিড় শ্রদ্ধা। বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি গ্রন্থটি মুদ্রণের গুরুদায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন। এ প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট আধিকারিক ও নিরলস কর্মীবৃন্দকে জানাই ঐকান্তিক ধন্যবাদ। দেশের প্রখ্যাত শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী প্রচ্ছদ এঁকে দিয়ে এ গ্রন্থের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছেন। অফুরন্ত শ্রদ্ধা জানাই তাঁকে। আহমদ পাবলিশিং হাউজের সত্যাধিকারী আলহাজ্ব মহিউদ্দিন আহমদ শুধু গ্রন্থটি পরিবেশনার দায়িত্বই গ্রহণ করেননি, এর প্রকাশেও তিনি উদার সহযোগিতা প্রদান করেছেন। তাঁকেও জানাই অকুণ্ঠ ধন্যবাদ।

অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটি ও বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা প্রার্থী। যোগাযোগ বিলম্ব ঘটায় কিছু কিছু তথ্য সংযোজন সম্ভব হয়নি। উদাহরণ স্বরূপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত ভাস্কর্য 'অপরাজেয় বাংলা' এবং জয়দেবপুর-টঙ্গী চৌরাস্তায় স্থাপিত ভাস্কর্য 'অতন্দ্র প্রহরী'র কৃতি শিল্পী যথাক্রমে সৈয়দ আবদুল্লাহ্ খালেদ এবং জনাব আবদুর রাজ্জাকের নাম ছবির সাথে থাকা সমুচিত ছিল। তা'ছাড়া অসাবধানতা বশতঃ কিছু কিছু তথ্য মূল বক্তব্য থেকে বাদ পড়ে গিয়েছে। এসব তথ্য গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে সংযোজন ও সংশোধনের ইচ্ছা রইল। উল্লেখ্য যে রণাঙ্গনের রাজনৈতিক এবং সমর ব্যক্তিত্ব ও গুণীজনের সাক্ষাৎকার গ্রহণে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা এক দুঃসাধ্য কাজ। বলাবহুল্য, যাঁরা ইতিমধ্যে আমাদের মাঝ থেকে হারিয়ে গেছেন, তাঁদের শূন্যতা আর কখনো পূরণ করা সম্ভব নয়। যাঁরা আছেন আমাদের মাঝে

সঠিক ঠিকানা সংগ্রহ করে তাঁদের সাথে যোগাযোগ করা শুধু সময় সাপেক্ষ নয়, ব্যয়সাপেক্ষও বটে। আবার অনেকে একাধিক বার যোগাযোগের পরও সাক্ষাৎকার দিতে পারেননি। কাজেই আলোচ্য গ্রন্থে সাক্ষাৎকার ইত্যাদি সংযোজনে আমাকেও একই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তবু আমি আশাবাদী। শীঘ্রই গ্রন্থটির একটি দ্বিতীয় খণ্ড ছাপানোর পরিকল্পনাও আমার রয়েছে। কাজেই একাত্তরের রণাঙ্গন প্রসঙ্গে সহৃদয় পাঠক পাঠিকার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত যে কোনও সংশোধনী বা প্রশাসনিক উপদেশাবলী সাদরে গৃহীত হবে।

ঢাকা
২২ শে জুন, ১৯৮২

শামসুল হুদা চৌধুরী

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নবম পরিচ্ছেদ

দশম পরিচ্ছেদ

একাদশ পরিচ্ছেদ

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ত্রয়োদশ অধ্যায়

এলবাম ও প্রামাণ্য দলিল — পৃষ্ঠা সংকেত

একাত্তরের রণাঙ্গন

এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম ঃ
লক্ষ জনতার মুহুর্মুহু স্লোগান এবং করতালির মধ্যে বঙ্গবন্ধুর উদাত্ত ঘোষণা (৭ই মার্চ, '৭১, ঢাকার রেসকোর্স ময়দান)।
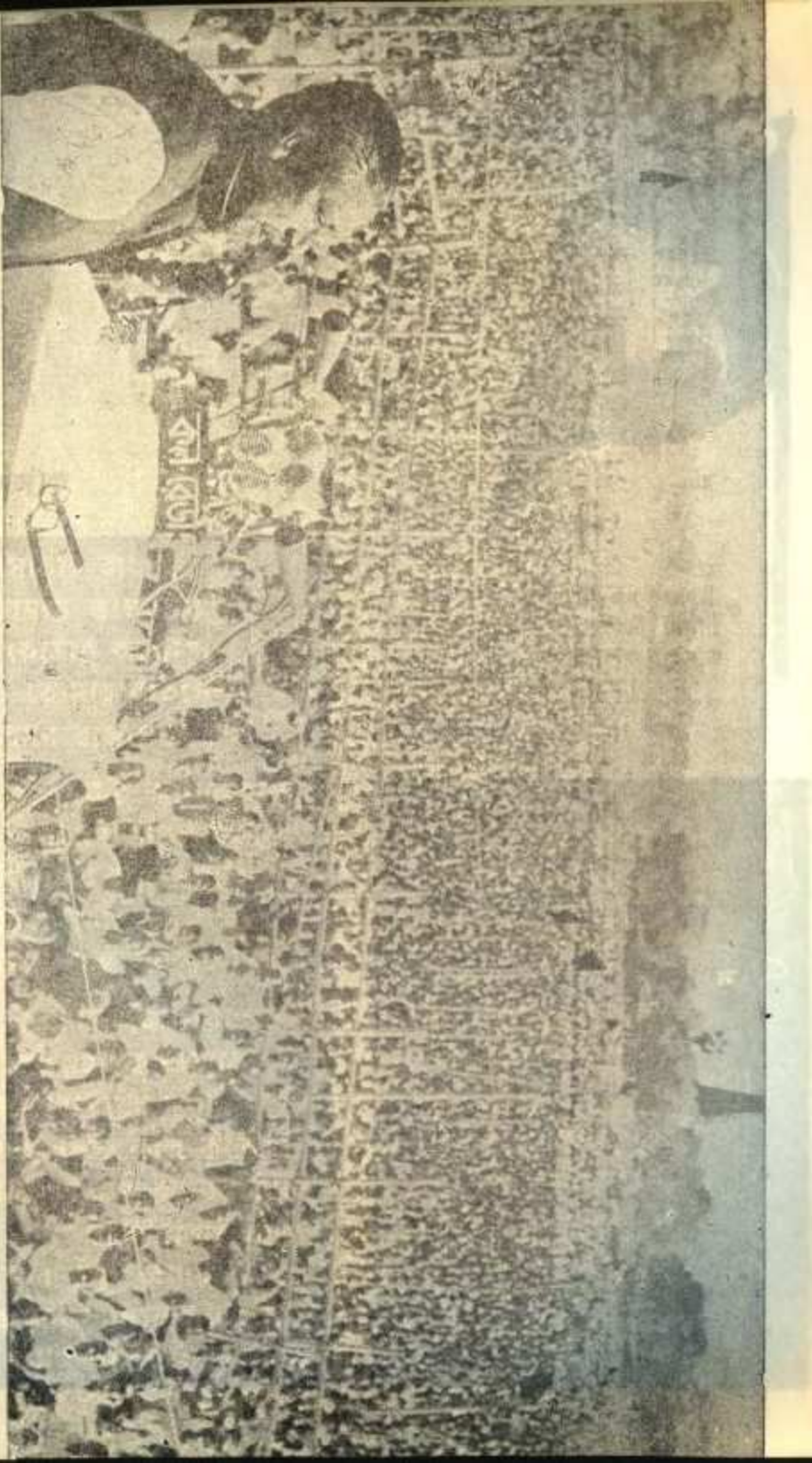
জাতীয় সঙ্গীত

আমার সোনার বাংলা,
আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ,
তোমার বাতাস—
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী ॥

ওমা, ফাগুনে তোর আমের বনের
ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায়রে—
ওমা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে
আমি কি দেখেছি মধুর হাসি ॥

কি শোভা কি ছায়াগো,
কি স্নেহ কি মায়াগো—
কি আঁচল বিছায়েছ
বটের মূলে নদীর কূলে কূলে।
মা তোর মুখের বাণী আমার কানে
লাগে সুধার মতো
মরি হায়, হায়রে—
মা তোর বদনখানি মলিন হলে
আমি নয়নজলে ভাসি ॥

মুক্তিযুদ্ধ কালীন জাতীয় পতাকা

দেশ শত্রু মুক্ত হওয়ার পর গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরবর্তী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বর্তমান পতাকা থেকে শুধু মাত্র মানচিত্রটি বাদ দেয়া হয়েছে।

রণ সঙ্গীত

মানচিত্রে রণাঙ্গন
(বাংলাদেশে)

শিলিগুড়ি
৬ সেক্টর
উত্তর
ভারত
রংপুর
দিনাজপুর
মেঘালয়
৭ সেক্টর
১১ সেক্টর
৫ সেক্টর
আসাম
বগুড়া
ময়মনসিংহ
সিলেট
৪ সেক্টর
রাজশাহী
টাঙ্গাইল
পাবনা
ঢাকা
৩ সেক্টর
কুষ্টিয়া
৮ সেক্টর
ফরিদপুর
ত্রিপুরা
২ সেক্টর
কুমিল্লা
১ সেক্টর
যশোহর
পশ্চিমবঙ্গ
খুলনা
নোয়াখালী
৯ সেক্টর
বরিশাল
পটুয়াখালী
রাঙ্গামাটি
চট্টগ্রাম
বঙ্গোপসাগর
কক্সবাজার
বার্মা

সংকেত
জেলা হেডকোয়ার্টার
সেক্টর সীমানা
সেক্টর নম্বর
সেক্টর হেডকোয়ার্টার

অতন্দ্র প্রহরী
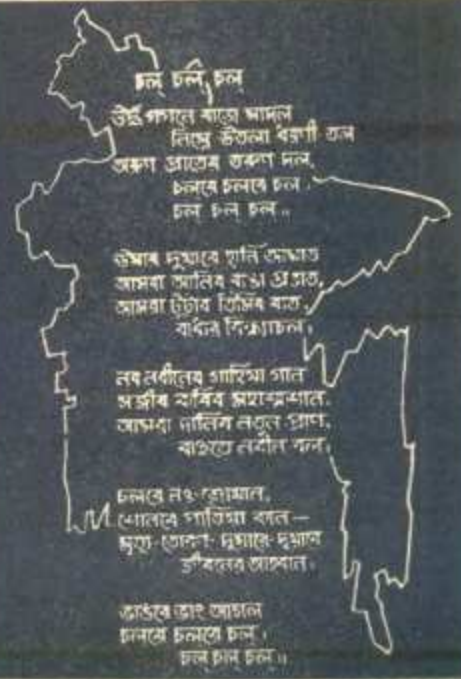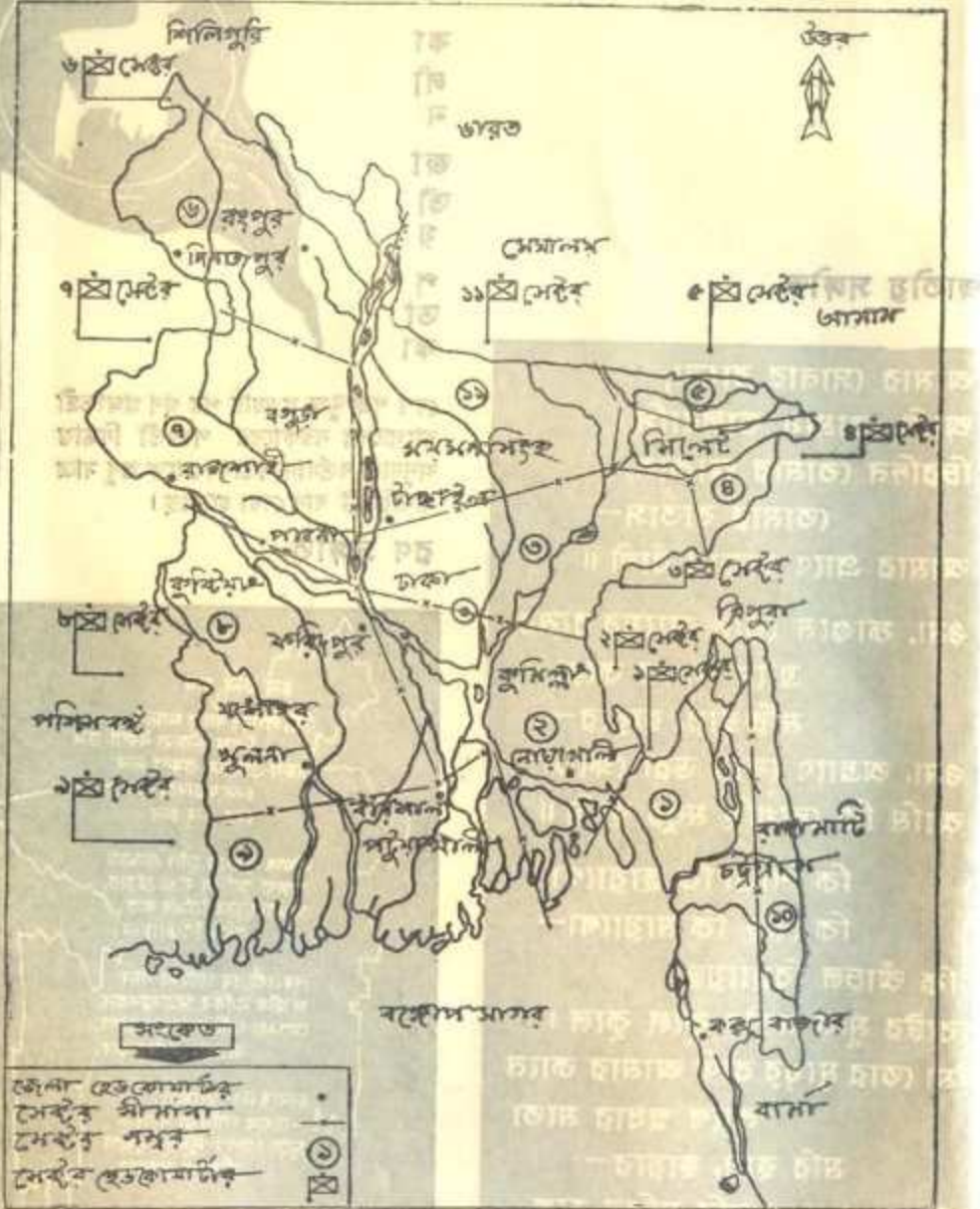
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধার প্রতীক। এই প্রতীক স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর '৭২ সালের প্রথম দিকে ঢাকার অদূরে জয়দেবপুর চৌরাস্তার স্থাপিত হয়। ১৯শে মার্চ '৭১ এই জয়দেবপুরবাসীই হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ সংঘর্ষে অবতীর্ণ হওয়ার দুঃসাহস করেছিলেন।

(এই ভাস্কর্যের স্থপতি : শিল্পী আবদুর রাজ্জাক)

অপরাজেয় বাংলা

মুক্তি যুদ্ধের স্মরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা ভবনে নির্মিত ভাস্কর্য। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘ চব্বিশ বছরের ইতিহাস এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এখান থেকেই উৎসারিত হয়েছে এ দেশের প্রতিটি স্বাধীনতা আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব।

(এই ভাস্কর্যের স্থপতি : শিল্পী সৈয়দ আবদুল্লাহ্ খালেদ)

চট্টগ্রাম বেতারের ঐতিহাসিক কালুরঘাট ট্রান্সমিটার

এই ট্রান্সমিটারের সাহায্যেই ২৬শে মার্চ, '৭১ সন্ধ্যা ৭ টা ৪০ মিঃ সময়ে চট্টগ্রামের কয়েকজন দুঃসাহসী শব্দ সৈনিক স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র নাম ঘোষণার মাধ্যমে ইথারে প্রথম আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে; তাঁরা জানিয়েছিলেন সাড়ে সাতকোটি বাঙ্গালী (বাংলাদেশী) ও বিশ্ববাসীকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা এবং যুদ্ধ শুরুর প্রথম বার্তা।

কালুরঘাট ট্রান্সমিটারের ষ্টুডিও বুথ। এই বুথ থেকেই মেজর (তৎকালীন এবং পরবর্তীকালে শহীদ রাষ্ট্রপতি) জিয়াউর রহমান ১৯৭১ সালের ২৭শে মার্চ ঐতিহাসিক স্বাধীনতা ঘোষণা প্রচার করেছিলেন।
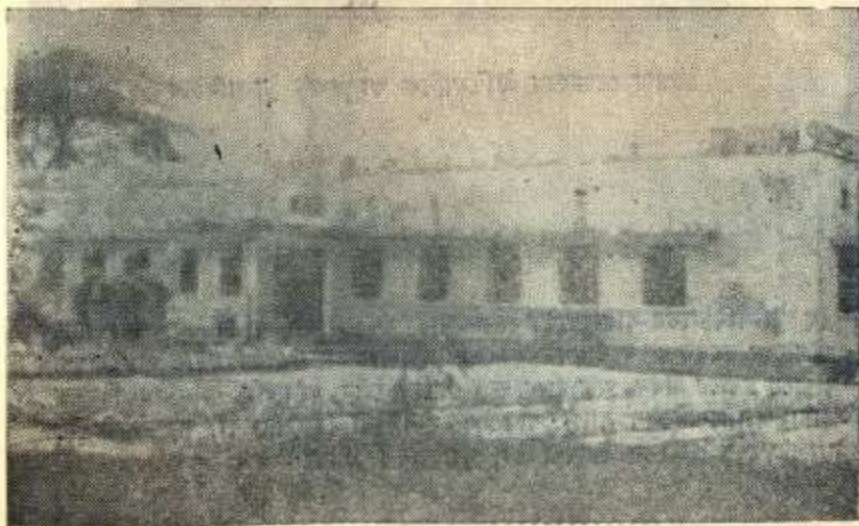
কালুরঘাট ট্রান্সমিটার ভবন

একাত্তরে বাঙ্গালী হত্যার অন্তরালে

প্রধান নায়ক

জেনারেল এহিয়া খান

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ('৬৯—'৭১)

প্রধান কুচক্রী

জুল্‌ফিকার আলী ভুট্টো
পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টির চেয়ারম্যান (তৎকালীন)

হত্যাকাণ্ডের নীল নক্সার তিন সহযোগী

লেঃ জেনারেল টিক্কা খান
গভর্নর এবং মার্শাল ল এডমিনিস্ট্রেটার

লেঃ জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ্ খান নিয়াজী
কমাণ্ডার ইষ্টার্ণ কমাণ্ড

মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী
গভর্ণরের উপদেষ্টা

ওরা চেয়েছিল বাঙ্গালী জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পৃথিবী থেকে ; চালিয়েছিল দীর্ঘ ন'মাস ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম হত্যালীলা ।

বাংলার দামাল ছেলেরা রুখে দাঁড়িয়েছিল প্রবল বিক্রমে শত্রুর বর্বর হামলা প্রতিহত করতে।

দিকে দিকে শুরু হয় যুদ্ধের প্রস্তুতি।
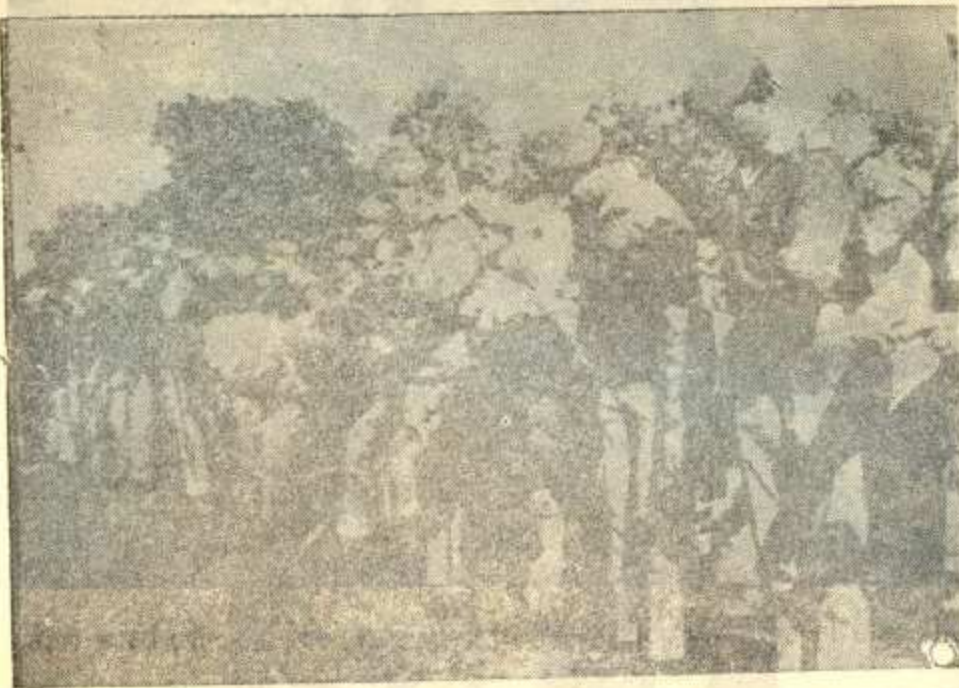
ন'মাস যুদ্ধ শেষে এলো চূড়ান্ত বিজয়ের দিন। হানাদার বাহিনী বাধ্য হ'ল অস্ত্র সমর্পন করতে, ১৬ই ডিসেম্বর '৭১ রাজধানী ঢাকার সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে।

হানাদার বাহিনীর পক্ষে আত্মসমর্পন দলিলে স্বাক্ষর করলেন লেঃ জেনারেল নিয়াজী (মধ্যে)। আর এ সাথেই শেষ হ'ল ন'মাস ব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ, বাঙ্গালীর স্বাধীনতা যুদ্ধ।

এই সেই আত্মসমর্পন দলিল

INSTRUMENT OF SURRENDER

The PAKISTAN Eastern Command agree to surrender all PAKISTAN Armed Forces in BANGLA DESH to Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA, General Officer Commanding in Chief of the Indian and BANGLA DESH forces in the Eastern Theatre. This surrender includes all PAKISTAN land, air and naval forces as also all para-military forces and civil armed forces. These forces will lay down their arms and surrender at the places where they are currently located to the nearest regular troops under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

The PAKISTAN Eastern Command shall come under the orders of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA as soon as this instrument has been signed. Disobedience of orders will be regarded as a breach of the surrender terms and will be dealt with in accordance with the accepted laws and usages of war. The decision of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA will be final, should any doubt arise as to the meaning or interpretation of the surrender terms.

Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA gives a solemn assurance that personnel who surrender shall be treated with dignity and respect that soldiers are entitled to in accordance with the provisions of the GENEVA Convention and guarantees the safety and well-being of all PAKISTAN military and para-military forces who surrender. Protection will be provided to foreign nationals, ethnic minorities and personnel of WEST PAKISTAN origin by the forces under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

Jagjit Singh	AAK Niazi Lt-Gen
(JAGJIT SINGH AURORA)	(AMIR ABDULLAH KHAN NIAZI)
Lieutenant-General	Lieutenant-General
General Officer Commanding in Chief Indian and BANGLA DESH Forces in the Eastern Theatre	Martial Law Administrator Zone B and Commander Eastern Command (PAKISTAN)
16 December 1971.	16 December 1971.

মুক্তিবাহিনীর বিজয় উল্লাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

একটি জাতির জন্ম

বাংলার স্বাধীনতা

পলাশীর প্রান্তরে ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন বাংলার আকাশ থেকে যে স্বাধীনতা সূর্য্য অস্তমিত হয়েছিল, সেই সূর্য্য পরাধীনতার দু'শ বছরের অন্ধকার পথ পেরিয়ে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার সবুজ দিগন্তে আবার উদিত হয়েছে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর। রাজধানী ঢাকার সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে এই দিন সম্মিলিত মিত্র ও মুক্তিবাহিনীর কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করেছিল তৎকালীন পাকিস্তানের শেষ প্রেসিডেন্ট এহিয়া খানের হানাদার সৈন্য-বাহিনী। আর সেই আনুষ্ঠানিকতার সাথেই থেমে গিয়েছিল বাংলাদেশের ন'-মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধ; বাঙ্গালী পরিপূর্ণতা লাভ করল একটি স্বাধীন সার্বভৌম জাতি হিসেবে; পৃথিবীর মানচিত্রে চিত্রিত হ'ল একটি নূতন এলাকা; সংযোজিত হ'ল একটি নূতন স্বাধীন দেশ—'বাংলাদেশ'।

মূলতঃ ২৫শে মার্চ '৭১ একান্ত আকস্মিক ভাবে সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল যে রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধ, ন'মাস শেষে ১৬ই ডিসেম্বর, '৭১ সেই যুদ্ধেরই যবনিকাপাত ঘটেছিল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের মাধ্যমে।

স্পষ্টতঃই '৭১-এর ন'মাস ছিল আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রান্তিকাল। কিন্তু বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস কেবলমাত্র '৭১-এর ন'মাসের মধ্যেই সীমিত নয়। নবাব আলীবর্দী খাঁ প্রতিষ্ঠিত বাংলার স্বাধীন নবাবীর পতনকাল অর্থাৎ ১৭৫৭ সাল থেকে পরবর্তী দু'শ বছরেও সীমিত নয় আমাদের সংগ্রামের এ ইতিহাস। প্রায় দু'হাজার বছরেরও উর্দ্ধকাল বাংলার মাটিতে পালাবদল ঘটেছে বহু রাজা এবং রাজবংশের। কিন্তু খৃষ্টপূর্ব ৩২১ অব্দে উদ্ভূত মৌর্য্য রাজবংশ থেকে পাকিস্তানের শাসককুল পর্যন্ত সবাই ছিলেন বিদেশী। তবে গ্রীক লেখক-গণের বর্ণনায় গঙ্গরিডাই বা গঙ্গারিডুই নামে যে এক পরাক্রমশালী জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়, ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে সম্ভবতঃ তাঁরা বাংলাদেশের অধিবাসী ছিলেন। অপরদিকে পুরান, মহাভারত ও পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে

বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতির যেসব উল্লেখ পাওয়া যায়, সেগুলি থেকে অনুমিত হয় যে প্রাচীন বাংলার আর্য প্রভাবযুক্ত কিছু খণ্ড রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতবর্ষে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের সুযোগে বাংলায় বঙ্গ-রাজ্য নামে একটি স্বাধীন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। গোপচন্দ্র ছিলেন এই রাজ্যের প্রথম নরপতি। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে বা সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে শশাঙ্ক নামক আর এক নরপতি বঙ্গ রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্বাধীন গৌড় রাজ্য। তাঁকে মনে করা হয় প্রাচীন বঙ্গের সব চাইতে পরাক্রমশালী স্বাধীন নরপতি। এমনিভাবে পরবর্তীকালে বাংলার শাসককুলের তালিকার স্থান করে নিয়েছিলেন পাল বংশ, সেন বংশ, তুর্কীর মুসলমানগণ, পাঠান, মুঘল, বৃটিশ এবং সর্বশেষে পাকিস্তানী নয়া উপনিবেশবাদী চক্র। তাঁরা ছিলেন বিদেশী। কিন্তু বিদেশী হলেও পাল বংশ, তুর্কী ও পাঠান সুলতানগণ, ঈশা খাঁ, কেদার রায় এবং নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা প্রমুখ ভালবেসেছিলেন বাংলাকে। তাঁরা প্রাণপাত করতেও দ্বিধাবোধ করেননি বাংলা ও বাঙ্গালীর জন্য। পলাশীর প্রান্তরে প্রধান সেনাপতি মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতা এবং ষড়যন্ত্রে বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক ক্ষুদে বাহিনীর হাতে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার পরাজয় এবং শোচনীয় মৃত্যুবরণ এমনি এক মর্মান্তিক ঘটনা।

পলাশীর প্রান্তরে নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার পরাজয়ের পর শুধু বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যাই নয়, ক্রমে পুরো ভারত উপমহাদেশই বৃটিশ সাম্রাজ্যের পদানত হয়েছিল। কেটে গেছে পরাধীনতার গ্লানিময় দু'শ বছরের আর এক অন্ধকার অধ্যায়। পরবর্তীকালে সংগ্রাম এবং আত্মত্যাগের বহু পথ অতিক্রম করে ভারতবাসী তা'দের দীর্ঘ দিনের হারানো স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছিল—ভারত এবং পাকিস্তান নামে দু'টি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। কিন্তু বহু ত্যাগ এবং রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এ স্বাধীনতা লাভের পর দেখা গেল পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলের শাসকচক্র এর পূর্বাঞ্চলকে কলোনীর চাইতে বেশী মর্যাদা দিতে সম্মত হ'ল না। পাকিস্তান সৃষ্টির এক বছর পার হতে না হতেই ওরা আঘাত হানলো পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর।

স্বাধিকার আন্দোলনের সূত্রপাত

১৯৪৮ সালে তৎকালীন গভর্নর জেনারেল ও পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ঢাকা এলেন। ২১শে মার্চ '৪৮ তিনি ঢাকার রেস্ কোর্স ময়দানের (বর্তমান সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান) বিশাল জনসভায় ঘোষণা করলেন —উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা। উক্ত বিশাল জনসভায়

উপস্থিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্রের সেদিনের প্রথম প্রতিবাদ জনতার গুঞ্জনে মিশে গিয়েছিল। কিন্তু তাঁরা মিঃ জিন্নাহ্‌র এ জাতীয় উক্তিকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি। মাত্র তিন দিন পর অর্থাৎ ২৪শে মার্চ, ১৯৪৮ মিঃ জিন্নাহ্ কার্জন হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন উৎসবে পুনরাবৃত্তি করলেন রাষ্ট্র ভাষা সম্পর্কে তাঁর ঐ একই মন্তব্য। সেদিন কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রস্তুত হয়ে এসেছিলেন ভাষা সম্পর্কে মিঃ জিন্নাহ্‌র যে কোনও বিতর্কমূলক উক্তির প্রতিবাদের জন্য। ৪০-এর দশকের ফরিদপুরের টুঙ্গিপাড়ার অখ্যাত এক কিশোর বালক, ৪৫-৪৮ এর ছাত্র নেতা, ৪৮-৭০ এর স্বাধিকার সংগ্রামী এবং ৭০-৭১ এর বঙ্গবন্ধু ও বাঙ্গালী জাতির স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান সহ কয়েকজন ছাত্র নেতা সেদিন সমস্বরে গর্জে উঠেছিলেন রাষ্ট্র ভাষার ওপর মিঃ জিন্নাহ্‌র এক তরফা মন্তব্যের প্রতিবাদে। তাঁরা মিঃ জিন্নাহ্‌র মুখের কথা শেষ না হতেই 'না না' বলে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ ধ্বনিতে প্রকম্পিত করেছিলেন পুরো কার্জন হল।

পূর্ব বাংলার মানুষ তখন থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের মাধ্যমে তাঁরা ১৯৪৭ সালে খণ্ডিত স্বাধীনতা পেলেও তাঁদের স্বাধিকারের সংগ্রাম শেষ হয়নি। পুনরায় তাঁরা সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন স্বাধিকার আদায়ের লক্ষ্যে। প্রয়োজন হলো আরো আত্ম ত্যাগের, আরো অধিক রক্ত দানের। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী বাংলার মানুষ ঢাকার বুকে রক্ত ঢেলে দিল। শহীদ হলেন বরকত, সালাম, জব্বার, রফিক প্রমুখ ছাত্র-জনতা। ক্রমে এই ভাষা আন্দোলন রূপ পরিগ্রহ করলো সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামে।

'৫২ সালের ভাষা আন্দোলন পেরিয়ে এলো '৫৪ সালের নির্বাচন, '৫৬ সালের পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র, '৫৮ সালের আয়ুব খানের স্বৈরাচারী সামরিক শাসন, '৬২ সালের কুখ্যাত হামুদুর রহমানের শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট এবং '৬৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তনে মোনেম খাঁর বিরুদ্ধে ছাত্র বিক্ষোভ।

শেখ মুজিবের ছ'দফা

এমনিভাবে ক্যালেণ্ডারের পাতা থেকে এক একটি বছর যেতে লাগল সংগ্রামের এক একটি অধ্যায় হয়ে। এলো ১৯৬৬ সাল। এই বছরই শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকার আদায়ের লক্ষ্যে লাহোরে উপস্থাপন করেছিলেন ঐতিহাসিক ছ' দফা। এই ছ' দফা প্রস্তাব ছিল নিম্নরূপ:

১। ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানকে একটি সত্যিকারের

ফেডারেশন রূপে গড়িতে হইবে। তাহাতে পার্লিয়ামেন্ট পদ্ধতিতে সরকার থাকিবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কদের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হইবে। আইন-সভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকিবে।

২। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে মাত্র দুইটি বিষয় থাকিবে—প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় ষ্টেটসমূহের (বর্তমান ব্যবস্থায় যাহাকে প্রদেশ বলা হয়) হাতে থাকিবে।

৩। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে দু'টি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ বিনিয়োগযোগ্য মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। অথচ দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সি থাকিবে। শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিষয় থাকিবে যাহাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে। দুই অঞ্চলে দুইটি আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে।

৪। সকল প্রকারের ট্যাক্স-খাজনা ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সেই ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউর একটি অংশ ফেডারেল তহবিলে জমা হইয়া যাইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সমূহের ওপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকিবে। এইভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের তহবিল হইবে।

৫। দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আদায়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখিতে হইবে। এই অর্থে স্ব স্ব আঞ্চলিক সরকারের এখতিয়ার থাকিবে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা দুই অঞ্চল সমানভাবে দিবে অথবা সংবিধানের নির্ধারিত হারে আদায় হইবে। বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপন ও আমদানী রপ্তানীর অধিকার আঞ্চলিক সরকারের থাকিবে।

৬। বাংলাদেশের জন্য মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারী রক্ষীবাহিনী গঠন করা হইবে এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আত্মনির্ভর হইবে।

স্পষ্টতঃই শেখ মুজিবের ছয় দফা প্রস্তাব ছিল ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব বা পাকিস্তান প্রস্তাবেরই একটি পরিবর্তিত রূপ মাত্র। তৎকালীন পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন শাসকচক্র শেখ মুজিবুর রহমানের এই প্রস্তাবকে চিহ্নিত করলেন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের কৌশল হিসেবে। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান ছ' দফার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিষোদগারণ শুরু করলেন। ৮ই মে রাতে শেখ মুজিব ও কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতাকে দেশ রক্ষা আইনে গ্রেফতার করা হ'ল। প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ১৩ই মে '৬৬ প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। আওয়ামী লীগের আহ্বানে ৭ই জুন '৬৬ ছ' দফার দাবীতে সারা প্রদেশব্যাপী

পালিত হয় গণ আন্দোলন ও সর্বাত্মক হরতাল। ধর্মঘটি জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ ও ই. পি. আর বাহিনী বেপরোয়া গুলি চালালো। ফলে ঢাকা সহ প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে হতাহত হয়েছিলেন বহু লোক এবং বন্দী হয়েছিলেন বহু রাজনৈতিক এবং ছাত্র নেতা।

ষড়যন্ত্র ও হত্যার রাজনীতি

তারপর দীর্ঘ দিন শেখ মুজিবের ওপর চলল গ্রেফতারী পরোয়ানা, জেল-হাজত এবং মুক্তির প্রহসন। ৭ই জুন '৬৮ মুক্তি পেয়ে জেল কটকেই বন্দী হলেন তিনি। পরবর্তীকালে কুখ্যাত আগরতলা মামলায় লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেমের পরিবর্তে তাঁকেই জড়িত করা হ'ল এক নম্বর আসামী হিসেবে। দুই নম্বর আসামী থাকলেন লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম। আগরতলা মামলার প্রহসন চলাকালে ১২ই ফেব্রুয়ারী '৬৯ জেল হাজতেই নির্মমভাবে হত্যা করা হ'ল আগরতলা মামলার অন্যতম আসামী সার্জেণ্ট জহুরুল হককে। স্বৈরাচারী শাসক চক্রের পরবর্তী শিকার হলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ডক্টর শামসুজ্-জোহা। হানাদার সৈন্যদল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে তাঁকে বেয়নেটের আঘাতে নির্মমভাবে হত্যা করল ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯।

তৎকালীন পাকিস্তানের সামরিক চক্রের এমনি নৃশংস হত্যাকাণ্ডে সারা পূর্ব বাংলা এক চরম ক্ষোভ এবং আক্রোশে ফেটে পড়ল। রাজধানী ঢাকা সহ প্রদেশের সর্বত্র দুর্ভেদ্য জনতার একই আওয়াজ: স্বৈরাচারী সরকারের পতন চাই। সামরিক বাহিনী নামল রাস্তায়। ওরা কার্ফিউ দিয়ে বুটের তলায় নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইল জনতার দাবীকে। কিন্তু বিফল হ'ল। আয়ুব খান বাধ্য হয়েছিলেন কুখ্যাত আগরতলা মামলা তুলে নেয়ার জন্য।

আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের পর ২২শে ফেব্রুয়ারী '৬৯ জেল হাজত থেকে মুক্তি পেলেন শেখ মুজিব। সেখান থেকে সরাসরি তিনি গেলেন রাওয়ালপিণ্ডি আয়ুব খান আহূত গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য। মওলানা ভাসানীও একই সাথে রাওয়ালপিণ্ডি গেলেন এবং এই বৈঠকে যোগ দিলেন। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রতিনিধিত্ব করলেন জুলফিকার আলী ভুট্টো সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিগণ। শেখ মুজিবুর রহমান এই বৈঠকেই পুনরায় উপস্থাপন করলেন তাঁর ঐতিহাসিক ছ' দফা প্রস্তাব। কিন্তু এবারও প্রত্যাখ্যাত হ'ল তাঁর ছ' দফা প্রস্তাব। আয়ুব খানের গোল টেবিল বৈঠকও একই সাথে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ'ল।

আইয়ুবের স্থলাভিষিক্ত হলেন এহিয়াঃ নির্বাচন প্রহসন

জনতার দুর্নিবার দাবীকে উপেক্ষা করতে পারেননি আয়ুব খানের মত পরাক্রমশালী স্বৈরাচারী একনায়কও। মাথা নোয়াতে হ'ল তাঁকে। ক্ষমতা হস্তান্তর করলেন তিনি ঠিকই। কিন্তু সে ক্ষমতার মালিক জনগণ হলেন না। ক্ষমতা তুলে দিলেন তিনি তাঁরই উত্তরসূরী আর এক পরাক্রমশালী সামরিক দোসর এহিয়া খানের হাতে। ক্ষমতা হাতে পেয়ে এহিয়া খান বহু সুন্দর সুন্দর কথা বললেন। প্রতিশ্রুতি দিলেন কালবিলম্ব না করে দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন দেয়ার জন্য।

'৭০-এ দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল। এই নির্বাচনে আওয়ামী-লীগ পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত মোট ১৬৯টি আসনের মধ্যে মোট ১৬৭টি আসন লাভ করলেন। কিন্তু নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করা সত্বেও শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগকে সরকার গঠন করতে দেয়া হয়নি। অপরদিকে ১২ই এবং ১৩ই জানুয়ারী. '৭১ এহিয়া খান বৈঠক ডাকলেন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে নব নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ আহ্বান প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য। একই ভাবে ১৭ই জানুয়ারী. '৭১ তিনি পৃথক আলোচনায় বসলেন পশ্চিম পাকিস্তান সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন প্রাপ্ত পিপল্‌স্ পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে। পশ্চিম পাকিস্তানের লারকানায় অনুষ্ঠিত ১৭ই জানুয়ারী. '৭১-এর উক্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধান সেনাপতি জেনারেল আবদুল হামিদ খান ও লেঃ জেনারেল পীর জাদা।

পাকিস্তানে একটি নূতন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ঐক্যমতের লক্ষ্যে ২৭ এবং ২৮শে জানুয়ারী. '৭১ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হ'ল মুজিব-ভুট্টো বৈঠক। এই বৈঠকেই শেখ মুজিব আহ্বান জানিয়েছিলেন ১৫ই ফেব্রুয়ারী. '৭১ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন ডাকার জন্য। কিন্তু এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন জুলফিকার আলী ভুট্টো। তিনি ভিন্ন মত প্রকাশ করলেন ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহে এই অধিবেশন ডাকার জন্য। লাহোর প্রস্তাব ভিত্তিক আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসনের জন্য ছ' দফার আলোকে গঠনতন্ত্র প্রণয়নের যৌক্তিকতা ও তিনি অস্বীকার করলেন। কাজেই পাকিস্তানের গঠনতন্ত্র প্রণয়নের লক্ষ্যে আহুত মুজিব-ভুট্টো বৈঠক ও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ'ল।

এমনি দ্রুত রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে প্রেসিডেন্ট এহিয়া খান এক বেতার ভাষণে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন ঢাকায় অনুষ্ঠানের

জন্য ৩রা মার্চ. '৭১ধার্য্য করলেন। অপরদিকে ছ' দফার পুনর্বিন্যাস দাবীতে ১৫ই ফেব্রুয়ারী '৭১ আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভুট্টো জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বয়কটের হুমকি দিলেন।

১৯শে ফেব্রুয়ারী. '৭১ রাওয়ালপিণ্ডিতে অনুষ্ঠিত হ'ল এহিয়া-ভুট্টো বৈঠক। ২২শে ফেব্রুয়ারী '৭১ প্রেসিডেন্ট এহিয়া খান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভা বাতিল ঘোষণা করলেন। একান্ত নাটকীয় ভাবে তিনি ৩রা মার্চ. '৭১ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ও স্থগিত ঘোষণা করলেন অধিবেশন শুরুর মাত্র তিন দিন আগে অর্থাৎ ১লা মার্চ. '৭১। একই সাথে এহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসনেরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করলেন। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর-এর পদ থেকে ভাইস এডমিরাল আহসানকে অপসারণ করে তদস্থলে এই প্রদেশের সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল সাহেব জাদাকে দিলেন গভর্ণরের অতিরিক্ত দায়িত্ব ভার।

পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য ঢাকাতে সাংবাদিক সম্মেলন ডাকলেন শেখ মুজিব। এহিয়া খান কর্তৃক প্রথম জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ জানালেন তিনি উক্ত সম্মেলনের মাধ্যমে। ২রা মার্চ, '৭১ ঢাকা শহর এবং ৩রা মার্চ, '৭১ প্রদেশব্যাপী হরতাল পালন সহ ৭ই মার্চ '৭১ রেস কোর্স ময়দানে জনসভা আহ্বান করলেন শেখ মুজিব। বস্তুতঃ তখন থেকেই শুরু হয়েছিল শেখ মুজিবের অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী।

ঘোষণানুযায়ী ২রা মার্চ, '৭১ ঢাকা শহরে পূর্ণ হরতাল পালিত হ'ল। দুপুরে পল্টন ময়দানে ছাত্র লীগের তৎকালীন সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় তৎকালীন সহ-সভাপতি আ, স, ম, আবদুর রব স্বাধীন বাংলার প্রথম পতাকা উত্তোলন করলেন। গুলি বর্ষিত হ'ল হরতালকারীদের ওপর। উত্তাল জনতা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তাদের প্রতিহত করার জন্য জারী করা হ'ল কার্ফিউ। কিন্তু জনতা কার্ফিউর আদেশ অমান্য করে মশাল মিছিল বের করলেন ঢাকার রাজপথে। ব্যারিকেড সৃষ্টি করলেন সেনাবাহিনীর চলাচল প্রতিহত করার জন্য। ক্রমে পরিস্থিতি আরো চরমে পৌঁছল। প্রদেশের বিভিন্ন জেলা থেকেও গুলি বর্ষণের দুঃসংবাদ এলো।

নূতন আর এক চাল খেললেন এহিয়া খান। জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের পরিবর্তে তিনি ৩রা মার্চ, '৭১ জাতীয় পরিষদের পার্লামেন্টারী গ্রুপের বার জন নেতার বৈঠক আহ্বান করলেন। কিন্তু শেখ মুজিব এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলেন। এইদিনই অনুষ্ঠিত হয়েছিল পল্টন ময়দানে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ছাত্র-গণ জমায়েত। ৩রা মার্চ, '৭১-এর এই ছাত্র-গণ জমায়েতেই

বাঙ্গালী জাতীয় সত্বার বিকাশ ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রথম ঘোষণাপত্র পাঠ করলেন তৎকালীন ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শাহজাহান সিরাজ। এই সভাতেই শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীন বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক ঘোষণা করা হয়েছিল এবং নির্দ্ধারণ করা হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশ-এর জাতীয় সঙ্গীত ও জাতীয় পতাকা। পরদিন অর্থাৎ ৪ঠা মার্চ, '৭১ প্রদেশব্যাপী সকল সরকারী-বেসরকারী অফিস-আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সামগ্রিক যান-বাহন ব্যবস্থা সহ ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের এমনি দুর্বার গণ আন্দোলনকে ব্যহত করার জন্য প্রেসিডেণ্ট এহিয়া খান নূতন সামরিক আইন প্রশাসক এবং গভর্ণর হিসেবে পাঠালেন দুর্দ্দর্শ জেনারেল টিক্কা খানকে। ৫ই মার্চ, '৭১ তিনি ঢাকা পৌছলেন। কিন্তু ৭ই মার্চ, '৭১ পূর্ব পাকিস্তান হাই কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি বি. এ. সিদ্দিকী গভর্ণর পদে জেনারেল টিক্কা খানের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনায় অস্বীকৃতি জানিয়ে গণ আদালত এবং গণ জাগরণের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এক দুঃসাহসী নজির স্থাপন করলেন।

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ

এলো ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ, '৭১। দ্বি-প্রহর না যেতেই স্মরণাতীতকালের উত্তাল জনতার মিছিলে মিছিলে ভরে গেল ঢাকার রেস কোর্স ময়দান। সবাই অপেক্ষা করছেন বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ শোনার জন্য। বেলা অপরাহ্ণ প্রায় চারটার সময় লক্ষ জনতার মুহুর্মুহু শ্লোগান এবং করতালির মধ্যে নেতা সভামঞ্চে এসে দাঁড়ালেন। একটা নতুন নির্দেশের আশায় লক্ষ জনতার নিবিষ্ট দৃষ্টি তখন শেখ মুজিবের প্রতি। মূলতঃ ৭ই মার্চ, '৭১-এর ঐতিহাসিক ভাষণই ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপক্ষে শেখ মুজিবের পরোক্ষ ঘোষণা। তাঁর ৭ই মার্চ '৭১-এর ঐতিহাসিক ভাষণের পূর্ণ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হ'ল:

"আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সকলে জানেন এবং বোঝেন আমরা আমাদের জীবন দিয়া চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ অধিকার চায়। কি অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেমব্লি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরী করবো

এবং এদেশের ইতিহাসকে আমরা গড়ে তুলবো। এদেশের মানুষ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবেন। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলছি বাংলাদেশের করুণ ইতিহাস, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস—এই রক্তের ইতিহাস মুমূর্ষু মানুষের করুণ আর্তনাদ—এদেশের করুণ ইতিহাস, এদেশের মানুষের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে আমরা রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারিনি। ১৯৫৮ সালে আয়ুব খাঁ মার্শাল-ল জারী করে ১০ বছর আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬১ সালের আন্দোলনে আয়ুব খাঁর পতনের পরে ইয়াহিয়া এলেন। ইয়াহিয়া খান সাহেব বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন—আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হোল। প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম, ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আমাদের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে সভা হবে। আমি বললাম, ঠিক আছে, আমরা এসেমব্লিতে বসবো। আমি বললাম, এসেমব্লির মধ্যে আলোচনা করবো—এমনকি এও পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশী হলেও একজনের মতেও যদি তা ন্যায্য কথা হয়, আমরা মেনে নেব।

ভুট্টো সাহেব এখানে ঢাকায় এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন, আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরো আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করলাম—আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরী করবো—সবাই আসুন, বসুন। আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরী করবো। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বার যদি আসে তাহলে কসাইখানা হবে এসেমব্লি। তিনি বললেন যে, যে যাবে তাদের মেরে ফেলে দেওয়া হবে। যদি কেউ এসেমব্লিতে আসে পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত সব জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম এসেমব্লি চলবে। আর হঠাৎ মার্চের ১লা তারিখ এসেমব্লি বন্ধ করে দেওয়া হলো।

ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেণ্ট হিসেবে এসেমব্লি ডেকেছিলেন। আমি বললাম, আমি যাবো। ভুট্টো বললেন, যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে এলেন। তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হোল, দোষ দেওয়া হোল বাংলার মানুষের, দোষ দেওয়া হোল আমাকে। দেশের মানুষ প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল।

আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালন করুন। আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো, সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোল। আমি বললাম, আমরা জামা কেনার পয়সা দিয়ে অস্ত্র পেয়েছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করবার জন্য। আজ সেই অস্ত্র আমার দেশের গরীব দুঃখী মানুষের বিরুদ্ধে—তার বুকের উপর হচ্ছে গুলী। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু—আমরা বাঙালীরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

আমি বলেছিলাম জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কিভাবে আমার গরীবের উপর, আমার বাংলার মানুষের বুকের উপর গুলী করা হয়েছে। কিভাবে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কি করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। আপনি আসুন আপনি দেখুন। তিনি বললেন, আমি ১০ তারিখে রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স ডাকবো।

আমি বলেছি, কিসের এসেমব্লি বসবে; কার সঙ্গে কথা বলবো? আপনারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছেন, তাদের সঙ্গে কথা বলবো? পাঁচ ঘণ্টা গোপন বৈঠকে সমস্ত দোষ তারা আমাদের উপর বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন। দায়ী আমরা।

২৫ তারিখে এসেমব্লি ডেকেছেন। রক্তের দাগ শুকায় নাই। ১০ তারিখে বলেছি, রক্তে পাড়া দিয়ে, শহীদের উপর পাড়া দিয়ে, এসেমব্লি খোলা চলবে না। সামরিক আইন মার্শাল্‌-ল, উইড্রো করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকের ভিতরে ঢুকাতে হবে। যে ভাইদের হত্যা করা হয়েছে তাদের তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো আমরা এসেমব্লিতে বসতে পারবো কি না। এর পূর্বে এসেমব্লিতে আমরা বসতে পারি না।

আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না। দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই যে আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট কাচারী, আদালত ফৌজদারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরীবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য যে সমস্ত অন্যান্য জিনিষগুলি আছে সেগুলির হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিক্সা, গরুরগাড়ী, রেল চলবে। শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রীম কোর্ট, হাই কোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গভর্নমেণ্ট দপ্তর, ওয়াপদা—কোন কিছুই চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেওয়া না হয়, এরপর যদি ১টি

গুলী চলে, এরপর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়—তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে, এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট, যা যা আছে সবকিছু—আমি যদি হুকুম দিবার না পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। সৈন্যরা, তোমরা আমাদের ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, তোমাদের কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু আর তোমরা গুলী করবার চেষ্টা কর না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবা না।

আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দুর পারি সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আওয়ামী লীগ অফিসে সামান্য টাকা পয়সা পৌঁছে দেবেন। আর ৭ দিন হরতালে শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে, প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন। সরকারী কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে ততদিন ওয়াপদা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হোল—কেউ দেবে না। শুনুন মনে রাখুন, শত্রু পিছনে ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুঠতরাজ করবে। এই বাংলায়—হিন্দু মুসলমান যারা আছে আমাদের ভাই, বাঙালী, অ-বাঙালী তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন, কর্মচারীরা, রেডিও যদি আমাদের কথা না শোনে, তাহলে কোন বাঙালী রেডিও ষ্টেশনে যাবে না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, তাহলে টেলিভিশনে যাবেন না। ২ ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনে পত্র নিতে পারে। পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বাংলাদেশের নিউজ বাইরে পাঠানো চলবে।

এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা চলছে—বাঙালীরা বুঝেসুঝে কাজ করবে। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলুন। এবং আমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লা। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।"

শেখ মুজিবের ৭ই মার্চ, '৭১-এর ঐতিহাসিক ভাষণ ঢাকার রেস কোর্স ময়দান থেকে (বর্তমান সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান) তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সব বেতারে একই সাথে সম্প্রচারের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও স্বৈরাচারী সামরিক সরকারের

আকস্মিক সিদ্ধান্তে সেদিন সম্প্রচারিত হয়নি। কিন্তু ঢাকা বেতারের সর্বশ্রেণীর কর্মচারীর বেতার কেন্দ্র বয়কটের কাছে মাথা নোয়াতে হয়েছিল এহিয়ার সামরিক সরকারকে। পরদিন অর্থাৎ ৮ই মার্চ, '৭১ সকাল ৮-৩০ মিঃ সময়ে রেস কোর্স ময়দানে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চ, '৭১-এর রেকর্ডকৃত পুরো ভাষণই ঢাকা বেতার থেকে প্রচারিত হয়েছিল এবং একই সাথে সম্প্রচারিত হয়েছিল প্রদেশের অন্য সব বেতার কেন্দ্র থেকে।

পল্টনে মওলানা ভাসানী

এলো ৯ই মার্চ, '৭১ ঢাকার পল্টনের জনসভায় বয়োবৃদ্ধ জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী চূড়ান্ত স্বাধীনতা, ও সার্বভৌমত্বের লক্ষ্যে সংগ্রাম সূচনার আহ্বান জানিয়ে বাংলাদেশে জাতীয় সরকার গঠনের দাবী তুললেন। পল্টনের বিশাল জনসভায় তুমুল করতালি ও হর্ষধ্বনির মধ্যে অশীতিপর বৃদ্ধ জননেতা ঘোষণা করলেন:

"একদিন ভারতের বুকে নির্বিচারে গণহত্যা করিয়া জালিয়ানওয়ালাবাগের মর্মান্তিক ইতিহাস রচনা করিয়া অত্যাচার অবিচারের বন্যা বহাইয়া দিয়াও প্রবল পরাক্রমশালী বৃটিশ সরকার শেষ রক্ষায় সক্ষম হয় নাই। শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের শুভ বুদ্ধির উদয় হইয়াছে। পাক-ভারত উপমহাদেশকে শত্রুতে পরিণত না করিয়া সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের মধ্যে সরিয়া যাওয়াই তাঁহারা মঙ্গলকর মনে করিয়াছেন। যে বৃটিশ সাম্রাজ্যে একদিন সূর্য্য অস্ত যাইত না, রূঢ় বাস্তবের কষাঘাতে সে সাম্রাজ্যের সূর্য্যও আজ অস্তমিত।—প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়াকেও তাই বলি, অনেক হইয়াছে, আর নয়। তিক্ততা বাড়াইয়া আর লাভ নাই। 'লা-কুম দীনুকুম অলইয়াদীন'-এর নিয়মে (তোমার ধর্ম তোমার, আমার ধর্ম আমার) পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লও।—মুজিবের নির্দেশ মত আগামী ২৫ তারিখের মধ্যে কোন কিছু করা না হইলে আমি শেখ মুজিবুর রহমানের সহিত মিলিয়া ১৯৫২ সালের ন্যায় তুমুল আন্দোলন শুরু করিব। খামাকা কেহ মুজিবকে অবিশ্বাস করিবেন না, মুজিবকে আমি ভাল করিয়া চিনি।"

১৪ই মার্চ, '৭১ স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের চেক পোষ্ট বসানো হ'ল ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ এলাকায়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক ঘোষিত পূর্ব বাংলার সর্বাধিনায়ক শেখ মুজিবের অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন তখন চূড়ান্ত সাফল্যের পথে। ঠিক এমনি পরিস্থিতিতে প্রেসিডেণ্ট এহিয়া খান কঠোর সামরিক প্রহরায় ঢাকা এলেন ১৫ই মার্চ, '৭১ সাথে এলেন, জেনারেল খাদেম হোসেন রাজা, জেনারেল হামিদ খান, জেনারেল খোদাদাদ খান, জেনারেল

মিঠ্ঠা খান, জেনারেল পীরজাদা, জেনারেল ওমর প্রমুখ উর্দ্ধতন সামরিক কর্মকর্তা।

প্রথম প্রতিরোধ সংঘর্ষ

মুজিব-এহিয়া বৈঠক বসল ১৬ই মার্চ, '৭১। একই সাথে চলল সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর দুর্বার গণ-দাবীর মিছিল। গণউত্তেজনা ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকল প্রদেশের সর্বত্র। একই সাথে বৃদ্ধি পেতে থাকল প্রতিরোধ আন্দোলন। এমনি প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠল ঢাকার জয়দেবপুরেও।

১৯শে মার্চ, '৭১ ঢাকা থেকে ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আরবাবকে পাঠানো হয়েছিল জয়দেবপুর অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরী থেকে গোলাবারুদ নিয়ে আসার জন্য এবং একই সাথে জয়দেবপুরস্থ দ্বিতীয় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্টকে নিরস্ত্র করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু জয়দেবপুর বাসীর প্রবল প্রতিরোধ এহিয়ার সামরিক বাহিনীর এই হীন প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছিল। স্পষ্টতঃই ১৯শে মার্চ, '৭১ জয়দেবপুর বাসীই এহিয়ার সশস্ত্র হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধ সংঘর্ষে আসার দুঃসাহস করেছিলেন। তাঁদের এই প্রতিরোধ অভিযানে পরোক্ষ সমর্থন দিয়ে ছিলেন তৎকালীন জয়দেবপুরস্থ দ্বিতীয় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্ট-এর কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্ণেল মাসুদুল হোসেন খান এবং সেকেণ্ড-ইন্-কমাণ্ড মেজর শফিউল্লাহ্ (পরবর্তীকালে মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ্ 'বীর উত্তম' এবং বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর প্রাক্তন প্রধান সেনাপতি)।

এহিয়া-ভুট্টোর সাথে শেখ মুজিবের বৈঠক চলেছিল ২৫শে মার্চ, '৭১ পর্য্যন্ত। কিন্তু ক্রমেই পাকিস্তানী শাসক চক্রের সততার প্রতি তাঁর সন্দেহ বেড়ে গিয়েছিল। তিনি গভীরভাবে চিন্তা করলেন ঢাকার বাইরে গিয়ে কোনও গুপ্ত জায়গা থেকে ব্রডকাষ্ট করে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য। ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের তিনি জানালেন তাঁর এই অভিপ্রায়ের কথা। কিন্তু তখন সময় অনেক পেরিয়ে গেছে। ততদিনে তিনি আটকা পড়ে গিয়েছেন এহিয়ার জালে।

মূলতঃ এহিয়ার প্রহসন বৈঠকই পশ্চিমা সামরিক বাহিনীকে সুযোগ করে দিয়েছিল জাহাজ এবং বিমানযোগে পাকিস্তান থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র আনার জন্য।

গণসংযোগ মাধ্যমের ভূমিকা

একাত্তরের গণ অভ্যুত্থানকালে বেতার, টেলিভিশন এবং খবরের কাগজ সহ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমগুলি স্বাধিকার আদায়ের স্বপক্ষে এক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে। বেতারের অনুষ্ঠান ঘোষণায় রেডিও পাকিস্তানের পরিবর্তে প্রচার শুরু হয়েছিল ঢাকা বেতার, চট্টগ্রাম

বেতার, রাজশাহী বেতার ইত্যাদি। ঢাকা থেকে অতিরিক্ত বাংলা সংবাদ বুলেটিন ও প্রচার শুরু হয়েছিল, যা বাকী আঞ্চলিক বেতারগুলি থেকে সম্প্রচারিত হতো।

এমনিভাবে পূর্ব বাংলার সব সরকারী-বেসরকারী সংস্থা এগিয়ে এলো শেখ মুজিবের অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা শোনার জন্য উদগ্রীব লক্ষ কণ্ঠে সোচ্চার দাবীর মিছিল অব্যাহত থাকল সারা প্রদেশব্যাপী। এমনি পরিবেশে পাকিস্তান পিপল্স্ পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকা এলেন ২১শে মার্চ, '৭১।

২২শে মার্চ, '৭১ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সব দৈনিক পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছিল লাল সূর্য্য এবং হলুদ মানচিত্র খচিত বাংলা দেশের পতাকা। ঐদিনই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল্স্ এর যশোহরস্থ প্রধান ভবনে বাঙালী অফিসার ও জোয়ানগণ স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে স্বাধীনতার স্বপক্ষে আর এক দুঃসাহসী উদাহরণ স্থাপন করেছিলেন।

২৩শে মার্চ '৭১ ছিল পাকিস্তানের জাতীয় দিবস। এইদিন এহিয়া খান একটি গ্রহণযোগ্য কনফেডারেশনের ভিত্তিতে (সম্ভবতঃ ছ' দফার আলোকে) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ক্ষমতা হস্তান্তরের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন বলে ধারণা করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি এ জাতীয় কোনও ঘোষণা করলেন না। অপরদিকে একই দিন পূর্বাহ্নে উত্তাল জনতার দাবীতে ৩২নং ধানমণ্ডির শেখ মুজিবুর রহমানের বাস ভবনে উত্তোলিত হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। একইদিন বিকেলেও পল্টনের জনসভায় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলিত হয়েছিল।

মুজিব-এহিয়া বৈঠকের পরিণতি

মুজিব-এহিয়া বৈঠক যে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, ২৪শে মার্চ '৭১ সকালের মধ্যেই শেখ মুজিবের কাছে তা সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হয়ে গিয়েছিল। ঐদিন পূর্বাহ্নে কয়েকজন বিদেশী সাংবাদিক তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তাঁরা জানতে চাইলেন বৈঠকের ফলাফল সম্পর্কে। উত্তরে শেখ মুজিব শুধু বলেছিলেন: আপনারা অভিজ্ঞ সাংবাদিক। সম্মেলনের ফলাফল যে কি হতে পারে, তা আপনারাই অনুমান করে নিতে পারেন।

২৪শে মার্চ '৭১ রাতেই শেখ মুজিব চট্টগ্রামে এম, আর, সিদ্দিকীকে টেলিফোনে জানিয়ে দিয়েছিলেন হানাদার বাহিনীর যে কোনও সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য।

সারা প্রদেশব্যাপী দুর্বার গণ অভ্যুত্থানের মাঝে ২৫শে মার্চ, '৭১ পর্যন্ত একদিকে যেমন চলেছে মুজিব-এহিয়া বৈঠক, তেমনি পাশাপাশি চলেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার দাবীতে লক্ষ জনতার মিছিল। জনতা চাইলেন স্বাধীনতার সুস্পষ্ট ঘোষণা। এমনি পরিস্থিতিতে আকস্মিক ভাবে গা-ঢাকা দিয়ে করাচী পাড়ি জমালেন প্রেসিডেণ্ট এহিয়া খান। পালিয়ে যাওয়ার প্রাক্কালে তিনি হানাদার বাহিনীকে নির্দেশ দিয়ে গেলেন ঘুমন্ত পূর্ব পাকিস্তানীদের নির্বিচারে হত্যার জন্য, সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর নেতা বঙ্গবন্ধুকে বন্দী করে করাচী নিয়ে যাওয়ার জন্য। মনিবের নির্দেশ কার্যকরী হ'ল—অক্ষরে অক্ষরে। হানাদার বাহিনী ২৫শে মার্চ দিবাগত রাত ১টার পর বঙ্গবন্ধুকে বন্দী করে ২৯শে মার্চ সংগোপনে নিয়ে গেলো করাচী। ২৫শে মার্চ রাত ১১টা কি তারও কিছু আগে থেকে ওরা নির্বিচারে চালালো নিরপরাধ এবং অসহায় বাঙ্গালীর ওপর মর্টার, সেল এবং গাঁজোয়া। হানাদার সামরিক বাহিনী পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল্স্ এবং পুলিশ বাহিনীকে শুধু নিরস্ত্র করেনি, হত্যা করেছে পাশবিকভাবে। একমাত্র ২৫শে মার্চ, '৭১-এর রাতেই ওরা এমনি নৃশংস ভাবে হত্যা করেছে লক্ষাধিক বাঙালীকে।

বন্দী হওয়ার পূর্বক্ষণে শেখ মুজিবুর রহমান চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা জহুর আহমদ চৌধুরী সহ প্রদেশের বিভিন্ন এলাকায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার লিখিত বাণী ওয়ারলেসে পাঠানোর ব্যবস্থা করে গেলেন। এই বার্তার মুদ্রিত হ্যাণ্ডবিলই ২৬শে মার্চ, '৭১ দুপুরের মধ্যে চট্টগ্রামবাসীর হস্তগত হয়েছিল। হ্যাণ্ডবিলটি ছিল ইংরেজীতে। চট্টগ্রামের ডাক্তার মন্জুলা আনোয়ার অনুদিত উক্ত হ্যাণ্ডবিলটির বাংলা অনুবাদ ডাক্তার সৈয়দ আনোয়ার আলী স্মৃতি থেকে নিবেদন করেছেন এভাবে:

"বাঙ্গালী ভাইবোনদের কাছে এবং বিশ্ববাসীর কাছে আমার আবেদন, রাজারবাগ পুলিশ ক্যাম্প ও পিলখানা ই-পি-আর ক্যাম্পে রাত ১২টায় পাকিস্তানী সৈন্যরা অতর্কিত হামলা চালিয়ে হাজার হাজার লোককে হত্যা করেছে। হানাদার পাকিস্তানী সৈন্যদের সঙ্গে আমরা লড়ে যাচ্ছি। আমাদের সাহায্য প্রয়োজন এবং পৃথিবীর যে কোনও স্থান থেকেই হোক। এমতাবস্থায় আমি বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করছি। তোমরা তোমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে মাতৃ-ভূমিকে রক্ষা কর। আল্লাহ্ তোমাদের সহায় হউন।"

—শেখ মুজিবুর রহমান।

দৈনিক বাংলা ২৬শে মার্চ, '৮১ বিশেষ সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত।

উল্লেখ্য যে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার বাণী সম্বলিত হ্যাণ্ডবিলটির উক্ত বাংলা অনুবাদ ২৬শে মার্চ, '৭১ চট্টগ্রামের কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে সংগঠিত বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের প্রথম সান্ধ্য অধিবেশনে প্রচারিত হয়েছিল। উপস্থাপক ছিলেন জনাব আবুল কাশেম সন্দ্বীপ।

২৬শে মার্চ, '৮১ দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাস' শীর্ষক এক নিবন্ধে ডাক্তার আনোয়ার আলী লিখেছেন: 'চট্টগ্রামে আমরা তখন সিডিএ আবাসিক এলাকায় থাকি। খবর এলো ই-পি-আর জোয়ানদের জন্য খাবার প্রয়োজন। ওরা তখন পাকিস্তানী নেভীর সাথে লড়ে যাচ্ছে। চট্টগ্রাম সেনা ছাউনী থেকে যে সমস্ত জোয়ান, অফিসার বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল, তারাই সেনানিবাস ঘিরে রেখেছে এবং পাকিস্তানী সৈন্যদের বিব্রত করছে। এই বীরদের প্রয়োজন রসদের, খাবারের। আমাদের কাছে সংবাদ আসার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বাসায় সবাই মিলিত হয়েছিলাম। আলোচনা চলছে ভবিষ্যত কর্মপন্থা নিয়ে। গরীব ধনী নির্বিশেষে প্রত্যেকে সাধ্যমত চাঁদা দিয়ে যতটুকু পারলেন সাহায্য করলেন। চাঁদা সংগ্রহ করার পর আলোচনা চলছে কিভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে খাদ্য ও রসদ সরবরাহ করা যায়। কিভাবে আহতদের চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করা যাবে। সমস্যা হলো কিভাবে বাজারে যাওয়া যায়। কারণ রাস্তায় ব্যারিকেড, বিশেষ করে বড় রাস্তায় এবং এতগুলি জিনিষ কিনতে রিয়াজউদ্দিন বাজার ছাড়া উপায় নেই। এলাকাবাসীদের অনেকে বিপুল উৎসাহে এগিয়ে এসেছিলেন। এলেন ওয়াপদার দু'জন তরুণ ইঞ্জিনিয়ার আশিকুল ইসলাম ও দিলীপ চন্দ্র দাস। বিভিন্ন ক্যাম্পে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া যোদ্ধাদের জন্য খাদ্য ও রসদ নিয়ে যাবার জন্য ইঞ্জিনিয়ার আশিক ওয়াপদার একটি পিক-আপ গাড়ী (চট্টগ্রাম ট ৯৬১৫) স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছেড়ে দিলেন। গাড়ীটা চালাবার দায়িত্ব নিলাম আমি নিজে। আমার স্পষ্ট মনে আছে, আগ্রাবাদ হোটেলের পেছনের রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে কদমতলী হয়ে আমরা রিয়াজউদ্দিন বাজার যাই এবং প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনে নিয়ে আসি। ফেরার পথে আগ্রাবাদ রোডে (বর্তমান শেখ মুজিব রোড) একজন লোক টেলিগ্রাম বলে চেঁচাচ্ছিল আর এক টুকরো কাগজ বিলি করছিল। গাড়ী থামিয়ে একটি কাগজ সংগ্রহ করি। সে কাগজটি ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের নামে প্রচারিত একটি ইংরেজী বাণী: ২৫শে মার্চ রাতে ঢাকার ঘটনাবলীর উল্লেখ করে বিশ্ববাসীর প্রতি সাহায্যের আবেদন আর দেশবাসীর প্রতি প্রতিরোধের নির্দেশ।"

২৯শে মার্চ '৭১ এহিয়া খানের সামরিক বাহিনী নির্দ্ধারিত বিমানে বঙ্গবন্ধুকে পাঠিয়ে দিয়েছিল করাচী। কোনও বাঙ্গালী জানল না তাঁর

অবস্থানের কথা। এদিকে হানাদার বাহিনীর নৃশংস তাণ্ডবলীলা রাজধানী ঢাকার রাতের আঁধারকে করল আরো ভারী। গুলি, ট্যাঙ্ক, আর মর্টারের শব্দে চলতে থাকলো হত্যার বীভৎস মহোৎসব। ঢাকার জনগণ হারিয়ে ফেললেন প্রতিবাদের ভাষা, প্রতিরোধের শক্তি।

মেজর জিয়াউর রহমান
মেজর মীর শওকত আলী

চট্টগ্রামের ষোল শহরে ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এর সেকেণ্ড-ইন্-কমাণ্ড ছিলেন মেজর জিয়াউর রহমান (পরবর্তীকালে লে: জেনারেল এবং প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি)। তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন মেজর মীর শওকত আলী (পরবর্তী কালে লে: জেনারেল)। মেজর জিয়াউর রহমান এবং মেজর মীর শওকত আলী ছাড়াও অষ্টম বেঙ্গল রেজিমেন্টে আরো কয়েকজন বাঙালী অফিসার ছিলেন। ২৫শে মার্চ, '৭১ রাত প্রায় ১১টা ৩০ মি: সময়ে তাঁরা টেলিফোনে জানতে পারলেন যে ঢাকায় হত্যাকাণ্ড শুরু হয়ে গিয়েছে। মেজর মীর শওকতের ভাষায়:

"আমাদের কর্তব্য আমরা আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম। কারণ ২৫শে মার্চ-এর আগে থেকেই অসহযোগ আন্দোলনের যে রূপ নিচ্ছিল, সে সাথে যখনই আমাদের নিযুক্ত করা হতো ব্যারিকেড সরানোর জন্য কিংবা জনগণকে হটানোর জন্য, আমরা তাদের বিরুদ্ধে কাজ কখনো ঠিকভাবে করতাম না। কার্যত: আমরা সেই চূড়ান্ত অসহযোগের সময় থেকেই আন্দোলনের প্রতি আমাদের সমর্থন জানাতে শুরু করি। কাজেই ২৫শে মার্চ, '৭১ রাতে যখন হানাদার বাহিনী বাঙ্গালী হত্যাকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তখন আমাদেরও তাৎক্ষণিকভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া বাদে অন্য কোনও বিকল্প ছিল না। বাঙ্গালী হত্যাকাণ্ড শুরু হওয়ার খবর দিয়ে সম্ভবত: আমাদের কাছে প্রথম টেলিফোন করেছিলেন চট্টগ্রামের হান্নান ভাই (চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের তৎকালীন সভাপতি)।"

রাত ১১টার সময় মেজর জিয়াউর রহমান ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রধান কার্যালয় থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে গিয়ে জেনারেল আনসারীর কাছে রিপোর্ট করার জন্য নির্দেশ পেলেন। নৌ-বাহিনীর একখানা ট্রাক পাঠানো হলো তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সাথে দেয়া হয়েছিল দু'জন পাকিস্তানী অফিসারকে। মেজর জিয়াউর রহমান তাঁর ডায়রীতে লিখেছেন:

"ট্রাকের চালক ছিল একজন অবাঙ্গালী। আমার সাথে ছিল ব্যাটালিয়নের মাত্র তিনজন জোয়ান। এত রাতে কেন তারা আমাকে বন্দরে রিপোর্ট করতে পাঠাচ্ছে, একটা সংশয় আমার মধ্যে দানা বেধে উঠছিল। আসলে তারা আগেই

টের পেয়েছিল আমি চরম একটি পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছি। সুতরাং তারা চাইছিল আমাকে শেষ করে ফেলতে। তাই সেই রাতেই তারা ষড়যন্ত্র এঁটে ফেলেছিল। আগ্রাবাদের একটি বড় ব্যারিকেডের সামনে ট্রাক থেমে গেলো। আমি নেমে পায়চারী করছিলাম রাস্তায়। ভাবছিলাম কখন সবাইকে সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেবো। ঠিক সে সময় মেজর খালেকুজ্জামান সেখানে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। অনুচ্চস্বরে বললেন: ওরা ক্যান্টনমেণ্টে হামলা শুরু করেছে। শহরেও অভিযান চালিয়েছে। হতাহত হয়েছে শহরে বহু নিরীহ মানুষ। বুঝতে পারলাম, যে সময়ের জন্যে এতদিন অপেক্ষা করছিলাম, সে সময় এসে গেছে। সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলাম: উই রিভোল্ট (আমরা বিদ্রোহ করছি)। নির্দেশ দিলাম ষোল শহরে ফিরে যাও। পাকিস্তানী অফিসারদের আটক করো। যুদ্ধের জন্য তৈরী করে রাখো ব্যাটালিয়নের সবাইকে। ট্রাকে উঠে পাঞ্জাবী ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলাম ট্রাক ফিরিয়ে নিয়ে চলো ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টারের দিকে। সৌভাগ্য আমাদের। সে নিঃশব্দে আমার নির্দেশ পালন করল। ষোল শহরে এসে দ্রুত নেমে পড়লাম ট্রাক থেকে। নৌ-বাহিনীর আটজন এসকর্ট ছিল সঙ্গে। মুহূর্তে একটি রাইফেল কেড়ে নিলাম তাদের একজনের কাছ থেকে। সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানী নেভেল অফিসারটির দিকে রাইফেল তাক করে বললাম: হ্যাণ্ডস্ আপ। তোমাকে গ্রেফতার করা হলো। ঘটনার আকস্মিকতায় সে হকচকিয়ে আত্মসমর্পণ করল। অন্যদিকে রাইফেল উঁচিয়ে ধরতেই তারাও সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে অস্ত্র নামিয়ে রাখলো। ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডারকে ঘুম থেকে তুলে এনে পাকড়াও করা হলো। ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্ট সেণ্টারে এলাম। লেঃ কর্ণেল চৌধুরী এবং ক্যাপ্টেন রফিকের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম। সিভিল টেলিফোন সার্ভিসের একজন অপারেটারকে টেলিফোনে পেলাম। তাকে বললাম: ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্টের অষ্টম ব্যাটালিয়ন স্বাধীনতা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে—এ সংবাদটি যেন চট্টগ্রামে তিনি কমিশনার, পুলিশের ডি. আই, জি, আর রাজনৈতিক নেতাদের জানিয়ে দেন। কারণ টেলিফোনে আমি তাঁদের কাউকেও পাচ্ছিলাম না। টেলিফোন অপারেটার আনন্দ প্রকাশ করলেন আমার কথায় এবং অত রাতে সবাইর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলেন তিনি। সেই মুহূর্তটি ছিল জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। ব্যাটালিয়নের সব অফিসার আর জোয়ানদের এক জায়গায় একত্র করে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলাম। বললাম: আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধে নেমেছি, তারা এই ঘোষণাটির জন্যই উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছিল। পরমুহূর্তেই সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। রাত তখন ২টা ১৫ মিঃ, ২৬শে মার্চ, '৭১। জাতির জন্য অবিস্মরণীয় সেই মুহূর্তটি।"

মেজর জিয়াউর রহমান আরো উল্লেখ করেন :

"রাত চারটায় (২৬শে মার্চ, '৭১ প্রত্যুষে) রেল লাইন ধরে আমরা যাত্রা করলাম। পথে বি ডি আর এর একশ' জন আমাদের সঙ্গে যোগ দিল। দুপুরে পটিয়া পাহাড়ে পৌঁছে গেলাম। জাতির সেই প্রথম স্বাধীনতা যোদ্ধাদের পথে পথে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানালো জনগণ। তারা খাবার নিয়ে আসলো ক্ষুধার্ত সৈনিকদের জন্য। স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম ঘাঁটি হল পটিয়ার পাহাড়। ২৬শে মার্চের মধ্যেই তিন'শ সদস্যের একটি বাহিনীকে চট্টগ্রাম পাঠানো হলো হানাদারদের মোকাবিলার জন্যে। প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। সেই প্রথম সম্মুখ সমর। বহু দেশপ্রেমিক প্রাণ দিলেন দেশের মাটিকে মুক্ত করার জন্যে। পাকিস্তানী শিবিরে তখন আতঙ্ক। তাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলো।"

ক্যাপটেন রফিক

ক্যাপ্টেন রফিক (পরে মেজর) ছিলেন তখন ই-পি-আর এর চট্টগ্রাম সেক্টার এডজুটেণ্ট। ২৫শে মার্চ '৭১ এর ঘটনা সম্পর্কে তিনি বলেন:

রাত আটটায় ডাঃ জাফর ঢাকার সর্বশেষ খবর জানার জন্য চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ অফিসে চলে গেলেন। আমি আমার বন্ধু ক্যাপ্টেন মুসলিমউদ্দিনের সাথে রাতের খাবার খেতে গেলাম। খাওয়া মাত্র শুরু করেছি এমন সময় ডাঃ জাফর আওয়ামী লীগের একজন কর্মীকে সাথে নিয়ে এসে বললেন, 'পাকিস্তানী সৈন্যরা ট্যাঙ্ক নিয়ে ঢাকা ক্যাণ্টনমেণ্ট থেকে শহরের দিকে 'মুভ' করতে শুরু করেছে।' আমি জানতে চাইলাম এটা একদম ঠিক খবর কিনা। ডাঃ জাফর বললেন, আমি এইমাত্র এম, আর, সিদ্দিকী সাহেবের বাসা থেকে এসেছি। তিনি একটু আগে ঢাকা থেকে এ খবর পেয়েছেন এবং আমাদের বলেছেন আপনার কাছে খবর পৌঁছানোর জন্য। এখন জেলা আওয়ামী লীগ অফিসে সর্বশেষ পরিস্থিতি আলোচনার জন্য রুদ্ধদ্বার কক্ষে বৈঠক চলছে। ভাবলাম মাত্র কয়েক সেকেণ্ড, তারপরে বললাম, আমি আমার ই, পি, আর ট্রুপকে নিয়ে পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করছি। আপনি ষোল শহর এবং ক্যাণ্টনমেণ্টে গিয়ে সমস্ত বাঙ্গালী সৈন্যদের আমার সাথে যোগ দিতে বলুন।

রাত তখন ন'টা। দু'জন সশস্ত্র গার্ড ও ড্রাইভার কালামকে সাথে নিয়ে সারসন রোড ধরে ওয়ারলেস কলোনীর দিকে অগ্রসর হলাম। আমার মনের মধ্যে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন—এ যুদ্ধে কি সেনাবাহিনীর অন্য লোকেরা অংশ নেবে? শেখ মুজিব কি নিরাপদে ঢাকা শহর থেকে ফিরতে পারবেন? আমরা কি কখনো স্বাধীন হতে পারবো? এমনি হাজারো প্রশ্ন মনের মধ্যে রেখে এগিয়ে চলছি।

আমার হাতে ছিল একটি ষ্টেন গান। একমাত্র ওয়ারলেস কলোনীতেই পাকিস্তানী অফিসার ক্যাপ্টেন হায়াত একটি প্লাটুনকে কমাণ্ড করছিলেন। সেকেণ্ড-ইন্-কমাণ্ডও ছিলেন একজন পাকিস্তানী অফিসার। আমার ইচ্ছে বিনা রক্তপাতে এবং নিঃশব্দে অল্প সময়ের মধ্যে পাকিস্তানীদের বন্দী করার। প্রথম টারগেট হিসেবে বেছে নিলাম ক্যাপ্টেন হায়াতকেই। জীপ নিয়ে পৌঁছলাম ক্যাপ্টেন হায়াতের রুমের সামনে। সে সবেমাত্র বিছানায় গিয়েছিল। আমার ডাক শুনে হায়াত এসে দরজা খুলতেই দু' এক কথা বলেই তার মাথায় ষ্টেন গান দিয়ে আঘাত করলাম। ক্যাপ্টেন হায়াত তার জামার পকেট থেকে পিস্তল বের করার চেষ্টা করতেই আমার একজন দেহরক্ষী তাকে রাইফেল দিয়ে পুনরায় জোরে আঘাত করলো। ফলে সে মেঝেতে পড়ে যায় এবং তাকে বন্দী করি। পাকিস্তানী সুবেদার হাশমতকেও একনিভাবে বন্দী করি। একজন অবাঙ্গালী সৈন্য আমাকে গুলী ছোঁড়ার চেষ্টা করতেই ড্রাইভার কালাম তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। আমরা প্লাটুনের আরো তিনজন পাকিস্তানীকে বন্দী করে বাঙ্গালী সেনাদের সব কথা বুঝিয়ে বললাম। তারা সবাই প্রস্তুত ছিল মানসিকভাবে এবং অপেক্ষায় ছিল নির্দ্দেশের।

হালি শহরে পৌঁছলাম রাত সাড়ে ৯টায়। এখানে বাঙ্গালী জে, সি ও, এবং এন, সি, ওরা অপেক্ষা করছিলেন। তিনটি অস্ত্রাগারই ছিল বাঙ্গালীদের নিয়ন্ত্রণে। সব সৈন্যরা অস্ত্রাগারের সামনে সমবেত হলো এবং তাদের মধ্যে বিতরণ করা হলো অস্ত্রশস্ত্র। হালি শহর ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এখানে প্রায় তিন' শ ছিল অবাঙ্গালী সৈন্য যাদের বেশীর ভাগই সিনিয়র, জে, সি, ও এবং এন, সি, ও। আমরা তাদের সবাইকে অত্যন্ত নিঃশব্দে এবং সতর্কতার সাথে গ্রেফতার করে ফেলি।"

ব্রিগেডিয়ার মজুমদার
ক্যাপটেন এম, এস, এ, ভূঁইয়া

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ব্রিগেডিয়ার (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল) মজুমদার ছিলেন তখন চট্টগ্রাম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্টাল সেণ্টারের অধিনায়ক। লেঃ জেনারেল টিক্কা খানের পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী ২৪শে মার্চ দুপুর ১টায় তাঁকে এক জরুরী কনফারেন্সের ভাঁওতা দিয়ে ঢাকা ক্যাণ্টনমেণ্টে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। একই দিন ব্রিগেডিয়ার আনসারীকে চট্টগ্রাম ক্যাণ্টনমেণ্টের ষ্টেশন কমাণ্ডার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল। সেণ্টার কমাণ্ডাণ্ট হিসেবে অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল উক্ত সেণ্টারের ডেপুটি কমাণ্ডাণ্ট কর্ণেল সিগরীকে। ক্যাপ্টেন এম, এস, এ, ভূঁইয়া (বর্তমানে ব্রিগেডিয়ার) ছিলেন ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের

অধীনে হোল্ডিং কোম্পানীর কোম্পানী কমাণ্ডার। ২৬শে মার্চ '৭১ রাতের প্রথম প্রহরে চট্টগ্রামে কি ঘটেছিল তার বর্ণনা দিতে গিয়ে ক্যাপ্টেন ভূঁইয়া বলেন:

"রাত তখন প্রায় একটা। ছায়া-শ্যামলিমা ঘেরা পাহাড়-পরিবৃত বন্দর নগরী চট্টগ্রাম গভীর ঘুমে নিমগ্ন। কিন্তু কে জানতো, সেই হিম-শীতল স্তব্ধতাকেই বিদীর্ণ করে দিয়ে অকস্মাৎ গর্জে উঠবে হানাদার পশ্চিমা দস্যুদের মারণাস্ত্র, সেই আঘাতে লুটিয়ে পড়বে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্ট সেণ্টারের অগণিত বীর সৈনিক। ২০নং বেলুচ রেজিমেণ্টের সৈন্য বোঝাই ৬টি ট্রাক ধীরে ধীরে রেজিমেণ্ট সেণ্টারের অস্ত্রাগারের সামনে এসে দাঁড়ালো। তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই তারা অস্ত্রাগারে আধিপত্য বিস্তার করলো। অস্ত্রাগারে প্রহরারত রেজিমেণ্টের বাঙ্গালী সৈনিকেরা আকস্মিক আক্রমণে প্রাণ হারালো। প্রহরারত বাঙালী সৈনিকদের নির্মমভাবে খতম করে দিয়ে পশ্চিমা দস্যুরা সেণ্টারের চতুর্দিকে পজিশন নিয়ে দাঁড়ালো। তারপর শুরু হল তাদের সুপরিকল্পিত পৈশাচিক হত্যাযজ্ঞ। মেশিনগান, মর্টার, ট্যাংক থেকে শুরু হল অবিরাম গুলি বর্ষন। সেই আঘাতে সেণ্টারের বিল্ডিংগুলো কেঁপে কেঁপে ধ্বসে পড়তে লাগলো। চতুর্দিক থেকে বর্ষিত গুলির শব্দে আকাশ হলো প্রকম্পিত। সবকিছু ছাপিয়ে জেগে রইলো শুধু মরণ-যন্ত্রণা কাতর, ভীতি বিহ্বল মানুষের আর্তনাদ। রিক্রুট সেণ্টারের প্রতিটি কক্ষের অভ্যন্তরে মেশিনগান থেকে অবিরাম গুলি বর্ষিত হলো। সেই গুলির আঘাতে মৃত্যু বরণ করলেন অনেক বীর বাঙালী সৈনিক। যাঁরা তখনো নিরস্ত্র অসহায় ভাবে বেঁচে ছিলেন তাঁদের ধরে নিয়ে গিয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে পৈশাচিক উল্লাসে গুলি করে হত্যা করা হলো। মুমূর্ষুদের মর্মান্তিক আর্তনাদে চট্টলার আকাশ বার বার বিদীর্ণ হতে লাগল। কিন্তু সেই আর্তনাদও বেশীক্ষণ শোনা গেল না। মৃত্যু যন্ত্রণা কাতর মানুষের কণ্ঠ অচিরেই স্তব্ধ হয়ে এলো। সেণ্টার প্রাঙ্গনটি তখন মানুষের রক্তে থৈ থৈ করছে। চারিদিকে নেমে এসেছে মৃত্যু বিভীষিকা।"

২৬শে মার্চ '৭১ রাতের প্রথম প্রহরে ক্যাপ্টেন এম, এস, এ ভূঁইয়া ছিলেন চট্টগ্রামের শেরশাহ্ কলোনীতে। তিনি গুলির শব্দে জেগে গেলেন এবং মুহূর্তে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। চিন্তা করতে লাগলেন এ সময়ে তাঁর কি করণীয়। এমন সময় রেজিমেণ্ট সেণ্টারের একজন হাবিলদার প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে এসে সেখানে উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে জানালেন ক্যাণ্টনমেণ্টের সব বাঙ্গালী সৈন্যকেই পশ্চিমা সৈন্যরা মেরে ফেলেছে। সেই বেদনার্ত মুহূর্তেই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন বাঙ্গালী হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য। নিকটস্থ এক বাসা থেকে ৮ম বেঙ্গল

রেজিমেন্টে মেজর জিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু পেলেন না। ঐ মুহূর্তে তাঁর হাতের কাছে কোনও যানবাহন ছিল না। অগত্যা পায়ে হেঁটে ২৬শে মার্চ সকাল প্রায় সাতটার দিকে ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টে গিয়ে পৌছলেন। ওখানে কারো সাক্ষাৎ না পেয়ে তিনি ফিরে এসে চট্টগ্রামের পুলিশ সুপার; ডি, আই, জি এবং পরে ডেপুটি কমিশনারের সাথে দেখা করলেন। তখন তাঁর মনের ভিতরে একটি মাত্রই চিন্তা কি করে ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করা যায়। দুপুর ১২টায় তিনি বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৭০ জন সৈনিক সহ পাহাড়তলী পুলিশ রিজার্ভ ক্যাম্পে পৌছলেন। ওখানে পেলেন প্রায় চারশত পুলিশ ছাড়াও একটি ই, পি, আর প্লাটুন।

ই, পি, আর হেড কোয়ার্টারের এডজুটেন্ট ছিলেন ক্যাপ্টেন রফিক। ক্যাপ্টেন ভুঁইয়া টেলিফোনে তাঁর সাথে যোগাযোগ করলেন। ক্যাপ্টেন রফিকের পরামর্শেই তিনি চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণের পরিকল্পনা বাদ দিয়ে তাঁর ফোর্স নিয়ে কুমিরার দিকে এগিয়ে গেলেন। কুমিল্লা থেকে তখন পাক হানাদার বাহিনীর ২৪ এফ, এফ রেজিমেন্ট চট্টগ্রামের দিকে এগিয়ে আসছিল। তিনি তাদের প্রতিরোধ করার দায়িত্ব নিয়ে ধাবিত হলেন কুমিরার দিকে। ২৬শে মার্চ বিকেল পাঁচটা। বেঙ্গল রেজিমেন্ট আর ই, পি, আর এর মোট ১০২ জন যোদ্ধা সমন্বয়ে গঠিত তাঁর দলের প্রধান অস্ত্র ছিল একটি এইচ, এম, জি, কয়েকটি এল, এম, জি আর বাকী সব রাইফেল। আওয়ামী লীগ কর্মীদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন পাঁচটি ট্রাক। একটি ট্রাকে গুলির বাক্স এবং বাকী চারটি ট্রাকে তুলে নিলেন ১০২ জন যোদ্ধাকে। রাস্তার পাশের হাজার জনতার শ্লোগান, জয় বাংলা, বেঙ্গল রেজিমেন্ট জিন্দাবাদ, ই পি, আর জিন্দাবাদ, ইত্যাদি হর্ষধ্বনির মধ্যে ছিল তাঁদের সেদিনের প্রতিরোধ অভিযান।

তাঁরা চট্টগ্রামের কুমিরায় পৌছেছিলেন প্রায় সন্ধ্যা ৬টায়। তাঁরা খবর পেলেন ২৪ এফ, এফ, বাহিনী তাঁদের থেকে তখন আর মাত্র ছয় সাত মাইল দূরে রয়েছে। তাই ওখানেই তাঁরা অবস্থান নিলেন। গ্রামের লোকজনের সহযোগিতায় গাছের এক বিরাট ডাল কেটে এনে রাস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করলেন। প্রায় সন্ধ্যা ৭টার দিকে শত্রুবাহিনী ওখানে পৌছে গেল। তারা ব্যারিকেড সরানোর জন্য নীচে নামার সুযোগেই আড়াল থেকে এক সাথে গর্জে উঠেছিল ভুঁইয়ার দলের সমরাস্ত্র। প্রায় দু'ঘন্টাকাল স্থায়ী এই প্রতিরোধ যুদ্ধে শত্রুবাহিনীর কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্ণেল ও একজন লেফটেনেন্টসহ বিভিন্ন পর্যায়ের প্রায় ১৫২ জন হানাদার সৈন্য নিহত হয়েছিল। ক্যাপ্টেন ভুঁইয়ার পক্ষে স্বাধীনতা

সংগ্রামী ১৪ জন বীর সৈনিক শাহাদাত বরণ করেছিলেন। এমনিভাবে সেদিনের যুদ্ধে ২৪ এফ, এফ, রেজিমেন্টের একটি পুরো কোম্পানীকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন ক্যাপ্টেন ভুঁইয়া তাঁর নবগঠিত বাহিনীর সহায়তায়।

ক্রমে রাত ভারী হওয়ার সাথে সাথে বাড়তে লাগল শত্রুর চাপ। এদিকে ক্যাপ্টেন ভুঁইয়ার দলের ফ্রন্ট লাইনে আরো গুলির দরকার। বিশেষ করে ভারী মেশিন গানের গুলি ফুরিয়ে গেছে। প্রয়োজন আরো সৈনিক, আরো অস্ত্রের। রাত ১টায় ক্যাপ্টেন ভুঁইয়া সীতাকুণ্ড থেকে রেলওয়ে টেলিফোনে ক্যাপ্টেন রফিক সহ অনেকের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। তাই বাধ্য হয়ে ফিরে গেলেন চট্টগ্রাম শহরে।

২৮শে মার্চ '৭১ তিনি মেজর জিয়ার নির্দেশে ই, পি, আর এর ৩০ জন সৈনিক নিয়ে পাক নৌ-বাহিনীর কমোডোর মমতাজের বাসায় আক্রমণ চালিয়েছিলেন। কিন্তু সাধ্যমত আক্রমণ চালিয়েও তেমন কিছু ক্ষতি সাধন করতে পারেননি। কারণ কমোডোর মমতাজের বাসা ছিল একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ। সেখানে ফিট করা ছিল ২টি ভারী মেশিনগান। মেশিনগানের সামনে রাইফেল নিয়ে যুদ্ধ করা ছিল এক দুঃসাহসিক কাজ। পরবর্তী দু'দিন অর্থাৎ ২৯ এবং ৩০শে মার্চ '৭১ ক্যাপ্টেন ভুঁইয়া ছিলেন চট্টগ্রাম বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। ১লা এপ্রিল, '৭১ তিনি চলে গিয়েছিলেন চট্টগ্রামের বান্দরবন থানায়। ওখান থেকে কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি এবং পরে মহালছড়ি হয়ে ৩রা এপ্রিল সকালে তিনি পৌছেছিলেন রামগড়। এখানেই তিনি মেজর জিয়া এবং ক্যাপ্টেন রফিকের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন এবং একসাথে শুরু করেছিলেন দ্বিতীয় পর্যায়ে মুক্তিবাহিনী সংগঠনের কাজ। ঐ সময় যাঁরা তাঁদের সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সর্ব জনাব মনসুর আলী (এম. এন, এ), মোশাররফ হোসেন (এম, এন, এ), হারুনুর রশীদ (এম, এন, এ) এবং চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি জনাব এম, এ, হান্নান। পরবর্তীকালে ক্যাপটেন ভুঁইয়া চলে যান তিন নম্বর সেক্টরে। মুক্তি যুদ্ধের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি সেই সেক্টরে নিয়োজিত থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধ চালিয়ে যান।

চট্টগ্রাম বন্দরে অস্ত্র বোঝাই জাহাজ

২৪শে মার্চ, '৭১ থেকে ২৭শে মার্চ, '৭১ পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দরে কি ঘটেছিল তার একটি খণ্ড চিত্র এখন তুলে ধরছি। চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের ডেপুটি কমাণ্ডাণ্ট কর্ণেল সিগরীকে সেন্টার কমাণ্ডাণ্ট-এর পদে উন্নীত করা হয়েছিল ২৪শে মার্চ, '৭১। নুতন দায়িত্ব নিয়েই তিনি ৫০ জন বাঙালী সৈন্যকে ২০নং বেলুচ

রেজিমেণ্টের একটি কোম্পানীর সাথে চট্টগ্রাম বন্দরে পাঠিয়ে দিলেন। বাঙালী সৈন্যদের হাতে কোনও অস্ত্র দেয়া হয়নি। চট্টগ্রামের ১৭নং জেটির প্রতিরক্ষার দায়িত্ব দেয়া হল বেলুচ রেজিমেণ্টের এই কোম্পানীকে। অপরদিকে ঐ জেটিতে নোঙর করা সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্রশস্ত্রও গোলা বারুদ খালাসের দায়িত্ব অর্পিত হ'ল উল্লেখিত ৫০ জন বাঙালী সৈন্যের ওপর।

ভারী অস্ত্র এবং গোলা বারুদে ভর্তি উক্ত সোয়াত জাহাজ কয়েকদিন আগে চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছেছিল। ইতিপূর্বে এই জাহাজ থেকে অস্ত্রশস্ত্র খালাসের প্রচেষ্টা চালিয়ে হানাদার বাহিনী বন্দরে কর্মরত বেসামরিক লোকজনের বাধার সম্মুখীন হয়েছিল। মারমুখী জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য তারা কয়েক রাউণ্ড গুলি পর্যন্ত ছুঁড়েছিল। এখন তারা ভাবনা মুক্ত। উক্ত অস্ত্রশস্ত্র খালাসের সময় ব্রিগেডিয়ার আনসারী এবং কর্ণেল সিগরী উপস্থিত ছিল।

২৫শে মার্চ '৭১ বেলা ১টার সময় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্ট এবং ৮ম বেঙ্গল রেজিমেণ্ট থেকে আরো এক প্লাটুন করে মোট দুই প্লাটুন বাঙ্গালী সৈন্য আনা হলো উক্ত মাল খালাসের জন্য। ২৭ পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের একটি কোম্পানী তাদের চালিত করে নিয়ে এসেছিল। তারা জেটির চতুর্দ্দিকে প্রতিরক্ষায় নিযুক্ত হয়ে বাঙ্গালী সৈন্যদের লাগিয়ে দিল অস্ত্র খালাসের কাজে। মোট ১২০ জন বাঙ্গালী সৈন্যকে দিয়ে তারা ২৬শে মার্চ, '৭১ সকাল ১০টা পর্যন্ত মাল খালাস করলো। এ সময় এসব বাঙ্গালী সৈন্যদের কোনও খাবার পর্যন্ত সরবরাহ করা হয়নি। মাল খালাসের পর ক্যাণ্টনমেণ্টে ফেরৎ যাওয়ার অনুমোদন পর্যন্ত তাঁরা পেলেন না।

বেঙ্গল রেজিমেণ্টের দ্বিতীয় দলটির সাথে হাতিয়ার ছিল। এমতাবস্থায় ওখানে কর্মরত বাঙ্গালী আর্মি অফিসার ক্যাপ্টেন আজিজের পরামর্শক্রমে পাঞ্জাবী সৈন্যদের দেখাদেখি তারাও পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে অবস্থান নিতে উদ্যত হলেন। কিন্তু ব্রিগেডিয়ার আনসারীর তাৎক্ষণিক নির্দ্দেশে তাঁরা সব হাতিয়ার ফেরত দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তবে হাবিলদার আবদুস সাত্তার, হাবিলদার আবদুল খালেক, নায়েক নিজামুদ্দিন, লেন্স নায়েক আখতারুদ্দিন ও আরো অনেকে প্রথমে হাতিয়ার জমা দিতে অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু পরে তাঁরাও বাধ্য হয়েছিলেন অস্ত্র জমা দিতে। ক্যাপ্টেন আজিজের কাছ থেকেও অস্ত্র কেড়ে নেয়া হয়েছিল। ২৬শে মার্চ, '৭১ রাতে অভুক্ত এসব হতভাগ্য বাঙ্গালী সৈন্যকে সোয়াত জাহাজে আটকিয়ে রাখা হয়েছিল। পাঞ্জাবী বাহিনীর কঠোর প্রহরা এড়িয়ে ওখান থেকে তাদের বের হওয়া ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব।

২৭শে মার্চ, '৭১ বিকেল ৪টায় উক্ত হতভাগ্য বাঙ্গালী সৈন্যদের সোয়াত জাহাজ থেকে বের করে এনে জেটির প্লাটফর্মে দাঁড় করানো হলো গুলি করার জন্য। সুবেদার রব দুই হাত ওপরে তুলে আবেদন জানালেন নিরস্ত্র বাঙালীদের এমনি অসহায় ভাবে হত্যা না করার জন্য। তাঁর দেখাদেখি বাকী সবাইও হাত তুলে জানালেন তাঁদের আত্মসমর্পণের কথা। কিন্তু তাঁদের সব আবেদনই ব্যর্থ হল। গুলি চালানোর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে সুবেদার রব নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে কোনও রকমে আত্মরক্ষা করলেন। কিন্তু বাকী সব বাঙালী কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে জেটির পাটাতনে লুটিয়ে পড়লেন। বাঙালীর রক্তের বন্যা বয়ে গেল ১৭ নম্বর জেটির পাটাতনে। যে দু'একজন গুলির আঘাতে আহত অবস্থায় মৃত্যুক্ষণ গুনছিলেন তাঁদেরকেও সেদিন সঙ্গীন দিয়ে খুঁচিয়ে খুচিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। হানাদার বাহিনী পরে এসব লাশকে কর্ণফুলী নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিল। নায়েব সুবেদার নুরুল ইসলাম এবং নায়েব সুবেদার ভৈরব নদীতে ফেলে দেয়া ঐ মৃত লাশগুলির মধ্যে জীবন নিয়ে কোনও রকমে মিশেছিলেন এবং সাঁতরে গ্রামে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন।

২৭শে মার্চ, '৭১ এমনিভাবে শতাধিক বাঙালী সৈন্যের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল চট্টগ্রাম বন্দরের বুক চিরে প্রবাহিত কর্ণফুলী নদী। জোয়ার ভাটার সাথে দোল খাওয়া এসব হতভাগ্য সৈনিকদের লাশ কর্ণফুলীর কূলের অধিবাসী প্রত্যক্ষ করেছিলেন কয়েকদিন ধরে।

মেজর শফিউল্লাহ্

আগেই উল্লেখ করেছি ঢাকার জয়দেবপুর দ্বিতীয় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্টের সেকেণ্ড-ইন্-কমাণ্ড ছিলেন মেজর শফিউল্লাহ্ (পরবর্তীকালে মেজর জেনারেল এবং প্রাক্তন সশস্ত্র বাহিনী প্রধান)। জয়দেবপুর থেকে তিনি প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন সর্বাত্মক স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। উল্লেখ্য যে তাঁর এ দুঃসাহসিক কর্মে সর্বাত্মক সহযোগিতা দান করেছেন উক্ত রেজিমেণ্টের বাঙ্গালী কমাণ্ডিং অফিসার লেঃ কর্ণেল মাসুদুল হোসেন খান। ইতিপূর্বে তাঁদের রণপ্রস্তুতির খবর পেয়ে ঢাকা ক্যাণ্টনমেণ্ট থেকে জাহানজেব আরবাবের নেতৃত্বে হানাদার বাহিনীর একটি দল জয়দেবপুর ক্যাণ্টনমেণ্টে গিয়েছিল বাঙ্গালী অফিসারদের নিরস্ত্র করার জন্য। কিন্তু জয়দেবপুর ক্যাণ্টনমেণ্টের প্রতিরোধ ব্যূহ এতই সুদৃঢ় ছিল যে জাহানজেব আরবাবকে খালি হাতে ফিরে যেতে হয়েছিল জয়দেবপুর থেকে। মেজর শফিউল্লাহ্‌র ভাষায়:

"৩রা মার্চ '৭১ এর পর যখন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে এহিয়া খানের কথাবার্তা চলছিল, তখন একটা গুজব রটে গিয়েছিল যে জয়দেবপুরের দ্বিতীয় ইষ্ট

বেঙ্গল রেজিমেণ্টকে নিরস্ত্র করা হচ্ছিল। ঐ গুজবের সাথে সাথে জনগণ জয়দেবপুর থেকে টঙ্গী পর্যন্ত রাস্তায় ব্যারিকেড লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এটা ঘটেছিল ১৯শে মার্চ, '৭১। আমি তখন জয়দেবপুরে দ্বিতীয় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্ট-এর সেকণ্ড-ইন্-কমাণ্ড। জয়দেবপুরের লোকজনের সাথে কথাবার্তা বললাম, তাঁদের বুঝানোর চেষ্টা করলাম: আমরা ট্রেনিং নিয়েছি অস্ত্র ব্যবহার করার জন্য, অস্ত্র জমা দেয়ার জন্য নয়। ——ঢাকা আর্মি হেড কোয়ার্টারে কে বা কাহারা এই খবর জানিয়ে দিল। জানামাত্রই ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আরবাব পুরা এক ব্যাটালিয়ান পাঞ্জাবী রেজিমেণ্ট নিয়ে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে জয়দেবপুর রওয়ানা দিল। সে লক্ষ্য করল যে প্যালেসে আমরা এমন ব্যবস্থা রেখেছি যে বাইরের যে কোনও আক্রমণকে সহজে প্রতিহত করা সম্ভব। যথার্থই আমরা বাইরের অন্য কোনও আক্রমণের কথা চিন্তা করিনি। আমাদের একমাত্র ভয়ের কারণ ছিল ঢাকা আর্মি হেড্ কোয়ার্টার। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম ওরা যে কোনও মুহূর্তে সুযোগ পেলেই আমাদের নিরস্ত্র করতে আসবে। কাজেই আমরাও প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলাম তাদের কোন সুযোগ না দেয়ার জন্য।"

স্পষ্টতঃই ১৯শে মার্চ, '৭১ জয়দেবপুরবাসীর সশস্ত্র প্রতিরোধের পরোক্ষ সহযোগী ছিলেন লে: কর্ণেল মাসুদুল হোসেন খান এবং মেজর শফিউল্লাহ্। ২৩শে মার্চ, '৭১ জয়দেবপুরের বাঙ্গালী ব্যাটালিয়ান কমাণ্ডার মাসুদুল হোসেনকে কৈফিয়ৎ দানের জন্য ঢাকা আর্মি হেড কোয়ার্টারে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। মেজর শফিউল্লাহ্ তাঁকে আর্মি হেড কোয়ার্টারে যেতে নিষেধ করেছিলেন। বলেছিলেন, সেখানে গেলে আর আসতে দেয়া হবে না। ঘটনা ঠিক তাই হয়েছিল। কর্ণেল মাসুদুল হোসেন ঢাকা গেলেন। যাওয়ার সাথে সাথেই তাঁর কর্মস্থল হেড কোয়ার্টারে বদলী করে দেয়া হয়েছিল। নুতন ব্যাটালিয়ান কমাণ্ডার কাজী আবদুর রকীব (ইনিও বাঙ্গালী) জয়দেবপুর ক্যাণ্টনমেণ্টের ভার নিয়েছিলেন ২৫শে মার্চ '৭১ বিকেল প্রায় ৪টায়। ঢাকা থেকে কর্ণেল মাসুদ রাত প্রায় সাড়ে এগারটার দিকে মেজর শফিউল্লাহ্‌র সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করে জানালেন: "শফিউল্লাহ্, আমি এখানে কিছু গুলির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। তোমাদের ওখানে কি হচ্ছে?" মেজর শফিউল্লাহ্ প্রত্যুত্তরে জানালেন: "আমাদের এখানেতো কিছু হচ্ছে না। তবে গুলি? কিসের গুলি?" এই দুই তিনটা কথা বলার সাথে সাথেই টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তারপরই টিক্কা খান ব্যক্তিগতভাবে কাজী রকিবের সাথে কথা বলল। টিক্কা খান কাজী রকিবকে জানালো: "গাজীপুরে গণ্ডগোল

হওয়ার খবর আমরা পাচ্ছি। তুমি সেখানে একটা কোম্পানী পাঠাও।" মেজর শফিউল্লাহ্ এটাকে একটা অজুহাত হিসেবে ধরে নিলেন। মেজর শফিউল্লাহ আরও বললেন:

"আমাদের যা ফোর্স ছিল তার একাংশকে গাজীপুর অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরীতে পাঠিয়ে আমাদের ফোর্সকে ছোট করে দেয়াই ছিল টিক্কাখানের আসল উদ্দেশ্য। ব্যাপারটি আমি এভাবে চিন্তা করেছিলাম। রাত সাড়ে এগারটার পর ঢাকার সাথে আমাদের সব টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছিল। ২৬শে মার্চ, '৭১ আমি আমার ব্যাটালিয়ান কমাণ্ডারকে বললাম: আপনি ঢাকাকে বলে দিন ময়মনসিংহে অবস্থানরত আমাদের ট্রুপস চাপের মুখে আছে। তাদের সাহায্যের জন্য এখান থেকে আরো কিছু ট্রুপস ময়মনসিংহে সরিয়ে নেয়াই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য।"

২৮শে মার্চ '৭১ পূর্বাহ্ণেই মেজর শফিউল্লাহ্ তাঁর কমাণ্ডের সমস্ত বাঙ্গালী অফিসার এবং জোয়ানদের নিয়ে জয়দেবপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন টাঙ্গাইল। তিনি জয়দেবপুর অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরীর বিপুল অস্ত্রসম্ভার হাতের কাছে যা পেয়েছিলেন সবই তাঁর বাহিনীর সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ২৯শে মার্চ '৭১ ময়মনসিংহ পৌঁছে তিনি সেখানকার প্রশাসন নিজ হাতে তুলে নিয়েছিলেন। ময়মনসিংহ থেকে তাঁর বাহিনী নিয়ে ফিরে এসে ঢাকা ক্যাণ্টনমেণ্টে আঘাত হানার পরিকল্পনা নিচ্ছিলেন মেজর শফিউল্লাহ্। স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম বীর সেনানী মেজর খালেদ মোশাররফ তখন তাঁর বাহিনী নিয়ে অবস্থান নিয়েছিলেন সিলেট। মেজর খালেদ মোশাররফের পরামর্শে তিনি তার এ দুঃসাহসিক অভিযানের পরিকল্পনা ত্যাগ করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল পরবর্তী কালে তাঁরা শক্তি সঞ্চয় করে একযোগে ঢাকা ক্যাণ্টনমেণ্ট আক্রমণ করবেন।

মেজর খালেদ মোশার্‌রফ
ক্যাপটেন জামিল
ক্যাপটেন মাহবুব

২২শে মার্চ, '৭১ পর্যন্ত মেজর খালেদ মোশাররফ (পরে মেজর জেনারেল) ছিলেন ঢাকাতে। কিন্তু তাঁকে নাটকীয়ভাবে ঐদিনই ফোর্থ বেঙ্গল রেজিমেণ্টের সেকণ্ড-ইন্-কমাণ্ডের দায়িত্ব দিয়ে কুমিল্লা পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। ২৪শে মার্চ

'৭১ কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের ব্যাটালিয়ান কমাণ্ডার লে: খিজির হায়াত খানের কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নেবার পর মুহূর্তে তিনি নূতন আর এক অর্ডার পেলেন সিলেটের শমসের নগর যাওয়ার জন্য। এমনি নাটকীয় অর্ডারে বিস্ময় এবং সন্দিগ্ধ মন নিয়ে মেজর খালেদ মোশাররফ রওয়ানা দিলেন শমসের নগর। কিন্তু তাঁকে ঐ যাত্রা থেকে ফেরানোর জন্য পথিমধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার লোকজন ছুটে এলেন তাঁর কাছে। ঐ সময় তাঁর যাত্রা পথের অন্যতম সহযোগী ছিলেন ক্যাপটেন শাফায়াত জামিল। শাফায়াত জামিলকে তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় রেখে দিলেন। সেখানে তাঁকে সাবধানে থাকার পরামর্শ দিয়ে খালেদ মোশাররফ চলে গেলেন সিলেট।

যে কোনও পরিস্থিতি সম্মুখীন হওয়ার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই মেজর খালেদ মোশাররফ রওয়ানা দিয়েছিলেন সিলেট। তাঁর অন্যতম সহযোগী ছিলেন তরুণ ক্যাপ্টেন মাহবুব। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য তাঁরা সিলেট পৌঁছলেন পাকা রাস্তা ছেড়ে কাঁচা রাস্তা দিয়ে। শমসের নগর বাজারে একখানা সামরিক গাড়ীতে একজন পাঞ্জাবী ক্যাপ্টেনকে ষ্টেনগান নিয়ে পাহারারত দেখে তাঁদের সন্দেহ আরো ঘনীভূত হ'ল।

সেদিন ছিল ২৬শে মার্চ '৭১। পাঞ্জাবী ক্যাপ্টেন শমসের নগর বাজার থেকে চলে যেতেই মেজর খালেদ মোশাররফ ওয়ারলেস যোগে শাফায়াত জামিলের সাথে যোগাযোগ করলেন। ততক্ষণে সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। তিনি তরুণ ক্যাপ্টেন মাহবুবকে নিয়ে রাত ১০টায় রাস্তার সমস্ত আলো নিভিয়ে দিয়ে রওয়ানা দিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পথে। ওয়ারলেসে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখলেন শাফায়াত জামিলের সাথে। তাঁর কাছ থেকে জানতে পারলেন ব্যাটালিয়ান কমাণ্ডার খিজির হায়াত খান মিটিং ডেকেছে পরদিন অর্থাৎ ২৭শে মার্চ '৭১ পূর্বাহ্ন ১০টায়। মেজর খালেদ মোশাররফের পক্ষে দ্বিপ্রহরের আগে কোনক্রমে সেখানে পৌঁছা সম্ভব ছিল না। তাই তিনি শাফায়াত জামিলকে ওয়ারলেসেই নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁর করণীয় সেরে নেওয়ার জন্য। নির্দেশানুযায়ী শাফায়াত জামিল মিটিং শুরুর এক ঘণ্টা আগেই অর্থাৎ ২৭শে মার্চ, '৭১ পূর্বাহ্ন ঠিক ন'টায় খিজির হায়াত খান এবং অন্যান্য পাঞ্জাবীদের গ্রেফতার করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ক্যান্টনমেন্টে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

রাজারবাগ পুলিশ হেড্ কোয়ার্টারে আক্রমণ

২৫শে মার্চ '৭১ এহিয়ার সামরিক বাহিনীর বাঙ্গালী নিধনযজ্ঞের প্রধান লক্ষ্য ছিল ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ হেড কোয়ার্টার। কারণ ইতিপূর্বে সেখানে

কিছু পাক হানাদার হতাহত হয়েছিল। কাজেই প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে লক্ষ্যস্থল বেছে নিতে তারা ভুল করেনি। হানাদার বাহিনী রাতে ট্যাঙ্ক আর মেশিনগানের গুলি দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেয় রাজারবাগ পুলিশ হেড কোয়ার্টার। এই পুলিশ হেড কোয়ার্টারের কক্ষগুলির ধ্বংসস্তুপের সাথে মিশে যায় শতাধিক পুলিশ কর্মচারীর ছিন্ন দেহ। রাতারাতি সে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে জেলা শহরগুলিতে। প্রতিটি জেলা, মহকুমা এবং থানায় গড়ে ওঠে পুলিশ বাহিনীর প্রতিরক্ষা। তাঁদের সহযোগিতা করেন ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস, আনসার, মুজাহিদ ও ছাত্রবৃন্দ। প্রথম পর্যায়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালী, সিলেট, ময়মনসিংহ, খুলনা, যশোহর, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, রাজশাহী, পাবনা, দিনাজপুর, বগুড়া, রংপুর প্রভৃতি জেলায় সশস্ত্র আক্রমণে হতাহত হয় বহু পাক সৈন্য। এমনি ভাবে পুলিশ বাহিনী মুক্তি বাহিনীর উল্লিখিত বিভিন্ন ইউনিটের সহযোগিতায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ক্যান্টনমেন্টগুলি ছাড়া বাকী সব এলাকাকে সাময়িকভাবে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করাই পুলিশ বাহিনীর একমাত্র দায়িত্ব। কিন্তু '৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা কালে প্রায় চল্লিশ হাজার বাঙ্গালী পুলিশ কর্মচারী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যেভাবে প্রতিরোধ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তা ছিল অনন্য। পুলিশকে কখনো সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি। কিন্তু ব্যতিক্রম হ'ল এখানে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহন করে এদেশের পুলিশ স্থাপন করল এক নূতন ইতিহাস।

স্বাধীনতা ঘোষণা ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

স্পষ্টতঃই ২৫শে মার্চ, '৭১ দিবাগত রাতে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য বিভিন্ন ক্যান্টনমেণ্ট থেকে তাৎক্ষণিক এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে, স্ব-দায়িত্বে অস্ত্র হাতে বেরিয়ে পড়েছিলেন বাংলার শার্দুল সৈনিকগণ। বিভিন্ন থানা এবং পুলিশ লাইনের পুলিশ অফিসার এবং সিপাহীগণ ও নিজ নিজ দায়িত্বে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন প্রতিরোধ সংগ্রামে। সেদিন তাঁরা ছিলেন বিচ্ছিন্ন। তাঁরা সেদিন জানতে পারেননি অন্য কোনও ক্যান্টনমেণ্ট বা পুলিশ লাইনের বাঙ্গালী সশস্ত্র যোদ্ধা এমনি এগিয়ে আসছিলেন কিনা।

বাংলার বীর সৈনিক ও পুলিশ বাহিনী যখন এমনি মরণ যুদ্ধে লিপ্ত তখন বাংলার সাধারণ মানুষ ছিলেন শোকাকুল, হতবাক এবং স্তব্ধ। ২৬শে মার্চ '৭১ এর সকাল সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর জন্য বয়ে এনেছিল এক সাগর রক্ত, হাহাকার আর শোকের কালো ছায়া। এমনি হতাশার মধ্যে চট্টগ্রামে বিনি

হ'ল বঙ্গবন্ধু কর্তৃক বাংলা দেশের স্বাধীনতা ঘোষণার ইংরেজী হ্যাণ্ডবিল। কেউ পেলো, কেউ পেলো না ; কেউ পড়ল, কেউ পড়ল না। সবাই তখন কম্পিত, শঙ্কিত। চট্টগ্রামের স্থানীয় চিকিৎসক ডাঃ সৈয়দ আনোয়ার আলী এমনি একটি হ্যাণ্ডবিল হাতে নিয়ে বাসায় এসে স্ত্রী ডাঃ মনজুলা আনোয়ারের হাতে দিলেন। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে শুধু এর অনুবাদই করেননি, সাথে সাথেই বসে গেলেন কপি করার কাজে। সাথে কপি করার কাজে লাগিয়ে দিলেন ডাঃ আনোয়ার আলীর ভাইজি কাজী হোসনে আরাকে। তিনি ছিলেন চট্টগ্রাম বেতারের একজন অনুষ্ঠান ঘোষিকা। অনুবাদটির কপি চট্টগ্রামের জনগণের কাছে বিলি করাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। কিন্ত এমনি আর কত কপিই বা বিলি করা সম্ভব। হ্যাণ্ডবিলে মুদ্রিত বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার ঐতিহাসিক বাণীটি চট্টগ্রাম বেতার থেকে প্রচারই'ত সর্বোত্তম কাজ। ডাক্তার মনজুলা আনোয়ার স্বামী ডাঃ আনোয়ার আলীকে জানালেন তাঁর মনের কথা। ডাঃ আনোয়ার আলী তাৎক্ষনিক ভাবে স্ত্রীর কথার সমর্থন জানালেন। স্থানীয় ওয়াপদার দু'জন ইঞ্জিনিয়ার জনাব আশিকুল ইসলাম ও মিঃ দিলীপ সহ একখানা জীপে তাঁরা ছুটে গেলেন চট্টগ্রাম বেতারে। ওদিকে চট্টগ্রাম বেতারের তৎকালীন নিজস্ব শিল্পী জনাব বেলাল মোহাম্মদ ইতিপূর্বেই চট্টগ্রাম বেতার ভবনে এসে পৌঁছে গেছেন কর্তৃপক্ষের কাছে বেতার চালু করার অনুরোধ নিয়ে। চট্টগ্রাম ফটিকছড়ি কলেজের তৎকালীন ভাইস-প্রিন্সিপাল জনাব আবুল কাশেম সন্দীপও তখন চট্টগ্রাম বেতারে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা চট্টগ্রাম বেতার কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করলেন বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র চালু করার সমর্থন আদায়ের জন্য। মূলতঃ বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু করার প্রথম পরিকল্পনা নিয়েছিলেন বেলাল মোহাম্মদ। চট্টগ্রাম বেতার ভবন ছিল চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙর করা যুদ্ধ জাহাজের শেলিং আওতার মধ্যে। চট্টগ্রাম বেতারের তৎকালীন সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক জনাব আবদুল কাহ্হার প্রস্তাবিত বেতার কেন্দ্রের নিরাপত্তার কারণে টেলিফোনে বেলাল মোহাম্মদকে পরামর্শ দিলেন কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে চলে যাওয়ার জন্য। পরামর্শানুযায়ী তাঁরা ইঞ্জিনিয়ার আশিকুল ইসলামের জীপে ছুটলেন চট্টগ্রাম কালুরঘাট ট্রান্সমিটারের উদ্দেশ্যে। সাথে গেলেন আবুল কাশেম সন্দীপ, কাজী হোসনে আরা, ডাক্তার মনজুলা আনোয়ার, ডাক্তার আনোয়ার আলী কবি আবদুস সালাম ও ইঞ্জিনিয়ার দিলীপ। জীপ চালিয়ে নিয়ে গেলেন ইঞ্জিনিয়ার আশিকুল ইসলাম।

ইতিপূর্বে চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের তৎকালীন সভাপতি জনাব আবদুল হান্নান অপরাহ্ণ প্রায় দু'টার সময় চট্টগ্রাম বেতার থেকে (আগ্রাবাদ) আনুমানিক

পাঁচ মিনিটের এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ রেখেছিলেন দেশবাসীর উদ্দেশ্যে। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার বাণীর আলোকেই ছিল জনাব এম, এ, হান্নানের এই ভাষণ। স্পষ্টতঃই চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পক্ষে প্রথম বিপ্লবী ভাষণ প্রচারের গৌরব অর্জন করেছিলেন জনাব এম, এ, হান্নান।

সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালী চট্টগ্রাম বেতারের কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে সংগঠিত বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রথম অনুষ্ঠান শুনতে পেয়েছিলেন ২৬শে মার্চ, '৭১ সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিঃ সময়ে। এই বেতারের প্রথম সান্ধ্য অধিবেশনেই পবিত্র কোরাণ তেলাওয়াতের পর বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার বাংলা অনুবাদটি উপস্থাপন করেন জনাব আবুল কাশেম সন্দীপ। পরদিন অর্থাৎ ২৭শে মার্চ '৭১-এর সান্ধ্য অধিবেশনে সদ্য গঠিত এই বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে পুনরায় বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা প্রচার করলেন মেজর জিয়াউর রহমান (পরবর্তীকালে লেঃ জেনারেল এবং বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি)। মেজর জিয়াউর রহমানের সেদিনের ঐতিহাসিক ভাষণটি তাঁর স্ব-কণ্ঠ বাণী-বদ্ধকৃত টেপ থেকে নিম্নে তুলে দেয়া হ'ল:

"The Government of the Sovereign State of Bangladesh on behalf of our Great Leader, the Supreme Commander of Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman, we hereby proclaim the independence of Bangladesh, and that the Government headed by Sheikh Mujibur Rahman has already been formed. It is further proclaimed that Sheikh Mujibur Rahman is the sole leader of the elected representatives of Seventy Five Million People of Bangladesh, and the Government headed by him is the only legitimate government of the people of the Independent Sovereign State of Bangladesh, which is legally and constitutionally formed, and is worthy of being recognised by all the governments of the World. I therefore, appeal on behalf of our Great Leader Sheikh Mujibur Rahman to the governments of all the democratic countries of the world, specially the Big Powers and the neighbouring countries to recognise the legal government of Bangladesh and take effective steps to

stop immediately the awful genocide that has been carried on by the army of occupation from Pakistan. *.................................. the legally elected representatives of the majority of the people ....The guiding principle of a new state will be first neutrality, second peace and third friendship to all and enmity to none. May Allah help us. Joy Bangla"

*This sentence could not be fully reproduced from the tape owing to defective recording.

সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালী যে মুহূর্তে ছিলেন নিদারুণ হতাশা এবং শোকে মুহ্যমান, ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁরা শুনতে পেলেন মেজর জিয়াউর রহমানের কণ্ঠে বাংলাদেশের স্বাধীনতার উদাত্ত এবং তেজোদীপ্ত ঘোষণা। তাঁর সেদিনের কণ্ঠে ছিল এক অপরাজেয় আত্মবিশ্বাস, সাড়েসাত কোটি বাঙ্গালীর জাগরণের এক মহামন্ত্র। দিশেহারা বাঙ্গালী উঠে দাঁড়ালো গভীর আত্মবিশ্বাসে। এহিয়া চক্র ফেটে পড়ল মহা আক্রোশে। বিভিন্ন ক্যান্টনমেণ্ট এবং পুলিশ লাইন থেকে বেরিয়ে আসা বীর শার্দুলগণ পেলেন নূতন আশার আলো, নূতন প্রেরণা। তাঁরা বুঝলেন যে তাঁরা আর একা নন, তাঁরা বিচ্ছিন্ন নন। জোরদার হ'ল সর্বাত্মক স্বাধীনতা যুদ্ধ।

এরপর মেজর জিয়াউর রহমানের আরো দুটি ভাষণ বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছিল যথাক্রমে ২৮ এবং ৩০শে মার্চ, '৭১। এ দুটি ভাষণের মাধ্যমেও তিনি এহিয়া খানের ঘৃণ্য বাহিনীর গণহত্যা রোধে এগিয়ে আসার জন্য জাতিসংঘ ও বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রতি পুনরায় উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন।

৩০শে মার্চ, '৭১ মেজর জিয়াউর রহমানের ভাষণের কিছু পরই এই বেতার কেন্দ্র হানাদার বাহিনীর বোমারু আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। অতঃপর তিনি গিয়েছিলেন রামগড়ে। বিপ্লবী আওয়ামী লীগ সরকারের সার্বিক পরিচালনায় এবং জেনারেল আতাউল গণি ওসমানীর সমর নেতৃত্বে প্রাথমিক পর্যায়ে এই রামগড়েই তিনি নূতন ভাবে সংগঠন করেন তাঁর বাহিনী।

এমনিভাবে প্রদেশের বিভিন্ন সেক্টরে নিয়োজিত বাঙ্গালী অফিসার এবং জোয়ানগণ, পুলিশ লাইন এবং থানা সহ পুলিশ বিভাগের বিভিন্ন অফিসার এবং পুলিশ বাহিনী, বেতার, সংবাদপত্র এবং অন্যান্য গণসংযোগ মাধ্যমের বিভিন্ন শ্রেণীর সরকারী-বেসরকারী কর্মচারী, মুজাহিদ, আনসার এবং ছাত্র-শিক্ষক-জনতা তাৎক্ষণিকভাবে কিংবা দু'একদিন আগে পরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

From Maj Zia
Declaration

Punjabis have used 3rd Commando Battalion in Chittagong city area to subdue the valliant freedom fighters of Sadhin Bangla. But ~~two~~ they have been thrown back and many of them have been killed.

The Punjabis have been extensively using F-86 aircrafts to kill the civilian strongholds and vital key points. They are killing the civilians, men, women and children brutally. So far atleast 200 thousands of ~~people~~ Bengalee civilians have been killed in Chittagong area alone.

The Sadhin Bangla Liberation Army is pushing the Punjabis from one place to the other.

At present Punjabis have utilized at least two Brigades of Army, Navy and Air force. It is in fact a combined operation.

I once again request the United Nations and the Big Powers to intervene and physically come to our aid. Delay will mean massacre of additional millions.

Ziaur
31/3

মেজর (তৎকালীন) জিয়াউর রহমান কর্তৃক ৩০শে মার্চ, '৭১ প্রচারিত আবেদনের ফটো কপি। লক্ষণীয় যে স্বাক্ষর দান কালে তিনি ৩০শে মার্চ-এর স্থলে ভুলক্রমে ৩১শে মার্চ লিখেছিলেন। ৩০শে মার্চ, '৭১ মেজর জিয়াউর রহমান কর্তৃক এই ভাষণ প্রচারের কিছু পরই হানাদার বাহিনীর বোমারু বিমান আক্রমণে চট্টগ্রামের কালুরঘাট ট্রান্সমিটার বিধ্বস্ত হয়ে যায়।

মন্তব্য—

মেজর জিয়ার আবেদন : বিষয়বস্তু ও বিভ্রান্তি

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত মেজর (তৎকালীন) জিয়াউর রহমানের আবেদন প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে পাঠককুলের পক্ষ থেকে নানান প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। তিনি মোট ক'টি আবেদন প্রচার করেছিলেন এবং কোনটির বিষয়বস্তু কি ছিল? উত্তরটি তিনি নিজেই তাঁর ডায়রীর ভাষায় দিয়েছেন এ ভাবে: "২৭শে মার্চ শহরের চারিদিকে তখন বিক্ষিপ্ত লড়াই চলছিল। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় রেডিও ষ্টেশনে এলাম। এক টুকরা কাগজ খুঁজছিলাম। হাতের কাছে একটি এক্সারসাইজ খাতা পাওয়া গেল। তার একটি পৃষ্ঠায় দ্রুত হাতে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম ঘোষণার কথা লিখলাম। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্বভার নিয়েছি সে কথাও লেখা হলো সেই প্রথম ঘোষণায়।-- কিছুক্ষণের মধ্যে সে ঘোষণা বেতারে প্রচার করলাম। ২৮শে মার্চ সকাল থেকে পনেরো মিনিট পর পর ঘোষণাটি প্রচার করা হলো কালুরঘাট রেডিও ষ্টেশন থেকে। —৩০শে মার্চ দ্বিতীয় ঘোষণাটি প্রচার করা হলো রাজনৈতিক নেতাদের অনুরোধ-ক্রমে।"

মেজর জিয়াউর রহমানের উল্লিখিত মন্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে তিনি মাত্র দু'টি আবেদনই প্রচার করেছিলেন যথাক্রমে ২৭শে এবং ৩০শে মার্চ, '৭১। আলোচ্য গ্রন্থেও এ সাথে তাঁর দু'টি আবেদনই উদ্ধৃত হয়েছে। তন্মধ্যে প্রথমটি তাঁরই স্বকণ্ঠ বাণী-বদ্ধকৃত টেপ থেকে নেয়া হয়েছে। দ্বিতীয়টিও তাঁরই স্বহস্ত লিখিত আবেদনের ফটো কপি। কাজেই আবেদন দু'টির বিষয়বস্তু সম্পর্কে মতদ্বৈতের কোনও অবকাশ নেই। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, তবে কি মেজর জিয়াউর রহমান স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মোট তিনটি আবেদনই প্রচার করেছিলেন? কারণ, এ সাথে আলোচ্য গ্রন্থে উল্লেখিত দু'টি আবেদনের কোনওটিতেই তিনি অস্থায়ী রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্বভার নিয়েছিলেন, এ জাতীয় কথা নেই। উপরন্তু দেখা যায় যে প্রথম আবেদন পত্রে ছিল বাংলাদেশের মহান নেতা ও সর্বাধিনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে একটি আইনানুগ সরকার গঠন এবং শেখ মুজিবুর রহমান যে স্বাধীন সর্বভৌম বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের একমাত্র নির্বাচিত নেতা ছিলেন তারই ঘোষণা এবং তারি আলোকে নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের জন্য পরাশক্তি ও প্রতিবেশী রাষ্ট্র সমুহের কাছে আবেদন।

মুজিব নগর

১৭ই এপ্রিল '৭১ কুষ্টিয়ার বৈদ্যনাথ তলার আম বাগান

শপথ গ্রহণের পর প্রথম মন্ত্রীসভার সদস্যবৃন্দ:
(বাম থেকে সৈয়দ নজরুল ইসলাম (উপ-রাষ্ট্রপতি), জনাব তাজুদ্দিন আহমদ (প্রধান মন্ত্রী), খন্দকার মোস্তাক আহমদ (পররাষ্ট্র ও আইন মন্ত্রী), জনাব মনসুর আলী (অর্থ মন্ত্রী) এবং জনাব কামরুজ্জামান (স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী)। ছবিতে প্রধান সেনাপতি কর্ণেল (পরে জেনারেল) আতাউল গণি ওসমানীকেও দেখা যাচ্ছে (সর্ব দক্ষিণে)।

মুজিব নগরে অস্থায়ী সরকার

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মুজিব নগরে অস্থায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়েছিল ১০ই এপ্রিল, ১৯৭১। সদ্য গঠিত এই অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার দেশী-বিদেশী সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে আত্মপ্রকাশ করেছিল কুষ্টিয়ার বৈদ্যনাথ তলায় ১৭ই এপ্রিল, ১৯৭১। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান ঘোষিত হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্বভার অর্পিত হ'ন উপরাষ্ট্রপতি ঘোষিত সৈয়দ নজরুল ইসলামের ওপর। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব-ভার নিলেন জনাব তাজউদ্দিন আহমদ। পররাষ্ট্রমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্বভার অর্পিত হ'ন যথাক্রমে খোন্দকার মোস্তাক আহমদ, ক্যাপ্টেন এম, মনসুর আলী এবং জনাব কামরুজ্জামানের ওপর। কর্ণেল (পরবর্তী জেনারেল) মোহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানীর ওপর অর্পিত হ'ন মুক্তি যুদ্ধের প্রধান সেনাপতির দায়িত্বভার।

প্রসঙ্গতঃ ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট এক সামরিক অভ্যুত্থানে বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হয়েছিলেন। একই নির্মম হত্যার শিকার হয়েছিলেন '৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধের চার জাতীয় নেতা—সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এবং জনাব কামরুজ্জামান। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাত্র তিন মাস পর ৭ই নভেম্বর, '৭৫ ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী দশায় তাঁদেরকে হত্যা করা হয়েছিল।

১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে বাংলাদেশ তার স্বাধীনতা হারিয়েছিল, আর ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল সেই প্রাচীন জেলারই আর এক আম্রকাননে আত্মপ্রকাশ করেছিল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার। কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথ তলার নূতন নামকরণ হ'ন মুজিব নগর। এই মুজিব নগরই ছিল বাংলাদেশের অস্থায়ী রাজধানী। অবশ্য নূতন বিপ্লবী সরকারের আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশের এক ঘণ্টা কালের মধ্যেই হানাদার বাহিনী এলাকাটিকে পুনর্দখল করে নিয়েছিল। তাই বাধ্য হয়ে মুজিব নগর প্রশাসনকে সুবিধামত মুক্তাঙ্গনে নিয়ে যেতে হয়েছিল। কিন্তু অস্থায়ী রাজধানী হিসেবে ঘোষিত মুজিব নগর নামের আর পরিবর্তন হয়নি। নব গঠিত অস্থায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাজধানী হিসেবে এই মুজিব নগর নামই সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালী এবং বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত ছিল '৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ দিন পর্যন্ত।

১৭ই এপ্রিল '৭১ বেলা পূর্বাহ্ন ১১টা ১০ মিনিটের সময় কুষ্টিয়ার বৈদ্যনাথ তলায় আয়োজিত সভা মঞ্চের পশ্চিম দিক থেকে এলেন নেতৃবৃন্দ। উপস্থিত জনতা মুহুর্মুহু করতালি দিয়ে নেতৃবৃন্দকে স্বাগত জানালেন। সদ্য গঠিত সশস্ত্র বাহিনীর একটি দল অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে আনুষ্ঠানিক ভাবে অভিবাদন জানালেন। এরপর একে একে নেতৃবৃন্দ মঞ্চে নির্ধারিত আসনে বসলেন। প্রথমে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তারপর প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ, তারপর মন্ত্রী খন্দকার মোস্তাক আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, জনাব কামরুজ্জামান এবং প্রধান সেনাপতি কর্ণেল (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল) আতাউল গণি ওসমানী। স্বেচ্ছাসেবকগণ পুষ্পবৃষ্টি দিয়ে তাঁদের অভিবাদন জানালেন।

মুজিবনগরে আয়োজিত ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জনাব আবদুল মান্নান। শুরুতে পবিত্র কোরআন শরীফ থেকে তেলাওয়াত করা হ'ল। নূতন রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্র পাঠ করলেন আওয়ামী লীগের চীফ হুইপ অধ্যাপক ইউসুফ আলী। নব গঠিত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের নাম হলো 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ'। চারটি ছেলে প্রাণ ঢেলে গাইল 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'। তারপর উঠে দাঁড়ালেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। প্রধানমন্ত্রী পদে জনাব তাজউদ্দিন আহমদ এবং তাঁর পরামর্শে আরও তিন জনের আনুষ্ঠানিক নিয়োগের কথা ঘোষণা করলেন তিনি। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি একে একে পরিচয় করিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর তিন সহকর্মীকে। এরপর তিনি নূতন রাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিসেবে কর্ণেল (পরে জেনারেল) আতাউল গনি ওসমানী এবং সেনাবাহিনীর চীফ অব ষ্টাফ পদে কর্ণেল আবদুর রবের নাম ঘোষণা করলেন।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির ভাষণ

শপথ অনুষ্ঠান শেষে মুজিব নগরের এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এক সংক্ষিপ্ত অথচ প্রাণস্পর্শী ভাষণ দেন। তিনি তাঁর ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথা বারবার বললেন। শুধুমাত্র তাঁর নেতৃত্ব এবং স্বার্থ ত্যাগ এবং সংগ্রামী জীবনই যে একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে আমাদেরকে বাঁচার প্রেরণা দিয়েছে, শক্তি দিয়েছে সে কথা তিনি বারবার উল্লেখ করলেন। সদ্য ঘোষিত রাজধানী মুজিবনগরের পাদপীঠ কুষ্টিয়ার বৈদ্যনাথ তলার আম বাগানে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে বললেন:
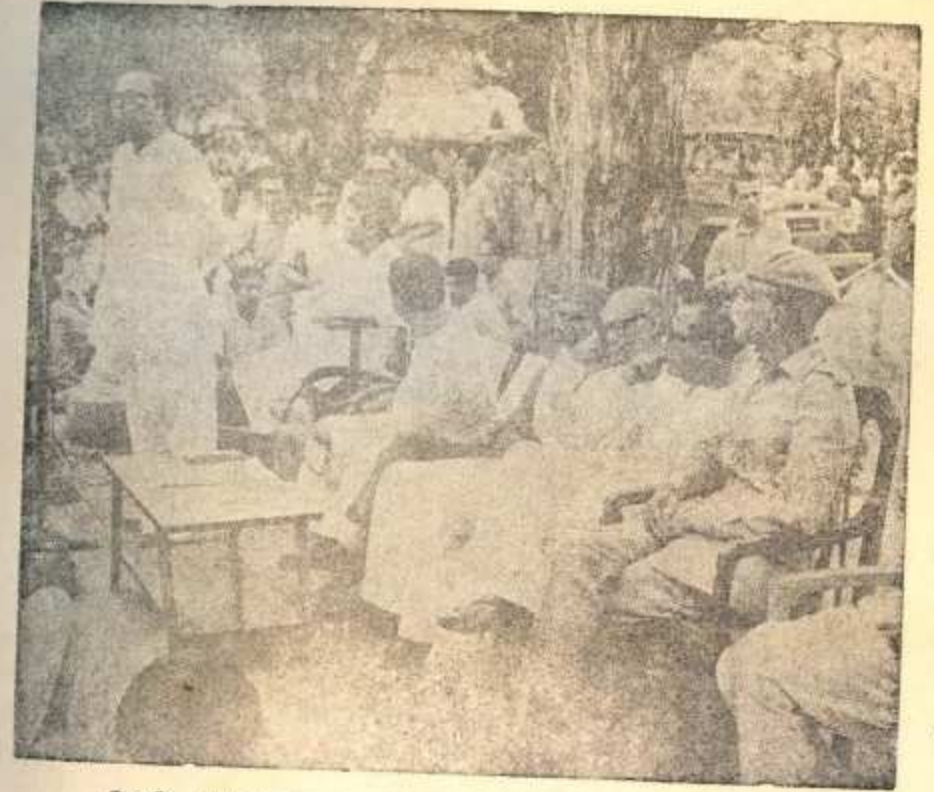
বিপ্লবী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হওয়ার পর ভাষণরত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম

"আজ এই আম্রকাননে একটি নূতন জাতি জন্ম নিল। বিগত বহু বৎসর যাবত বাংলার মানুষ, তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতি, নিজস্ব ঐতিহ্য, নিজস্ব নেতাদের নিয়ে এগুতে চেয়েছেন। কিন্তু পাকিস্তানী কায়েমী স্বার্থ কখনই তা হতে দিল না। ওরা আমাদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে। আমরা নিয়মতান্ত্রিক পথে এগুতে চেয়েছিলাম, ওরা তা দিল না। ওরা আমাদের ওপর বর্বর আক্রমণ চালান। তাই আজ আমরা লড়াইয়ে নেমেছি। এ লড়াইয়ে আমাদের জয় অনিবার্য্য। আমরা পাকিস্তানী হানাদারদেরকে বিতাড়িত করবোই। আজ না জিতি কাল জিতব। কাল না জিতি পরশু জিতবই। আমরা বিশ্বের সব রাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান চাই। পরস্পরের ভাই হিসেবে বসবাস করতে চাই। মানবতার, গণতন্ত্রের এবং স্বাধীনতার জয় চাই। আপনারা জানেন, পাকিস্তানের শোষণ এবং শাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য গত ২৩ বছর ধরে বঙ্গবন্ধু সব স্বার্থ পরিত্যাগ করে আন্দোলন করেছেন। তিনি চেয়েছিলেন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার। আমি জোর দিয়ে বলছি তিনি আমাদের মধ্যে আছেন। জাতির সংকটের সময় আমরা তাঁর নেতৃত্ব পেয়েছি। তাই বলছি পৃথিবীর মানচিত্রে আজ যে নূতন রাষ্ট্রের সূচনা হল তা চিরদিন থাকবে। পৃথিবীর কোন শক্তি তা মুছে দিতে পারবে না। আপনারা জেনে রাখুন গত ২৩ বছর ধরে বাংলার সংগ্রামকে পদে পদে আঘাত করছে পাকিস্তানের স্বার্থবাদী শিল্পপতি, পুঁজিবাদী ও সামরিক কুচক্রীরা। আমরা চেয়েছিলাম শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের অধিকার আদায় করতে। লজ্জার কথা, দুঃখের কথা ঐ পশ্চিমারা শেরে বাংলাকে দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়েছিল। হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে কারাগারে পাঠিয়েছিল। তাই ওদের সঙ্গে আপোষ নেই, ক্ষমা নেই।

আমাদের রাষ্ট্রপতি জনগণ নন্দিত ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ নির্যাতীত মানুষের মূর্ত প্রতীক শেখ মুজিব বাংলার মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের জন্য সংগ্রাম করে আজ বন্দী। তাঁর নেতৃত্বে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম জয়ী হবেই।"

স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র

১৭ই এপ্রিল '৭১ কুষ্টিয়ার আমবাগানে গঠিত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ছিল নিম্নরূপ:

"যেহেতু ১৯৭০ সনের ৭ই ডিসেম্বর হইতে ১৯৭১ সনের ১৭ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি

নির্বাচিত করা হইয়াছিল, এবং যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ দলীয় ১৬৭ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত করিয়াছিলেন, এবং যেহেতু জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সনের ৩রা মার্চ তারিখে শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিবেশন আহ্বান করেন, এবং যেহেতু আহূত এই পরিষদ স্বেচ্ছাচার এবং বে-আইনীভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা, এবং যেহেতু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি পালন করিবার পরিবর্তে বাংলাদেশের গণ প্রতিনিধিদের সহিত পারস্পরিক আলোচনা চলাকালে হঠাৎ ন্যায় নীতির বহির্ভূত এবং বিশ্বাস ঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং যেহেতু উল্লিখিত বিশ্বাস ঘাতকতা মূলক কাজের জন্য উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসম্বাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাংলাদেশের অখণ্ডতা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান, এবং যেহেতু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছে এবং এখনো বাংলাদেশের বেসামরিক ও নিরস্ত্র জনগণের বিরুদ্ধে নজীরবিহীন গণহত্যা ও নির্যাতন চালাইতেছে, এবং যেহেতু পাকিস্তান সরকার অন্যায় যুদ্ধ ও গণহত্যা ও নানাবিধ নৃশংস অত্যাচার পরিচালনা দ্বারা বাংলাদেশের গণ প্রতিনিধিদের একত্রিত হইয়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিয়া জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে, এবং যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাহাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী কার্যাক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের ওপর তাহাদের কার্যাকরী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, যেহেতু সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতি যে ম্যাণ্ডেট দিয়াছেন সেই ম্যাণ্ডেট মোতাবেক আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আমাদের সমন্বয়ে গণ পরিষদ গঠন করিয়া পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য মনে করি, সেই হেতু আমরা বাংলাদেশকে সার্বভৌম গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি, এবং উহার দ্বারা পূর্বাহ্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা অনুমোদন করিতেছি।

এতদ্-দ্বারা আমরা আরো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে শাসনতন্ত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

রাষ্ট্র প্রধান প্রজাতন্ত্রের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক পদেও অধিষ্ঠিত থাকিবেন। রাষ্ট্রপ্রধানই সর্বপ্রকার প্রশাসন ও আইন প্রণয়নের অধিকারী।

রাষ্ট্র প্রধানের প্রধানমন্ত্রীও মন্ত্রী সভার সদস্যদের নিয়োগের ক্ষমতা থাকিবে। তাঁহার কর ধার্যও অর্থ ব্যয়ের ক্ষমতা থাকিবে, তাঁহার গণ পরিষদের অধিবেশন আহ্বান ও উহার অধিবেশন মুলতবী ঘোষণার ক্ষমতা থাকিবে। উহা ছাড়া বাংলাদেশের জনসাধারণের জন্য আইনানুগও নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল ক্ষমতারও তিনি অধিকারী হইবেন। বাংলাদেশের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে আমরা আরো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে কোন কারণে রাষ্ট্র প্রধান যদি না থাকেন, অথবা রাষ্ট্র প্রধান যদি কাজে যোগদান করিতে না পারেন অথবা তাঁহার কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে যদি অক্ষম হন তাহা হইলে রাষ্ট্র প্রধানকে প্রদত্ত সকল ক্ষমতা ও দায়িত্ব উপরাষ্ট্র প্রধান পালন করিবেন।

আমরা আরো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে আমাদের এই স্বাধীনতার ঘোষণা ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ হইতে কার্য্যকর বলিয়া গণ্য হইবে।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে আমাদের এই সিদ্ধান্ত কার্য্যকর করার জন্য আমরা অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে যথাযথ ভাবে রাষ্ট্র প্রধান ও উপ-রাষ্ট্র প্রধানের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য দায়িত্ব অর্পণ ও নিযুক্ত করিলাম।

প্রধান মন্ত্রী তাজউদ্দিনের ভাষণ

নূতন রাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করার পর জনাব তাজউদ্দিন আহমদ উপস্থিত পরিষদ সদস্য, সুধী, দেশী-বিদেশী সাংবাদিক ও বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। জনাব তাজউদ্দিন আহমদ তাঁর এই ঐতিহাসিক ভাষণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পটভূমি ব্যাখ্যা করে নূতন রাষ্ট্র বাংলাদেশকে তাৎক্ষণিক ভাবে স্বীকৃতি দান ও এর সাহায্য ও সহযোগিতার এগিয়ে আসার জন্য বিশ্বের জাতিবর্গের প্রতি আহ্বান জানান। ভাষণটি পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকেও প্রচারিত হয়েছিল। জনাব তাজউদ্দিন আহমদের এই ঐতিহাসিক ভাষণের পূর্ণ বিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হ'ল:

"বাংলাদেশ এখন যুদ্ধে লিপ্ত। পাকিস্তানের উপনিবেশবাদী নিপীড়নের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জন ছাড়া আমাদের হাতে আর কোনও বিকল্প নেই।

বাংলাদেশে গণহত্যার আসল ঘটনাকে ধামাচাপা দেয়ার লক্ষ্যে পাকিস্তান সরকারের অপপ্রচারের মুখে বিশ্ববাসীকে অবশ্যই জানাতে হবে কিভাবে বাংলার শান্তিকামী মানুষ সশস্ত্র সংগ্রামের পরিবর্তে সংসদীয় পদ্ধতিকেই বেছে নিয়েছিল। তবেই তাঁরা বাংলাদেশের ন্যায়সঙ্গত আশা আকাংখাকে সত্যিকার ভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন।

পাকিস্তানের জাতীয় সংহতি রক্ষার শেষ চেষ্টা হিসেবে আওয়ামী লীগ পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে ছ' দফার আলোকে বাংলাদেশের জন্য স্বায়ত্তশাসন চেয়েছিলেন। ১৯৭০-এ আওয়ামী লীগ এই ছ'দফা নির্বাচনী ইশতাহারের ভিত্তিতেই পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের মোট ৩১৩টি আসনের মধ্যে বাংলাদেশের জন্য বরাদ্দ ১৬৯টি আসনের স্থলে মোট ১৬৭টি আসন লাভ করেছিল। নির্বাচনী বিজয় এতই চুড়ান্ত ছিল যে আওয়ামী লীগ মোট শতকরা আশিটি ভোট পেয়েছিল। এই বিজয়ের চুড়ান্ত রায়েই আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

স্বভাবতঃই নির্বাচন পরবর্তী সময়টি ছিল আমাদের জন্য এক আশাময় দিন। কারণ সংসদীয় গণতন্ত্রে জনগণের এমনি চুড়ান্ত রায় ছিল অভুতপূর্ব। দুই প্রদেশের জনগণই বিশ্বাস করেছিলেন যে এবার ছ' দফার ভিত্তিতে উভয় প্রদেশের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য গঠনতন্ত্র সম্ভব হবে। তবে সিন্ধু এবং পাঞ্জাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভকারী পাকিস্তান পিপল্‌স্ পার্টি তাদের নির্বাচন অভিযানে ছ' দফাকে এড়িয়ে গিয়েছিল। কাজেই ছ' দফাকে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার জন্য জনগণের কাছে এইদল জবাবদিহি ছিল না। বেলুচিস্তানের নেতৃস্থানীয় দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ছিল ছ'দফার পূর্ণ সমর্থক। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রভাবশালী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিও ছ' দফার আলোকে পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনে বিশ্বাসী ছিল। কাজেই প্রতিক্রিয়াশীলদের পরাজয় সূচনাকারী '৭০-এর নির্বাচন পাকিস্তান গণতন্ত্রের আশাপ্রদ ভবিষ্যতেরই ইঙ্গিত বহন করেছিল।

আশা করা গিয়েছিল যে জাতীয় পরিষদ আহ্বানের প্রস্তুতি হিসেবে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি আলোচনায় বসবে। এমনি আলোচনার প্রস্তাব এবং পাল্টা প্রস্তাবের ওপর গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা উপস্থাপনের জন্য আওয়ামী লীগ সব সময়ই সম্মত ছিল। তবে এই দল বিশ্বাস করেছে যে যথার্থ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে জাগ্রত রাখার জন্য গোপনীয় সম্মেলনের পরিবর্তে জাতীয় পরিষদেই গঠনতন্ত্রের ওপর বিতর্ক হওয়া উচিত। এরই প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ চেয়েছিল যথাসত্বর জাতীয় পরিষদ আহ্বানের জন্য। আওয়ামী লীগ আসন্ন জাতীয় পরিষদ

দেশী-বিদেশী সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণরত প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমদ

অধিবেশনে উপস্থাপনের লক্ষ্যে একটি খসড়া গঠনতন্ত্র প্রণয়নের কাজে লেগে গেল এবং এ ধরনের একটি গঠনতন্ত্র প্রয়োগের সব আইনগত এবং বাস্তব দিকও তারা পরীক্ষা করে দেখল।

পাকিস্তানের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের ওপর আলোচনার জন্য জেনারেল ইয়াহিয়া খান এবং শেখ মুজিবের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় জানুয়ারী, '৭১ এর মাঝামাঝি সময়ে। এই বৈঠকে জেনারেল ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগের ছ' দফা ভিত্তিক কর্মসূচীকে বিশ্লেষণ করলেন এবং ফল কি হতে পারে তারও নিশ্চিত ভরসা নিলেন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে। কিন্তু প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্র সম্পর্কে ইয়াহিয়া খান তাঁর নিজস্ব মন্তব্য প্রকাশে বিরত থাকলেন। তিনি এমন এক ভাব দেখালেন যে ছ' দফায় সাংঘাতিক আপত্তিজনক কিছুই তিনি খুঁজে পাননি। তবে পাকিস্তান পিপল্‌স্ পার্টির সাথে একটি সমঝোতার আশার ওপর তিনি জোর দিলেন।

পরবর্তী আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় পাকিস্তান পিপল্‌স্ পার্টি এবং আওয়ামী লীগের সাথে ঢাকায় ২৭শে জানুয়ারী, '৭১। জনাব ভুট্টো এবং তাঁর দল আও-য়ামী লীগের সাথে গঠনতন্ত্রের ওপর আলোচনার জন্য এ সময়ে কয়েকটি বৈঠকে মিলিত হন।

ইয়াহিয়ার ন্যায় ভুট্টোও গঠনতন্ত্রের অবকাঠামো সম্পর্কে কোনও সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আনয়ন করেননি। বরং তিনি এবং তাঁর দল ছ' দফার বাস্তব ফল কি হতে পারে সে সম্পর্কে আলোচনার প্রতিই অধিক ইচ্ছুক ছিলেন। যেহেতু এ ব্যাপারে তাদের প্রতিক্রিয়া ছিল না সূচক, এবং যেহেতু এ নিয়ে তাদের কোনও তৈরী বক্তব্যও ছিল না, সেহেতু, এ ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ আপোষ ফরমুলায় আসাও সম্ভব ছিল না। অথচ দুই দলের মধ্যে মতানৈক্য দূর করার জন্য প্রচেষ্টার দুয়ার সব সময়ই খোলা ছিল। এই আলোচনা বৈঠক থেকে এটাও স্পষ্ট হয়ে গেল যে কোন্ পর্যায় থেকে আপোষ ফরমুলায় আসা সম্ভব সে সম্পর্কেও জনাব ভুট্টোর নিজস্ব কোনও বক্তব্য ছিল না।

এখানে একটি কথা আরো পরিষ্কার ভাবে বলে রাখা দরকার যে আওয়ামী লীগের সাথে আলোচনায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এ ধরনের কোনও আভাসও পাকিস্তান পিপল্‌স্ পার্টি ঢাকা ত্যাগের আগে দিয়ে যাননি। উপরন্তু তারা নিশ্চয়তা দিয়ে ছিলেন যে আলোচনার জন্য সব দরজাই খোলা রয়েছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ-আলোচনার পর পাকিস্তান পিপল্‌স্ পার্টি আওয়ামী লীগের সাথে দ্বিতীয় দফায় আরো অধিক ফলপ্রসূ আলো-

চনায় বসবেন, অথবা জাতীয় পরিষদেও তারা ভিন্নভাবে আলোচনার জন্যও অনেক সুযোগ পাবেন।

পরবর্তী পর্যায়ে জনাব ভুট্টোর জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বয়কটের সিদ্ধান্ত সবাইকে বিস্মিত ও হতবাক করে। তার এই সিদ্ধান্ত এ জন্যই সবাই-কে আরো বেশী বিস্মিত করে যে শেখ মুজিবের দাবী মোতাবেক ১৫ই ফেব্রু-য়ারী জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান না করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ভুট্টোর কথামতই ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডেকেছিলেন। পরিষদ বয়কটের সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য সমস্ত দলের সদস্যদের বিরুদ্ধে ভীতি প্রদর্শনের অভিযান শুরু করেন। এ অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে পরিষদের অধিবেশনে যোগদান থেকে বিরত রাখা। এ কাজে ভুট্টোর হস্তকে শক্তিশালী করার জন্য জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ইয়া-হিয়ার ঘনিষ্ঠ সহচর লেঃ জেনারেল ওমর ব্যক্তিগত ভাবে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের সঙ্গে দেখা করে তাদের ওপর পরিষদের অধিবেশনে যোগদান না করার জন্য চাপ দিতে থাকেন। জনাব ভুট্টো ও লেঃ জেনারেল ওমরের চাপ সত্বেও পি, পি, পি ও কায়ুম লীগের সদস্যগণ ব্যতীত অপরাপর দলের সমস্ত সদস্যই ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের জন্য বিমানে পূর্ব বাংলায় গমনের টিকিট বুক করেন। এমনকি কায়ুম লীগের অর্ধেক সংখ্যক সদস্য তাদের আসন বুক করেন। এমনও আশ্বাস পাওয়া যাচ্ছিল যে পি, পি,-পি-র বহু সদস্য দলীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ঢাকায় আসতে পারেন। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এভাবে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেও যখন কোন কুল-কিনারা পাওয়া যাচ্ছিল না, তখন ১লা মার্চ অনির্দিষ্ট কালের জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করেন জেনারেল ইয়াহিয়া তাঁর দোস্ত ভুট্টো-কে খুশী করার জন্য। শুধু তাই নয়, জেনারেল ইয়াহিয়া পূর্ব বাংলার গভর্ণর আহসানকেও বরখাস্ত করলেন। গভর্ণর আহসান ইয়াহিয়া প্রশাসনে মধ্যপন্থী বলে পরিচিত ছিলেন। বাঙালীদের সংমিশ্রণে কেন্দ্রে যে মন্ত্রীসভা গঠিত হয়ে-ছিল তাও বাতিল করে সরকারের সমস্ত ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তানী মিলিটারী জান্তার হাতে তুলে দেয়া হলো।

এমতাবস্থায় ইয়াহিয়ার সমস্ত কার্যাক্রমকে কোন ক্রমেই ভুট্টোর সাথে চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে বাংলাদেশের গণ-রায় বানচাল করার প্রয়াস ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না। জাতীয় পরিষদই ছিল একমাত্র স্থান যেখানে বাংলাদেশ তার বক্তব্য কার্য্য-করী করতে পারতো এবং রাজনৈতিক শক্তি প্রদর্শন করতে পারতো। এটাকে

বানচাল করার চেষ্টা চলতে থাকে। চলতে থাকে জাতীয় পরিষদকে সত্যিকার ক্ষমতার উৎস না করে একটা 'ঠুটো জগন্নাথে' পরিণত করার।

জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিতের প্রতিক্রিয়া যা হবে বলে আশঙ্কা করা হয়েছিল তাই হয়েছে। ইয়াহিয়ার এই স্বৈরাচারী কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য সারা বাংলাদেশের মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে রাস্তায় নেমে পড়েন। কেননা বাংলাদেশের মানুষ বুঝতে পেরেছিলেন যে ক্ষমতা হস্তান্তরের কোন ইচ্ছাই ইয়া-হিয়া খানের নেই এবং তিনি পার্লামেন্টারী রাজনীতির নামে তামাশা করছেন। বাংলাদেশের জনগণ এটা স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিল যে এক পাকিস্তানের কাঠামোতে বাংলাদেশের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ের কোন সম্ভাবনা নেই। ইয়াহিয়া নিজেই আহ্বান করে আবার নিজেই যেভাবে জাতীয় পরিষদের অধি-বেশন বন্ধ করে দিলেন তা থেকেই বাঙালী শিক্ষা গ্রহণ করেছে। তাই তারা এক বাক্যে পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর চাপ দিতে থাকেন।

শেখ মুজিব এতদ্‌সত্বেও সমস্যার একটা রাজনৈতিক সমাধানের জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। ৩রা মার্চ অসহযোগ কর্মসুচীর আহ্বান জানাতে গিয়ে তিনি দখলদার বাহিনীকে মোকাবেলার জন্য শান্তির অস্ত্রই বেছে নিয়েছিলেন। তখনো তিনি আশা করছিলেন যে সামরিক চক্র তাদের জ্ঞানবুদ্ধি ফিরে পাবে। গত ২রা ও ৩রা মার্চ ঠাণ্ডা মাথায় সামরিক চক্র কর্তৃক হাজার হাজার নিরস্ত্র ও নিরীহ মানুষকে গুলি করে হত্যা করার মুখে বঙ্গবন্ধুর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের নজির পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

শেখ সাহেবের অসহযোগ আন্দোলন আজ ইতিহাসের অন্তর্গত। অসহযোগ আন্দোলনের ক্ষেত্রে তিনি সৃষ্টি করলেন এক নুতন ইতিহাস। বাংলাদেশে ১লা মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্য্যন্ত অসহযোগ আন্দোলন যেভাবে এগিয়ে গেছে মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে তার নজির খুজে পাওয়া যাবে না। এত কার্য্যকরী অসহ-যোগ আন্দোলন কোথাও সাফল্য লাভ করেনি। পূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন চলেছে দেশের সর্বত্র। নুতন গভর্ণর লেঃ জেনারেল টিক্কা খানের শপথ অনুষ্ঠান পরি-চালনা করার জন্য পাওয়া গেল না হাইকোর্টের কোন বিচারপতি। পুলিশ এবং পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস সহ গণ প্রশাসন বিভাগের কর্মচারিগণ কাজে যোগ দিতে অস্বীকার করেন। জনগণ সেনাবাহিনীর সরবরাহ বন্ধ করে দিল। এমনকি সামরিক দপ্তরের অসামরিক কর্মচারিগণ তাঁদের অফিস বয়কট করলেন। কেবল কাজে যোগদান থেকে বিরত থেকেই তাঁরা ক্ষান্ত হলেন না। অসামরিক

প্রশাসনও পুলিশ বিভাগের লোকের সক্রিয় সমর্থনও নিজেদের আনুগত্য প্রকাশ করলেন শেখ সাহেবের প্রতি। তাঁরা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন যে আওয়ামী লীগ প্রশাসনের নির্দেশ ছাড়া তারা অন্য কারো নির্দেশ মেনে চলবেন না।

এ অবস্থার মুখোমুখী হয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে ক্ষমতাসীন না হয়েও অসহযোগের মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণে আওয়ামী লীগ বাধ্য হলো। এ ব্যাপারে শুধু আপামর জনগণই নয়, বাংলাদেশের প্রশাসন ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের দ্ব্যর্থহীন সমর্থন লাভ তারা করেছিলেন। তারা আওয়ামী লীগের নির্দেশাবলী সর্বান্তকরণে মাথা পেতে মেনে নিলেন এবং সমস্যাবলীর সমাধানে আওয়ামী লীগকে একমাত্র কর্তৃপক্ষ বলে গ্রহণ করলেন। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় কঠিন ধরনের দেখা দেয় নানাবিধ দুরূহ সমস্যা। কিন্তু এসব সমস্যাবলীর মধ্যেও বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে দেশের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক দপ্তরের কাজ যথারীতি এগিয়ে যাচ্ছিল। বাংলাদেশে কোন আইনানুগ কর্তৃপক্ষ না থাকা সত্ত্বেও পুলিশের সহযোগিতায় আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছা-সেবকগণ আইন শৃংখলা রক্ষার যে আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, তা স্বাভাবিক সময়েও অন্যদের অনুকরণীয় হওয়া উচিত। আওয়ামী লীগ ও ঐতিহাসিক অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি জনগণের সর্বাধিক সমর্থন দৃষ্টে জেনারেল ইয়াহিয়া তাঁর কৌশল পাল্টালেন। ৬ই মার্চ ইয়াহিয়াকে একটা কনফ্রণ্টেশনের জন্য উত্তেজনা সৃষ্টিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বলে মনে হলো। কেননা তাঁর ঐদিনের প্ররোচনামূলক বেতার বক্তৃতায় সঙ্কটের সম্পূর্ণ দায়িত্ব চাপালেন আওয়ামী লীগের ওপর। অথচ যিনি ছিলেন সঙ্কটের স্থপতি সেই ভুট্টো সম্পর্কে তিনি একটি কথাও বললেন না। মনে হয় তিনি ধারনা করেছিলেন যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন। অনুরূপ উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে তা নির্মূল করার জন্য ঢাকায় সেনাবাহিনীকে করা হয় পূর্ণ সতর্কীকরণ। লেঃ জেনারেল ইয়াকুব খানের স্থলে পাঠানো হলো লেঃ জেনারেল টিক্কা খানকে। এই রদবদল থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় সামরিক জান্তার ঘৃণ্য মনোভাবের পরিচয়।

কিন্তু ইতিমধ্যে মুক্তিপাগল মানুষ স্বাধীনতা লাভের জন্য পাগল হয়ে ওঠে। এ সত্ত্বেও শেখ মুজিব রাজনৈতিক সমাধানের পথে অটল থাকেন। জাতীয় পরিষদে যোগদানের ব্যাপারে তিনি যে ৪ দফা প্রস্তাব পেশ করেন তাতে যেমন একদিকে প্রতিফলিত হয়েছে জনগণের ইচ্ছা, অপরদিকে, শান্তিপূর্ণ সমাধানে পৌঁছানোর জন্য ইয়াহিয়াকে দেয়া হয় তার শেষ সুযোগ।

বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটি অবশ্যই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে পাকিস্তানের রাজনৈতিক সঙ্কট নিরসনের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ইয়াহিয়া এবং তার জেনারেলদের ছিল না। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশে সামরিক শক্তিকে জোরদার করার জন্য কালক্ষেপন করা। ইয়াহিয়ার ঢাকা সফর ছিল আসলে বাংলাদেশে গণহত্যা পরিচালনার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। এটা আজ, পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে যে অনুরূপ একটি সঙ্কট সৃষ্টির পরিকল্পনা বেশ আগেভাগেই নেয়া হয়েছিল।

১লা মার্চের ঘটনার সামান্য কিছু আগে রংপুর থেকে সীমান্ত রক্ষার কাজে নিয়োজিত ট্যাংকগুলো ফেরত আনা হয়। ১লা মার্চ থেকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পশ্চিম পাকিস্তানী কোটিপতি ব্যবসায়ী পরিবারসমূহের সাথে সেনাবাহিনীর লোকদের পরিবার পরিজনদেরকেও পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো হতে থাকে।

১লা মার্চের পর থেকে বাংলাদেশের সামরিক শক্তি গড়ে তোলার কাজ ত্বরান্বিত করা হয় এবং তা ২৫শে মার্চ পর্যন্ত অব্যাহত গতিতে চলে। সিংহলের পথে পি-আই-এর কমার্শিয়াল ফ্লাইটে সাদা পোষাকে সশস্ত্র বাহিনীর লোকদের বাংলাদেশে আনা হল। সি ১৩০-পরিবহন বিমানগুলোর সাহায্যে অস্ত্র এবং রসদ এনে বাংলাদেশে স্তূপীকৃত করা হয়।

হিসাব নিয়ে জানা গিয়াছে ১লা মার্চ থেকে ২৫শে মার্চের মধ্যে প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম সহ অতিরিক্ত এক ডিভিশন সৈন্য বাংলাদেশে আমদানী করা হয়। ব্যাপারটা নিরাপদ করার জন্য ঢাকা বিমান বন্দরকে বিমানবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। সমগ্র বিমান বন্দর এলাকায় আর্টিলারী ও মেশিনগানের জাল বিস্তার করা হয়। যাত্রীদের আগমন-নির্গমনের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করা হয়। ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ও হত্যাকাণ্ড সংগঠনে ট্রেনিংপ্রাপ্ত একদল এস-এস-জি কমাণ্ডো গ্রুপ বাংলাদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে ছেড়ে দেয়া হয়। ২৫শে মার্চের পূর্ববর্তী দুই দিনে ঢাকা ও সৈয়দপুরে যেসব কুকাণ্ড ঘটে এরাই সেগুলো সংগঠন করেছিল। সামরিক হস্তক্ষেপের অজুহাত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে স্থানীয় ও অস্থানীয়দের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টির মাধ্যমে একটা উত্তেজনার পরিবেশ খাড়া করাই ছিল এসবের উদ্দেশ্য।

প্রতারণা বা ভণ্ডামীর এই ষ্ট্র্যাটেজী গোপন করার অংশ হিসেবেই ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের সাথে তার আলোচনায় আপোষমূলক মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন। ১৬ই মার্চ আলোচনা শুরু হলে ইয়াহিয়া তৎপূর্বে যা ঘটেছে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং সমস্যার একটা রাজনৈতিক সমাধানের জন্য আন্তরিক আগ্রহ

প্রকাশ করেন। শেখ মুজিবের সাথে আলোচনার এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে ইয়াহিয়ার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল আওয়ামী লীগের ক্ষমতা হস্তান্তরের ৪ দফা শর্তের প্রতি সামরিক জান্তার মনোভাব কি? জবাবে ইয়াহিয়া জানান যে এ এ ব্যাপারে তাদের তেমন কোন আপত্তি নেই। তিনি আশা করেন যে ৪ দফা শর্ত পূরণ ভিত্তিতে উভয় পক্ষের উপদেষ্টাগণ একটা অন্তবর্তীকালীন শাসনতন্ত্র প্রণয়নে সক্ষম হবেন।

আলোচনাকালে যে সব মৌলিক প্রশ্নে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয় সেগুলি হল:

১। মার্শাল্ ল বা সামরিক আইন প্রত্যাহার করে প্রেসিডেন্টের একটি ঘোষণার মাধ্যমে একটা বেসামরিক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর।

২। প্রদেশগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলসমূহের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর।

৩। ইয়াহিয়া প্রেসিডেন্ট থাকবেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনা করবেন।

৪। জাতীয় পরিষদের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্যগণ পৃথক পৃথক ভাবে বৈঠকে মিলিত হবেন।

আজ ইয়াহিয়া ও ভুট্টো জাতীয় পরিষদের পৃথক পৃথক অধিবেশনের প্রস্তাবের বিকৃত ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। অথচ ইয়াহিয়া নিজেই ভুট্টোর মনোরঞ্জনের জন্য এ প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এ প্রস্তাবের সুবিধা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইয়াহিয়া সেদিন নিজেই বলেছিলেন যে, ৬ দফা হলো বাংলাদেশের এবং কেন্দ্রের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয়ের এক নির্ভরযোগ্য নীল নক্সা। পক্ষান্তরে এটার প্রয়োগ পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য সৃষ্টি করবে নানারূপ অসুবিধা। এমতাবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তানী এম. এন, এ-দের পৃথকভাবে বসে ৬ দফার ভিত্তিতে রচিত শাসনতন্ত্র এবং এক ইউনিট ব্যবস্থা বিলোপের আলোকে একটা নুতন ধরনের ব্যবস্থা গড়ে তোলার সুযোগ অবশ্যই দিতে হবে।

শেখ মুজিব এবং ইয়াহিয়ার মধ্যকার এই নীতিগত মতৈক্যের পর একটি মাত্র প্রশ্ন থেকে যায় এবং তা হলো অন্তবর্তী পর্যায়ে কেন্দ্র ও বাংলাদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন। এক্ষেত্রেও উভয় পক্ষ এই মর্মে একমত হয়েছিলেন যে, ৬ দফার ভিত্তিতে অদূর ভবিষ্যতে যে শাসনতন্ত্র রচিত হতে যাচ্ছে মোটামুটি তার আলোকেই কেন্দ্র ও বাংলাদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন হবে।

অন্তবর্তীকালীন মীমাংসার এই অংশটি সম্পর্কে একটা পরিকল্পনা তৈরীর উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্টের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা জনাব এম, এম, আহমদকে বিমানে করে ঢাকা আনা হয়। আওয়ামী লীগ উপদেষ্টাদের সাথে আলাপ-আলোচনায় তিনি স্পষ্টভাবে এ কথা বলেন যে রাজনৈতিক মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর

৬ দফা কার্যকরী করার প্রশ্নে দুর্লঙ্ঘ কোন সমস্যা দেখা দেবে না। এমনকি অন্তবর্তী পর্যায়েও না।

আওয়ামী লীগের খসড়ার ওপর তিনি যে তিনটি সংশোধনী পেশ করেছিলেন তাতে একথাই প্রমাণিত হয়েছিল যে সরকার এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে তখন যে ব্যবধানটুকু ছিল তা নীতিগত নয়, বরং কোথায় কোন্ শব্দ বসবে সে নিয়ে। ২৪শে মার্চের বৈঠকে ভাষার সামান্য রদবদলসহ সংশোধনীগুলি আওয়ামী লীগ গ্রহণ করে। অতঃপর অন্তবর্তীকালীন শাসনতন্ত্র চূড়ান্তকরণের উদ্দেশ্যে ইয়াহিয়া ও মুজিবের উপদেষ্টাদের শেষ দফা বৈঠকে মিলিত হওয়ার পথে আর কোন বাধাই ছিল না।

এ প্রসঙ্গে একটা জিনিষ পরিস্কার করে বলতে হয়, কোন পর্যায়েই আলোচনা অচলাবস্থার সম্মুখীন হয়নি। অথচ ইয়াহিয়া বা তার উপদেষ্টারা আভাসইঙ্গিতেও এমন কোন কথা বলেননি যে তাদের এমন একটা বক্তব্য আছে যা থেকে তারা নড়চড় করতে পারেন না।

গণহত্যাকে ধামা-চাপা দেয়ার জন্য ইয়াহিয়া ক্ষমতা হস্তান্তরে আইনগত ছত্রছায়ার প্রশ্নেও আজ জোচ্চুরীর আশ্রয় নিয়েছেন। আলোচনায় তিনি এবং তার দলবল একমত হয়েছিলেন যে ১৯৪৭ সালে ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের মাধ্যমে যেভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়েছিল তিনিও সেভাবে একটা ঘোষণার মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের আইনগত ছত্রছায়ার ব্যাপারে ভুট্টো পরবর্তীকালে যে ক্যাকড়া তুলেছেন ইয়াহিয়া তাই অনুমোদন করেছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, ইয়হিয়া ঘুণাক্ষরেও মুজিবকে এ সম্পর্কে কিছু জানাননি। ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য জাতীয় পরিষদের একটা অধিবেশন বসা দরকার—ইয়াহিয়া যদি আভাস ইঙ্গিতেও একথা বলতেন তাহলে আওয়ামী লীগ নিশ্চয়ই তাতে আপত্তি করতো না। কেননা এমন একটা সামান্য ব্যাপারকে উপেক্ষা করে আলোচনা বানচাল করতে দেয়া যায় না। তাছাড়া জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগুরু দল হিসেবে আওয়ামী লীগের ভয় করার কিছুই ছিল না। দেশের দুই অংশের জাতীয় পরিষদের সদস্যদের পৃথক পৃথক বৈঠকের যে প্রস্তাবে আওয়ামী লীগ সম্মতি দিয়েছিল, তা শুধু ভুট্টোকে খুশী করার জন্যই করা হয়েছিল। এটা কোন সময়ই আওয়ামী লীগের মৌলিক নীতি ছিল না।

২৪শে মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া এবং আওয়ামী লীগ উপদেষ্টাদের মধ্যে চূড়ান্ত বৈঠকে জনাব এম, এম, আহমদ তার সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করেন। এই খসড়া প্রস্তাবের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য জেনারেল পীরজাদার

আহ্বানে একটা চূড়ান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। দুঃখের বিষয় কোন চূড়ান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়নি। বরং জনাব এম, এম, আহমদ আওয়ামী লীগকে না জানিয়ে ২৫শে মার্চ করাচী চলে গেলেন।

২৫শে মার্চ রাত ১১টা নাগাদ সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন হয় এবং সেনাবাহিনী শহরে 'পজিশন' গ্রহণ করতে থাকে। মধ্যরাত্রি নাগাদ ঢাকা শহরের শান্তিপ্রিয় জনগণের ওপর পরিচালনা করা হল গণহত্যার এক পূর্ব নির্দিষ্ট কর্মসূচী। অনুরূপ বিশ্বাসঘাতকতার নজির সমসাময়িক ইতিহাসে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইয়াহিয়া আওয়ামী লীগকে দেননি কোন চরমপত্র। অথবা মেশিনগান, আর্টিলারী সুসজ্জিত ট্যাংকসমূহ যখন মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো ও ধ্বংস-লীলা শুরু করে দিল তার আগে জারী করা হয়নি কোন কার্ফিউ অর্ডার। পরদিন সকালে লেঃ জেনারেল টিক্কা খান তার প্রথম সামরিক নির্দেশ জারী করলেন বেতার মারফত। কিন্তু ৫০ হাজার লোক তার আগেই প্রাণ হারিয়েছেন বিনা প্রতিরোধে। এদের অধিকাংশই ছিল নারী ও শিশু। ঢাকা শহর পরিণত হয় নরককুণ্ডে। প্রতিটি অলিগলি ও আনাচেকানাচে চলতে লাগলো নির্বিচারে গুলি। সামরিক বাহিনীর লোকদের নির্বিচারে অগ্নিসংযোগের মুখে রাতের অন্ধকারে বিছানা ছেড়ে যেসব মানুষ বের হওয়ার চেষ্টা করলো তাদেরকে নির্বি-চারে হত্যা করা হল মেশিনগানের গুলিতে।

আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত আক্রমণের মুখেও পুলিশ ও ই-পি-আর বীরের মতো লড়ে গেল। কিন্তু দুর্বল, নিরীহ মানুষ কোন প্রতিরোধ দিতে পারলো না। তারা মারা গেল হাজারে হাজারে। পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্টের নির্দেশে সেনাবাহিনী যে ব্যাপক গণহত্যা চালিয়েছে আমরা তার একটা নির্ভরযোগ্য তালিকা প্রস্তুত করছি এবং শীঘ্রই তা প্রকাশ করবো। মানব সভ্যতার ইতিহাসে যেসব বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার কাহিনী আমরা শুনেছি, এদের বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতা তার সবকিছুকে ম্লান করে দিয়েছে।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দিয়ে ২৫শে মার্চ রাতে ইয়াহিয়া ঢাকা ত্যাগ করলেন। যাওয়ার আগে তিনি তাদেরকে দিয়ে গেলেন বাঙ্গালী হত্যার এক অবাধ লাইসেন্স। কেন তিনি এই বর্বরতার আশ্রয় নিয়েছিলেন পরদিন রাত ৮টার সময় বিশ্ববাসীকে জানানো হলো এর কৈফিয়ত। এই বিবৃতিতে তিনি নরমেধযজ্ঞ সংঘটনের একটা ব্যাখ্যা বিশ্ববাসীকে জানালেন। তার বক্তব্য একদিকে ছিল পরস্পর বিরোধী এবং অন্যদিকে ছিল মিথ্যার বেসাতিতে ভরা। মাত্র ৪৮ ঘন্টা আগেও যে দলের সাথে তিনি শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের

ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছিলেন সে দলের লোকদের দেশদ্রোহী ও দলটিকে অবৈধ ঘোষণার সাথে বাংলাদেশের পরিস্থিতি বা আলাপ-আলোচনার কোন সং-গতি খুঁজে পেল না বিশ্ববাসী। বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিনিধিত্বশীল এবং জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগুরু আসনের অধিকারী আওয়ামী লীগকে বে-আইনী ঘোষণা করে গণপ্রতিনিধিদের হাতে তার ক্ষমতা হস্তান্তরের ওয়াদাকে সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর অবাধ মত প্রকাশের প্রতি তামাশা ছাড়া মানুষ আর কিছু ভাবতে পারলো না। তার বক্তব্য থেকে এ কথা সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত হলো যে ইয়াহিয়া আর যুক্তি বা নৈতিকতার ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিতে চান না এবং বাংলাদেশের মানুষকে নির্মূল করার জন্য জঙ্গী আইনের আশ্রয় নিতে বদ্ধপরিকর।

পাকিস্তান আজ মৃত এবং অসংখ্য আদম সন্তানের লাশের তলায় তার কবর রচিত হয়েছে। বাংলাদেশে যে শত সহস্র মানুষের মৃত্যু হয়েছে তা পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে একটা দুর্লংঘ্য প্রাচীর হিসেবে বিরাজ করছে। পূর্ব পরিকল্পিত গণহত্যায় মত্ত হয়ে ওঠার আগে ইয়াহিয়ার ভাবা উচিত ছিল তিনি নিজেই পাকিস্তানের কবর রচনা করছেন। তারই নির্দেশে তার লাইসেন্সধারী কসাইরা জনগণের ওপর যে ধ্বংসলীলা চালিয়েছে তা কোন-মতেই একটা জাতীয় ঐক্যের অনুকূল ছিল না। বর্ণগত বিদ্বেষ এবং একটা জাতিকে ধ্বংস করে দেওয়াই ছিল এর লক্ষ্য। মানবতার লেশমাত্রও এদের মধ্যে নেই। উপরওয়ালাদের নির্দেশে পেশাদার সৈনিকরা লঙ্ঘন করেছে তাদের সামরিক নীতিমালা, এবং ব্যবহার করেছে শিকারী পশুর মত। তারা চালিয়েছে হত্যাযজ্ঞ, নারী ধর্ষণ, লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও নির্বিচারে ধ্বংসলীলা। বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে এর নজীর নেই। এ সব কার্যকলাপ থেকে এ কথারই আভাস মেলে যে ইয়াহিয়া খানও তার সাঙ্গপাঙ্গদের মনে দুই পাকিস্তানের ধারণা দৃঢ়-ভাবে প্রোথিত হয়ে গেছে। যদি না হতো তাহলে তারা একই দেশের মানুষের ওপর এমন নির্মম বর্বরতা চালাতে পারতো না। ইয়াহিয়ার এই নির্বিচার গণ-হত্যা আমাদের জন্য রাজনৈতিক দিক থেকে অর্থহীন নয়। তার এ কাজ পাকি-স্তানে বিয়োগান্ত এই মর্মান্তিক ইতিহাসের শেষ অধ্যায়, যা ইয়াহিয়া রচনা করে-ছেন বাঙ্গালীর রক্ত দিয়ে। বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হওয়া বা নির্মূল হওয়ার আগে তারা গণহত্যা ও পোড়া মাটি নীতির মাধ্যমে বাঙ্গালী জাতিকে শেষ করে দিয়ে যেতে চায়। ইত্যবসরে ইয়াহিয়ার লক্ষ্য হল আমাদের রাজনৈতিক, বুদ্ধিজীবী মহল ও প্রশাসন ব্যবস্থাকে নির্মূল করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কারখানা, জনকল্যাণ মূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ ধ্বংস করা এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে শহরগুলোকে ধূলিস্যাৎ করা, যাতে একটি জাতি হিসেবে কোনদিনই আমরা মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারি।

ইতিমধ্যে এ লক্ষ্য পথে সেনাবাহিনী অনেকদূর এগিয়ে গেছে। যে বাংলাদেশকে তারা দীর্ঘ ২৩ বছর নিজেদের স্বার্থে লাগিয়েছে, শোষণ করেছে তাদেরই বিদায়ী লাথির উপহার হিসেবে সেই বাংলাদেশ সর্বক্ষেত্রে পাকিস্তান থেকে ৫০ বছর পিছিয়ে পড়ল।

অগ্নুৎসবের পর গণহত্যার এমন জঘন্যতম ঘটনা আর ঘটেনি। অথচ বৃহৎ শক্তিবর্গ বাংলাদেশের ঘটনার ব্যাপারে উট পাখীর নীতি অনুসরণ করে চলেছেন। তাঁরা যদি মনে করে থাকেন যে এতদ্বারা তাঁরা পাকিস্তানের ঐক্য বজায় রাখার ব্যাপারে সহায়তা করেছেন, তা'হলে তাঁরা ভুল করেছেন। কেননা, পাকিস্তানের ভবিষ্যত সম্পর্কে ইয়াহিয়া খান নিজেও মোহমুক্ত।

তাঁদের বুঝা উচিত যে পাকিস্তান আজ মৃত এবং ইয়াহিয়া নিজেই পাকিস্তানের হত্যাকারী। স্বাধীন বাংলাদেশ আজ একটা বাস্তব সত্য। সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালী অজেয় মনোবল ও সাহসের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছে এবং প্রতিদিন হাজার হাজার বাঙ্গালী সন্তান রক্ত দিয়ে এই নূতন শিশু রাষ্ট্রকে লালিত পালিত করছেন। দুনিয়ার কোন জাতি এ নূতন শক্তিকে ধ্বংস করতে পারবে না। আজ হোক কাল হোক দুনিয়ার ছোট বড় প্রতিটি রাষ্ট্রকেই গ্রহণ করতে হবে এ নূতন জাতিকে। স্থান দিতে হবে বিশ্ব রাষ্ট্রপুঞ্জে।

সুতরাং রাজনীতি এবং মানবতার স্বার্থেই আজ বৃহৎ শক্তিবর্গের উচিত ইয়াহিয়ার ওপর চাপ সৃষ্টি করা, তার লাইসেন্সধারী হত্যাকারীদের খাঁচায় আবদ্ধ করা এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করা। আমাদের সংগ্রামকে সোভিয়েট ইউনিয়ন, ভারত এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষ যে সমর্থন দিয়েছেন তা' আমরা চিরকাল কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবো। গণচীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন ও অন্যান্য দেশের কাছ থেকেও আমরা অনুরূপ সমর্থন আশা করি এবং তা পেলে সেজন্য তাদেরকে অভিনন্দন জানাবো। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের উচিত তাদের নিজ নিজ পর্যায়ে পাকিস্তানের ওপর চাপ সৃষ্টি করা এবং তারা যদি তা করেন তাহলে ইয়াহিয়ার পক্ষে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আর একদিনও হামলা অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়।

জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ হবে বিশ্বের অষ্টম বৃহৎ রাষ্ট্র। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হবে ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনীর সৃষ্ট ভস্ম ধ্বংসস্তুপের ওপর একটা নূতন দেশ গড়ে তোলা। এ একটা দুরূহ বিরাট দায়িত্ব। কেননা আগে থেকেই আমরা বিশ্বের দরিদ্রতম জাতিসমূহের অন্যতম। এছাড়া একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য মানুষ এক ঐতিহাসিক সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। তারা প্রাণপণে

সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। তারা প্রাণ দিচ্ছে অকাতরে। সুতরাং তাদের আশা আমরা ব্যর্থ করতে পারি না। তাদের ভবিষ্যতকে উজ্জ্বল করতেই হবে। আমার বিশ্বাস, যে জাতি নিজে প্রাণ ও রক্ত দিতে পারে, এতো ত্যাগ স্বীকার করতে পারে সে জাতি তার দায়িত্ব সম্পাদনে বিফল হবে না। এ জাতির অটুট ঐক্য স্থাপনের ব্যাপারে কোন বাধা বিপত্তি টিকতে পারে না।

আমাদের এই অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে আমরা কামনা করি বিশ্বের প্রতিটি ছোট বড় জাতির বন্ধুত্ব। আমরা কোন শক্তি ব্লক বা সামরিক জোটভুক্ত হতে চাই না—আমরা আশা করি শুধুমাত্র শুভেচ্ছার মনোভাব নিয়ে সবাই নিঃসংকোচে আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন। কারো তাবেদারে পরিণত হওয়ার জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণের দীর্ঘ সংগ্রামে আমাদের মানুষ এত রক্ত দেয়নি, এত ত্যাগ স্বীকার করছে না।

আমাদের এই জাতীয় সংগ্রামে, তাই আমরা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি এবং বৈষয়িক ও নৈতিক সমর্থনের জন্য বিশ্বের জাতিসমূহের প্রতি আকুল আবেদন জানাচ্ছি। এ ব্যাপারে প্রতিটি দিনের বিলম্ব ডেকে আনছে সহস্র মানুষের অকাল মৃত্যু এবং বাংলাদেশের মূল সম্পদের বিরাট ধ্বংস। তাই বিশ্ববাসীর প্রতি আমাদের আবেদন, আর কালবিলম্ব করবেন না, এই মুহূর্তে এগিয়ে আসুন এবং এতদ্বারা বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের চিরন্তন বন্ধুত্ব অর্জন করুন।

বিশ্ববাসীর কাছে আমরা আমাদের বক্তব্য পেশ করলাম, বিশ্বের আর কোন জাতি আমাদের চেয়ে স্বীকৃতির বেশী দাবীদার হতে পারে না। কেননা, আর কোন জাতি আমাদের চেয়ে কঠোরতর সংগ্রাম করেনি, অধিকতর ত্যাগ স্বীকার করেনি। জয়বাংলা।"

প্রথম সরকারী নির্দেশ

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জনাব তাজুদ্দিন আহমদের প্রথম সরকারী নির্দেশের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। তাঁর প্রথম সরকারী নির্দেশের অনুলিপি নিম্নে সন্নিবেশিত হ'ল:

"স্বাধীন বাংলাদেশ আর তার সাড়ে সাত কোটি সন্তান আজ চূড়ান্ত সংগ্রামে নিয়োজিত। এ সংগ্রামের সফলতার ওপর নির্ভর করছে সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর, আপনার, আমার সন্তানদের ভবিষ্যত। আমাদের এ সংগ্রামে জয়লাভ করতেই হবে এবং আমরা যে জয়লাভ করব, তা অবধারিত।

মনে রাখবেন আমরা এ যুদ্ধ চাইনি। বাঙালীর মহান নায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চেয়েছিলেন গণতান্ত্রিক উপায়ে বিরোধের মীমাংসা করতে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিপতি, শোষকশ্রেণী ও রক্ত পিপাসু পশু শক্তির মুখপাত্র ইয়াহিয়া-হামিদ-টিক্কা সে পথে পা না বাড়িয়ে বাঙালীর পাট বেচা টাকায় গড়ে তোলা সেনাবাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে আমাদের ওপর সর্বশক্তি নিয়ে। তারা নির্বিচারে খুন করছে আমাদের সন্তানদের, মা-বাপদের; ইজ্জত নষ্ট করছে মা-বোনদের, আর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে শহরের পর শহর, গ্রামের পর গ্রাম। তাই আমরা আজ পাল্টা হামলায় নিয়োজিত হয়েছি। গঠন করা হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার। এ সরকারের প্রধানতম লক্ষ্য হলো বাংলাদেশকে শত্রু কবল হতে মুক্ত করা। বাংলাদেশের এই মুক্তি সংগ্রামে ধর্ম, মত, শ্রেণী বা দল নেই। বাংলার মাটি, পানি ও আলো বাতাসে লালিত পালিত প্রতিটি মানুষের একমাত্র পরিচয় আমরা বাঙালী। আমাদের শত্রু পক্ষ আমাদের সেই ভাবেই গ্রহণ করেছে। তাই তারা যখন কোথাও গুলি চালায়, শহর পোড়ায় বা গ্রাম ধ্বংস করে, তখন তারা আমাদের ধর্ম দেখে না, মতাদর্শ দেখে না—বাঙালী হিসেবেই আমাদেরকে মারে।

স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার সকল রকমের অত্যাচার, অবিচার, অন্যায় ও শোষণের অবসান ঘটিয়ে এক সুখী সমৃদ্ধ, সুন্দর সমাজতান্ত্রিক ও শোষণহীন সমাজ কায়েমে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাই জাতির এই মহা সঙ্কট মুহূর্তে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আপনাদের প্রতি আমার আবেদন:

১। কোন বাঙ্গালী কর্মচারী শত্রু পক্ষের সাথে সহযোগিতা করবেন না। ছোট বড় প্রতিটি কর্মচারী স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশ মোতাবেক কাজ করবেন। শত্রু কবলিত এলাকায় তারা জন প্রতিনিধিদের এবং অবস্থা বিশেষে নিজেদের বিচার-বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করবেন।

২। সরকারী, আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সমস্ত কর্মচারী অন্যত্র গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন, তাঁরা স্ব স্ব পদে বহাল থাকবেন এবং নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার ও মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করবেন।

৩। সকল সামরিক, আধা সামরিক লোক কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত অবিলম্বে নিকটতম মুক্তিসেনা শিবিরে যোগ দেবেন। কোন অবস্থাতেই শত্রুর হাতে পড়বেন না বা শত্রুর সাথে সহযোগিতা করবেন না।

৪। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার ছাড়া অন্য কারো বাংলাদেশ থেকে খাজনা, ট্যাক্স, শুল্ক আদায়ের অধিকার নেই। মনে রাখবেন আপনার কাছ

থেকে শত্রুপক্ষের এভাবে সংগৃহীত প্রতিটি পয়সা আপনাকে ও আপনার সন্তানদের হত্যা করার কাজে ব্যবহার করা হবে। তাই যে কেউ শত্রুপক্ষকে খাজনা ট্যাক্স দেবে, অথবা এ ব্যাপারে সাহায্য করবে, বাংলাদেশ সরকার ও মুক্তিবাহিনী তাদেরকে জাতীয় দুশমন বলে চিহ্নিত করবে এবং তাদের দেশদ্রোহের দায়ে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করবে।

৫। যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিশেষ করে নৌ-চলাচল সংস্থার কর্মচারীরা কোন অবস্থাতেই শত্রুর সাথে সহযোগিতা করবেন না। সুযোগ পাওয়া মাত্রই তাঁরা যানবাহনাদি নিয়ে শত্রু কবলিত এলাকার বাইরে চলে যাবেন।

৬। নিজ নিজ এলাকার খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। আর এ চাহিদা মিটানোর জন্য খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে জনগণকে উৎসাহিত করতে হবে। মনে রাখবেন বর্তমান অবস্থায় বিদেশী খাদ্যদ্রব্য ও জিনিষপত্রের ওপর নির্ভর করলে তা আমাদের জন্য আত্মহত্যার শামিল হবে। নিজেদের ক্ষমতানুযায়ী কৃষি উৎপাদনের চেষ্টা করতে হবে। স্থানীয় কুটির শিল্প বিশেষ করে তাঁত শিল্পের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

৭। কালোবাজারী, মুনাফাখোরী, মওজুদদারী, চুরি, ডাকাতি বন্ধ করতে হবে; এদের প্রতি কঠোর নজর রাখতে হবে। জাতির এই সঙ্কট সময়ে এরা আমাদের এক নম্বর দুশমন। প্রয়োজনবোধে এদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৮। আর এক শ্রেণীর সমাজবিরোধী ও দুষ্কৃতিকারী সম্পর্কেও সদা সচেতন থাকতে হবে। এদের কার্যকলাপ দেশদ্রোহমূলক। -----একবার এদের খপ্পরে পড়লে আর নিস্তার নেই। ------------------

৯। গ্রামে গ্রামে রক্ষীবাহিনী গড়ে তুলতে হবে। মুক্তিবাহিনীর নিকটতম শিক্ষা শিবিরে রক্ষীবাহিনীর স্বেচ্ছাসেবকদের পাঠাতে হবে। গ্রামের শান্তি ও শৃংখলা রক্ষা ছাড়াও এরা প্রয়োজনবোধে মুক্তিবাহিনীর সাথে প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করবে। আমাদের কোন স্বেচ্ছাসেবক বা কর্মী যাতে কোন অবস্থাতেই শত্রুর হাতে না পড়ে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

১০। শত্রুপক্ষের গতিবিধির সমস্ত খবরাখবর অবিলম্বে মুক্তিবাহিনীর কেন্দ্রে জানাতে হবে।

১১। স্বাধীন বাংলা মুক্তিবাহিনীর যাতায়াত ও যুদ্ধের জন্য চাওয়া মাত্র সমস্ত যানবাহন (সরকারী/বেসরকারী) মুক্তিবাহিনীর হাতে ন্যস্ত করতে হবে।

১২। বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনী অথবা বাংলাদেশ সরকার ছাড়া অন্য কারো কাছে পেট্রোল, ডিজেল, মোবিল ইত্যাদি বিক্রি করা চলবে না।

১৩। কোন ব্যক্তি পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর অথবা তাদের এজেন্টদের কোন প্রকারের সুযোগ সুবিধার সংবাদ সরবরাহ অথবা পথ নির্দেশ করবেন না। যে করবে তাকে আমাদের দুশমন হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

১৪। কোন প্রকার মিথ্যা গুজবে কান দেবেন না বা চূড়ান্ত সাফল্য সম্পর্কে নিরাশ হবেন না। মনে রাখবেন যুদ্ধে অগ্রাভিযান ও পশ্চাদাপসারণ দু'টাই সমান গুরুত্বপূর্ণ। কোন স্থান থেকে মুক্তিবাহিনী সরে গেছে দেখলেই মনে করবেন না যে আমরা সংগ্রামে বিরতি দিয়েছি।

১৫। বাংলাদেশের সকল সুস্থ ও সবল ব্যক্তিকে নিজ নিজ আগ্নেয়াস্ত্র সহ নিকটস্থ মুক্তিবাহিনী শিবিরে রিপোর্ট করতে হবে। এ নির্দেশ সকল আনসার, মোজাহিদ ও প্রাক্তন সৈনিকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

১৬। শত্রু বাহিনীর ধরা পড়া সমস্ত সৈন্যকে মুক্তিবাহিনীর কাছে সোপর্দ করতে হবে। কেননা, জিজ্ঞাসাবাদের পর তাদের কাছ থেকে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হতে পারে।

১৭। বর্বর ও খুনী পশ্চিমা সেনাবাহিনীর সকল প্রকার যোগাযোগ ও সরবরাহ ব্যবস্থা যাতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হতে পারে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।"

'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত এবং
সাপ্তাহিক জয় বাংলা ১১ই মে ৭১ সংখ্যায় মুদ্রিত।'

কর্ণেল (পরে জেনারেল) আতাউল গনি ওসমানী

কর্ণেল (পরে জেনারেল) আতাউল গনি ওসমানীকে ১৭ই এপ্রিল '৭১ আনুষ্ঠানিক ভাবে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। তবে কার্যতঃ তিনি এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন ১২ই এপ্রিল '৭১ পূর্বাহ্ন থেকে। তখন ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এর প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও অষ্টম ব্যাটালিয়ান এবং প্রাক্তন, ই-পি-আর এর উইং সমূহ স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধ করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে এসে যোগ দেন সশস্ত্র পুলিশ, আনসার

ও মুজাহিদ। এপ্রিল মাস হতে যোগ দেন বাংলাদেশে কর্মরত বিমান বাহিনীর অফিসার, ওয়ারেন্ট অফিসার ও অন্যান্য পদস্থ সদস্যরা, ফ্রান্স থেকে পাকিস্তানী ডুবো জাহাজ পরিত্যাগকারী নৌ-বাহিনীর বাঙ্গালী ওয়ারেন্ট অফিসার ও অন্যান্য পদস্থ নাবিকসহ নৌ-বাহিনীর সদস্য। যুদ্ধের শুরু হতেই দেশের তরুণরা—ছাত্র, পল্লীর কৃষক তনয় ও শ্রমিক এসে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও প্রাক্তন ই-পি-আর এর সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দেন। প্রাথমিক পর্যায়ে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট -এর ব্যাটালিয়ানসমূহকে দিয়েই এসব তরুণদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

জেনারেল ওসমানী এপ্রিল মাসেই একটি বিরাট গেরিলা বাহিনীও নৌ-কমাণ্ডো গঠনসহ নিয়মিত বাহিনীর সম্প্রসারণ ও পুনর্গঠনের পরিকল্পনা নেন। মে মাসে ভারতেই তিনি এই বিরাট গেরিলা বাহিনী ও নৌ-কমাণ্ডো গঠন এবং তাদের জন্য প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সরবরাহের ব্যবস্থা সম্পন্ন করেন। একই সঙ্গে বিমান বাহিনী সংগঠনের জন্য প্রয়োজনীয় বিমান এবং স্থল বাহিনী সম্প্রসারণ ও পুনর্গঠন করে প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা তিনি সম্পন্ন করেন। পাকিস্তানী হানাদারদের বিরুদ্ধে গেরিলা বাহিনীকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঠানো শুরু হয়েছিল জুন মাসের শেষ দিকে। বিমান বাহিনীর জন্য বিমান সংগ্রহে বিলম্ব হওয়ায় বিমান বাহিনীর বহু বেসামরিক অফিসারকে তিনি স্থল-বাহিনীতে নিয়োগ করেন। তাঁরা স্থল যুদ্ধে কৃতিত্বপূর্ণ নেতৃত্ব প্রদান করতে সক্ষম হন।

মুক্তিবাহিনী গঠিত হয়েছিল নিয়মিত বাহিনী এবং গণবাহিনী সমন্বয়ে। জেনারেল ওসমানী সংগঠিত গেরিলা বাহিনীর নামকরণ করেছিলেন গণবাহিনী। বেসামরিক তরুণদের দ্বারাই এই বাহিনী গঠিত হওয়ায় তিনি এমনি নাম দিয়েছিলেন। নিয়মিত বাহিনী এবং গণবাহিনী সামগ্রিক ভাবে মুক্তি বাহিনী পরিচয়ে সমন্বিত পরিকল্পনা মতে বিভিন্ন সেক্টরের পরিচালনায় যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। মুক্তি যুদ্ধের শুরু থেকে ৩রা ডিসেম্বর '৭১ পর্যন্ত এই মুক্তি বাহিনীই অবিরাম ঝড় বৃষ্টি, ও অত্যন্ত কষ্টকর এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে স্থল, সমুদ্র উপকূল ও আভ্যন্তরীণ নৌ-পথে এবং পরবর্তী পর্যায়ে সীমিত সামর্থ নিয়ে আকাশ যুদ্ধেও বীরত্বের সাক্ষর রাখতে সমর্থ হন। জেনারেল ওসমানী বলেন: "ভারতীয় কর্তৃপক্ষ আমাদের অস্ত্র, রসদ ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করেছেন। কিন্তু ৩রা ডিসেম্বরের পূর্ব পর্যন্ত ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী যুদ্ধে নামেন নি।" অতএব তাঁর মতে মুক্তি বাহিনীকে "সহায়ক শক্তি" রূপে বর্ণনা করা শুধু অপমানকরই নয়, এ জাতীয় যে কোনও মন্তব্য ইতিহাসকে বিকৃত করার শামিল।

যথার্থই ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন ৩রা ডিসেম্বর '৭১ থেকে অর্থাৎ পাকিস্তান এবং হিন্দুস্থান আনুষ্ঠানিক ভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার পর। তখন থেকেই শুরু হয় সম্মিলিত মিত্র ও মুক্তি বাহিনীর যৌথ কমাণ্ড। এই যৌথ কমাণ্ডের সেনাপতি ছিলেন ভারতীয় ইষ্টার্ণ কমাণ্ডের জি, ও সি জেনারেল জগজিত সিং অরোরা। ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশে সশস্ত্র বাহিনীর সাথে যুক্ত হওয়ার সাথে সাথে একই সাথে স্থল, বিমান ও নৌ-যুদ্ধে বাংলাদেশের স্বপক্ষে দ্রুত নাটকীয় বিজয় সূচিত হয়। কাজেই একাত্তরের রণাঙ্গনের কেবল শেষ প্রান্তেই ভারতীয় বাহিনী মুক্তি বাহিনীর সাথে সম্মিলিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেও তাদের কাছে বাঙ্গালী জাতি অবশ্যই কৃতজ্ঞ থাকবে। তবে সাথে সাথে স্বীকার করতে হবে যে ভারতীয় বাহিনীর সংযুক্তির সাথে বাংলাদেশের বীর মুক্তি যোদ্ধাদের খাটো করে দেখার কোনও অবকাশ নেই। কারণ ৩রা ডিসেম্বর '৭১-এর মধ্যেই মুক্তি বাহিনী যখন হানাদার পাক বাহিনীর শক্তিকে নিঃশেষ করে দিয়ে বিজয়ের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে গিয়েছিলেন, তখনই মাত্র ভারতীয় বাহিনী এসে মুক্তি বাহিনীর সহায়ক শক্তিরূপে যোগ দেন। কাজেই বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর বীরত্ব এবং আত্মত্যাগকে বাঙ্গালী জাতি অত্যন্ত গৌরব এবং শ্রদ্ধার সাথে চিরদিন স্মরণ করবে।

রণাঙ্গনের এগার সেক্টার

জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী মুক্তি যুদ্ধ পরিচালনার জন্য একাত্তরের পুরা রণাঙ্গণকে মোট ১১টি সেক্টারে বিভক্ত করেছিলেন। তিনি প্রতিটি সেক্টারের ভার অর্পণ করেছিলেন এক একজন সেক্টার কমাণ্ডার বা অধিনায়কের ওপর। নিম্নে সেক্টার নম্বর ও অঞ্চলসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত সেক্টার কমাণ্ডারগণের পূর্ণ তালিকা সন্নিবেশিত হ'ল:

সেক্টার নম্বর ও অঞ্চল	সেক্টার কমাণ্ডারগণের পদবী ও নাম	দায়িত্বকাল মন্তব্য
১—চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং ফেনী নদী পর্যন্ত	(ক) মেজর জিয়াউর রহমান	এপ্রিল-জুন
	(খ) ক্যাপটেন পরে মেজর মোহাম্মদ রফিক	জুন-ডিসেম্বর
২—নোয়াখালী জেলা, আখাউড়া-ভৈরব রেল লাইন পর্যন্ত কুমিল্লা জেলা, ঢাকা জেলা এবং ফরিদপুর জেলার কিছু অংশ	(ক) মেজর খালেদ মোশাররফ	এপ্রিল-সেপ্টেম্বর
	(খ) মেজর এ, টি, এম, হায়দার	সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর

কর্ণেল (পরে জেনারেল) মোহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী, পি এস সি
প্রধান সেনাপতি

সেক্টর কমাণ্ডার-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত

অধিনায়কগণ

মেজর জিয়াউর রহমান

মেজর খালেদ মোশাররফ

মেজর শফিউল্লাহ্

মেজর সি, আর দত্ত

মেজর মীর শওকত আলী

উইং কমাণ্ডার এম, বাশার

মেজর কাজী নুরুজ্জামান

মেজর আবু ওসমান চৌধুরী

মেজর এম, এ, জলিল

মেজর আবু তাহের

মেজর এ, টি, এম হায়দার

মেজর এম, এ, মঞ্জুর

*মেজর জয়নাল আবেদিন

ক্যাপ্টেন (পরে মেজর) মোহাম্মদ রফিক

*ক্যাপ্টেন (পরে মেজর) এ, এন, এম, নূরুজ্জামান

*ফ্লাইট লেঃ এম, হামিদুল্লাহ্

*মেজর জয়নাল আবেদীন, মেজর এ, এন, এম. নূরুজ্জামান এবং ফ্লাইট লেঃ এম, হামিদুল্লাহ্‌র ছবি না পাওয়ায় সংযোজন সম্ভব হ'ল না বলে দুঃখিত।

৩--আখাউড়া-ভৈরব রেল লাইন হতে পূর্ব দিকে কুমিল্লা জেলা ও সিলেট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমা এবং ঢাকা জেলার কিছু অংশ ও কিশোরগঞ্জ	(ক) মেজর কে. এম. শফিউল্লাহ্	এপ্রিল-সেপ্টেম্বর
	(খ) ক্যাপটেন পরে মেজর এ. এন, এম. নুরুজ্জামান	সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর
৪--সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চল, খোয়াই, শায়েস্তাগঞ্জ রেল লাইন বাদে পূর্ব ও উত্তর দিকে সিলেট-ডাউকি সড়ক পর্যন্ত	মেজর সি আর দত্ত	
৫--সিলেট জেলার পশ্চিমাঞ্চল সিলেট-ডাউকি সড়ক হতে সুনামগঞ্জ-ময়মনসিংহ জেলার সীমান্ত পর্যন্ত	মেজর মীর শওকত আলী	
৬--রংপুর জেলা এবং দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁও মহকুমা (পরে যুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার্থে রংপুর জেলার ব্রহ্মপুত্র নদী তীরস্থ অঞ্চল ১১ নম্বর সেক্টারের অধীনে দেয়া হয়)	উইং কমাণ্ডার এম, বাশার	
৭--দিনাজপুর জেলার দক্ষিণাঞ্চল, রাজশাহী, পাবনা ও বগুড়া জেলা (পরে যুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার্থে রংপুর জেলার ব্রহ্মপুত্র নদী-তীরস্থ অঞ্চল ১১নং সেক্টারে দেয়া হয়)	মেজর কাজী নুরুজ্জামান	
৮--কুষ্টিয়া, যশোহর, ফরিদপুরের অধিকাংশ এবং দৌলতপুর সাতক্ষীরা সড়ক বাদে খুলনা জেলা পর্যন্ত।	(ক) মেজর আবু ওসমান চৌধুরী	আগষ্ট পর্যন্ত

	(খ) মেজর এম, এ, মঞ্জুর	আগষ্ট হতে (যুদ্ধের শেষ দিকে ৯ নম্বর সেক্টার ও তাহার পরিচালনাধীন করা হয়)।
৯—দৌলতপুর-সাতক্ষীরা সড়ক (সহ) হতে দক্ষিণে খুলনা জেলা এবং বরিশাল, পটুয়াখালী জেলা	(ক) মেজর এ, জলিল	ডিসেম্বর শুরু পর্যান্ত
	(খ) মেজর জয়নাল আবেদীন	ডিসেম্বর মাসের শেষ কয়েকদিন।
১০—নৌ-কমাণ্ডো-সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল ও আভ্যন্তরীণ নৌ-পথ		নৌ-কমাণ্ডোরা বিভিন্ন সেক্টারে নির্দিষ্ট মিশনে যখন নিয়োজিত তখন সংশ্লিষ্ট সেক্টার কমাণ্ডারের অধীনে কাজ করতেন।
১১—ময়মনসিংহ জেলা (কিশোরগঞ্জ বাদে) এবং *টাঙ্গাইল জেলা	(ক) মেজর আবু তাহের	আগষ্ট-নভেম্বর
	(খ) ফ্লাইট লেফটেনাণ্ট এম, হামিদুল্লাহ্ (নভেম্বরে মেজর আবু তাহের গুরুতরভাবে অসুস্থ হওয়ার পর)	নভেম্বর-ডিসেম্বর

*টাঙ্গাইল সাব সেক্টারে কাদের সিদ্দিকী তাঁর বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করেন।

ব্রিগেড আকারের তিন ফোর্স

উপরোক্ত ১১টি সেক্টার ছাড়াও জেনারেল ওসমানী তিনটি ব্রিগেড আকারের ফোর্স গঠন করেছিলেন এবং এগুলির নামকরণ করেছিলেন ফোর্স অধিনায়কের নামের প্রথম অক্ষর দিয়ে। ফোর্স তিনটির বিবরণী নিম্নে সন্নিবেশিত হ'ল:

ফোর্স-এর নাম	অধিনায়ক	দায়িত্বকাল/মন্তব্য
'জেড' ফোর্স	মেজর পরে লেঃ কর্ণেল জিয়াউর রহমান	জুলাই-ডিসেম্বর
'কে' ফোর্স	(ক) মেজর পরে লেঃ কর্ণেল খালেদ মোশাররফ	সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর
	(খ) মেজর আবু সালেক চৌধুরী (লেঃ কর্ণেল খালেদ মোশারফ গুরুতরভাবে আহত হওয়ার পর নভেম্বর হতে অস্থায়ীভাবে অধিনায়ক)।	
'এস' ফোর্স	মেজর পরে লেঃ কর্ণেল কে, এম, শফিউল্লাহ্	সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর

ফোর্সরূপে নামকরণের পূর্বেই জেড্ ফোর্স এর বাহিনী ব্রিগেড পর্যায়ে জুন মাসের শেষ দিকে/জুলাই মাসের প্রারম্ভে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্টের প্রথম, তৃতীয় ও অষ্টম ব্যাটালিয়ান দিয়ে একজন অস্থায়ী অধিনায়কের পরিচালনায় প্রথমে গঠিত হয়। পরে জেনারেল ওসমানী জুলাই মাসে মেজর জিয়াউর রহমানকে অধিনায়ক নিয়োগ করেন এবং এর নাম করণ করেন জেড ফোর্স। জেনারেল ওসমানী 'কে' ফোর্স এবং 'এস' ফোর্স গঠনের সিদ্ধান্তও প্রথম থেকেই নিয়েছিলেন। কিন্তু অস্ত্র ও যাবতীয় সরঞ্জাম পেতে বিলম্ব হওয়ায় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্টের ৯ম, ১০ম ও ১১তম ব্যাটালিয়ান গঠনও বিলম্বিত হয়েছিল)।

বাংলাদেশ বিমান বাহিনী: এয়ার কমোডোর এ, কে, খোন্দকার

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সাথে যুক্ত হয়েছিল বাংলাদেশ বিমান বাহিনী। এই বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন এয়ার কমোডোর এ, কে, খোন্দকার। মুক্তাঞ্চলে ছোট একটি রানওয়ে ছিল। সেই রানওয়ের পাশে সাধারণ একটি বাঁশের ঘরে থাকতেন বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর পাইলট এবং টেকনিশিয়ানগণ। মুক্তাঞ্চলের এক জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় রাতের আঁধারে বিমান চালিয়ে প্রশিক্ষণ দিতেন এয়ার কমোডোর এ, কে, খোন্দকার। উল্লেখ্য যে তারা ডিসেম্বর '৭১ এর পর ভারতীয় বিমান বাহিনী বাংলাদেশ সশস্ত্র

বাহিনীর সাথে যোগ দেয়ার প্রথম তিন চার দিনের মধ্যেই ভারতীয় বিমান বাহিনী পাকিস্তান বিমান বাহিনীকে পঙ্গু করে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। তবে এই অভিযানে প্রথম বিমান আক্রমণের কৃতিত্ব নিয়েছিলেন নবগঠিত বাংলাদেশ বিমান বাহিনী। এয়ার কমোডোর এ, কে, খোন্দকারের পরিচালনাধীন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বৈমানিকগণ বাংলাদেশ বাহিনীর নিজস্ব বিমান নিয়েই ৪ঠা ডিসেম্বর, '৭১ চট্টগ্রাম এবং ঢাকায় প্রথম আক্রমণ চালিয়েছিলেন। কোনও প্রকারের নেভিগেশন এইড ছাড়াই তাঁরা সেদিন বোমারু আক্রমণের যে নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন, তা ছিল বিস্ময়কর। এই বিমানের রক্ষণাবেক্ষণের সম্পূর্ণ দায়িত্বও নিয়েছিলেন বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রকৌশলীগণ।

মুজিব বাহিনী

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন মুজিব বাহিনী। মুজিব বাহিনী মুক্তি বাহিনীরই অঙ্গ। আওয়ামী লীগ এবং ছাত্র লীগের বাছাই করা তরুণ ও শিক্ষিত কর্মীদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল এই বাহিনী। যাঁরা এই বাহিনী গঠনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন তাঁরা ছিলেন জনাব সিরাজুল আলম খান, শেখ ফজলুল হক মণি, জনাব আবদুর রাজ্জাক এবং জনাব তোফায়েল আহমদ।

'৭১ এর গণ অভ্যুত্থানকালে অর্থাৎ শেখ মুজিবের অসহযোগ আন্দোলনের সময়েই জন্ম হয়েছিল এই বাহিনীর। মার্চ '৭১ এর মাঝামাঝি সময়ে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের সামরিক শাসন নিজ হাতে তুলে নিয়েছিলেন এবং পঁয়ত্রিশটি নির্দেশ জারী করেছিলেন। এইসব নির্দেশ বাস্তবায়ন এবং দেশের আইন শৃংখলার নিশ্চয়তা বিধানের দায়িত্বে এগিয়ে এসেছিলেন আওয়ামী লীগ এবং ছাত্র লীগের যুব স্বেচ্ছাসেবী কর্মীগণ। মার্চ '৭১ এর শেষ প্রান্তে যখন পাকিস্তানী সামরিক চক্রের অশুভ উদ্দেশ্য অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠে, তখন এই সব স্বেচ্ছাসেবকগণই প্রথম প্রতিরোধ আন্দোলন সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং শুরু করেছিলেন সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ। ২৩শে মার্চ, '৭১ ঢাকার আউটার ষ্টেডিয়ামে এই ছাত্র-যুব-নেতারাই বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন এবং যুব সেনাদের সামরিক অভিবাদন গ্রহণ করেন। মুক্তি যুদ্ধকে সংগঠিত ও শক্তিশালী করা ছাড়াও এই যুদ্ধের নেতৃত্ব যাতে কোনও উগ্র বা চরমপন্থী দলের হাতে চলে না যায়, সেটাও মুজিব বাহিনীর অন্যতম লক্ষ্য ছিল।

সাধারণভাবে জনসাধারণের মন থেকে হতাশা দূর করা এবং মুক্তি যুদ্ধ পরিচালনার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য স্থির থাকে এই উদ্দেশ্য নিয়েই মুজিব বাহিনী

বিমান বাহিনীর অধিনায়ক

এয়ার কমোডোর (অব:)
এ, কে, খোন্দকার

মুজিব বাহিনীর চার প্রধান

সিরাজুল আলম খান
(বামে)
আবদুর রাজ্জাক
(ডানে)

শেখ ফজলুল হক মণি
(বামে)
তোফায়েল আহমদ
(ডানে)

কাদেরিয়া বাহিনী

কাদের সিদ্দিকী

গঠিত হলেও পরবর্তীকালে এই বাহিনী প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নিয়ে সশস্ত্র মুক্তি যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়। ডিসেম্বর, '৭১-এ মুজিব বাহিনীর প্রায় পাঁচ হাজার তরুণ বিশেষ ধরনের গেরিলা যুদ্ধ প্রশিক্ষণ শেষ করেন। এদের কারও বয়স একুশের বেশী ছিল না।

কাদেরিয়া বাহিনী

একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে অধিকৃত বাংলাদেশের অভ্যন্তরেই নিজস্ব প্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষণ নিয়ে যে বাহিনী এক অনন্য বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল সে বাহিনীর নাম কাদেরিয়া বাহিনী। অধিনায়ক ছিলেন টাঙ্গাইলের কাদের সিদ্দিকী। গেরিলা পদ্ধতির যুদ্ধের একটি রীতি হ'ল হিট্ এণ্ড রান অর্থাৎ আঘাত হান এবং পালিয়ে যাও। কিন্তু কাদেরীয়া বাহিনী '৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধে সংযোজন করেছিলেন সম্পূর্ণ এক ভিন্নরীতি। তাঁদের পদ্ধতি ছিল হিট্ এণ্ড এডভান্স। অর্থাৎ আঘাত হান এবং এগিয়ে যাও। সমগ্র টাঙ্গাইল জেলা, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও পাবনার কিছু অংশ ছিল এই বাহিনীর এলাকা। ব্যাপক সমর খণ্ডযুদ্ধ ও ছোট-খাট সংঘর্ষসহ এই বাহিনীর মোট লড়াইএর সংখ্যা সাড়ে তিনশ'রও বেশী। তাঁদের হাতে নিহত হয়েছে সহস্রাধিক খান সেনা। অপরদিকে এই বাহিনীর শহীদ মুক্তি যোদ্ধার সংখ্যা হ'ল মাত্র একত্রিশ জন।

কাদেরীয়া বাহিনী ছিল হানাদার বাহিনীর এক মহা আতঙ্ক। এই বাহিনীর নাম শুনা মাত্রই হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগিদের বুকে কাঁপন ধরত। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে কাদেরীয়া বাহিনী ও এই বাহিনীর অধিনায়ক কাদের সিদ্দিকীর নাম চির উজ্জ্বল থাকবে।

পরিশেষে বাংলাদেশ-এর ন' মাসব্যাপী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে 'বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল আতাউল গনি ওসমানীর ভাষায় বলছি "একটা আধুনিক সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সামগ্রীর অপ্রতুলতা ছাড়াও ছিল নেতৃত্ব দেয়ার জন্য বিভিন্ন স্তরের অধিনায়কের সংখ্যার অপ্রতুলতা। তদুপরি সদ্যগঠিত একটি রাষ্ট্রের পক্ষে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আন্তরাষ্ট্রীয় বিষয়াদি পরিচালনায় অভিজ্ঞতা এবং সুযোগও ছিল সীমিত। কিন্তু এসব প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও বাংলাদেশের সশস্ত্র মুক্তিবাহিনী একাত্তরের রণাঙ্গণে যে অসম সাহসিকতা, রণনৈপুণ্য এবং দেশাত্মবোধের পরিচয় দিয়ে এদেশকে স্বাধীন করেছেন তার নজির পৃথিবীতে খুব কমই খুঁজে পাওয়া যাবে"। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে তাঁদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। কৃতজ্ঞ জাতি তাঁদের অবদানকে কখনো ভুলতে পারবে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রঃ

বিস্তারিত তথ্য

কালুরঘাট ট্রান্সমিটার

একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের দ্বিতীয় ফ্রন্ট হিসেবে কাজ করেছে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালী যখন এহিয়ার হানাদার বাহিনীর আক্রমণে দিশেহারা, শোকাকুল: কামানের গোলায় পুলিশ লাইন ভস্মীভূত এবং যখন ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ই-পি-আর এর কিছু বঙ্গ শার্দুল সম্পূর্ণ অন্ধভাবে স্ব স্ব দায়িত্বে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছিলেন, অন্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন প্রতিরোধ সংগ্রামে, ঠিক তখনই জন্ম নিয়েছিল বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। এই বেতার কেন্দ্রের প্রথম অনুষ্ঠান শুনা মাত্র বহু বাঙ্গালী অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি। সে অশ্রু ছিল আনন্দের, স্বস্তির, গৌরবের। বাঙ্গালী আবার উঠে দাঁড়ালো গভীর আত্ম বিশ্বাসে। বীর বঙ্গশার্দুলগণ পেলেন শত্রুর ওপর আঘাত হানার নূতন প্রেরণা। ২৭শে মার্চ, ৭১ এই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকেই মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে তেজোদ্দীপ্ত ভাষায় পৃথিবীর মানুষকে জানিয়ে দিয়েছিলেন নূতন রাষ্ট্র বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার বাণী। এই বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমেই তিনি পৃথিবীর জাতি সমুহের কাছে জানিয়েছিলেন বাংলাদেশের প্রতি তাৎক্ষণিক স্বীকৃতি এবং সহযোগিতা দানের আহ্বান।

২৫শে মার্চ, '৭১ রাতে ইতিহাসের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের পর ২৬শে মার্চ, '৭১-এর সূর্য বয়ে এনেছিল বাংলার বুকে এক সাগর রক্ত, হাহাকার, এবং শোকের কালো ছায়া। বাঙ্গালীর স্বাধিকার আদায়ের সংকল্প ও তেজ বুঝি ২৫শে মার্চ-এর ঐ কাল রাত্রির হত্যার সাথেই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল চিরদিনের জন্য! কিন্তু না। এমনি হতাশার মধ্যে ২৬শে মার্চ '৭১ অপরাহ্ণে প্রায় দু'টার সময় তৎকালীন চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে এল একটি বিদ্রোহী কণ্ঠ। প্রায় পাঁচ মিনিটকাল স্থায়ী এই কণ্ঠে ছিল বাংলার জনগণের প্রতি দখলদার বাহিনীকে সর্বশক্তি দিয়ে রুখে দাঁড়ানোর উদাত্ত আহ্বান। এই দুঃসাহসী বীর কণ্ঠ ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের তৎকালীন সভাপতি মরহুম জনাব আবদুল

হান্নান। কিন্তু পাঁচ মিনিট পরই থেমে গিয়েছিল সে কণ্ঠ। আবার নেমে এল এক কঠিন নিস্তব্ধতা। মনে হ'ল এহিয়া খানের বেয়নেট আর মর্টার বুঝি আবার জয়ী হ'ল। হানাদার বাহিনী বুঝি বাঙ্গালীর স্বাধীন সত্তাকে চিরদিনের জন্য কবর দিল। ঠিক এমনি হতাশার মুহূর্তে হঠাৎ প্রায় সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিট সময়ে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে আর একটি কণ্ঠ ইথার ভেদ করে বেরিয়ে এলো। ঘোষিত হ'ল: "নাসরুম মিনাল্লাহে ওয়া ফাত্হুন করীব"। আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় নিকটবর্তী)। চট্টগ্রাম বেতারের কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে সদ্য সংগঠিত স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে ভেসে এসেছিল এই বিপ্লবী কণ্ঠ। ঘোষক ছিলেন চট্টগ্রাম কাটিকছড়ি কলেজের তৎকালীন ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল জনাব আবুল কাশেম সন্দীপ। ইতিপূর্বে অনুষ্ঠান ঘোষণার প্রারম্ভে চট্টগ্রাম বেতারের তৎকালীন অনুষ্ঠান ঘোষক কাজী হোসনে আরা, জনাব আবুল কাশেম সন্দীপের সাথে পর পর কয়েকবার "বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বলছি" এ জাতীয় কথাক'টি কয়েকবার প্রচার করে শ্রোতা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করলেন চট্টগ্রাম বেতারের বর্ষীয়ান গীতিকার এবং কবি আবদুস সালাম। অতঃপর বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার বাণী পড়ে শুনালেন জনাব আবুল কাশেম সন্দীপ। উল্লেখ্য যে এই বাণী ছিল পূর্বাহ্ণে চট্টগ্রামে বিলিকৃত একটি ইংরেজী হ্যাণ্ডবিলের বঙ্গানুবাদ। স্থানীয় ডাক্তার আনোয়ার আলী সংগৃহীত হ্যাণ্ডবিলটির বঙ্গানুবাদ করেছিলেন তাঁরই স্ত্রী ডাঃ মন্জুলা আনোয়ার। কিছুক্ষণ পরই প্রচারিত হ'ল একটি ভাষণ। ভাষণ নয়ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। প্রচারিত হ'ল: 'নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লিহি আলা রাসূলীহিল করিম।--- -আস্সালামু আলায়কুম। প্রিয় বাংলার বীর জননীর বিপ্লবী সন্তানেরা। স্বাধীনতাহীন জীবনকে ইসলাম ধিক্কার দিয়েছে। আমরা আজ শোষক প্রভুত্ব লোভীদের সাথে সর্বাত্মক সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছি। এই গৌরবোজ্জ্বল স্বাধিকার আদায়ের যুদ্ধে, আমাদের ভবিষ্যৎ জাতির মুক্তি যুদ্ধে মরণকে বরণ করে যে জানমাল কোরবানী দিচ্ছি, কোরআনে করীমের ভাষায় তারা মৃত নহে, অমর। দেশবাসী ভাই-বোনেরা আজ আমরা বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম করছি----নাসরুম্ মিনাল্লাহে ওয়া ফাতহুন করীব। জয় বাংলা।" চট্টগ্রাম বেতারের বয়োবৃদ্ধ গীতিকার কবি আবদুস সালাম ছিলেন এই বীর কণ্ঠ।

প্রথম পর্যায়ে চট্টগ্রাম বেতারের কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সংগঠিত হয়েছিল চট্টগ্রাম বেতারের দশজন নিবেদিত কর্মী (দু'জন বেতার কর্মী ছিলেন না), স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, জনগণ এবং ইষ্ট বেঙ্গল

রেজিমেন্টের সহযোগিতায়। এই বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের দশজন সার্বক্ষণিক সংগঠক ছিলেন সর্বজনাব বেলাল মোহাম্মদ (উক্ত বেতারের তৎকালীন নিজস্ব শিল্পী), আবুল কাসেম সন্দীপ (ফটিকছড়ি কলেজের তৎকালীন ভাইস প্রিন্সিপাল), সৈয়দ আবদুস শাকের (চট্টগ্রাম বেতার তৎকালীন বেতার প্রকৌশলী), আবদুল্লাহ্ আল ফারুক (ঐ তৎকালীন অনুষ্ঠান প্রযোজক), মোস্তফা আনোয়ার (ঐ তৎকালীন অনুষ্ঠান প্রযোজক), রাশেদুল হোসেন (ঐ তৎকালীন টেকনিক্যাল এসিষ্ট্যান্ট), আমিনুর রহমান (ঐ তৎকালীন টেকনিক্যাল এসিষ্ট্যান্ট), শারফুজ্জামান (ঐ তৎকালীন টেকনিক্যাল অপারেটার), রেজাউল করিম চৌধুরী (ঐ তৎকালীন টেকনিক্যাল অপারেটার) এবং কাজী হাবিবুদ্দিন (ইনি বেতার কর্মী ছিলেন না)। বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন বেলাল মোহাম্মদ; এই বেতার কেন্দ্রের প্রথম অধিবেশন সংগঠনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন আবুল কাশেম সন্দীপ, স্থানীয় বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্তার মন্জুলা আনোয়ার, ডাক্তার সৈয়দ আনোয়ার আলী, ইঞ্জিনিয়ার আশিকুল ইসলাম, দিলীপ চন্দ্র দাশ এবং কাজী হোসনে আরা প্রমুখ। কিন্তু শেষোক্ত চারজন প্রথম সন্ধ্যার ঐতিহাসিক অধিবেশন শেষে কালুরঘাট ট্রান্সমিটার ছেড়ে যাওয়ার পর আর ফিরে আসেননি। উল্লেখ্য যে উদ্বোধনী অধিবেশনের সময় কাজী হোসনে আরা কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অবস্থান গোপন রাখার জন্য নিরাপত্তা জনিত কারণে কণ্ঠ দিতে পারেন নি।

প্রসঙ্গতঃ ২৬শে মার্চ, '৮১ দৈনিক বাংলায় লিখিত এক নিবন্ধে ডাক্তার সৈয়দ আনোয়ার আলী দাবী করেছেন যে তাঁর স্ত্রী ডাক্তার মন্জুলা আনোয়ারই বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রথম উদ্যোক্তা। ডাঃ আনোয়ার আলী উক্ত নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন, বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার একখানা ইংরেজী হ্যাণ্ডবিল ঐদিন (২৬শে মার্চ, '৭১) দুপুরে হাতে নিয়ে বাসায় পৌঁছা মাত্রই তাঁর স্ত্রী এর বাংলা অনুবাদ করতে বসে যান এবং অনুবাদ শেষে তাঁর ভাইঝি কাজী হোসনে আরা সহ দু'জনে মিলে এর অনেকগুলি কপি করে ফেলেন। কিন্তু এমনি কপি কত জনকেই বা দেওয়া সম্ভব! ডাক্তার আনোয়ার আলী তাঁর নিবন্ধে উল্লেখ করেন বঙ্গবন্ধু কর্তক স্বাধীনতা ঘোষণার উক্ত বাণী চট্টগ্রাম বেতারের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক প্রচারের উদ্দেশ্যেই ডাক্তার মন্জুলা আনোয়ারের প্রস্তাবক্রমে ইঞ্জিনিয়ার আশিকুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার দিলীপ দাশ এবং কাজী হোসনে আরা সহ তাঁরা প্রথমে আগ্রাবাদ এবং পরে কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে চলে যান। স্থানীয় ওয়াপদার একখানা পিক-আপ গাড়ী

(চট্টগ্রাম ট ৯৬১৫) ছিল ইঞ্জিনিয়ার আশিকের সাথে, এই গাড়ীতে সর্বজনাব বেলাল মোহাম্মদ, আবুল কাশেম সন্দীপ, কবি আবদুস সালাম প্রমুখ সহ তাঁরা গিয়েছিলেন চট্টগ্রাম বেতার (আগ্রাবাদ) থেকে কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে। স্বয়ং ইঞ্জিনিয়ার আশিকুর ইসলামই পিক-আপ গাড়িখানা চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

ডাক্তার মন্জুলা আনোয়ারের প্রতি আমরা জানাই আমাদের সংগ্রামী অভিনন্দন। তবে ঐ সময় বেতার কেন্দ্র চালু করার চিন্তা একই সাথে আরো অনেকের মনে আসা বিচিত্র ছিল না। আমাদের শ্রদ্ধা তাঁদের সবাইর প্রতি সম ভাবে অর্পিত।

বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সার্বক্ষণিক প্রথম দশজন সংগঠন কর্মীকে প্রত্যক্ষ ভাবে আরো যাঁরা সহযোগিতা প্রদান করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন—ডাক্তার মোহাম্মদ শফি (শহীদ), বেগম মুশতারী শফি, মীর্জা নাসিরউদ্দিন (চট্টগ্রাম বেতারের তৎকালীন আঞ্চলিক প্রকৌশলী), জনাব সুলতান আলী (ঐ তৎকালীন বার্তা সম্পাদক), জনাব আবদুস সোবহান (ঐ বেতার প্রকৌশলী), জনাব দেলোয়ার হোসেন (ঐ বেতার প্রকৌশলী), জনাব মাহমুদ হোসেন (শহীদ), জনাব আবদুস শুকুর, জনাব সেকান্দর হায়াত খান, জনাব মোসলেম খান এবং আরো অনেকে। এ ছাড়া যাঁদের পরোক্ষ সমর্থন এই বেতার সংগঠনে বিশেষ ভাবে সহায়ক হয়েছিল তাঁদের মধ্যে তৎকালীন চট্টগ্রাম বেতারের সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক মরহুম আবদুল কাহ্হারের নাম অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে উল্লেখযোগ্য। মূলতঃ জনাব আবদুল কাহ্হারের পরামর্শক্রমেই বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, আগ্রাবাদস্থ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রে সংগঠিত না হয়ে হানাদার বাহিনীর যুদ্ধ জাহাজের শেলিং আওতা থেকে নিরাপদ দূরত্বে কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে সংগঠিত হয়েছিল। অন্যথায় হয়ত বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রথম তাৎপর্যময় দিনগুলিই নয় শুধু, এদেশের স্বাধীনতার প্রারম্ভিক দিনগুলির ইতিহাসই হয়ত সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে লিখতে হতো। কাজেই স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ের কারো মুহূর্তের অবদানকেও সামান্য মনে করা যায় না।

স্পষ্টতঃই এহিয়া খানের লেলিয়ে দেয়া হানাদার বাহিনীর বর্বর হামলা শুরুর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সক্রিয় হয়েছিল বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। এই বেতার কেন্দ্র শুধু এহিয়া খানের চ্যালেঞ্জই গ্রহণ করেনি, সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর মুক্তি যুদ্ধের প্রতি সহানুভূতিশীল বিশ্বের সমর্থন এবং সহযোগিতার আহ্বান

জানানো হয়েছিল এখন থেকেই। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ঐতিহাসিক নাম ঘোষণা মুহূর্তে ম্লান করে দিয়েছিল দাম্ভিক এহিয়ার প্রতিরোধহীন বিজয় দর্পকে। এই বেতার কেন্দ্র, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এবং শোকাভিভূত লাখো বাঙ্গালীর মনে সঞ্চার করেছিল আশার আলো। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ইথারে আলোড়ন তুলল: বীর বাঙ্গালীগণ এহিয়া চক্রকে প্রতিহত করছে সর্বশক্তি দিয়ে। ই-পি-আর এবং পুলিশ বাহিনী বীর বিক্রমে শত্রুর ওপর আঘাত হানছে। দেশ প্রেমিক বাঙ্গালীগণ রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করে শত্রুর অগ্রযাত্রা প্রতিরোধ করছে। দিকে দিকে চলছে শত্রু হননের মিছিল।"

২৭শে মার্চ, '৭১ মেজর জিয়াউর রহমান (পরবর্তীকালে লে: জেনারেল এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি) স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্বাধীনতা ঘোষণা পাঠ করলেন। মেজর জিয়াউর রহমানের সেদিনের ঐতিহাসিক ভাষণ এই গ্রন্থের ৩১ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছে। বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের এমনি অনুষ্ঠান প্রচার শুনে দিশেহারা সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালী উঠে দাঁড়ালো গভীর আত্ম-বিশ্বাসে। এহিয়া চক্র ফেটে পড়ল মহা আক্রোশে। সূত্রপাত হ'ল সর্বাত্মক স্বাধীনতা যুদ্ধের।

দুই দিন পর এই বেতার কেন্দ্রের নাম থেকে বিপ্লবী কথাটি বাদ দেয়া হয়েছিল। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রচার বাধাহীন ভাবে এগুতে পারেনি। প্রচণ্ড বাধা এলো মাত্র চার দিনের মধ্যে। শত্রুর বোমারু বিমান থেকে ৩০শে মার্চ, '৭১ চট্টগ্রাম বেতারের কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে বোমা ফেলা হ'ল। উপরান্তর না দেখে আমাদের বীর শব্দসৈনিকগণ তৎকালীন ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস-এর সহায়তায় একটি ক্ষুদ্র এক কিলোওয়াট ট্রান্সমিটার বয়ে নিয়ে এলেন মুক্তাঞ্চলে। এই ট্রান্সমিটারের সাহায্যে বিচ্ছিন্ন ভাবে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়েছিল আরো কিছুদিন।

মুজিব নগর :
পঞ্চাশ কিলোওয়াট মধ্যম তরঙ্গ ট্রান্সমিটার

মুজিব নগরে অস্থায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়েছিল ১০ই এপ্রিল, '৭১। ১৭ই এপ্রিল, '৭১ কুষ্টিয়ার বৈদ্যনাথতলায় এই অস্থায়ী সরকার আনুষ্ঠানিক ভাবে আত্মপ্রকাশের পর মুক্তিযুদ্ধের প্রচার জোরদার করার উদ্দেশ্যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রকে নূতন করে সংগঠনের দায়িত্ব অর্পিত হ'ল

জনাব আবদুল মান্নান, এম, এন, এর উপর। এই বেতার কেন্দ্রের পরোক্ষ উপদেষ্টা ছিলেন সর্বজনাব জিল্লুর রহমান (এম, এন, এ), মোহাম্মদ খালেদ (এম, এন, এ) এবং তাহেরউদ্দিন ঠাকুর (এম, এন, এ)।

মুজিব নগরে পঞ্চাশ কিলোওয়াট (মধ্যম তরঙ্গ) শক্তি-সম্পন্ন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শুভ সূচনা হয়েছিল ২৫শে মে '৭১। পূর্ণ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে শুরু হয়েছিল এই বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচার। দৈনিক সকাল ৭টা ও সন্ধ্যে ৭টা এ দুই অধিবেশনে শুরু হ'ল এ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান সূচীতে অন্তর্ভুক্ত হ'ল বাংলা এবং ইংরেজী খবর, সংগ্রামী মুক্তি যোদ্ধাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান 'অগ্নিশিখা', 'চরমপত্র' বিশেষ কথিকা, বঙ্গবন্ধুর বাণী এবং দেশাত্মবোধক গানের অনুষ্ঠান 'জাগরণী'। নব পর্যায়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জন্য প্রথম গান বাণীবদ্ধ করলেন রংপুর বেতারের তৎকালীন পল্লীগীতি শিল্পী শাহ্ আলী সরকার। শুনেছি স্বাধীনতা প্রাপ্তির কিছুদিন পর তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল এবং ঐ অবস্থায়ই তিনি রংপুরে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহে)- - - - -।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কাজ চলত ছোট্ট একটি দ্বিতল বাড়ীতে। অনুষ্ঠান বাণীবদ্ধ করার জন্য ষ্টুডিও ছিল মাত্র একটি। পরে আরো একটি কক্ষ খালি করে অনুষ্ঠান রেকর্ডিং-এর ব্যবস্থা হয়েছিল। তবে এগুলিতে পেশাগত ষ্টুডিওর ন্যায় কোনও শব্দ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ছিল না। ছিল না প্রয়োজনীয় বাদ্য-যন্ত্র ও যন্ত্রী। অবশ্য পরবর্তীকালে বাদ্যযন্ত্রের আংশিক অভাব পূরণ হয়েছিল। আমরা ড্রাম, সাইড-ড্রাম, গীটার, কর্নেট ইত্যাদি যন্ত্রপাতি খরিদ করে নিয়েছিলাম। কিন্তু বাড়ীর ব্যবস্থা আর হ'ল না। ওখানেই আমরা খেতাম। সারাদিন এবং গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করে ঐ বাড়ীর খোলা মেঝেতেই চাদর পেতে শুয়ে পড়তাম।

আগেই বলেছি, চরমপত্র : বিশেষ ব্যাংগ রচনা, অগ্নিশিখা, মুক্তি বাহিনীর জন্য অনুষ্ঠান, জাগরণী : উদ্দীপনামূলক গানের অনুষ্ঠান এবং ইংরেজী ও বাংলা খবর ইত্যাদি দিয়েই শুরু হয়েছিল মুজিব নগরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান। চরমপত্র লিখতেন এবং পড়তেন জনাব এম, আর, আখতার। অনুষ্ঠানটি পরিকল্পনা করেছিলেন জনাব আবদুল মান্নান (ভারপ্রাপ্ত এম, এন, এ)। অগ্নিশিখা : মুক্তি বাহিনীর জন্য বিশেষ অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা, প্রযোজনা এবং নামকরণ করেন জনাব টি, এইচ, শিকদার। প্রথম দিকে কিছুদিন তিনি এ অনুষ্ঠানের পরিচালনাও করেছেন। পরবর্তীকালে পর্যায়ক্রমে সর্ব জনাব মোস্তফা আনোয়ার এবং আশরাফুল আলম এ অনুষ্ঠানের পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন।

অল্প কয়েকদিনের জন্য অধ্যাপক বদরুল হাসানও অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেছেন। 'রক্ত স্বাক্ষর' : বিশেষ সাহিত্যানুষ্ঠানের পরিকল্পনা এবং প্রথম কিছুদিন প্রযোজনার দায়িত্বে ছিলেন জনাব টি. এইচ, শিকদার। পরবর্তীকালে এ অনুষ্ঠানের প্রযোজনার ভার নিয়েছিলেন জনাব আশরাফুল আলম। অল্প কয়েকদিন পর সংযোজিত হয়েছিল 'বিশ্ব জনমত' এবং সাপ্তাহিক জয়বাংলা পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্য। এ দু'টি অনুষ্ঠানের পাণ্ডুলিপি পড়তেন জনাব আমিনুল হক বাদশা। 'বিশ্ব জনমত' লিখতেন জনাব সাদেকীন। তবে মাঝে মধ্যে জনাব আবুল কাশেম সন্দীপও এ অনুষ্ঠানের পাণ্ডুলিপি লিখে দিয়েছেন। 'অগ্নিশিখা' : মুক্তি বাহিনীর জন্য বিশেষ অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল রণভেরী : মুক্তি যোদ্ধাদের জন্য বিশেষ সংবাদ বুলেটিন (পরিবর্তিত নাম রণাঙ্গনের সংবাদ) এবং 'দর্পণ' : মুক্তি যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে লিখিত বিশেষ কথিকা। 'দর্পণ' কথিকাটি লিখতেন ও পড়তেন জনাব আশরাফুল আলম।

সীমিত কয়েকজন লেখক, কথক এবং শিল্পী নিয়ে শুরু হয়েছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচার। প্রথম প্রথম আভ্যন্তরীণ ভাবে পাণ্ডুলিপি লেখা ও প্রচারে উৎসাহ পাওয়া গিয়েছিল প্রচুর। কিন্তু সে উৎসাহ বেশীদিন টিকিয়ে রাখা ছিল যথার্থই কঠিন। তাই বিভিন্ন ধারার পাণ্ডুলিপির লেখক এবং কথক সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হ'ল বিশেষ ভাবে। অপরদিকে দৈনন্দিন প্রচারিত অনুষ্ঠানের ত্রুটি-বিচ্যুতির পর্যালোচনারও প্রয়োজন দেখা দিল চরমভাবে।

৬ই জুন, '৭১ আমরা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সামগ্রিক অবস্থা পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে সভা ডাকলাম। এটাই ছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সর্ব স্তরের কর্মীর প্রথম সভা। এতে এম, এন, এ পর্যায়ে উপস্থিত ছিলেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের উপদেষ্টা সর্বজনাব জিল্লুর রহমান, মোহাম্মদ খালেদ এবং তাহেরউদ্দিন ঠাকুর। ভারপ্রাপ্ত এম. এন, এ জনাব আবদুল মান্নান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ জরুরী কাজে সেদিন মুজিব নগরের বাইরে ছিলেন। তাই এ সভায় তিনি উপস্থিত থাকতে পারেন নি। ন'দিনের ব্যবধানে ১৫ই জুন '৭১ আমরা সম্মিলিত ভাবে আবার একত্রিত হয়েছিলাম। এ দু'টি সভায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচার সংগঠন প্রসংগে আমরা কয়েকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।

পরবর্তীকালে প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ একবার স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নীতি নির্দ্ধারণী সভা ডাকা সাব্যস্ত হয়েছিল। এ পর্যায়ে প্রথম নীতি নির্দ্ধারণী সভা আহুত হয়েছিল মুজিব নগরস্থিত গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

সরকারের প্রতিরক্ষা সচিব জনাব আবদুস সামাদের সভাপতিত্বে তাঁরই দপ্তর কক্ষে। জনাব আবদুস সামাদ ৩রা সেপ্টেম্বর '৭১ থেকে ১৩ই অক্টোবর, '৭১ পর্যন্ত একই সাথে প্রেস, তথ্য, বেতার ও চলচ্চিত্রেরও অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেন। ১৪ই অক্টোবর, '৭১ থেকে সচিব হিসেবে এই বিভাগের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন জনাব আনোয়ারুল হক খান। স্বাধীনতা যুদ্ধ শেষে মুজিব নগর থেকে ফিরে এসেও তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রনালয়ের সচিব হিসেবে প্রায় মাসাধিক কাল দায়িত্ব পালন করেছেন। উল্লেখ্য যে জনাব আনোয়ারুল হক খান ছিলেন যুদ্ধ শেষের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের প্রথম সচিব। সার্বক্ষণিক বেতার কর্মী হিসেবে আমরা ছাড়াও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের উল্লিখিত নীতি নির্দ্ধারণী সভায় উপস্থিত থাকতেন সর্ব জনাব কামরুল হাসান (বিশিষ্ট অংকন শিল্পী এবং অস্থায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প এবং ডিজাইন বিভাগের পরিচালক), জনাব আবদুল জব্বার খান (বিশিষ্ট চিত্র প্রযোজক এবং অস্থায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের চলচ্চিত্র বিভাগের পরিচালক), জনাব এম, আর আখতার (চরম পত্রের লেখক এবং পাঠক ও অস্থায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রেস ও তথ্য বিভাগের পরিচালক) জনাব আলমগীর কবির (বিশিষ্ট চিত্র প্রযোজক এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ইংরেজী অনুষ্ঠানের সংগঠক) প্রমুখ। মাঝে মধ্যে প্রয়োজনের ভিত্তিতে বিশেষ আমন্ত্রনক্রমে এ জাতীয় সভায় উপস্থিত থাকতেন মিঃ সমর দাশ (বিশিষ্ট সুরকার এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম সংগীত পরিচালক), হাসান ইমাম (বিশিষ্ট চিত্রাভিনেতা, চিত্র প্রযোজক এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের বাংলা সংবাদ পাঠক, নাট্যাভিনেতা এবং নাট্য প্রযোজক) প্রমুখ।

জুলাই, '৭১ হতে ক্রমে স্বাধীনতা যুদ্ধ ব্যাপক আকার ধারণ করতে থাকে। আমাদের জঙ্গী অনুষ্ঠানও চলতে থাকে তেমনি ব্যাপক ভাবে। ইতিমধ্যে দৈনিক বাংলা এবং ইংরেজী সংবাদ ছাড়াও 'ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ প্রোগ্রাম' নাম দিয়ে প্রায় কুড়ি মিনিট ব্যাপ্তির অতিরিক্ত একটি অনুষ্ঠান সংযোজিত হয়েছিল। এ অনুষ্ঠানটির পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন জনাব আলমগীর কবীর। জনাব আলী যাকের ছিলেন এ অনুষ্ঠান প্রচারে তাঁর প্রধান সহযোগী। এ ছাড়া সংযোজিত হয়েছিল দৈনিক অনূর্দ্ধ দশ মিনিটের একটি উর্দ্দু অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করতেন জনাব জাহিদ সিদ্দিকী। কিছুদিন এ অনুষ্ঠানের অন্যতম সহযোগীর দায়িত্ব পালন করেছেন জনাব শহিদুর রহমান। এ অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল জনাব জাহিদ সিদ্দিকী লিখিত ও পঠিত বিশেষ উর্দ্দু পর্যালোচনা।

তাঁর অগ্নিঝরা এবং খাঁটি উর্দু উচ্চারণ পশ্চিমা হানাদার বাহিনীকে শুধু বিভ্রান্ত করেনি, উপরন্তু তাদের মনোবলকে নিষ্ক্রিয় করে দিতে পেরেছিল অনেকখানি। অথচ জনাব জাহিদ সিদ্দিকী ছিলেন ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জের অধিবাসী।

জুলাই, '৭১এর মধ্যে আমরা আরো কয়েকটি আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান সংযোজন করেছিলাম। তন্মধ্যে জল্লাদের দরবার: এহিয়া খান ও তার সভাসদবৃন্দের চরিত্র চিত্রণ করে বিশেষ ব্যাংগ নাটিকা, দৃষ্টিপাত: বিশেষ পর্যালোচনা, ইসলামের দৃষ্টিতে: বিশেষ কথিকা এবং 'রাজনৈতিক মঞ্চ' ও 'পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে' বিশেষ পর্যালোচনা উল্লেখযোগ্য। জল্লাদের দরবার: বিশেষ নাটিকার পাণ্ডুলিপিকার ছিলেন কল্যাণ মিত্র। মরহুম রাজু আহমেদ ছিলেন এ অনুষ্ঠানের প্রধান চরিত্র 'কেল্লা ফতেহ্ আলী খান'। কেল্লা ফতেহ্ আলী খানরূপী এহিয়া খানের রূপক চরিত্রে তাঁর দরদ ভরা স্বার্থক অভিনয় কৃতজ্ঞ বাঙালী জাতির পক্ষে কখনো ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। এই নাটিকায় অন্যান্য চরিত্রে যাঁরা সার্থক অভিনয় করেছেন তাঁরা ছিলেন নারায়ণ ঘোষ (দুর্মুখ), আজমল হুদা মিঠু, প্রসেনজিৎ বোস, জহিরুল হক, কাজিয়া বসু, ইফতেখারুল আলম, বুলবুল মহালনবীশ এবং করুনা রায়। এহিয়া খানের বিবেগ 'দুর্মুখ' এর চরিত্রে নারায়ণ ঘোষের অভিনয় সবাইকে মুগ্ধ করেছে। সর্বোপরি নাট্যকার কল্যাণ মিত্রের অপূর্ব কাহিনী সৃষ্টি এবং সার্থক চরিত্র চিত্রায়নই ছিল নাটিকাটির সফল উপস্থাপনার প্রধান সহায়ক কারণ। পরবর্তীকালে সোনার বাংলা: পল্লী শ্রোতাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান, কাঠগড়ার আসামী, পিণ্ডির প্রলাপ, রণাঙ্গনের চিঠি, মুক্তাঞ্চল ঘুরে এলাম, ইয়াহিয়া জবাব দাও প্রভৃতি আরো কয়েকটি আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান আমরা সংযোজন করেছিলাম। এ ছাড়া জনাব এম, আর আখতারের উৎসাহে 'ওরা রক্তবীজ' নামে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য বিশেষ একটি অনুষ্ঠানও সংযোজিত হয়েছিল। তবে এ অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হয়েছিল মাত্র দু'দিন। 'সোনার বাংলা' এবং 'প্রতিধ্বনি' এ দুটি অনুষ্ঠানের পাণ্ডুলিপি লিখন, সংযোজন এবং প্রযোজনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন জনাব শহীদুল ইসলাম। অল্প দিন পর 'সোনার বাংলা' অনুষ্ঠানটির দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল জনাব মুস্তাফিজুর রহমানের ওপর। 'কাঠগড়ার আসামী' অনুষ্ঠানটিরও লেখক এবং পাঠক ছিলেন তিনি। 'সোনার বাংলা' অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণকারী শিল্পী ছিলেন—মাধুরী চট্টোপাধ্যায় (কাজলীর মা), সৈয়দ মোহাম্মদ চাঁদ (রুস্তম ভাই), ইয়ার মোহাম্মদ (জমির ভাই) এবং আপেল মাহমুদ (নজিদের বাপ)। 'পিণ্ডির প্রলাপ'-এর লেখক এবং পাঠক ছিলেন জনাব আবু তোয়াব খান। 'পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে' অনুষ্ঠানটি

লিখতেন জনাব ফয়েজ আহমদ এবং পাঠ করতেন জনাব কামাল লোহানী। 'ইয়াহিয়া জবাব দাও' কথিকা সিরিজের লেখক এবং পাঠক ছিলেন জনাব শওকত ওসমান।

যেসব নিবেদিত বুদ্ধিজীবি নিয়মিত অনুষ্ঠান সিরিজে অংশ নিয়েছেন তাঁরা ছিলেন সৈয়দ আলী আহসান ('ইসলামের দৃষ্টিতে' ধারাবাহিক কথিকা), ডক্টর মাযহারুল ইসলাম, অধ্যাপক আবদুল হাফিজ ও সাংবাদিক রনেশ দাশ গুপ্ত (দৃষ্টি-পাত: ধারাবাহিক পর্যালোচনা), আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী (পুতুল নাচের খেল), ফয়েজ আহমদ (পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে), সাদেকীন (বিশ্ব জনমত), আমির হোসেন (সংবাদ পর্যালোচনা), গাজীউল হক (রণাঙ্গনের চিঠি), সলিমুল্লাহ্ (রাজনৈতিক পর্যালোচনা), মাহবুব তালুকদার (মানুষের মুখ), আবদুর রাজ্জাক চৌধুরী (পর্যালোচনা ও সূর্য্য শপথ), মাহ্মুদুল্লাহ্ চৌধুরী (দখলীকৃত এলাকা ঘুরে এলাম), বদরুল হাসান (বেঈমানের দলিল এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পাণ্ডুলিপি লিখন ও কণ্ঠদান), মোহাম্মদ মুসা (রনাঙ্গণ ঘুরে এলাম), নাসিম চৌধুরী (গেরিলা যুদ্ধের কলাকৌশল) এবং আরো অনেকে।

যেসব বুদ্ধিজীবি সুধীজন অনিয়মিত কথক হিসেবে কিংবা ছোট গল্প লিখে অনুষ্ঠান প্রচারে অংশ নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ডক্টর মুজাফ্ফর আহমদ চৌধুরী (মরহুম), ডক্টর এ, আর, মল্লিক, ডক্টর আনিসুজ্জামান, ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমদ, ডক্টর বেলায়েত হোসেন, ডক্টর এ, জি, সামাদ, ডক্টর অজয় রায়, ডক্টর মাহমুদ শাহ্ কোরেশী, ডক্টর এ, কে এম, আমিনুল ইসলাম, জহির রায়হান (মরহুম), সন্তোষ গুপ্ত, অধ্যাপক অসিত রায় চৌধুরী, অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস, অধ্যাপক মোহাম্মদ আবু জাফর, জাহাঙ্গীর আলম, ডাক্তার নুরুন নাহার জহুর, আইভি রহমান, কুলসুম আসাদ, নুরজাহান মাযহার, মুশতারী শফী, রাজিয়া আখতার ডলি, মাহমুদা খাতুন, বাসনা গুন, দিপ্তী লোহানী, রেবা আখতার, জলি জাহানুর, দীপা ব্যানার্জি, সুকুমার ঘোষ, শওকত আরা আজিজ, পারভীন আখতার, দিলীপ কুমার ধর, বুলবন ওসমান, আবদুল জলিল, অনুপম সেন, রেজওয়ানুল হক, ডেভিড প্রণব দাশ, খোন্দকার মকবুল হোসেন, দেবেশ দাশ, মুজিব বিন হক, মোহাম্মদ আশরাফউদ্দিন, অধ্যাপক আবু সুফিয়ান, প্রণব চৌধুরী, হাফেজ আলী, আবুল মনজুর এবং আরো অনেকে।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নিয়মিত অনুষ্ঠান সিরিজের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল 'প্রতিনিধির কণ্ঠ'। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্র প্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিন আহমদ ও অর্থমন্ত্রী

জনাব এম, মনসুর আলী কর্তক জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণ এবং বাণী সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর মনে সঞ্চার করেছিল আশার আলো। মুক্তি বাহিনীর প্রধান সেনাপতি কর্ণেল (পরবর্তীকালে জেনারেল) আতাউল গণি ওসমানীও দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ রেখেছিলেন। এ ছাড়া যেসব গণপ্রতিনিধি বিভিন্ন সময়ে কণ্ঠ দান করেছেন তাঁরা ছিলেন তৎকালীন এম, এন, এ, জনাব আবদুল মান্নান (ভার প্রাপ্ত এম, এন, এ প্রেস, তথ্য, বেতার ও ফিল্ম), জনাব জিল্লুর রহমান (কার্য্য নির্বাহী সম্পাদক, সাপ্তাহিক জয় বাংলা পত্রিকা), জনাব আবদুল মালেক উকিল, জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী, জনাব ইউসুফ আলী, সৈয়দ আবদুস সুলতান, জনাব মোহাম্মদ খালেদ, বেগম বদরুননেসা আহমদ, জনাব নুরুল হক, অধ্যাপক হুমায়ুন খালেদ, জনাব শামসুর রহমান (শাহজাহান), অধ্যাপক আবু সাইয়ীদ, জনাব শামসুদ্দীন মোল্লাহ্, জনাব মোস্তাফিজুর রহমান (চুনু মিঞা), জনাব মনসুর আহমদ, জনাব সাখাওয়াত উল্লাহ্, ডাক্তার সায়িদুর রহমান ও জনাব নাজিমুদ্দিন প্রমুখ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ছাত্রদের ভূমিকা ছিল অনন্য। যেসব ছাত্র নেতা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে তাঁদের মূল্যবান ভাষণ এবং কথিকা প্রচার করেছেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সর্বজনাব নূরে আলম সিদ্দিকী, শাহজাহান সিরাজ, আবদুল কুদ্দুস মাখন, এম, এ, রেজা এবং আরো অনেকে।

স্বাধীনতা যুদ্ধে সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালী ও মুক্তি বাহিনীর মধ্যে মনোবল ও প্রেরণা সঞ্চারের জন্য গানের ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয়। যাঁরা গান অথবা কবিতা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সেকান্দর আবু জাফর, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, নির্মলেন্দু গুণ, মহাদেব সাহা, আসাদ চৌধুরী, টি, এইচ, সিকদার, সরওয়ার জাহান, মাহবুব তালুকদার, শহীদুল ইসলাম, বেলাল মোহাম্মদ, আবুল কাশেম সন্দ্বীপ, মুস্তাফিজুর রহমান, মোহাম্মদ শাহ্ বাঙ্গালী, প্রণদিৎ বড়ুয়া, এস, এম, আবদুল গণি বোখারী, মিজানুর রহমান চৌধুরী (তৎকালীন এম, এন, এ নহেন), নওয়াজেশ হোসেন, গণেশ ভৌমিক (পরবর্তীকালে খাজা সুজন), মাকসুদ আলী সাঁই, সবুজ চক্রবর্তী, বিপুব দাশ, বিপ্রদাশ বড়ুয়া, রফিক নওশাদ, অধ্যাপক অসিত রায় চৌধুরী, মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, প্রণব চৌধুরী, অরূপ তালুকদার, নাসিম চৌধুরী, কাজী রোজী এবং আরো অনেকে। যেসব নেপথ্য গীতিকার স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে অংশ নেননি, কিন্তু যাঁদের রচিত গান স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে গীত হয়েছে তাঁদের মধ্যে ছিলেন গাজী মযহারুল আনোয়ার, গৌরী প্রসন্ন মজুমদার, আবদুল লতিফ, ফজল-এ-খোদা, গোবিন্দ হালদার, নঈম

গওহর, সলিল চৌধুরী, শ্যামল দাশ গুপ্ত, ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, কবি আজিজুর রহমান, হাফিজুর রহমান ও আরো অনেকে।

যাঁরা সংগীতে অথবা পুঁথি পাঠে অথবা আবৃত্তিতে কণ্ঠ দান কিংবা সঙ্গীত পরিচালনায় মূল্যবান অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সঙ্গীত পরিচালনায় সমর দাশ, সঙ্গীত পরিচালনা ও কণ্ঠ দানে আবদুল জব্বার, অজিত রায়, আপেল মাহমুদ, রথীন রায়, মান্না হক, এম, এ, মান্নান, পুঁথি পাঠে মোহাম্মদ শাহ্ বাঙ্গালী, আবৃত্তিতে অতিথি শিল্পী কাজী সব্যসাচী (কাজী নজরুল ইসলামের জ্যেষ্ঠ পুত্র), মুজিব বিন হক, নিখিল রঞ্জন দাশ (ধারা বর্ণনা), একক বা সমবেত কণ্ঠ দানে শাহ্ আলী সরকার, সনজিদা খাতুন, কল্যাণী ঘোষ, অনুপ কুমার ভট্টাচার্য্য, মনসুর আহমদ, কাদেরী কিবরিয়া, সুবল দাশ, হরলাল রায়, এস, এম, এ, গনি বোখারী, শাহীন মাহমুদ, অনিলচন্দ্র দে, অরূপ রতন চৌধুরী, মোশাদ আলী, শেফালী ঘোষ, হেনা বেগম, মফিজ আঙ্গুর, নাকী আখন্দ, স্বপ্না রায়, মালা খান, রূপা খান, মাধুরী আচার্য্য, নমিতা ঘোষ, ইন্দ্রমোহন রাজবংশী, আবু নওশের, রমা ভৌমিক, মনোয়ার হোসেন, অজয় কিশোর রায়, কামালউদ্দিন, ইকবাল আহমদ, রঞ্জন ঘটক, মনোরঞ্জন ঘোষাল, তোরাব আলী শাহ্, নায়লা জামান, বুলবুল মহাল নবীশ, এম, এ, খালেক, মাকসুদ আলী সাঁই, ফকির আলমগীর, মলয় ঘোষ দস্তীদার, মঞ্জুলা দাশ গুপ্ত, সুব্রত সেন গুপ্ত, উমা চৌধুরী, মোশাররফ হোসেন, ঝর্ণা ব্যানার্জী, দীপা ব্যানার্জী, সুকুমার বিশ্বাস, তরুণ রায়, প্রবাল চৌধুরী, তোরাব আলী, রফিকুল আলম, কল্যাণী মিত্র, মঞ্জুশ্রী নিয়োগী, লীনা দাশ, সকিনা বেগম, রেজওয়ানুল হক, অনীতা বসু, নীনা, রুনা, মহিউদ্দিন খোকা, রিজিয়া সাইফুদ্দিন, রেহানা বেগম, মিহির নন্দী, অমিতা সেন গুপ্ত, ভক্তি রায়, অর্চনা বসু, মোস্তফা আনুজ, সাধন সরকার, মুজিবুর রহমান, মিনু রায়, গীতা চাটার্জী, শান্তি মুখার্জী, জীবন কৃষ্ণ দাশ, শিবশঙ্কর রায়, সৈয়দ আলমগীর, ভারতী ঘোষ, শেফালী সান্যাল, মদনমোহন দাশ, শহীদ হাসান, অরুণা সাহা, জয়ন্তী ভুঁইয়া, কুইন মাহাজিন, মৃণাল ভট্টাচার্য্য, শারফউল নবী, প্রদীপ ঘোষ, মিহির কর্মকার, শক্তিশিখা দাশ, মিহির লালা, গীতশ্রী সেন, গৌরাঙ্গ সরকার, প্রণব চন্দ্র ঘোষ, সাইদুর রহমান, কাঞ্চন তালুকদার, মুকুল চৌধুরী, মলিনা দাশ, জরিন আহমদ, ইন্দু বিকাশ রায়, বাসুদেব, পরিতোষ শীল, মিতালী মুখার্জী, মলয় গাঙ্গুলী, তপন ভট্টাচার্য্য, চিত্তরঞ্জন ভুঁইয়া, শক্তিমহাল নবীশ, তিমির নন্দী, মানুলাল চৌধুরী, আফরোজা মামুন এবং আরো অনেকে। যেসব সঙ্গীত শিল্পী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যাননি, কিন্তু যাঁদের গান স্বাধীন বাংলা বেতার

কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে ছিলেন শাহনাজ বেগম (পরবর্তী কালে শাহনাজ রহমতউল্লাহ্)। শিল্পী কণ্ঠে গীত এবং আবদুল লতিফ রচিত ও সুরারোপিত গান "সোনা সোনা সোনা লোকে বলে সোনা' সোনা নয় তত খাঁটি বাংলা দেশের মাটি" সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীকে স্বাধীনতার শপথে উদ্বুদ্ধ করতে সহায়ক হয়েছিল অনেকখানি। সঙ্গীত বিভাগের কাজে সহযোগিতা প্রদান করেছেন কাজী হাবিবুদ্দিন (অনুষ্ঠান সচিব), ও রংগলাল দেব চৌধুরী (টেপ লাইব্রেরী এবং দৈনন্দিন টেপ তালিকা)।

বন্ত্র সংগীতে ছিলেন সুজেয় শ্যাম, কালাচাঁদ ঘোষ, গোপী বল্লভ বিশ্বাস, হরেন্দ্র চন্দ্র লাহিড়ী, সুবল দত্ত, বাবুল দত্ত, অবিনাশ শীল, সুনীল গোস্বামী, তড়িৎ হোসেন খান, দিলীপ দাশ গুপ্ত, দিলীপ ঘোষ, জুলু খান, রুনু খান, বাসুদেব দাশ, সমীর চন্দ, শতদল সেন এবং আরো অনেকে।

নাট্যকার, নাট্য প্রযোজক এবং নাট্য শিল্পিগণের মধ্যে ছিলেন—নাট্যকার আবদুল জব্বার খান, নারায়ণ ঘোষ, কল্যাণ মিত্র, মামুনুর রশীদ, নাট্য প্রযোজক রণেন কুশারী, নাট্য প্রযোজক অভিনেতা—হাসান ইমাম, মরহুম রাজু আহমদ (জল্লাদের দরবার নাটিকার প্রধান চরিত্র কেল্লা ফতেহ আলী খান), নারায়ণ ঘোষ (জল্লাদের দরবারের অন্যতম প্রধান চরিত্র—দুর্মুখ), তোফাজ্জল হোসেন এবং আরো অনেকে। নাটক এবং জীবন্তিকায়—সুভাষ দত্ত, আতাউর রহমান, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, সুমিতা দেবী, নাজমুল হুদা মিঠু, ফিরোজ ইফতেখার, প্রসনজিৎ বোস, অমিতাভ বসু, জহুরুল হক, ইফতেখারুল আলম, বুলবুল মহাল নবীশ, করুণা রায়, গোলাম রব্বানী, মাসুদা নবী, অমিতা বসু, সৈয়দ দীপেন, লায়লা হাসান, মুক্তিমহাল নবীশ, নন্দিতা চট্টোপাধ্যায়, রাশেদুর রহমান, কাজী তামান্না, দিলীপ চক্রবর্তী, দিলীপ সোম, বাদল রহমান, মযহারুল হক, আসাবুদ্দিন খান, মদন শাহ, খান মুনির, পূর্ণেন্দু সাহা, তোফাজ্জল হোসেন, আনোয়ার পারভেজ, উম্মে কুলসুম, সফিয়া খাতুন, তাজিন মাহনাজ মুর্শিদ, দিলশাদ বেগম, ইবার মোহাম্মদ, সৈয়দ মোহাম্মদ চাঁদ এবং আরো অনেকে।

যাঁরা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতে ও অনুবাদে মৌলানা নুরুল ইসলাম জেহাদী, মৌলানা খায়রুল ইসলাম যশোরী, ও মৌলানা ওবায়দুল্লাহ বিন্ সাঈদ জালালাবাদী। পবিত্র কোরআনের আলোকে জনাব হাবিবুর রহমানের কয়েকটি আলোচনা ও প্রচারিত হয়েছিল 'ইসলামের দৃষ্টিতে: এই সিরিজে। পবিত্র গীতা পাঠে অংশ নিয়েছেন—বিনয় কুমার মণ্ডল ও জ্ঞানেন্দ্র বিশ্বাস। পবিত্র ত্রিপিটক পাঠে—রণধির বড়ুয়া এবং পবিত্র বাইবেল পাঠে ছিলেন ডেভিড প্রণব দাশ।

প্রশাসনিক কাজে ছিলেন—ফজলুল হক ভুঁইয়া (পরবর্তীকালে ইনি প্রেস, তথ্য, বেতার ও ফিল্ম-এর অফিস সুপারিনটেণ্ডেণ্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন), অনিল মিত্র (হিসাব রক্ষক), মরহুম আশরাফউদ্দিন (ষ্টেনোগ্রাফার), কালি দাশ রায় (ষ্টেনো টাইপিষ্ট), মহিউদ্দিন আহমদ (অফিস এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট), আনোয়ারুল আবেদীন (অফিস এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট), ইনি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য মাঝে মধ্যে পাণ্ডুলিপিও লিখেছেন), এস, এস, সাজ্জাদ হোসেন (ষ্টুডিও একজিকিউটিভ-কাম-রিসেপশানিষ্ট), বিমল কুমার নিয়োগী (পিয়ন), সত্য নারায়ণ ঘোষ (পিয়ন), শামসুল হক (পিয়ন), শাখাওয়াত হোসেন (পিয়ন) ও দুলাল (পিয়ন)। নকল নবীশের কাজে ছিলেন নওয়াব জামান চৌধুরী, দুলাল রায়, আবুল বরকত ও একরামুল হক চৌধুরী।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান উপস্থাপনা ছিল অত্যন্ত গতিশীল এবং আকর্ষণীয়। অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় যাঁরা কণ্ঠ দিয়েছেন প্রায় ক্ষেত্রেই তাঁরা নিজেরাই স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে লিখে দিতেন ঘোষণা বা উপস্থাপনার কথা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন—আশফাকুর রহমান খান, টি. এইচ. শিকদার, মোস্তফা আনোয়ার, আশরাফুল আলম, শহীদুল ইসলাম, বাবুল আখতার (মনজুর কাদের), আবু ইউনুস, মোতাহার হোসেন, মোহসীন রেজা ও আরো অনেকে।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা কর্মীগণ তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছেন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে। অনুষ্ঠান কর্মীগণের মধ্যে অনুষ্ঠান সংগঠক পর্যায়ে যাঁরা দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁরা ছিলেন সর্বজনাব আশফাকুর রহমান খান (সঙ্গীত এবং উপস্থাপনা), মেসবাহ্উদ্দিন আহমদ (নাটক এবং সাহিত্যানুষ্ঠান), বেলাল মোহাম্মদ (আভ্যন্তরীণ পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ও অধিবেশন পত্র তৈরী) এবং জনাব আলমগীর কবীর (ইংরেজী অনুষ্ঠান), অনুষ্ঠান প্রযোজক পর্যায়ে যাঁরা দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁরা ছিলেন সর্বজনাব টি, এইচ, শিকদার (অগ্নিশিখা: মুক্তিবাহিনীর জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান), তাহের সুলতান (সঙ্গীত), মোস্তফা আনোয়ার (কথিকা ও জীবন্তিকা), আবদুল্লাহ্ আল ফারুক (সাক্ষাৎকার এবং প্রামাণ্য অনুষ্ঠান সহ সংবাদ বিভাগের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন), মোহাম্মদ ফারুক (পরবর্তীকালে ইনি সাক্ষাৎকার এবং প্রামাণ্য অনুষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করেছেন), আলি যাকের (ইংরেজী অনুষ্ঠান), আশরাফুল আলম (দর্পণ, ওবি, সাক্ষাৎকার) এবং জনাব জাহিদ সিদ্দিকী (উর্দু অনুষ্ঠান)। এছাড়া সোনার বাংলা এবং প্রতিধ্বনি এ দুটি অনুষ্ঠানের বিশেষ দায়িত্বে ছিলেন জনাব শহীদুল ইসলাম। উপস্থাপনা তত্ত্বাবধানে ছিলেন জনাব এ, কে, শামসুদ্দিন। অনুষ্ঠান ঘোষণা ও অগ্রিম অনুষ্ঠান পত্র লিখনের দায়িত্বে ছিলেন আবু ইউনুস। জনাব অনু ইসলাম সাপ্তাহিক

'জয়বাংলা' পত্রিকার প্রকাশনা ও ব্যবস্থাপনার কাজে বিশেষ দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া তিনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানেও অংশ নিয়েছেন।

বার্তা বিভাগে বার্তা সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন কামাল লোহানী, ইংরেজী সংবাদ বুলেটিন তৈরী ম, মামুন, এ, কে, এম, জালালউদ্দিন, সুব্রত বড়ুয়া ও মৃণাল রায়, বাংলা সংবাদ বুলেটিন—আবুল কাসেম সন্দীপ, রনজিৎ পাল চৌধুরী, বাংলা সংবাদ পাঠ—কামাল লোহানী, হাসান ইমাম, আলী রেজা চৌধুরী, নুরুল ইসলাম সরকার, শহীদুল ইসলাম, আশরাফুল আলম ও বাবুল আখতার, ইংরেজী সংবাদ পাঠ—পারভীন হোসেন, জরীন আহমদ ও ফিরোজ ইফতেখার।

প্রকৌশল বিভাগ—প্রকৌশলের দায়িত্বে ছিলেন সৈয়দ আবদুস শাকের। সহযোগী প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন সর্বজনাব রাশেদুল হোসেন, আমিনুর রহমান, শরফুজ্জামান, মোমিনুল হক চৌধুরী, প্রণব রায়, রেজাউল করিম চৌধুরী ও হাবিবুল্লাহ্ চৌধুরী।

যাঁর মহান নেতৃত্ব, পরিকল্পনা এবং পথ নির্দেশ আমাদের দিয়েছে জংগী অনুষ্ঠান প্রচারে সার্বিক অনুপ্রেরণা, তিনি ছিলেন যুদ্ধকালীন অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের প্রেস, তথ্য, বেতার ও ফিল্ম-এর ভারপ্রাপ্ত এম, এন, এ জনাব আবদুল মান্নান (আমাদের মান্নান ভাই)। উল্লেখ্য যে দ্বিতীয় পর্যায়ে মুজিব নগরে ৫০ কিলোওয়াট মধ্যম তরঙ্গ শক্তি সম্পন্ন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সংগঠনের সার্বিক দায়িত্ব ন্যাস্ত ছিল তাঁর ওপর। যুদ্ধকালীন এই সংগঠনকে যদি উত্তাল মহাসমুদ্রে টহলরত একখানা রণতরীর সাথে তুলনা করা হয়, এবং যদি বলা হয় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের এক একজন শব্দ সৈনিক এবং প্রেস, তথ্য, বেতার ও ফিল্ম-এর এক একজন কর্মী ছিলেন এই তরীর নাবিক, তবে নিঃসন্দেহে জনাব আবদুল মান্নান ছিলেন এরই সুযোগ্য কাণ্ডারী। একজন দুঃসাহসী এবং সুকৌশলী কাণ্ডারী জনাব আবদুল মান্নানের কাছ থেকে সেদিনের উত্তাল মহাসমুদ্র অভিযানে আমরা পেয়েছি সার্বক্ষণিক অনুপ্রেরণা এবং পথনির্দেশ।

বঙ্গবন্ধুর তৎকালীন সহকারী প্রেস সেক্রেটারী জনাব আমিনুল হক বাদশা ছিলেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। জনাব বাদশা এই বেতার কেন্দ্রের সাংগঠনিক পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রশাসন, অনুষ্ঠান, পরিকল্পনা ও প্রচারে অংশ নেয়া ছাড়াও এর শিল্পী-কুশলীদের কল্যাণের প্রতি তাঁর মনোযোগ ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তিনি ছিলেন এই বেতার কেন্দ্রের শিল্পী-কুশলীদের 'বাদশা ভাই'।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে আরো অনেক শিল্পী-কুশলীর নাম এই গ্রন্থে সংযোজন সম্ভব হয়নি বলে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করছি। তাঁরা সবাই ছিলেন

এক একজন মহান মুক্তি যোদ্ধা—শব্দ সৈনিক। বলার অপেক্ষা রাখে না যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যবাহী। এই বেতার কেন্দ্রের শব্দ সৈনিকগণ সাড়ে সাত কোটি মুক্তিকামী বাঙ্গালীর মনোবলকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য দিবারাত্র কাজ করেছেন। তাঁদের ক্ষুরধার প্রচার মুক্তি যুদ্ধের গতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে সর্বাত্মক ভাবে। এই বেতার কেন্দ্রের এক একটি শব্দ ইথার ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে এক একটি বুলেট হয়ে। বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের ইউনিটগুলি এবং শত্রু কবলিত এলাকার সাথে যোগসূত্র বজায় রেখেছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। এই বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার বার্তা প্রথম প্রচারিত হওয়ার এক ঘণ্টা কালের মধ্যে বিবিসি এবং ভয়েস অব আমেরিকা সহ পৃথিবীর বহু বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সংবাদ বিশ্বের জনগণের কাছে ছড়িয়ে পড়েছিল।

সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালী যে মুহূর্তে এহিয়া খানের লেলিয়ে দেয়া বাহিনীর কবলে নিষ্পেশিত হয়ে মৃত্যুর দিন গুনছিল ঠিক সেই মুহূর্তে জন্ম নিয়েছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। এই বেতার কেন্দ্র দীর্ঘ ন'মাস ধরে অমিত তেজ, ওজস্বিনী ভাষা আর দৃপ্ত কণ্ঠে জংগী অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে বাংলার আপামর জনগণ ও এর অতন্দ্র প্রহরী মুক্তি যোদ্ধাদের সার্বক্ষণিক অনুপ্রেরণা দিয়ে, শক্তি দিয়ে, সাহস দিয়ে, দিশেহারা মুক্তিকামী বাঙ্গালীকে বিজয়ের সিংহদ্বারে পৌঁছে দিয়েছে। পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম দেশগুলির পাশে সংযোজন করেছে আর একটি নুতন দেশ—বাংলাদেশ। পৃথিবীর স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে এত বড় অবদান আর কোনও বেতার কেন্দ্র রাখতে পেরেছিল কিনা আমাদেরজানা নেই। যথার্থই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর (বর্তমানে প্রায় ন'কোটি বাংলাদেশীর) মুক্তির অগ্রদূত হিসেবে এ দেশের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সংযোজন : ২৬শে মার্চ '৭১ রাত দশটার পর স্বাধীন বাংলা বেতার বেতার কেন্দ্র পরিচিতি দিয়ে আরো একটি অতিরিক্ত অধিবেশন প্রচারিত হয়েছিল। চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে। প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন লন্ডন থেকে সদ্য প্রত্যাগত তরুণ ব্যবসায়ী জনাব মাহমুদ হোসেন। সহযোগী উদ্যোক্তা ছিলেন জনাব কাজল চৌধুরী, মিঃ রঙ্গলাল দেব চৌধুরী এবং আরো কয়েকজন কর্মী-কুশলী। প্রথম দু' জন ২৭শে মার্চ, '৭১ রাতেই অজ্ঞাতনামা আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছিলেন। (ইন্নালিল্লাহ্)।

এপ্রিল, '৭১ এর দ্বিতীয় সপ্তাহে হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীর দৃষ্টি এড়িয়ে ঢাকা বেতার থেকে গানের টেপ মুজিব নগর নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বেরকরে নেয়ার দুঃসাহস করেছিলেন সর্ব জনা আশফাকুর রহমান খান, টি, এইচ, শিকদার, তাহের সুলতান, শহীদুল ইসলাম এবং মঞ্জুর কাদের (বাবুল)। এ সব গানের টেপ সরিয়ে নিতে সাহায্য করেছিলেন ঢাকা বেতারের টেপ লাইব্রেরীয়ান জনাব মোহাম্মদ হামিদুল ইসলাম এবং এই বেতারের তৎকালীন বানিজ্যিক কার্যক্রমের সামরিক গীটার শিল্পী জনাব হাফিজুর রহমান।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
পত্র-পত্রিকা ও অন্যান্য মাধ্যম
বৈদেশিক মিশন
মুজিব নগর প্রশাসন

মুজিব নগর থেকে প্রকাশিত পত্র পত্রিকা

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ছাড়াও অন্য যে সব গণসংযোগ মাধ্যমে '৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে মূল্যবান অবদান রেখেছে তন্মধ্যে ছিল মুজিব নগর থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা। জয়বাংলা (বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মুখপত্র), নতুন বাংলা (মুজাফ্ফর ন্যাপের মুখপত্র), মুক্তিযুদ্ধ (বাংলাদেশ কমুনিষ্ট পার্টির মুখপত্র), বাংলার বাণী, দি পিপল, দি নেশন, দেশ বাংলা, দাবানল, রণাঙ্গন, বাংলার মুখ, সাপ্তাহিক বাংলা, মায়ের ডাক (মহিলাদের কাগজ), জন্মভূমি, স্বাধীন বাংলা, বিপ্লবী বাংলাদেশ, অভিযান, প্রভৃতি বহু সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকা রণাঙ্গনের খবরাখবর বয়ে নিয়ে চলে যেতো অধিকৃত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে। সাড়ে সাত কুটি বাঙ্গালীকে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সম্যক ধারনা দিয়ে তাঁদের মনোবলকে অক্ষুণ্ণ রাখতে এসব পত্রপত্রিকা রেখেছে এক গৌরবময় অবদান। মুজিব নগর থেকে প্রকাশিত এসব পত্র-পত্রিকার শীর্ষে ছিল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মুখপত্র 'সাপ্তাহিক জয়বাংলা'। জনাব আবদুল মান্নান এম, এন, এ ছিলেন এই পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি। সামগ্রিক ভাবে যুদ্ধকালীন বিপ্লবী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রেস, তথ্য, বেতার ও ফিল্ম-এর ভারপ্রাপ্ত এম, এন, এ ছিলেন জনাব আবদুল মান্নান।

জয়বাংলা পত্রিকার পরিচালনা সম্পাদক ছিলেন জনাব জিল্লুর রহমান (এম, এন, এ)। সম্পাদকমণ্ডলী ছিলেন সর্বজনাব আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, ডক্টর এবনে গোলাম সামাদ, মোহাম্মদ উল্লাহ্ চৌধুরী, আবদুর রাজ্জাক চৌধুরী, আনু ইসলাম, সলিমুল্লাহ্, আসাদ চৌধুরী এবং আবুল মনজুর। পরিচালনা বিভাগে ছিলেন সর্বজনাব ফজলুল হক, সারোয়ার জাহান, পার্থ ও রাখাল এবং আলোক চিত্র শিল্পীর দায়িত্বে ছিলেন আনন।

ঢাকার পাইওনিয়ার প্রেসের মালিক এবং তৎকালীন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য জনাব মোহাম্মদীন মাঝে মধ্যে জয়বাংলা পত্রিকার বিভিন্ন সাংগঠনিক কাজে সহযোগিতা প্রদান করেছেন। রাজশাহী সেরিকালচারের তৎকালীন সহকারী পরিচালক মিঃ সেন গুপ্ত ও কিছুদিন জয়বাংলা পত্রিকার জন্য কাজ করেছেন। এই পত্রিকার হিসাবপত্রের দায়িত্বে ছিলেন মিঃ অজিত দত্ত। প্রথম কিছুদিন তিনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের হিসাবপত্রও একই সাথে দেখেছেন। পরবর্তী কালে প্রেস, তথ্য, বেতার ও ফিল্ম-এর সার্বিক হিসাব রক্ষণের ভার অর্পিত হয়েছিল তাঁর ওপর।

মুজিব নগর থেকে প্রকাশিত এসব পত্র-পত্রিকার সম্পাদকীয় ছিল অত্যন্ত সুচিন্তিত এবং তাৎপর্যবাহী। সাপ্তাহিক 'জয় বাংলা' পত্রিকার ১৭ই সেপ্টেম্বর, '৭১ এর এমনি একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ এখানে তুলে দিলাম পাঠক কূলের উদ্দেশ্যে। শিরোনাম ছিল **সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি**।

"বর্তমান মুক্তি যুদ্ধকে সফল সমাপ্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে গণ প্রজাতন্ত্রী সরকারকে উপদেশ দানের জন্য বাংলাদেশের চারটি প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে যে উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে, তার খবর দেশ-বিদেশের সংবাদ পত্রে ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে এবং এ সম্পর্কে অনেক উৎসাহী আলোচনাও মুদ্রিত হয়েছে। বস্তুত এই সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হওয়ায় জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে জাতির যে নিবিড় ও অটুট ঐক্য আরেকবার প্রমানিত হল, তাতে বাংলাদেশের ভিতরে মুক্তি সংগ্রামীরা যেমন অনুপ্রাণিত হবেন, তেমনি বাইরে বাংলাদেশের শুভাকাংখী ও বন্ধু দেশগুলোও উৎসাহিত হবেন। বস্তুতঃ এই উপদেষ্টা কমিটি গঠনের গুরুত্ব এইখানেই যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনৈক্যের সৃষ্টির জন্য সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত এবং উগ্র তত্ত্ব সর্বস্বদের সুবিধাবাদী ভেদ নীতি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হল এবং জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের লক্ষ্যে অবিচল চারটি প্রগতিশীল দল বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের প্রতি তাঁদের ঘোষিত সমর্থন আরো কার্যকর ও সক্রিয় করে তুললেন। এই ব্যাপারে এই দলগুলির ভূমিকার যেমন প্রশংসা করতে হয় তেমনি প্রশংসা করতে হয় আওয়ামী লীগেরও। আওয়ামী লীগ গত সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশে প্রায় শতকরা নিরানব্বইটি আসনে জয়লাভ করে জাতিকে নেতৃত্ব দানের অবিসম্বাদিত অধিকার লাভ করা সত্বেও মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনায়

অন্যান্য প্রগতিশীল দলের সমর্থন ও উপদেশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত দ্বারা দলীয় স্বার্থের সঙ্গে জাতীয় স্বার্থের প্রতি তাঁদের আনুগত্য বলিষ্ঠ ভাবে প্রমাণ করেছেন।

সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটিতে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের রাজনৈতিক মত ও পথে পার্থক্য থাকলেও সকলেই পরীক্ষিত দেশ প্রেমিক। কমিটিতে ভাসানী ন্যাপের প্রতিনিধিত্ব করছেন মওলানা ভাসানী, বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধিত্ব করছেন শ্রী মণি সিং, বাংলাদেশ জাতীয় কংগ্রেসের শ্রী মনোরঞ্জন ধর এবং মুজাফ্ফর ন্যাপের অধ্যাপক মুজাফ্ফর আহমদ। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের প্রধান মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী এই কমিটিতে রয়েছেন। প্রধান মন্ত্রী কমিটির বৈঠক আহ্বান ও পরিচালনা করবেন।

মুজিব নগরে অনুষ্ঠিত এই উপদেষ্টা কমিটির প্রথম বৈঠকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারই যে বাংলাদেশের একমাত্র বৈধ সরকার এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশের অবিসম্বাদিত জাতীয় নেতা এ সত্যটির অকুন্ঠ অভিব্যক্তি দেখা গেছে। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর এই সমঝোতা ও অভিন্নতা একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

বাংলাদেশের গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার এবং এই সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটির মধ্যে স্বাভাবিক চরিত্রগত পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু রয়েছে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগত ঐক্য। এই লক্ষ্য হ'ল বাংলাদেশের পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা। চরিত্রগত পার্থক্যের ক্ষেত্রে বলা চলে, গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত একমাত্র সংস্থা। জনগণের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণও তা কার্যকর করার সম্পূর্ণ এখতিয়ার তার। অন্যদিকে জনগণের পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যকর করার ব্যাপারে সাহায্য ও সুপরামর্শ দান হবে উপদেষ্টা কমিটির লক্ষ্য। তাই এই উপদেষ্টা কমিটি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ দ্বারা গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার মুক্তিযুদ্ধকে জোরদার করার কাজে একটি বলিষ্ঠ ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ নিয়েছে। বলা চলে। এই ব্যবস্থার ফলে বাংলাদেশের সকল এলাকায় স্বাধীনতা এবং হানাদার দস্যুদের চূড়ান্ত পরাজয়ের দিন অবশ্যই ত্বরান্বিত হবে।''

এছাড়া সাপ্তাহিক জয় বাংলার আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল ''রণাঙ্গনে'' 'দখলকৃত এলাকা ঘুরে এলাম' ইত্যাদি। ১৭ই সেপ্টেম্বর '৭১ ''রণাঙ্গনে'' শিরোনামে প্রকাশিত খবর ছিল নিম্নরূপ:

''গত ৮ই সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম আদালত ভবনের দোতালার ওপর মুক্তিবাহিনীর গেরিলা যোদ্ধাদের বোমা বিস্ফোরণ ঘটলে দুই ব্যক্তি নিহত ও ১৭ জন গুরুতররূপে আহত হয়। এদের মধ্যে ৩ জনের অবস্থা মরণাপন্ন।

একটি বিদেশী সংবাদ সংস্থা জানাচ্ছেন যে গেরিলা যোদ্ধারা উক্ত টাইম বোমা একটি ছাতার ভেতরে লুকিয়ে রাখেন।

এদিকে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, বাংলাদেশ গেরিলা বাহিনী গত দু'সপ্তাহে যশোর জেলার শ্রীপুর থানার বিস্তীর্ণ এলাকা শত্রু কবল মুক্ত করেছেন।''

সাপ্তাহিক জয়বাংলা পত্রিকা মুজিব নগর থেকে প্রকাশিত সব পত্রিকার শীর্ষে থাকলেও অন্যান্য পত্রিকার আবেদনও কম ছিল না। এসব পত্র-পত্রিকাও বলিষ্ঠ সম্পাদকীয় এবং রণাঙ্গনের বিভিন্ন খবর জনসমক্ষে তুলে ধরে সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর স্বাধীনতা যুদ্ধকে সাফল্যের স্বর্ণদ্বারে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। ২১শে আগষ্ট '৭১ প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'বিপ্লবী বাংলাদেশ' পরিবেশিত **'ঘৃণ্য ১৪ই আগষ্ট'** শিরোনামে একটি নিবন্ধের অংশ বিশেষ এখানে তুলে দিলাম:

''**আজ** থেকে ২৪ বছর পূর্বে কুচক্রীদের চক্রান্ত জালে বাংলাদেশের মানুষের জীবনে এক কলঙ্কিত দিবস রূপে দেখা দেয় এই ১৪ই আগষ্ট। নরখাদক পশ্চিম পাকিস্তানী এবং তাদের তাবেদার পুঁজিপতিদের ষড়যন্ত্রের ফলে বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষ তথা পৃথিবীর পূর্ব দিগন্তের ন্যায় ও বিবেককে এই দিনে শৃংখলাবদ্ধ করা হয়।

নবাব বাদশার দল, পীরজাদা আর খানদের দল পশ্চিমী শক্তি গোষ্ঠী আফ্রিকা শোষনের মত বাংলাদেশে লুটেরার সম্পত্তি, এবং তাদের বিবি বেগমের বিলাস ব্যসনের উপকরণ যোগানোর ঘাঁটিরূপে লৌহ-শৃংখল পরিয়ে দিল বঙ্গোপসাগরের শ্যামলা নারীকে। আর কোটি কোটি আদম সন্তানদের চেপে ধরল পায়ের তলায়।

তাই ১৪ই আগষ্ট বাঙ্গালীর জীবনে স্বাধীনতার দিবস নয়; বন্ধনের দিবস, গ্লানির দিবস, ঘৃণার দিবস, পরাধীনতার দিবস। এই দিবস পশ্চিম পাকিস্তানী জঙ্গী শাসক এবং খুনী জল্লাদ ও ধনকুবেরদের কাছে বাঙ্গালী জাতির দাসখত লিখে দেয়ার দিবস।

যেমন করে একদিন মীর জাফরের ষড়যন্ত্রের ফলে দুই শত বৎসর পূর্বে বাঙ্গালীকে দাসখৎ লিখে দিতে হয়েছিল ইংরেজের কাছে, হারাতে হয়েছিল তার আজন্ম লালিত স্বাধীনতা, তেমনি করে কায়েদে আজম জিন্নাহ্, লিয়াকত প্রমুখ মুসলিম পুঁজিপতিদের মুখপাত্রদের মিথ্যা ধর্মীয় জিগিরের কাছে বাঙ্গালী মুসলমানরা আত্ম বিক্রয় করতে বাধ্য হয়েছিল।

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্টের কলঙ্কিত পাপকে বাঙ্গালী তাই কোনদিন ভুলবে না, ক্ষমা করতে পারে না।''

বহির্বিশ্বের পত্র-পত্রিকা

বিশ্বের যেসব পত্র-পত্রিকা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সমর্থনে তাঁদের অকৃত্রিম রায় প্রদান করেছিল সেগুলির অন্যতম ছিল 'দি নিউ ষ্টেটসম্যান', লণ্ডনের 'সানডে টেলিগ্রাফ', 'সানডে টাইমস', 'নিউইয়র্ক টাইমস', 'ইভনিং ষ্টার' (ওয়াশিংটন), 'দি কম্যুনিষ্ট (যুগোশ্লাভ কমিউনিষ্ট লীগের মুখপত্র), 'পিস নিউজ (লণ্ডন), 'নিউ নেশন (সিঙ্গাপুর), গার্ডিয়ান (ইংল্যাণ্ড), আনন্দবাজার (ভারত), যুগান্তর (ভারত), দৈনিক বসুমতি (ভারত), অমৃতবাজার (ভারত), দৈনিক সত্যযুগ (ভারত), রাইজিং নেপাল (নেপাল), কম্পাস, সাপ্তাহিক গণবার্তা, সাপ্তাহিক দেশ গৌরব, পরগম (কলিকাতা) প্রভৃতি।

স্বাধীনতা যুদ্ধ ও চলচ্চিত্র

মুজিব নগরে গঠিত ফিল্ম ডিভিশন-এর দায়িত্বে ছিলেন জনাব আবুল খায়ের এম, এন, এ। এর পরিচালক নিযুক্ত হয়েছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম বাংলা ছবি 'মুখ ও মুখোশে' এর প্রযোজক জনাব আবদুল জব্বার খান। ক্যামেরাম্যান, সহযোগী এবং স্ক্রিপ্ট রাইটার ছিলেন যথাক্রমে সর্ব জনাব আসিফ আলী, ফেরদৌস হালিম এবং আবুল মনজুর। তৈরী প্রামাণ্য চিত্র (ক) বার্থ অব এ নেশন (খ) ফ্রিডম ফাইটার্স (গ) চিলড্রেন অব বাংলাদেশ (ঘ) জেনোসাইড। পূর্ণাঙ্গ চিত্র 'জীবন থেকে নেয়া' এবং চারটি নিউজ ফিল্ম-এর প্রথম তিনটি জনাব জহির রায়হান এবং পরবর্তী একটি বাংলাদেশ ফিল্ম আর্টিষ্ট এণ্ড টেকনিশিয়ানগণ তৈরী করেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধ ও বৈদেশিক মিশন :

বিদেশে অবস্থানরত তৎকালীন পাকিস্তানের বৈদেশিক কূটনৈতিক মিশনের বাঙ্গালী অফিসার ও কর্মচারিগণের তাৎক্ষনিক সমর্থন ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। সেদিন তাঁরা শুধু এমনি সমর্থনই জানাননি, সদ্য ঘোষিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সমর্থনে এবং যুদ্ধরত বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণে তাঁদের অবদান ছিল অপরিসীম। বাঙ্গালী জাতির স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে আওয়ামী লীগ, স্বাধীনতার সমর্থক বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, মুক্তি যুদ্ধের ইউনিটগুলি, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ও মুজিব নগর থেকে প্রচারিত যুদ্ধকালীন পত্র-পত্রিকা এবং দেশপ্রেমিক ছাত্র-শিক্ষক জনতার পাশে তাঁদের নামও লিখিত থাকবে স্বর্ণাক্ষরে।

দিল্লীর দূতাবাস :

৬ই এপ্রিল '৭১ মধ্যরাতের কিছু পর দিল্লীর পাকিস্তানী হাই কমিশনের সেকেণ্ড সেক্রেটারী জনাব কে, এম, শাহাবুদ্দিন এবং প্রেস এটাচী জনাব আমজাদুল হক পাকিস্তান দূতাবাসের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নূতন রাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন এবং দূতাবাস ভবন ত্যাগ করেন। নয়াদিল্লী তাঁদেরকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়েছিলেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নয়াদিল্লীতে বাংলাদেশের মিশন খোলা হলে জনাব শাহাবুদ্দিন এই মিশনের প্রধান এবং জনাব হক এর প্রেস এটাচী নিযুক্ত হয়েছিলেন।

উল্লেখ্য যে মুজিব নগরে অস্থায়ী গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়েছিল ১০ই এপ্রিল '৭১ এবং এই নূতন সরকার দেশী-বিদেশী সাংবাদিকের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্ম প্রকাশ করেছিল কুষ্টিয়ার বৈদ্যনাথ তলার আম বাগানে ১৭ই এপ্রিল '৭১। কাজেই আনুষ্ঠানিক ভাবে সরকার গঠিত হওয়ার আগেই ৬ই এপ্রিল '৭১ দিল্লীর পাকিস্তান দূতাবাসের উক্ত দু'জন বাঙ্গালী কূটনৈতিক কর্তৃক সদ্য ঘোষিত বাংলাদেশের প্রতি তাৎক্ষণিক আনুগত্য প্রকাশ ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যবাহী। স্পষ্টতঃই পাকিস্তানের অন্যান্য বৈদেশিক মিশনের বাঙ্গালী সদস্যগণকেও এমনি তাৎক্ষণিকভাবে এগিয়ে আসার জন্য তাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

কোলকাতা বাংলাদেশ মিশন :

কোলকাতার ৯নং সার্কার্স এভিনিউতে ছিল পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশন ভবন। ১৮ই এপ্রিল রবিবার বেলা ১২টা ৪১ মিঃ সময়ে নব রাষ্ট্র বাংলাদেশের ঐতিহাসিক পতাকা উত্তোলনের দুঃসাহস করেছিলেন তৎকালীন ডেপুটি হাই-কমিশনার জনাব হোসেন আলী এবং তাঁর বাঙ্গালী সহকর্মীবৃন্দ। ১৮ই এপ্রিল '৭১ নবরাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রতি কোলকাতা মিশনের যাঁরা আনুগত্য ঘোষণা করে-ছিলেন তাঁরা ছিলেন সর্বজনাব এম, হোসেন আলী (ডেপুটি হাইকমিশনার), রফিকুল ইসলাম চৌধুরী 'ফার্ষ্ট সেক্রেটারী', আনোয়ারউল করিম চৌধুরী 'থার্ড সেক্রেটারী)', এম মোকসেদ আলী 'এসিষ্ট্যাণ্ট প্রেস এটাচী', সাঈদুর রহমান, এম. এ. হাকিম, আমীর আলী চৌধুরী, আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, মোহাম্মদ সায়েদুজ্জামান মিঞা, জয়নাল আবেদীন চৌধুরী, মোস্তাফিজুর রহমান আলিমু-জ্জামান, এ, জেড, এম, এ, কাদির, মতিউর রহমান, কাজী সেকান্দর আলী, মোহাম্মদ গোলামুর রহমান, শামসুল আলম, মোহাম্মদ সিদ্দিকুল্লাহ্, এ, কে, এম, আবু সুফিয়ান, আবদুর রব, মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম, মোহাম্মদ আমিনুল্লাহ্,

মোহাম্মদ আবুল বশার, এ, বি, এম, খুরশীদ আলম, আবদুল মান্নান ভুঁইয়া, আবদুর রহমান ভুঁইয়া, মোহাম্মদ আবদুর রহিম, মোহাম্মদ নুরুল আমীন, নুর আহমদ, মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, সমীরউদ্দিন, মোহাম্মদ সোলায়মান, এম, শামসুদ্দিন হোসেন, মোহাম্মদ জহুর হোসেন, মীর মোজাম্মেল হক, মোহাম্মদ জাকারিয়া, মোহাম্মদ ওয়াহিদুর রহমান, আবদুন্ নুর, এ, কে, এম, আবদুর রব, এ, এন, এম, কামরুর রশীদ, আনোয়ারুজ্জামান, আব্বাসউদ্দিন আহমদ চৌধুরী, ওয়াহিদুর রহমান, মোহাম্মদ শাহেদুর রহমান, শারফুল আলম, আবদুল কাদের, আবদুল মতিন প্রধানিয়া, আবদুল আমিন, মোহাম্মদ হোসেন, মতিউর রহমান, আবদুল গফুর মৃধা, আমান হোসেন, হাতেম আলী, বজলুর রহমান, মোহাম্মদ হেদায়েতউল্লাহ্, নুরুল হক, শামসুল আনোয়ার, মোমতাজ মিঞা, হরমুজুল হক, শমু মিঞা, মোহাম্মদ ইলিয়াস ও আবদুল হাশেম। অন্যান্য মিশন থেকে যাঁরা কোলকাতায় বাংলাদেশ মিশনে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন সর্বজনাব মোহাম্মদ খলিল-উদ্দিন, আলী আহমদ খান, এম, এ, মহীউদ্দিন ও মোহাম্মদ আবদুল হাই।

বলাবাহুল্য, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে বাঙ্গালী ঊর্ধতন কূটনীতিকবৃন্দের মধ্যে জনাব হোসেন আলীর বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা ছিল এক দুঃসাহসিক কাজ। তিনি শুধুমাত্র কোলকাতা বাংলাদেশ মিশনের প্রধানই ছিলেন না, তিনি পরিণত হয়েছিলেন ন'মাস ব্যাপী বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম প্রধান প্রেরণার উৎস। তাঁর সুযোগ্য পরিচালনায় কোলকাতার বাংলাদেশ মিশন বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের অন্যতম প্রধান দুর্গে পরিণত হয়েছিল। বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধের এই মহান সেনানী ২রা জানুয়ারী, ১৯৮১ কানাডায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্য্যন্ত তিনি কানাডায় বাংলাদেশের হাই কমিশনার হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে কানাডার অটোয়ায়।

ক্রমে ইরাক, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া, বৃটেন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, বার্মা, জাপান, হংকং প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ থেকে বাঙ্গালী কূটনৈতিক কর্মী ও পদস্থ অফিসারগণ বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। নভেম্বর, '৭১ এর শেষ দিকে দিল্লীর পাকিস্তানী দূতাবাসের অবশিষ্ট বাঙ্গালী কর্মচারিগণও দূতাবাস ত্যাগ করে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেছিলেন।

নিউইয়র্কের পাকিস্তান মিশনঃ

নিউইয়র্ক-এর পাকিস্তান মিশন থেকে সর্বপ্রথম পাকিস্তান সরকারের চাকুরী ত্যাগ করে গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেছিলেন
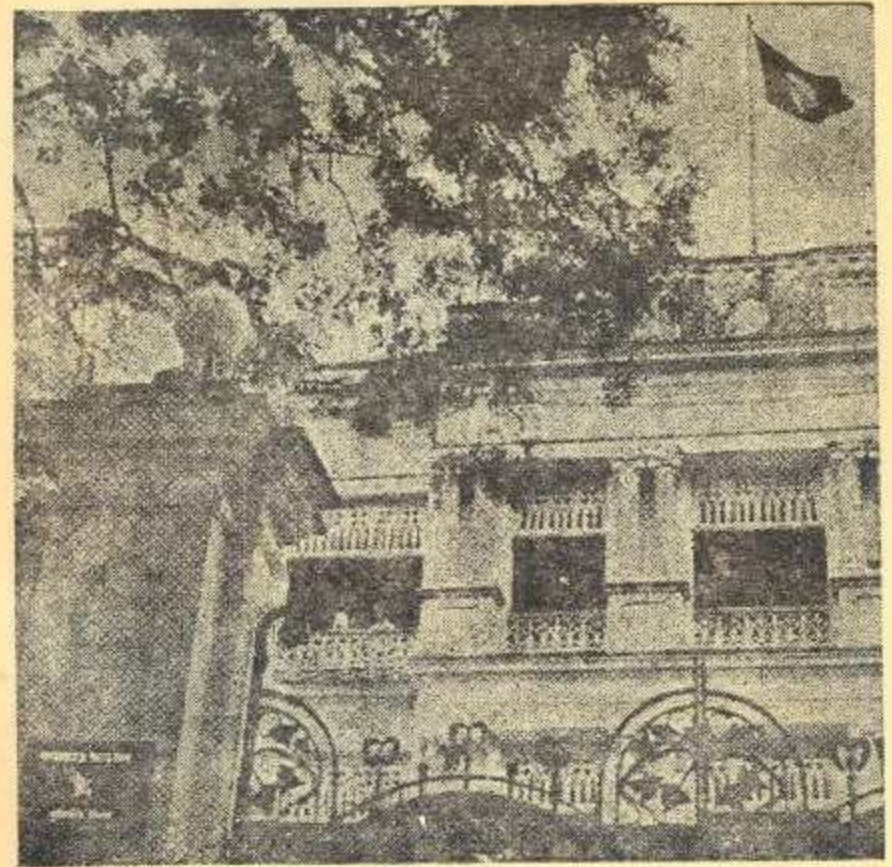
নবরাষ্ট্র বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে কোলকাতা বাংলাদেশ মিশন ভবনে।

জনাব এম, হোসেন আলী, মুক্তিযুদ্ধকালীন কোলকাতা বাংলাদেশ মিশনের প্রধান

কোলকাতা মিশনের চার কূটনীতিক—যাঁরা নবরাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেছিলেন :

জনাব রফিকুল ইসলাম চৌধুরী
ফার্ষ্ট সেক্রেটারী

জনাব আনোয়ারুল করিম চৌধুরী
থার্ড সেক্রেটারী

কাজী নজরুল ইসলাম
থার্ড সেক্রেটারী

জনাব এম, মোকসেদ আলী
এসিষ্ট্যান্ট প্রেস এটাচী।

জনাব আবুল হাসান মাহমুদ আলী। সম্ভবতঃ তিনি জুলাই কি আগষ্ট '৭১-এ বাংলা-দেশ সরকারের পক্ষে আনুগত্য ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর অন্যতম সহকর্মী জনাব আবদুল বাতেন সম্ভবতঃ অক্টোবর, '৭১-এ নূতন রাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। বাংলাদেশ সরকারের প্রতি নিউইয়র্কের বিভিন্ন আমেরিকান সংগঠনের সমর্থ ন আদায়ের জন্য তাঁরা কাজ করেছেন। এজন্য সেখানে তাঁরা একটি অফিসও খুলেছিলেন।

সর্বজনাব এ. এম. এ. মুহিত এবং এনায়েত করিম ছিলেন তখন ওয়াশিংটনে পাকিস্তান এমবেসীর মিনিষ্টার এবং জনাব কিবরিয়া ছিলেন কাউন্সিলার। জনাব এস. এ. করিম ছিলেন জাতিসংঘ পাকিস্তানের স্থায়ী উপ-প্রতিনিধি (ডেপুটি পারমানাণ্ট রিপ্রেজেনটেটিভ। স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ প্রান্তে তাঁরাও বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেছিলেন। তাঁরা সবাই এ্যামনেষ্টি ইণ্টারন্যাশনাল-এর মাধ্যমে আমেরিকায় রাজনৈতিক আশ্রয় পেয়েছিলেন।

(বৃটেন সহ অন্যান্য দেশসমূহের তৎকালীন পাকিস্তান মিশনের তথ্য হাতের কাছে না থাকায় এই গ্রন্থে প্রকাশ সম্ভব হল না বলে আন্তরিক ভাবে দুঃখিত।)

প্রবাসী বাঙ্গালীর অবদান:

নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটনে বাঙ্গালী কূটনৈতিকগণ ছাড়াও আমেরিকার প্রবাসী বাঙ্গালীগণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সহযোগীতা প্রদানের জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছিলেন। আমেরিকার প্রবাসী বাঙ্গালীগণের এ ধরনের প্রায় কুড়িটি সংগঠন কাজ করেছে। মধ্য আমেরিকায় গঠিত এমনি একটি সং-গঠনের নাম ছিল 'বাংলাদেশ এসোসিয়েশন—ইনফরমেশন'। ডক্টর এ. কে. এম. আমিনুল ইসলাম ছিলেন এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে প্রত্যক্ষভাবে দেখার জন্য উক্ত সংগঠনের পক্ষ থেকে তিনি মুজিব নগর এসেছি-লেন। প্রসঙ্গতঃ ডক্টর ইসলাম দীর্ঘদিন ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। আমেরিকায় গঠিত এমনি আর একটি সংগঠনের নাম ছিল 'বাংলাদেশ ডিফেন্স লীগ'। ডঃ এফ. আর. খান ছিলেন এই সং-গঠনের উদ্যোক্তা।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বৃটেনে অবস্থানরত বাঙ্গালীদের অবদান কম ছিল না। সেখানে অবস্থানরত প্রবাসী বাঙ্গালীরা যে অকুণ্ঠ সাহায্য করেছেন তা চিরকাল মনে রাখার মত। লণ্ডনে গঠন করা হয়েছিল বাংলাদেশ ষ্টিয়ারিং কমিটি, একশান বাংলাদেশ ইত্যাদি। এ ছাড়া বৃটেনের অন্যান্য শহরগুলির মধ্যে

উল্লেখযোগ্য এমনি বাঙ্গালী সংগঠনের মধ্যে ছিল লিডস-এর বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রণ্ট, মিডল্যাণ্ডস-এর বাংলাদেশ যুবক সমিতি, বার্মিংহামের বাংলাদেশ মুকুল ফৌজ ইত্যাদি। এ ছাড়া লণ্ডনের হাইডপার্ক স্পিকার্স কর্ণারে বিভিন্ন দলের উদ্যোগে গঠিত হয় বহু সভা এবং শহরের পথে পথে দেখা গিয়েছে বাংলাদেশের সমর্থনে বহু গণমিছিল।

কানাডা, জার্মেনী, নরওয়ে, লিবিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর সহ পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশেও গড়ে উঠেছিল এমনি সংগঠন। তাছাড়া, অস্থায়ী গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি হিসেবে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর উদ্যোগে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের এ ধরনের আরো কয়েকটি সংগঠন গড়ে উঠেছিল।

বলাবাহুল্য আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতেই (বিশেষ করে পশ্চিম বঙ্গে) সব চাইতে বেশী প্রবাসী বাঙ্গালী সংগঠন গড়ে উঠেছিল। তাছাড়াও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহ ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থার উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল এমনি অসংখ্য সহায়ক সংগঠন। এগুলি অন্যত্র বিস্তারিত আলোচিত হওয়ায় এখানে আর পুনরুল্লেখ করলাম না।

মুজিব নগর প্রশাসন

একাত্তরের রণাঙ্গনের সব চাইতে উল্লেখযোগ্য সংযোজন হ'ল মুজিবনগর প্রশাসন। বলাবাহুল্য, গণ প্রতিনিধিগণের পরই এই প্রশাসনই ছিল মুজিব নগরে অস্থায়ী গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ক্ষমতার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু

অস্থায়ী মন্ত্রী সভা:

রাষ্ট্রপতি : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
উপরাষ্ট্রপতি : সৈয়দ নজরুল ইসলাম
রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে ইনিই রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।
প্রধানমন্ত্রী : জনাব তাজুদ্দিন আহমদ
পররাষ্ট্র ও
আইন মন্ত্রী : খন্দকার মোস্তাক আহমদ
অর্থমন্ত্রী : জনাব মনসুর আলী
স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও
পুনর্বাসন মন্ত্রী : জনাব কামরুজ্জামান

গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ:

প্রধান সেনাপতি : জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী
প্রেস, তথ্য, বেতার ও
ফিল্ম-এর ভারপ্রাপ্ত
এম, এন, এ : জনাব আবদুল মান্নান

মুজিব নগর প্রশাসনকে কয়েকটি জোনে ভাগ করা হয়েছিল। যাঁরা এসব জোনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছেন, তাঁরা ছিলেন:

১। সাউথ ইষ্ট জোন (১): অধ্যাপক নুরুল ইসলাম চৌধুরী. এম. এন. এ
২। ঐ (২): জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী. এম. পি. এ
৩। নর্থ ইষ্ট জোন (১): জনাব দেওয়ান ফরিদ গাজী এম. এন. এ
৪। ঐ (২): জনাব শামসুর রহমান খান
৫। ইষ্ট জোন: লেফটেনাণ্ট কর্ণেল এম, এ. রব. এম. এন. এ
৬। নর্থ জোন: জনাব মতিউর রহমান
৭। ওয়েষ্ট জোন (১): জনাব আজিজুর রহমান
৮। ওয়েষ্ট জোন (২): জনাব আশরাফুল ইসলাম এম, এন, এ
৯। সাউথ ওয়েষ্ট জোন (১): জনাব এম, এ, রৌফ চৌধুরী, এম, পি, এ
১০। ঐ (২): শ্রী ফণিভুষণ মজুমদার, এম, পি, এ

সাহায্য ও পুনর্বাসন, যুব শিবির, বিদেশের জন্য মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত প্রকাশনা প্রভৃতি বিভাগ একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। অধ্যাপক ইউসুফ আলী (এম, এন, এ), জনাব তাহেরুদ্দিন ঠাকুর (এম, এন, এ) প্রমুখ এসব বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। জনাব এম, আর, সিদ্দিকী (এম, এন, এ) কিছুকাল বাংলাদেশের মুক্ত এলাকার পূর্বাঞ্চলের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জনাব সামসুদ্দোহা (এম, এন, এ) ও জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী প্রমুখ। এ ছাড়া মুজিব নগরে গঠিত বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতি, বাংলাদেশ বুদ্ধিজীবি সমিতি, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী ও কুশলী সমিতি, ভলান্টিয়ার্স কোর প্রভৃতি বেসরকারী সংগঠন ও মুক্তি যুদ্ধের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। ভলান্টিয়ার্স কোরের পরিচালক ছিলেন ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম (এম,এন, এ) আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনীর সদস্যা ছিলেন বেগম বদরুন্নেছা আহমদ (এম, এন, এ), বেগম রাফিয়া আখতার ডলি (এম, এন, এ), বেগম সাজেদা চৌধুরী (এম, এন, এ), বেগম আইভি রহমান, বেগম হোসনে আরা মান্নান, বেগম জাহানারা হক ও বেগম হাসিনা আহমদ প্রমুখ। মুক্তি-বাহিনী শিবির ও শরণার্থী শিবিরে এই বাহিনী সাহায্য সামগ্রী বিতরণ করতেন।

সমগ্র মুজিব নগর প্রশাসন পরিচালিত হয়েছে একটি পূর্ণাঙ্গ সেক্রেটারিয়েটের মাধ্যমে। এই সেক্রেটারিয়েটের প্রধান সচিবের দায়িত্ব পালন করেছেন জনাব রুহুল কুদ্দুস। মুজিব নগরে সংগঠিত গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সচিবালয় এবং সংশ্লিষ্ট সচিবগণের পূর্ণ বিবরণী নিম্নে সন্নিবেশিত হল:

সংস্থাপন সচিব : জনাব নুরুল কাদের খান,
আভ্যন্তরীণ সচিব : জনাব আবদুল খালেক
প্রতিরক্ষা সচিব : জনাব আবদুস সামাদ
তথ্য সচিব : জনাব আনোয়ারুল হক খান
বৈদেশিক সচিব : জনাব মাহবুবুল আলম চাষী
কেবিনেট সচিব : জনাব তওফিক ইমাম
অর্থ সচিব : জনাব খন্দকার আসাদুজ্জামান

পরিকল্পনা কমিশনের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন ডক্টর মুজাফ্ফর আহমদ চৌধুরী। রিলিফ কমিশনার : শ্রী জে, জি ভৌমিক এবং ইয়ুথ ক্যাম্প এর পরিচালক ছিলেন উইং কমাণ্ডার মীর্জা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

- রণাঙ্গনের সর্ব প্রধান ব্যক্তিত্ব
- সংগ্রামের আর একটি উজ্জল নক্ষত্র

রণাঙ্গনের সর্বপ্রধান ব্যক্তিত্ব

একাত্তরে আমরা ছিলাম রণাঙ্গনে। আমরা এগিয়ে যাচ্ছি অনাগত ভবিষ্যতের দিকে। এই রণাঙ্গনেই আমরা রচনা করেছি এক নুতন ইতিহাস; লাভ করেছি একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ 'বাংলাদেশ'। বিবর্তনশীল এ পৃথিবীতে যুগে যুগে পরিবর্তন আসবেই। আজকের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশও এমনি বিবর্তনেরই ফসল।

একাত্তরের এই বিবর্তনের প্রধান নায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন রণাঙ্গন থেকে বহুদূরে। যদিও তিনি ছিলেন পাকিস্তানে এহিয়া খানের কারাগারে বন্দী, বস্তুতঃ তিনিই ছিলেন ন'মাস ব্যাপী আমাদের শেষতম রণাঙ্গনের সর্বপ্রধান ব্যক্তিত্ব এবং প্রেরণার উৎস।

২৬শে মার্চ '৭১ চট্টগ্রাম বেতারের কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে সংগঠিত বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে আমাদের কয়েকজন সহকর্মী শব্দসৈনিক দেশবাসী এবং বিশ্ববাসীকে জানিয়েছিলেন: আমরা এখন হানাদার পাক বাহিনীর সাথে স্বাধীনতা যুদ্ধে লিপ্ত। আর এই যুদ্ধের নেতৃত্ব দিচ্ছেন স্বয়ং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পরদিন অর্থাৎ ২৭শে মার্চ, '৭১ চট্টগ্রামের ষোল শহরে অবস্থিত তৎকালীন ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৮ম ব্যাটালিয়ানের সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড মেজর জিয়াউর রহমান বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে শেখ মুজিবের পক্ষে আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা প্রচার করলেন। মেজর জিয়াউর রহমান পূর্বদিনের একই কথার প্রতিধ্বনি করে দেশবাসী ও বিশ্ববাসীকে জানালেন: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইতিমধ্যেই সদ্য ঘোষিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের একটি আইনানুগ সরকার গঠন করেছেন। একই প্রচারে তিনি বিশ্ববাসীকে আহ্বান জানালেন নূতন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে তাৎক্ষণিক স্বীকৃতি ও সহযোগীতা প্রদানের জন্য।

২৫শে মার্চ, '৭১ এর কাল রাত্রি পেরিয়ে শেখ মুজিব আদৌ জীবিত ছিলেন কিনা এ সম্পর্কে স্বভাবতঃই আমরা ছিলাম সন্দিহান। কিন্তু তথাপি সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর মনোবলকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের

কর্মীগণ এমনি কৌশলগত প্রচারের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। স্বভাবতই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে এ জাতীয় অনুষ্ঠান প্রচার ছিল পাকিস্তানের সামরিক শাসককুলের কাছে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য। কাজেই তারা পাকিস্তান বেতারের মাধ্যমে পাল্টা সংবাদ পরিবেশন করে জানাল যে শেখ মুজিবুর রহমানকে ২৫শে মার্চ, '৭১ রাতেই বন্দী করে তারা করাচী নিয়ে গিয়েছিল। পরদিন করাচী থেকে প্রকাশিত দৈনিক ইংরেজী ডন পত্রিকায় শেখ মুজিবের বন্দী দশার ছবিসহ একটি সংবাদও পরিবেশিত হ'ল। কাজেই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত সংবাদকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে গিয়ে প্রকারান্তে এহিয়া খানের সামরিক চক্র ধরা পড়ল তাদের আপন জালে। সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালী এবং বিশ্ববাসী জানলেন শেখ মুজিবের অবস্থানের কথা।

পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধুর বিচারের প্রহসন শুরু করলেন এহিয়া। দেশদ্রোহীতার কঠিন অভিযোগে তাঁকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলানোর সব উদ্যম নিলেন তিনি। ঐ পরিস্থিতিতে আমরা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে চরমপত্র : ঢাকার কথ্য ভাষায় লিখিত বিশেষ ব্যাঙ্গ রচনা, জল্লাদের দরবার : বিশেষ জীবন্তিকা সহ বাংলা, ইংরেজী সব অনুষ্ঠানে উন্মাদ এহিয়ার এই আয়োজনের বিরুদ্ধে সোচ্চার আওয়াজ তুললাম। এ ছাড়া 'শেখ মুজিবের বিচার প্রহসন' ও 'শেখ মুজিবের বিচার প্রসঙ্গ' নাম দিয়ে দুটি বিশেষ সিরিজে কয়েকটি কথিকাও প্রচারের ব্যবস্থা নিলাম আমরা। 'শেখ মুজিবের বিচার প্রহসন কথিকা মালার পরিকল্পনা, নির্দেশনা এবং পাঠে ছিলেন যুদ্ধকালীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রেস, তথ্য, বেতার ও ফিল্ম-এর ভারপ্রাপ্ত এম, এন, এ জনাব আবদুল মান্নান। পাণ্ডুলিপি লিখে দিতেন জনাব আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী। এমনি কথিকামালার চতুর্দশ কথিকাটি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম পাঠক কুলের উদ্দেশ্যে :।

শেখ মুজিবের বিচার প্রহসন
(চতুর্দশ পর্যায়)

বঙ্গবন্ধুর জীবন আজ সঙ্কটাপন্ন। এক হিংস্র আততায়ীর হাতে সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রিয় মুজিব ভাইয়ের জীবন আজ বিপন্ন। খুনী নর দস্যু ইয়াহিয়া আজ উন্মাদ। বাংলাদেশের মুক্তি সেনাদের হাতে চূড়ান্ত পরাজয়ের আগে এই বর্বর ঘাতক চরমভাবে প্রতিশোধ নিতে চায় বাঙ্গালী জাতির উপর। ইয়াহিয়া জানে, শেখ মুজিব বাঙ্গালী জাতির ভাই, বন্ধু, নেতা, পথপ্রদর্শক এবং তাদের আশা ও আকাংখার একমাত্র প্রজ্বলন্ত শিখা। বাঙ্গালী জাতির রক্তাক্ত হাতে এই

আলোর দীপশিখা নিভিয়ে দিতে চায় ইয়াহিয়া খান। তার সম্ভবতঃ ধারনা, এই দীপশিখা নিভে গেলে, বাংলার নয়নমণি আলো না দেখালে বাঙ্গালীর মুক্তিযুদ্ধ ব্যর্থ হয়ে যাবে। হায় মূর্খ ইয়াহিয়া তুমি জানো না, শেখ মুজিব শুধু বাংলাদেশের নেতা নন, তিনি নতুন বাঙ্গালী জাতির জনক। সাড়ে সাত কোটি মানুষের যে নতুন জাতি তিনি সৃষ্টি করেছেন, যে নতুন ইতিহাস তিনি রচনা করেছেন, তার জয়যাত্রা আর রুদ্ধ হওয়ার নয়। মুজিব আজ একা নন। তিনি লক্ষ মুজিব সৃষ্টি করে গেছেন বাঙ্গালী জাতির মধ্যে। আর তিনি নিজে সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনে এক মহান মৃত্যুঞ্জয়ী ব্যক্তিত্ব হয়ে চিরকাল বেঁচে থাকবেন। তিনি যেখানেই থাকুন, ইয়াহিয়ার কারাগারে অথবা জীবনের পরপারে, বাঙ্গালীর মুজিব ভাই চিরকাল বাঙ্গালী জাতিকে নেতৃত্ব দিবেন। ইয়াহিয়ার খুনীদের সাধ্য নেই, সাড়ে সাত কোটি মানুষের বুক থেকে এই মুজিবকে ছিনিয়ে নেয়ার।

হত্যাকারী ইয়াহিয়া, তুমি বিচার করতে চাও এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী নেতার ? তোমার হাত রক্ত রঞ্জিত। তোমার মুখে একটি জাতি হত্যার জঘন্য কলঙ্কের ছাপ লাগিয়ে সাজতে চাও, সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রাণপ্রিয় মুজিব ভাইয়ের বিচারক ? তোমার লজ্জা নেই। তুমি ঘৃণ্য জানোয়ারের চেয়েও অধম। তোমার পতন আসন্ন। হিটলার আর মুসোলিনির মত আজ তুমি হত্যার নেশায় মেতেছো ? কিন্তু হিটলারের মত আত্মহত্যা করেও তুমি ইতিহাসের চরম শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবে না। তুমি কি জানো না, মুসোলিনির শোচনীয় পরিণতির কথা ? মানুষ মরণশীল। কালের অমোঘ নিয়মে সকল মানুষের মত শেখ মুজিব ও একদিন মরবেন। ইয়হিয়া, তোমাকেও মরতে হবে। কিন্তু এই মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য আছে। মুজিব মৃত্যুর পরও পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের মনে বেঁচে থাকবেন। মুজিবের নাম হবে বিশ্বের নির্যাতীত, নিপীড়িত মানুষের কাছে অফুরন্ত প্রেরণা। কিন্তু ইয়াহিয়া, দৈহিক মৃত্যুর আগেই তোমার আসল মৃত্যু হয়ে গেছে। যেদিন তুমি ক্ষমতায় থাকবে না, সেদিন কুকুর বিড়ালও ঘৃণায় তোমার নাম উচ্চারণ করবে না। ইয়াহিয়া, তোমার নাম লেখা হবে বিংশ শতাব্দীর ঘৃণ্য ইয়াজিদ। আর টিক্কার নাম লেখা হবে এ যুগের শয়তান সীমার।

কিন্তু সত্যই কি শেখ মুজিব কোন অপরাধ করেছিল যার জন্য বছরের পর বছর তাঁকে জেলে থাকতে হবে এবং ইয়াহিয়া-টিক্কার মত তৃতীয় শ্রেণীর সেপাই-দের কাছ থেকে মৃত্যুদণ্ডের হুমকি সহ্য করতে হবে ? শেখ মুজিবের অপরাধ, তিনি ছয়দফা প্রচার করেছেন। কই, ১৯৬৯ সালে ছয়দফার দাবীতে তিনি যেদিন আইয়ুবের গোল টেবিল বৈঠক ছেড়ে আসেন, সেদিনতো বলা হয়নি,

ছয়দফা বে-আইনী দাবী? ছয়দফা আওয়ামী লীগের নির্বাচনী কর্মসূচী, একথা জেনেওতো ইয়াহিয়া আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে দিয়েছেন। শেখ মুজিব তাঁর মনের কথা লুকোননি। তিনি বেতার ও টেলিভিশন ভাষণেও বাঙ্গালীর বাঁচার ছয়দফা দাবী সুস্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরেছেন। এই দাবীর ভিত্তিতে তিনি দেশের ইতিহাসে যা হয়নি, সেই ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। নির্বাচনী বিজয়ের অধিকারী হলেন শেখ মুজিব। ইয়াহিয়া, সেদিন আগ্ বাড়িয়ে তুমিই বলেছিলে, শেখ মুজিব এদেশের ভাবী প্রধানমন্ত্রী। যদি তাই হবে, তাহলে ১লা মার্চ ভাবী প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ বাদে তুমি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করতে গেলে কেন? সে কি ভুট্টোর পাগলামির জন্য? না তোমরা নিজেরাই ভুট্টোকে দুষ্ট বুদ্ধি বানরের মত নাচিয়েছিলে? ইয়াহিয়া সাহেব, আজ তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তুমি কথায় কথায় তোমার এল, এফ, ও বা আইনগত কাঠামোর কথা বড়াই করে বলে থাকো। এই আইনগত কাঠামোতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকার পর বা বসার আগেই স্থগিত ঘোষণার ক্ষমতা তোমাকে কোন্ ধারায় দেয়া আছে, তা দয়া করে তুমি বিশ্ববাসীকে জানাবে কি? আইনগত কাঠামো আদেশে আছে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন শুরু হওয়ার ১২০ দিনের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজ সমাধা করা সম্ভব না হলে তুমি পরিষদ বাতিল করে দিতে পারো। তাহলে এই পরিষদের অধিবেশন বসতে দিয়ে ১২০ দিনের জন্য সবুর করা তোমার ধাতে সইলো না কেন? নাকি তুমি বুঝতে পেরেছিলে যে জাতীয় পরিষদে নির্ধারিত ১২০ দিনের মধ্যেই শাসনতন্ত্র তৈরী হবে এবং এই শাসনতন্ত্র তৈরী হওয়ার অর্থ, গণতান্ত্রিক সরকারের হাতে ক্ষমতা দিয়ে তোমাদের সামরিক জাণ্টার ব্যারাকে ফিরে যাওয়া। কিন্তু গত ২০ বছর ক্ষমতার যে দুধ কলার আস্বাদ তোমরা পেয়েছো, তাতে ক্ষমতা কি আর ছাড়তে পারো? তাইতো শেখ মুজিবকে অপরাধী সাজিয়ে তোমাদের এই জঘন্য চক্রান্ত। ভাবছো, হাতে রেডিও, টেলিভিশন আর খবরের কাগজ থাকলেই বুঝি যা খুশি মানুষকে বিশ্বাস করানো যায়? ইয়াহিয়া, তুমি শুধু ঘাতক নও, তুমি এ যুগের ইতিহাসের সব চাইতে নিকৃষ্ট মুর্খ!

সবশেষে আরেকটি কথা বলবো। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে, মিথ্যাবাদীর স্মরণশক্তি নেই। ইয়াহিয়া, তোমারও স্মরণশক্তি নেই। নইলে গত ফেব্রুয়ারী মাসে—এমনকি গত মার্চ মাসেও তুমি বলেছো, এবারের সাধারণ নির্বাচন সবচাইতে অবাধ, নিরপেক্ষ নির্বাচন। এখন চার মাস না ঘুরতেই তুমি বলছো, নির্বাচন অবাধ হয়নি। আওয়ামী লীগ গুণ্ডামী করে ভোট জাল করেছে। একটা দেশের প্রেসিডেন্টের মত দায়িত্বশীল পদ দখল করার পরও এতবড় একটা মিথ্যা

বলতে তোমার বাধে না, এ না হলে তুমি ইয়াহিয়া খাঁ? কিছুদিন আগে তুমি বিশ্ববাসীকে শুনিয়েছো, মার্চ মাসের বৈঠকের সময় শেখ মুজিব নাকি ঢাকায় তোমাকে গ্রেপ্তার করতে চেয়েছিলেন। এই গল্পটি কিন্তু ২৬শে মার্চের বেতার ভাষণ দেয়ার সময়ও তুমি ঠিক তৈরী করে উঠতে পারোনি। বিশ্বের কোন কোন সংবাদপত্র তাই ইতিমধ্যেই তোমাকে মিথ্যাবাদী রাখাল বালক আখ্যা দিয়েছে। কিন্তু ইয়াহিয়া সাহেব, মিথ্যার উপর তোমার রাজনীতি, মিথ্যার উপর তোমার ও তোমার ফ্যাসিষ্ট মিলিটারী জুণ্টার অস্তিত্ব। তাই মিথ্যা ছাড়া তোমাদের বাঁচার আর উপায় নেই। সম্প্রতি আওয়ামী লীগকে দোষারোপ করার জন্য যে শ্বেতপত্র বের করা হয়েছে, তা ছিল একগাদা মিথ্যার ঝুড়ি। ইয়াহিয়া সাহেব, তোমার লাই ম্যানুফ্যাকচারিং কারখানাটি বড় চালু? শ্বেতপত্রে লিখেছো, ১লা মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ তারিখ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে এক লাখ লোক হত্যা করেছে। আচ্ছা ইয়াহিয়া সাহেব, এই ১লা মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যান্ত বাংলাদেশে অন্ততঃ দুই ডজন বিদেশী সাংবাদিক ছিলেন। কই, তারাতো কেউ এসময় তাদের নিজ নিজ দেশের কাগজে খবর পাঠাননি যে, বাংলাদেশে খুনখারাবি হচ্ছে। তোমার করাচী, পিণ্ডি, লাহোরের কাগজগুলোতেও লক্ষ লোক দূরে থাক, হাজার লোক হত্যার খবরও বের হয়নি। কিন্তু যেই তোমরা ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে বাংলাদেশে নতুন কারবালা শুরু করলে, অমনি বিদেশী সাংবাদিকদের হাত-পা বেঁধে ঢাকা থেকে তাড়ানো হলো। ইয়াহিয়া, তুমি এমনই সত্যবাদী যে, আন্তর্জাতিক রেডক্রসের একটা টিমকেও তুমি ঢাকায় আসতে দেওনি। এত কাণ্ডের পর এখন নিজেই তুমি রক্তের দাগ মুছে শ্বেতপত্র তৈরী করছো। তোমার এই শ্বেতপত্রের কথাগুলো বাঙ্গালীর খুনে লেখা নয়কি?

ইয়াহিয়া খাঁ, তোমার এবং তোমার শয়তান চক্রকে বাংলাদেশের মানুষ শুধু একটি কথাই জানাবে, যে ফাঁসির রজ্জু তুমি শেখ মুজিবের জন্য পাকাচ্ছো, ওই দড়িতে তোমার এবং তোমার সহচরদেরই ঝুলতে হবে। এবং সেদিন খুব বেশী দূরে নয়।

শেখ মুজিব দীর্ঘজীবি হোন॥ জয় বাংলা॥

২

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রতিদিনের অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল বাংলা সংবাদ পর্য্যালোচনা। পর্য্যালোচনা করতেন সাংবাদিক আমির হোসেন। ১৭ই আগষ্ট '৭১ তারিখে প্রচারিত এমনি সংবাদ পর্য্যালোচনার বিষয়বস্তু ছিল "বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রসঙ্গ":

সংবাদ পর্য্যালোচনা—২৫

তিনটি খবর। তিনটি খবরের উৎসস্থল দূরদূরান্তের তিনটি জায়গা করাচী, নয়াদিল্লী, ওয়াশিংটন। অথচ খবর তিনটি একই সূত্রে গাঁথা—একই লোককে কেন্দ্র করে। আর তিনি হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

করাচী থেকে ফরাসী বার্তা প্রতিষ্ঠান এ, এফ, পি, জানিয়েছেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আত্মপক্ষ সমর্থনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করায় পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক আদালতে তার বিচার স্থগিত হয়ে গেছে। লায়ালপুরের কাছে শেখ সাহেবের বিচার প্রহসনের আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি বলেছেন আমি কোন অপরাধই করিনি। তাই বিচারে আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রশ্নই ওঠেনা।

নয়াদিল্লীতে মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডী বলেছেন তিনি সর্বপ্রথম শেখ মুজিবের মুক্তি দানের শর্তে বাংলাদেশ সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধানের পক্ষপাতী। বঙ্গবন্ধুর গোপন বিচারের তীব্র নিন্দা করে সিনেটর কেনেডী বলেন, শেখ মুজিব যদি কোন অপরাধ করে থাকেন তা হচ্ছে এই যে তিনি একটি নির্বাচনে জয় লাভ করেছেন। যেভাবে গোপনে তাঁর বিচার হচ্ছে তা আন্তর্জাতিক আইন ও রীতি-নীতির চূড়ান্ত বরখেলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়।

অপরদিকে জাতিসংঘে জঙ্গীশাহীর রাষ্ট্রদূত আগা হিলালী বলেছেন 'যে শেখ মুজিবের গোপন বিচার প্রত্যক্ষ করার জন্য আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের অনুমতি দেয়া হবে না।'

আগা হিলালী আরও বলেছে যে বঙ্গবন্ধুর বিচারকারী মিলিটারি কোর্টের রায় যাই হোক না কেন, তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করা হবে না। রায়ের পর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বঙ্গবন্ধুর দণ্ডাদেশ বাতিল বা হ্রাস করতে পারবেন।

খবরগুলো পাশাপাশি রেখে এগুলোর তাৎপর্য লক্ষ করলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, শেখ মুজিবকে জল্লাদবাহিনী এখনও হত্যা করেনি—করতে

পারবেও না। কারণ সে শক্তি ওদের নেই। তাই বঙ্গবন্ধুর বিচারের প্রহসন মঞ্চ সাজিয়ে সমগ্র বিশ্বকে ভীত সন্ত্রস্ত করে নর ঘাতক ইয়াহিয়া চেষ্টা করছে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করতে। বঙ্গবন্ধুর অমূল্য জীবনকে বাজি রেখে সে নেমেছে বাংলার স্বাধীনতার যুদ্ধ বানচালের জুয়াখেলায়। কিন্তু ইয়াহিয়া খান আবার ভুল করছে—আবার ভ্রান্তির বালুচরে পা আটকে গেছে তার। ইয়াহিয়া স্বীকার না করলেও বিশ্ববাসী জানেন, প্রায় সাড়ে ৪ মাস ধরে ভয়-ভীতি প্রলোভন দেখিয়ে চেষ্টা চলেছে শেখ মুজিবকে বসে আনবার। কিন্তু কোন লাভ হয়নি। বঙ্গবন্ধুর মাথা সে কিনতে পারেনি। আর পারেনি বলেই শেষ অস্ত্র নিক্ষেপের মত হুঙ্কার ছেড়েছে, 'আমি শেখ মুজিবের বিচার করবো, তাকে ফাঁসিতে ঝুলাবো।' এর পেছনে এক সুচতুর লক্ষ্য ছিল ইয়াহিয়া খাঁর। সে ভেবেছিলো, শেখ মুজিবকে হত্যার হুমকি দিয়ে তাঁকে বাগে আনা যাবে, মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল ভেঙ্গে দেওয়া যাবে আর যাবে বিশ্বজনমতকে বিভ্রান্ত করা। কিন্তু এবারও ব্যর্থ হয়েছে জল্লাদী প্রচেষ্টা। ভয় পাবার পরিবর্তে আরও বলিষ্ঠ কণ্ঠে বঙ্গবন্ধু বলেছেন 'আমি কোন অপরাধ করেনি। সুতরাং বিচার বা আত্ম-পক্ষ সমর্থনের কোন প্রশ্নই উঠে না।'

তাই বাধ্য হয়ে তাকে বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রহসন মুলতবী রাখতে হয়েছে। এই বিচার আর হত্যার হুমকি মুক্তি যোদ্ধাদের মনোবল এতটুকু দমাতে পারেনি। বরং শেখ মুজিবের নির্দেশিত পথে দ্বিগুণতর শক্তি নিয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে দুশমনের ওপর—আরও ত্রিশংকু অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হয়েছে হানাদার বাহিনী। আর বিশ্ব জনমত বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে ইয়াহিয়া খানের। এইতো গতকাল সিনেটর কেনেডী বলেছেন 'শেখ মুজিবের একটি মাত্র অপরাধ যে তিনি নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন। তাঁর গোপন বিচার আন্তর্জাতিক আইন ও রীতি-নীতির চূড়ান্ত বরখেলাপ মাত্র। বস্তুতঃ এ কথা কেনেডীর একার কথা নয়। কেনেডীর কণ্ঠে বিশ্ব বিবেকের স্বার্থহীন রায়ই ধ্বনিত হয়েছে। আর সে রায় ক্ষমাহীন নিয়তির মত জানিয়ে দিয়েছে অপরাধী শেখ মুজিব নয়—ইয়াহিয়া খান। যুদ্ধ শেখ মুজিব শুরু করেননি—ইয়াহিয়া খানের গণহত্যা অভিযানের জবাবেই সৃষ্টি হয়েছে রক্তাক্ত সংঘর্ষের। আর তাই সমস্যার সমাধানের সর্বপ্রথম শর্ত হচ্ছে শেখ মুজিবের মুক্তি। কেনেডীর এই বক্তব্যের আরেকটি তাৎপর্য আছে। কেনেডী দের বলা হয়ে থাকে মার্কিন বিবেকের কণ্ঠস্বর। আর সে কারণেই বলা যায়, কেনেডীর বক্তব্য পৃথিবীর আর দশটি দেশের মত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোটি কোটি শান্তি, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকামী মানুষেরই বক্তব্য। সুতরাং দেখা যায়,

যে দেশের অস্ত্র দিয়ে ইয়াহিয়া বাঙ্গালীদের হত্যা করছে, শেখ মুজিবকে হত্যার হুমকি দিচ্ছে সেই আমেরিকার জনগণের দৃষ্টিতেও ইয়াহিয়া দোষী, শেখ মুজিব নির্দোষ।

জল্লাদ ইয়াহিয়ার রাষ্ট্রদূত আগা হিলালী বলেছে, বিচারের রায় যাই হোক, সঙ্গে সঙ্গে শেখ মুজিবকে হত্যা করা হবে না। তার দণ্ডাদেশ বাতিল বা হ্রাসের ক্ষমতা থাকবে ইয়াহিয়ার। চমৎকার ব্যবস্থা। কিন্তু এর গোপন তাৎপর্যটুকু বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয়। ইয়াহিয়া চেয়েছিল ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধটাকে ধামাচাপা দিতে। কিন্তু ভারত-রাশিয়া শান্তি ও সহযোগীতার চুক্তি জল্লাদের সে খায়েশ চিরতরে গুড়িয়ে দিয়েছে। এখন একটি মাত্র তুরুপের তাস আছে ইয়াহিয়ার হাতে। আর সে হচ্ছে শেখ মুজিবের জীবন। তাই সে চাইছে বিচার প্রহসনে বঙ্গবন্ধুর চরম দণ্ডের ব্যবস্থা করে তাঁর জীবন রক্ষার ক্ষমতাটুকু নিজের হাতে নিয়ে তাই দিয়ে রাজনীতি করতে। আর ইয়াহিয়ার এই গোপন উদ্দেশ্যটি সম্পর্কে টাইম ম্যাগাজিন লিখেছেন: "এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই যে শেখ মুজিবকে দণ্ড দেওয়া হবে। তবু মনে হয়, ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করবে না। কারণ সে জানে বাংলাদেশের যুদ্ধে এক পাকিস্তানের আশা চিরতরে সমাধিস্থ হয়েছে। শেখ মুজিবকে বাঁচিয়ে রাখলে অন্ততঃ একটা শেষ সুযোগ পাওয়া যাবে। সে হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী রক্তাক্ত যুদ্ধের বদলে শান্তিপূর্ণভাবে বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভাগাভাগিটা সম্পন্ন করা।" অতঃপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

৩

আগষ্ট '৭১এ আমেরিকার সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডী বাংলাদেশের করুণ অবস্থা দেখার জন্য এসেছিলেন। তিনি দিল্লী অবস্থানকালে মুজিব নগরে গঠিত বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি, বাংলাদেশ লিবারেশন কাউন্সিল অব ইনটেলিজেনসিয়া সহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান শেখ মুজিবের মুক্তির প্রতি প্রভাব বিস্তারের অনুরোধ জানিয়ে তাঁর কাছে এক আবেদন উপস্থাপন করেছিলেন। এই আবেদনটি পরে ১২ই আগষ্ট, '৭১ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছিল। আবেদনটি নিম্নে সন্নিবেশ করলাম:

AN APPEAL TO SENATOR EDWARD KENNEDY

We were not surpised when we saw you taking up the cause of the people of Bangladesh following the noble tradition of your great

brothers John and Robert Kennedy. Your forthright denouncement of the Nazi-style campaign of genocide against the Bengali Nation and the policy of appeasement as is being pursued by the U.S. President Richard Nixon, clearly brought consolation for the entire people of Bangladesh. The Nation has now overcome the shock of a sudden massacre campaign and is pledged to win freedom from one of history's crudest colonialisms.

Our cause is just and our victory shall mean the victory for justice and democracy—the ideals that you and the American people cherish most. But this victory is being delayed and the suffering of the people is being enhanced by American military and economic aid to Islamabad Generals who are brutally suppressing the democratic aspirations of the people.

You have rushed to India to see for yourself the shocking plight of nearly eight million refugees who have fled from Yahya's guns to find minimum safety here. You may also witness the condition of seventy million others who could not flee. They are virtual refugees in their own country where sudden brutal death haunts them constantly. Already a million men, women and children have been methodically decimated Gestapo style raids daily pick up hundreds never to be heard of again. The economy of the region has been destroyed irreparably by senseless destruction of commercial & trading centres. Since March 25 Pakistani soldiers were let loose to commit murder, rape, loot and arson at will. Today, after four long months, there has been no let up in this gruesome orgy. And to crown it all has come the declaration of the trial by military court on 11 August 1971 of Sheikh Mujibur Rahman, the unchallenged and democratically elected leader of Bangladesh. General Yahya did not even hesitate to pronounce the verdict in advance. The great leader is certain to face murder by firing squad unless superior powers restrain the General and his accomplices.

Such a reign of terror can only help to aggravate the refugee problem by unbelievable proportions. But the way the world is proposing to cope with this horrifying tragedy calls for an immediate censure. Finding relief material for an ever widening flow of refugees without removing the real cause of the exodus is in itself, a

self-defeating process. As every day passes the world moves a step nearer to an international bloodbath over the issue. Yet the dangers could be adverted so easily simply by U.S. refusal to prop up the economically and militarily bankrupt regime of Islamabad. We are sure that American taxpayers, if correctly informed about the tragedy would be least inclined to foot the bill for Pakistani junta's massacre campaign in Bangladesh.

We appeal to you, your party and the American people to do everything in your power to force the U.S. Administration to reverse its present policy, recognise the Peoples Republic of Bangladesh and secure the safety and release of its President SheikhMujibur Rahman.

Signatories

A. R. Mallick
Syed Ali Ahsan
K. Sarwar Murshid
Zahir Raihan
Qamrul Hasan
Ranesh Das Gupta
Faiz Ahmed
Alamgir Kabir
Hasan Imam
Wahidul Huq
Ashraf Ali Chowdhury
M. A. Khair
Kamal Lohani
Brojen Das
Sadeq Khan
Belayet Hussain
Mustafa Monwar
Anupam Sen
Motilal Paul
Moudud Ahmed
Quamruzzaman
Farukh Khalil
Delwar Mohammad Ahmed
Ajoy Kumar Roy
Golam Morshed
Anwaruzzaman
Mazharul Islam
Shamsul Alam Sayed
Musharraf Hussain
Rashbehari Ghosh
Anisuzzaman
A. A. Ziauddin Ahmed
Kabori Chowdhury
Narayan Ghosh
Chittaranjan Chowdhury
Khashru Noman
Samar Das
Subhas Dutt
Abdul Jabbar Khan
Udayan Chowdhury
Raju Ahmed
Sumita Devi
Chitta Bordhan and
Zafar Iqbal.

On behalf of

Bangladesh Liberation Council of the Intelligentsia,
Bangladesh Teachers Association,
Bangladesh Film Artists & Technicians Association,
Bangladesh Sports Association.

স্পষ্টতঃই একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল দুটি :—এক, বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করা, এবং দুই, বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের কারাগার থেকে ছিনিয়ে আনা। তিরিশ লক্ষ বাঙ্গালীর প্রাণের বিনিময়ে ন'মাস ব্যাপী রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধ শেষে ১৬ই ডিসেম্বর '৭১ ঢাকার রেস কোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান) এহিয়া খানের হানাদার বাহিনীর আনুষ্ঠানিক অস্ত্র সমর্পণের মাধ্যমেই অর্জিত হ'ল আমাদের প্রথম লক্ষ্য স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। তারপর দীর্ঘ প্রায় এক মাস চলল নানান জল্পনা কল্পনা এবং দর কষাকষি। সবারই কাছে একই প্রশ্ন : বঙ্গবন্ধুকে কি আদৌ পাকিস্তানের কারাগার থেকে ফিরিয়ে আনা যাবে?

শেষ পর্যন্ত সেই অসম্ভব কাজটিও সম্ভব হয়েছিল। ৮ই জানুয়ারী '৭২ পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন শেখ মুজিব। ঐদিনই এক বিশেষ বিমানে তাঁকে পাকিস্তান ত্যাগের অনুমতি দেয়া হ'ল। কিন্তু কোথায় যাবেন সে সিদ্ধান্ত শেখ মুজিব নিজেই নিলেন চলন্ত বিমানে বসে। আমরা শুধুমাত্র জানলাম তিনি করাচী বিমান বন্দর থেকে নিরুদ্দিষ্ট পথে রওয়ানা হয়ে গেছেন।

দারুণ উৎকণ্ঠায় নিপাতিত হ'ল সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালী। অবশেষে আমরা জানলাম তিনি লণ্ডন অবতরণ করেছেন। দীর্ঘ ন'মাস পর এই প্রথম বারের মত আমরা সংশয়মুক্ত হলাম বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তা সম্পর্কে। পরবর্তী কর্মসূচী তিনি লণ্ডনে বসেই নিয়েছিলেন। ১০ই জানুয়ারী '৭২ তিনি এলেন দিল্লী। ওখান থেকে সরাসরি অন্য এক বিশেষ বিমানে তাঁকে নিয়ে আসা হ'ল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের রাজধানী, তাঁরই দীর্ঘ দিনের সংগ্রামের পাদপীঠ ঢাকা নগরীতে, যেখানে স্মরণাতীতকালের বৃহত্তম স্বতঃস্ফূর্ত জনতা অপেক্ষা করছিলেন তাঁকে প্রাণঢালা সম্বর্ধনা জানানোর জন্য, এক নজর দেখার জন্য। হর্ষোৎফুল্ল লাখ জনতার ভীড়ের মাঝ দিয়ে তেজগাঁও বিমান বন্দর থেকে বঙ্গবন্ধু সরাসরি এলেন রেসকোর্স ময়দানে। ঠিক দশমাস তিন দিন আগে ৭ই মার্চ '৭১ এই মাঠেই তিনি দিয়েছিলেন সংগ্রামের ডাক, সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীকে জানিয়েছিলেন স্বাধীনতার আহ্বান।

একাত্তরের রণাঙ্গনে এমন কোনও মুহূর্ত ছিল না, যখন আমরা বঙ্গ বন্ধুর কথা ভাবিনি, তাঁর অভাব অনুভব করিনি। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রতিটি অনুষ্ঠানেই তিনি ছিলেন এক অবিচ্ছেদ্য ব্যক্তিত্ব। এই বেতার কেন্দ্রের প্রতিটি অনুষ্ঠানেই ধ্বনিত হয়েছে তাঁর সংগ্রামী চেতনা। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল বজ্রকণ্ঠ। মূলতঃ ৭ই মার্চ, '৭১ রেস-কোর্স ময়দানে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ভাষণের অংশ বিশেষ তাঁরই স্বকণ্ঠে প্রচারিত হ'ত এই অনুষ্ঠানে। তারপরই বেজে উঠত গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার রচিত সেই বিখ্যাত গান:

শোন, একটি মুজিবরের থেকে
লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি, প্রতিধ্বনি
আকাশে বাতাসে উঠে রণি।
বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ॥
সেই সবুজের বুক চেড়া মেঠো পথে,
আবার এসে ফিরে যাবো আমার
হারানো বাংলাকে আবার তো ফিরে পাবো।
শিল্পে কাব্যে কোথায় আছে হায়রে
এমন সোনার দেশ।

বিশ্ব কবির সোনার বাংলা, নজরুলের বাংলাদেশ,
জীবনানন্দের রূপসী বাংলা
রূপের যে তার নেইকো শেষ, বাংলাদেশ।
'জয় বাংলা' বলতে মনরে আমার এখনও কেন ভাবো,
আমার হারানো বাংলাকে আবার তো ফিরে পাবো,
অন্ধকারে পুবাকাশে উঠবে আবার দিন মণি।

সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালী এবং রণাঙ্গনের মুক্তিবাহিনী তখন এক অপরাজেয় রূপ উন্মাদনায় উদ্বেলিত হয়ে উঠতেন।

করাচী বিমান বন্দরে বন্দী বঙ্গবন্ধু
(মার্চ ২৯ ১৯৭১)

এহিয়ার কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধুকে ছিনিয়ে আনার প্রতিজ্ঞা (জয়বাংলা পত্রিকা বিশেষ সংখ্যা থেকে)। কার্টুন: পীর আলী

১০ই জানুয়ারী, '৭২ বঙ্গবন্ধু দিল্লী থেকে তেজগাঁও বিমান বন্দর পৌঁছে সরাসরি এলেন রমনা রেসকোর্স ময়দানে। সেদিন তেজগাঁও থেকে রমনা পর্যন্ত লক্ষ জনতার ভীড় জমেছিল এহিয়ার কারাগার থেকে সদ্য প্রত্যাগত মহান নেতাকে এক নজর দেখার জন্য— তাঁকে জানাতে প্রাণঢালা সম্বর্ধনা। ছবিতে বাংলাদেশ বেতার, ঢাকার কর্মী-কুশলী ও শিল্পীবৃন্দ বঙ্গবন্ধুকে জানাচ্ছেন এমনি স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণ ঢালা সম্বর্ধনা।

১লা মার্চ '৭২—৬ই মার্চ '৭২ বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ-এর প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক রাষ্ট্রীয় শুভেচ্ছা সফরে গেলেন ভ্রাতৃপ্রতীম রাষ্ট্র সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে। ছবিতে মস্কোর ভ্নুকোভো বিমান বন্দরে বাংলাদেশ-এর প্রধানমন্ত্রীকে গার্ড-অব-অনার প্রদান করছেন মস্কোর একটি সুসজ্জিত গ্যারিসন। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী আলেক্সী কোসিগীন (বামে টুপি পরিহিত) সহ অন্যান্য সোভিয়েত নেতৃবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে বঙ্গবন্ধুকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। বঙ্গবন্ধুর উক্ত রাষ্ট্রীয় সফরের অন্যতম সহযোগী শামসুল হুদা চৌধুরীকে (এই গ্রন্থের লেখক) ছবিতে দেখা যাচ্ছে (সর্ব দক্ষিণে)। উল্লেখ্য যে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে একমাত্র সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রই বাংলাদেশের প্রতি সক্রিয় সমর্থন জানিয়েছিলেন।

১৭ই মার্চ '৭২ বন্ধু রাষ্ট্র ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এক শুভেচ্ছা সফরে এলেন বাংলাদেশে। গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তেজগাঁও বিমান বন্দরে সম্মানিতা অতিথিকে ফুলের তোড়া দিয়ে স্বাগতম জানালেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সহানুভূতিশীল বিশ্বের সমর্থন লাভে এই মহিয়সী মহিলার অবদান কৃতজ্ঞ বাঙালী জাতি স্মরণ রাখবে যুগ যুগ ধরে।

১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তৎকালীন উপ-প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে রেজিমেন্টাল কালার প্রদান করছেন বঙ্গবন্ধু।

সংগ্রামের আর এক
উজ্জ্বল নক্ষত্র

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

সংগ্রামের আর এক উজ্জ্বল নক্ষত্র

(মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী)

আগেই উল্লেখ করেছি ১৯৭১-এর ৯ই মার্চ ঢাকার পল্টনের এক বিরাট জনসভায় তুমুল করতালি ও হর্ষধ্বনির মধ্যে অশীতিপর বৃদ্ধ নেতা মওলানা ভাসানী প্রেসিডেন্ট এহিয়া খানকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন: "তিক্ততা বাড়াইয়া আর লাভ নাই। লা-কুম দী'নুকুম অলইয়াদীন-এর নিয়মে (তোমার ধর্ম তোমার, আমার ধর্ম আমার) পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লও।" ২৫শে মার্চ '৭১-এর মধ্যে এই দাবী না মেনে নিলে তিনি শেখ মুজিবের সাথে মিলে তুমুল আন্দোলন শুরু করার হুমকিও এহিয়া খানকে দিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য উপমহাদেশের এই প্রবীণ সংগ্রামী মওলানা বাঙ্গালীর স্বাধিকার আন্দোলনের অন্যতম বলিষ্ঠ প্রবক্তা। তিনি ছিলেন স্পষ্টভাষী এবং নির্ভীক। কখনো কাউকে ছেড়ে কথা বলতে তাঁকে দেখা যায়নি। সারা জীবন বিরোধী দলের সাথে থেকে সরকারের অন্যায়-অবিচারকে জনগণের সমক্ষে তুলে ধরার ব্রতই তিনি পালন করে গিয়েছেন মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত। জনগণের পাশে থেকেই তিনি সংগ্রাম করেছেন আজীবন। ১৯৫৪ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্ত ফ্রন্টের বিপুল বিজয়ের মূলে তিনিই ছিলেন প্রধান সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব।

একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের ডাকে এই অশীতিপর বৃদ্ধও চলে গিয়েছিলেন মুক্তাঞ্চলে। জুন, '৭১ পর্যন্ত তিনি ছিলেন রংপুরে। ওখান থেকে ২৪শে জুন '৭১ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রেরিত তাঁর একটি লিখিত ভাষণের কপি এতদ্ সাথে নিম্নে সন্নিবেশ করলাম:

গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন সরকার আফ্রো-এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার ১৮০ কোটি নির্যাতীত, শোষিত মানুষের গণ আন্দোলন ও গণ অভ্যুত্থান ধ্বংস করার জঘন্য ষড়যন্ত্রে জনগণের আস্থাহীন স্বৈরাচারী শাসক গোষ্ঠি যাহারা ছলে-বলে কলে-কৌশলে ও নানা প্রকার দমন-নীতি চালাইয়া জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শাসন ক্ষমতা আঁকড়াইয়া থাকে, তাহাদিগকে আশ্রয় ও শিখণ্ডী বানাইয়া অস্ত্র, অর্থ ও কুমন্ত্রণা প্রদান করিয়া নিজেদের প্রভুত্ব ও সীমাহীন শোষণ চিরস্থায়ী করার জন্য নানা টালবাহানা ও জঘন্য ষড়যন্ত্র করিয়া আসিতেছে, বিশেষ করিয়া সি, আই, এ, নামক কুখ্যাত সংস্থার মাধ্যমে প্রত্যেক দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার যে কলাকৌশল অবলম্বন করিয়াছে, তাহাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সহ পৃথিবীর অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীদিগের অন্যায়

অত্যাচার ও শোষণকে ম্লান করিয়া দিয়াছে। যাহার ফলে উপরি-উল্লিখিত তিন অঞ্চলের কোটি কোটি নির্যাতিত ও শোষিত মানুষ দিনের পর দিন সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন সরকারের প্রতি সর্বপ্রকার আস্থা হারাইয়া কঠোর মার্কিন বিরোধী হইতে বাধ্য হইয়াছে। বর্তমান মুহূর্তে স্বৈরাচারী পাকিস্তানের সরকারকে আবার নতুন করিয়া অস্ত্র সাহায্য দিয়া মার্কিন সরকার তাহার সেই চিরাচরিত জঘন্য ষড়যন্ত্রে মাতিয়াছে।

স্বাধীন বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি নির্যাতীত মানুষের প্রতি স্বৈরাচারী এহিয়া সরকার যে অমানুষিক নির্মম অত্যাচার চালাইয়া লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ, নিঃসহায় ও নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করিয়া চলিয়াছে, বাড়ী-ঘর, স্কুল-কলেজ, দোকান-পাঠ, মন্দির-মসজিদ জ্বালাইয়া দিয়া লক্ষ লক্ষ মানুষকে গৃহহারা ও পথের ভিখারীতে পরিণত করিতেছে, ধনসম্পদ লুটিয়া লইয়া নারী ও শিশুদিগের প্রতি বর্ণনাহীন জঘন্যতম পাশবিক অত্যাচার করিতেছে, যাহার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে নাই; সেই জঘন্যতম জালেম গণধিকৃত এহিয়া সরকারকে অস্ত্র, অর্থ সাহায্য না করিতে শুধু স্বাধীন বাংলার জনগণই নহে, খোদ আমেরিকার জনসাধারণ সহ দুনিয়ার গণতন্ত্রকামী শান্তিপ্রিয় জনসাধারণ নিক্সন সরকারের নিকট বারবার অনুরোধ করা সত্বেও সমস্ত বিশ্ব জনমত অগ্রাহ্য করিয়া একমাত্র মার্কিনী শোষক ও শাসক শ্রেণীর স্বার্থে এহিয়া সরকারকে আবার নতুন করিয়া পূর্বের চাইতে বেশী পরিমাণ আধুনিক সমরাস্ত্র ও বিমান সাহায্য প্রদান করিয়া নগ্ন মানবতাবিরোধী চরিত্রের পরিচয় দিতেছে। ইহার নিশ্চিত প্রতিফলন নিক্সন সরকারকে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।

সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন সরকারের মনে রাখা উচিত আক্রমণকারী এহিয়া সরকারকে যতই অস্ত্রশস্ত্র তাহারা প্রদান করুক না কেন, সাড়ে সাত কোটি স্বাধীন বাঙ্গালীর দেশকে আক্রমণকারীর হাত হইতে মুক্ত করার প্রাণের দাবী নস্যাৎ করিতে কখনই তাহারা পারিবে না। ভিয়েৎনামের জনসংখ্যা বাংলাদেশ হইতে অনেক কম হওয়া সত্বেও স্বয়ং নিক্সন সরকার দৈনিক ৫ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াও হালে পানি পাইতেছে না, গণবিপ্লব নির্মুল করিতে পারে নাই। স্বাধীন বাংলায় পাইকারী গণহত্যা ও অভিনব অমানবিক অত্যাচারের ঘৃণ্যতম লীলা ও ফন্দি ফিকির চালাইয়া তাহারা শাসন ও শোষণ কায়েম রাখিতে তো পারিবে নাই, উপরন্তু ইতিহাসের কাঠ গড়ায় মানবতার চরম দুশমন হিসাবে চিহ্নিত হইয়া থাকিবে।

তাই আশা করি, মানবতার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা, চীন ও বৃটেন সহ যে কোন দেশের সরকার এহিয়ার জঘন্যতম জালেম সরকারকে স্বাধীন বাংলায় টিকাইয়া রাখার জন্য অস্ত্র ও অর্থ সাহায্য প্রদান করিবে ইতিহাসের কাঠগড়ায় তাহাদিগকেও একদিন আসামী হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। তাই আমি দুনিয়ার সকল দেশের শান্তি, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রিয় জনগণ ও সরকারের নিকট আবেদন করি এহিয়া সরকারকে এই ধরনের মানবতা বিরোধী অস্ত্র ও অর্থ সাহায্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করুন ও প্রতিরোধ গড়িয়া তুলুন।

প্রসঙ্গতঃ আমি উল্লেখ করিতে চাই বাংলার স্বাধীনতার দাবীকে নস্যাৎ করিবার ষড়যন্ত্র যতই গভীর হউক না কেন তাহা ব্যর্থ হইবেই। রাজনৈতিক মীমাংসার নামে ধোকাবাজীকে জীবনের সকল সম্পদ হারাইয়া, নারীর ইজ্জত, ঘর-বাড়ী হারাইয়া, দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া এবং দশ লক্ষ অমূল্য প্রাণ দান করিয়া স্বাধীন বাংলার সংগ্রামী জনসাধারণ কিছুতেই গ্রহণ করিবে না। তাহাদের একমাত্র পণ হয় পূর্ণ স্বাধীনতা, না হয় মৃত্যু। মাঝখানে গোঁজামিলের কোন স্থান নেই। পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীকে নস্যাৎ করিয়া গোঁজামিল দিবার জন্য যে কোন দল এহিয়া খানের সহিত হাত মিলাইবে, তাহাদের অবস্থা গণবিরোধী মুসলিম লীগের চাইতেও বিকৃত হইবে। তাহাদের রাজনৈতিক মৃত্যু কেহ রোধ করিতে পারিবে না।

ভোমার, রংপুর — স্বাঃ আবদুল হামিদ খাঁ ভাসানী।
২৪।৬।১৯৭১

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীর অবদান

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ইতিহাসের পাতায় যাঁদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে, তাঁদের শীর্ষে ছিলেন এ দেশের ছাত্র এবং শিক্ষক, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, লেখক তথা বুদ্ধিজীবীগণ। '৪৮-এ রাষ্ট্র ভাষা সম্পর্কে মিঃ জিন্নাহ্‌র বিতর্কমূলক মন্তব্যের প্রতিবাদে জন্ম নিয়েছিল যে স্বাধিকার আন্দোলন, তারই পথ ধরে '৭১এর স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত প্রতিটি আন্দোলনে তাঁদের অবদান বাঙ্গালী জাতির কাছে থাকবে চির ভাস্বর।

স্পষ্টতঃই এ দেশের বুদ্ধিজীবীগণ তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে বাঙ্গালীকে তাঁদের স্বাধিকার ও জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন অনেকখানি। কিন্তু এ কাজ ছিল যথার্থই কঠিন। এজন্য তাঁদের অনেককেই সহ্য করতে হয়েছে বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন এবং জেল-জুলুম। বাজেয়াপ্ত হয়েছে তাঁদের একাধিক লেখা, বন্ধ হয়েছে প্রেস এবং প্রকাশনী। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত বিখ্যাত 'একুশে ফেব্রুয়ারী' সংকলন, খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াসের 'ভাসানী যখন ইউরোপে', সেকান্দর আবু জাফর সম্পাদিত মাসিক 'সমকাল'-এর একাধিক সংখ্যার বাজেয়াপ্তি, মরহুম তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিঞা) সম্পাদিত দৈনিক ইত্তেফাক-এর ওপর তৎকালীন উপনিবেশবাদী সরকারের বারবার আঘাত বাংলার বুদ্ধিজীবীগণের প্রতি স্বৈরাচারী সরকারের দমন-নীতির এমনি কয়েকটি জলন্ত উদাহরণ। এ ছাড়া মুনীর চৌধুরী, সাহিদুল হক, আলাউদ্দিন আল আজাদ, মরহুম তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিঞা), অজিত গুহ, শহীদ সাবের, শহিদুল্লাহ্ কায়সার প্রমুখকে প্রগতিশীল আন্দোলনে অংশ গ্রহণের অপরাধে কারান্তরালে থাকতে হয়েছে দীর্ঘদিন। বলাবাহুল্য এদেশের বুদ্ধিজীবীগণ একদিকে যেমন বাঙ্গালীকে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন, তেমনি তাঁরা বাঙ্গালী জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন শোষণের বিরুদ্ধে। মূলতঃ বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল স্বাধিকারের যে রক্তবীজ, তাকে একাত্তরের রণাঙ্গন পর্যন্ত দীর্ঘ পথে প্রাণ সঞ্চার করে দিনে দিনে মহীরুহে পরিণত করতে সহায়তা করেছেন আমাদের কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, দার্শনিক তথা বুদ্ধিজীবীগণ।

সাতচল্লিশ থেকে আটান্ন পর্যন্ত সময়ে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের আমলা এবং উপনিবেশবাদী নয়া শাসককুলের চক্রান্তের শিকার হয়েছিল যে গণতন্ত্র, তাকেই চূড়ান্তভাবে হত্যা করে আটান্নর অক্টোবরে মার্শাল ল' হাতে নিয়ে ক্ষমতায় এলেন সেনাপতি আয়ুব খান। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি এদেশের বুদ্ধিজীবীদের মস্তিষ্ক ধোলাইএর জন্য খুললেন বি, এন, আর, পাকিস্তান কাউন্সিল প্রভৃতি। তারপর দাউদ, আদমজী প্রভৃতি সাহিত্য পুরস্কার, প্রেসিডেন্ট পদক এবং খেতাবের মাধ্যমে কিনে নিতে চাইলেন এ দেশের বুদ্ধিজীবীদের মস্তিষ্ক। কিন্তু আয়ুব খানও শেষ রক্ষা করতে পারেননি। উনসত্তর-এর বাঙ্গালী জাতীয় চেতনা এবং গণ অভ্যুত্থানের মুখে তিনিও ভেসে গেলেন। তাঁর স্থলবর্তী হয়ে এলেন এহিয়া খান যুদ্ধের নাকারা নিয়ে। সত্তোর-এর নির্বাচিত সংখ্যা গরিষ্ঠ গণ প্রতিনিধি আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে আপোষ মীমাংসায় তিনি বিশ্বাসঘাতকতার মহড়া করলেন ১লা মার্চ, '৭১ থেকে ২৫শে মার্চ, '৭১ পর্যন্ত। এ সময়েও আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীগণ পিছিয়ে ছিলেন না। তাঁরা বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে গঠন করেছিলেন 'বিক্ষুব্ধ লেখক সমাজ'।

বস্তুত: বর্বর এহিয়ার আক্রমণের প্রথম লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী-সমাজ। বাঙ্গালীর স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রাম যখন তুঙ্গে, তখনই হানাদার বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছিল স্বাধিকার সংগ্রাম ও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের প্রাণসঞ্চারী এই বুদ্ধিজীবীদের ওপর। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়েই হানাদার বাহিনী ২৫শে মার্চ, '৭১ রাতের আঁধারে হত্যা করল আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন দার্শনিক ডক্টর গোবিন্দ দে সহ বাংলার কয়েকজন খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবীকে। ফলে ঐ কাল রাত্রির পর পরই আওয়ামী লীগ সহ অনেক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীর ন্যায় অনেক বুদ্ধিজীবীও দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। অনেকে আত্মগোপন করলেন দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন এলাকায়।

বাঙ্গালীর স্বাধীনতা যুদ্ধকে সর্বাত্মক সহযোগীতা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মুজিব নগর এবং ভারতের বিভিন্ন এলাকায় আশ্রয় গ্রহণকারী উদ্বাস্তু বুদ্ধিজীবীগণের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। একাত্তরের রণাঙ্গনের দ্বিতীয় ফ্রন্ট হিসেবে পরিচিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী কুশলীর সাথে কাঁধ মিলিয়ে তাঁরা বাংলার মানুষকে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, শক্তি দিয়েছেন, সাহস দিয়েছেন হানাদার বাহিনীর হাত থেকে আমাদের স্বদেশকে মুক্ত করার জন্য। দেশের অভ্যন্তরে এবং আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টির

প্রয়াসে তাঁরা মুজিব নগরে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁদের বলিষ্ঠ বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন।

প্রসঙ্গতঃ বাঙালী জাতীয়তাবাদের অন্যতম বলিষ্ঠ কবি সেকেন্দার আবু জাফর জুলাই, '৭১-এ ছেপেছিলেন এক গোপন ইস্তেহার। এই ইস্তাহারের মাধ্যমে চূড়ান্ত বিজয় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এটি তিন খণ্ডে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছিল। এ ছাড়াও এই বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত তাঁর বিখ্যাত সংগ্রামী গান 'জনতার সংগ্রাম চলবে, আমাদের সংগ্রাম চলবেই' রণাঙ্গন এবং অধিকৃত বাংলায় এক মহা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের স্বপক্ষে বিশ্ববাসীর সমর্থন আদায়ের উদ্দেশ্যে অস্থায়ী গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে বিচার-পতি আবু সাঈদ চৌধুরী ছুটে গেলেন ইউরোপের কয়েকটি দেশে। অপরদিকে উদ্বাস্তু বুদ্ধিজীবীগণের সমন্বয়ে ২১শে মে, '৭১ মুজিব নগরে গঠিত হ'ন 'বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি'। এই সমিতির কার্যাকরী সংসদের সদস্যগণ ছিলেন নিম্নরূপ:

সভাপতি: ডক্টর আজিজুর রহমান মল্লিক (তৎকালীন উপাচার্য্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়)।

কার্য্যকরী সভাপতি: জনাব কামরুজ্জামান (তৎকালীন প্রধান শিক্ষক, কিশোরী লাল জুবিলী হাই স্কুল, ঢাকা)।

কোষাধ্যক্ষ: ডক্টর সারওয়ার মোর্শেদ (তৎকালীন অধ্যক্ষ, ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

সাধারণ সম্পাদক: ডক্টর অজয় রায় (রিডার, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়)। মূলত, সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন ডক্টর আনিসুজ্জামান (রিডার, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়)। ডক্টর অজয় রায় মুজিব নগর পৌঁছার পর স্বেচ্ছায় তিনি এ দায়িত্ব তাঁর হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

এই সমিতির কার্য্যকরী সংসদের সদস্য ছিলেন সর্ব জনাব আনোয়ারুজ্জামান (তৎকালীন প্রধান শিক্ষক, লোহাগড়া হাই স্কুল, যশোর এবং গোলাম রশীদ)।

উল্লেখ্য যে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতিকে সার্বিক সহযোগীতা প্রদান করেছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠিত বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি। এই সমিতির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী। তিনি তাঁর সমিতির পক্ষ থেকে মোট ৩০০ টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির প্রাথমিক

ফাণ্ড খুলতে সাহায্য করেছিলেন। পরবর্তীকালে ভারত এবং বাংলাদেশের আরো অনেক প্রতিষ্ঠানের অর্থানুকূল্য পেয়েছিল এই সমিতি।

এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বাংলাদেশের এসব বাস্তুত্যাগী শিক্ষকগণ ভারত এবং ভারতের বাইরে অনেক বেশী বেতনের চাকুরীর আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সহযোগীতা প্রদানের বৃহত্ত স্বার্থে সে সব পদ বা আমন্ত্রণ গ্রহন করেননি। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির উল্লিখিত নিবেদিত কর্মিগণের সাথে স্মরণ করতে হয় চাঁদপুর ভোলানাথ মালটি-ল্যাটারেল স্কুলের অন্যতম শিক্ষক মিঃ নিত্য গোপাল শাহ্-এর নাম।

এই সমিতি গঠিত হওয়ার অল্পদিন পরই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির উদ্যোগে ডক্টর এ, আর, মল্লিক এবং ডক্টর আনিসুজ্জামানকে পাঠানো হয়েছিল উত্তর ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে তাঁদের নৈতিক সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহায়ক সমিতির পক্ষে এই দলে ছিলেন ডক্টর অনিরুদ্ধ রায়, অধ্যাপক অনিল সরকার, অধ্যাপক সৌরিন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং অধ্যাপক বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী। ডক্টর মল্লিকের নেতৃত্বে এই দল বহু সুধী জনের সংশয় ও দ্বিধা দূর করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁরা ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথেও দেখা করেছিলেন।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির দ্বিতীয় দলটি গিয়েছিলেন মধ্য ভারতে। এই দলে ছিলেন ডক্টর মযহারুল ইসলাম (তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)। ডক্টর অজয় রায় এবং অধ্যাপক শামসুল আলম সাঈদ। তাঁদের সহযোগীতা দান করেন পশ্চিম বঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। তৃতীয় দলটি যান দক্ষিণ ভারতে। এই দলে ছিলেন সৈয়দ আলী আহসান এবং ডক্টর মযহারুল ইসলাম।

'৭১-এর ঐ দুঃসময়ে শরণার্থী শিবিরের কিশোর কিশোরীদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল খুব বেশী। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির কার্য্যকরী সভাপতি জনাব কামরুজ্জামানের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হ'ন। শরণার্থী শিবিরেই এদের জন্য 'ওয়েলফেয়ার সেণ্টার' বা স্কুল খোলার কাজে লেগে গেলেন তিনি। মূল উদ্দেশ্য ছিল শরণার্থী শিশুরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে উশৃংখলতার পথে পা না বাড়ায়। তাঁর এ প্রচেষ্টায় মোট ৫৬টি স্কুল খোলা হয়েছিল, এবং এতে প্রায় সোয়া সাত শত শরণার্থী শিক্ষক নিয়োজিত হয়েছিলেন। এই প্রচেষ্টায় সার্বিক সহযোগীতা প্রদান করেছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি। তাছাড়া বঙ্গীয় প্রকাশ ও পুস্তক বিক্রেতা সভা, নেতাজী রিসার্স ব্যুরো, নয়া

প্রকাশ এবং ইন্টারন্যাশনাল রেসিকিউ কমিটি (কলিকাতা শাখা) প্রভৃতি সংস্থা ও এই প্রচেষ্টায় উদার ভাবে সহযোগীতা প্রদান করেছেন। জনাব কামরুজ্জামানের এ কাজে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির যে সব উদ্বাস্তু শিক্ষক একান্ত নিবিড়ভাবে সহযোগীতা প্রদান করেছেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক আবদুস সাত্তার, শ্রীযুক্তা হেনা দাস ও শ্রীমতি মালা চৌধুরী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির অন্যতম সদস্য অধ্যাপক প্রিয় দর্শন সেন শর্মার নিরলস সহযোগীতার কথাও এ সাথে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করতে হয়।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি বিশ্বের বুদ্ধিজীবীদের কাছে বাংলাদেশের সংগ্রামের কথা পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে 'বাংলাদেশ দ্য রিয়েলিটি' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। পুস্তিকাটির ব্যয়ভার বহন করেছিলেন পশ্চিম বঙ্গের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি।

ডক্টর এ, আর, মল্লিকের নেতৃত্বে প্রায় ৫০ জন শিক্ষক মিলে শরণার্থী পুনর্বাসন সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে একটি বাস্তব সম্মত পরিকল্পনা তৈরী করেছিলেন। এ ছাড়া এই সমিতির পক্ষে জাতিসংঘ, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং গ্রেট বৃটেনে ডক্টর মল্লিকের গণসংযোগ এবং বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃতি বিশ্লেষণ ও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির অন্যতম অবদান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জন্য একটি প্ল্যানিং সেল গঠন। প্রাথমিক পর্যায়ে এই সেল-এর সদস্য ছিলেন ডক্টর মুজাফ্ফর আহমদ চৌধুরী, ডক্টর সারওয়ার মোরশেদ, ডক্টর মোশাররফ হোসেন, ডক্টর আনিসুজ্জামান, ডক্টর অজয় রায় এবং অধ্যাপক সনৎ দত্ত।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ সংগ্রহ করে সাধ্য অনুযায়ী শরণার্থী শিক্ষকদের অর্থ সাহায্য প্রদান করেন। অবশ্য এ বাবত বেশীর ভাগ অর্থ সংগ্রহ করতে সহায়তা করেছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি। শরণার্থী শিক্ষকগণের জন্য অর্থ সংগ্রহে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে যাঁরা অত্যধিক পরিশ্রম করেছেন, তাঁদের মধ্যে ডক্টর অজয় রায়, শ্রী নিত্য গোপাল সাহা, জনাব আনোয়ারুজ্জামান ও শ্রীমতি নীহার সেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি একটি ইনফরমেশন ব্যাংক খুলেছিলেন।

কিন্তু মূলতঃ এই ব্যাংক এর কাজ করেছেন বাংলাদেশের শিক্ষকগণ (প্রথমে আমিন চৌধুরী এবং পরে ডক্টর অমিত মজুমদার)।

বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীগণ এমনিভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের স্বপক্ষে শুধুমাত্র অনুপ্রেরণাই যোগাননি, তাঁদের অনেকে সরাসরি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এমনি কয়েকজন শিক্ষক মুক্তিযোদ্ধার নাম নিম্নে সন্নিবেশ করলাম:

১। জনাব আতিয়ুর রহমান, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।
২। জনাব নূর মোহাম্মদ মিঞা—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৩। এস, এম, আনোয়ারুজ্জামান, প্রধান শিক্ষক, লোহাগড়া হাইস্কুল, যশোর।
৪। জনাব হেমায়েতউদ্দিন, আলফাডাঙ্গা, ফরিদপুর।
৫। ,, জিল্লুর রহমান, কামারগ্রাম, ফরিদপুর।
৬। ,, নুরুল আরেফীন, ফরিদপুর।
৭। ,, আবদুল মালেক, ফরিদপুর।
৮। ,, আমিরুজ্জামান, প্রধান শিক্ষক, ইতনাই হাই স্কুল, যশোর।
৯। ,, হীরু মাষ্টার, শিক্ষক, ইতনাই হাই স্কুল, যশোর।
১০। ,, লুৎফর রহমান, কোলা, যশোর।
১১। ,, শাহজাহান মিঞা, খুলনা।
১২। কাজী আবদুল হাফিজ, প্রধান শিক্ষক, তেরখাদা হাই স্কুল, খুলনা।
১৩। জনাব বুরহানউদ্দিন, শিক্ষক, তেরখাদা হাই স্কুল, খুলনা।
১৪। ,, আবদুস সাত্তার, নোয়াপাড়া হাই স্কুল, যশোর।
১৫। ,, আবদুস সালাম, কালিয়া হাই স্কুল, যশোর।
১৬। ,, মোশাররফ হোসেন, গ্রাজুয়েট হাই স্কুল, ঢাকা।
১৭। ,, ওয়াহিদুর রহমান, অধ্যক্ষ, লোহাগড়া কলেজ, যশোর।
১৮। ,, আবু সুফিয়ান, অধ্যাপক, দৌলতপুর কলেজ, খুলনা।
১৯। ,, জনাব আবুল কালাম আজাদ, তৎকালীন সভাপতি, প্রাইমারী শিক্ষক সমিতি (বাংলাদেশ)।
২০। ,, আয়ুবুর রহমান, অধ্যাপক, রামদিয়া কলেজ, ফরিদপুর।
২১। মিঃ দেবদাস ঘোষাল, জুবিলী হাই স্কুল, ঢাকা।
২২। মিঃ অমল ব্যানার্জি, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা।
২৩। জনাব মোসলেমউদ্দিন—চুয়াডাঙ্গা হাই স্কুল।

আগেই উল্লেখ করেছি বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতিকে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগীতা প্রদান করেছেন কলিকাতা বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি। এই দুই সমিতির উদ্যোগে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিনে প্রকাশিত হয়েছিল বাংলাদেশের গণহত্যা সম্বন্ধে একটি সচিত্র পুস্তিকা "Bangladesh the Truth". পুস্তিকাটির কপি পৃথিবীর সম্ভাব্য সব কয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হয়েছিল। এই পুস্তিকার সম্পাদনা করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর বংগেন্দু গাঙ্গুলী এবং ডক্টর (শ্রীমতি) মীরা গাঙ্গুলী। প্রায় একই সময় অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রেস কোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান) প্রদত্ত ৭ই মার্চ, '৭১-এর ভাষণ সংগ্রহ করে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। আওয়ামী লীগের ৬ দফা সংযোজন করেও তিনি অন্য আর একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। শরণার্থী শিক্ষকগণের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী অবলম্বনে 'বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ' নামে একটি সংকলন সম্পাদনা করেছিলেন অধ্যাপক যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আসাদুজ্জামান রচিত 'মুক্তি যুদ্ধে বাংলাদেশ', ডক্টর দুলাল চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশের প্রতি নৈতিক সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে বাংলা ভাষায় লিখিত পুস্তক-পুস্তিকা ছাড়াও যে কয়টি ইংরেজী পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল তার একটি তালিকা নিম্নে সন্নিবেশিত হ'ল:

1. Conflict in East Pakistan :
   Background & Prospect by Professor Edward S. Mason, Robert Dorffman & Stephen, A Marzlin.
2. Bangladesh Through Lens :
   An Album containing photos of the war-torn Bangladesh.
3. Bangladesh : Throw of a New Life :
   Edited by Doctor Bangendu Ganguly and Doctor (Mrs.) Meera Ganguly.
4. Pakistan and Bengali Culture :
   by Osman Zaman (University of Chittagong)
5. Bleeding Bangladesh : A document of valuable photos.
   Edited by Mrs. Shipra Aditya.

উল্লিখিত সব কয়টি ইংরেজী পুস্তক-পুস্তিকা পৃথিবীর সকল বিশ্ববিদ্যালয় এবং খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবীগণের কাছে পাঠানো হয়েছিল। এ ছাড়া কলিকাতাস্থ বাংলাদেশ মিশনও ভিন্ন ভাবে এসব পুস্তক-পুস্তিকা পৃথিবীর বিভিন্ন কূটনৈতিক

মিশনে পাঠিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে প্রকাশিত এসব পুস্তক পুস্তিকা বাংলাদেশের অনুকূলে জনমত সৃষ্টির ব্যাপারে এক অনন্য ভূমিকা পালন করেছে।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ছাড়াও জুন, '৭১-এর মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশ এর উদ্বাস্তু শিক্ষক, বৈজ্ঞানিক, কবি, চারু ও কারু শিল্পী, লেখক, সাংবাদিক, নাট্যকার ও অভিনেতা সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল 'দি বাংলাদেশ লিবারেশন কাউন্সিল অব দি ইনটেলিজেন্সীয়া'। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির ন্যায় এই কাউন্সিলেরও উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সমর্থনে সহানুভূতিশীল বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এ ছাড়া পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর যুদ্ধাপরাধের প্রামাণ্য চিত্র তুলে ধরা, স্বাধীনতা যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণে সহযোগীতা প্রদান করা এবং যুদ্ধের কাজে নিয়োজিত উক্ত লিবারেশন কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দের থাকা-খাওয়ার সংস্থান করাও ছিল এই কাউন্সিলের কর্মসূচীর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

উক্ত 'দি বাংলাদেশ লিবারেশন কাউন্সিল অব ইনটেলিজেন্সীয়া'র পক্ষ থেকে বিশ্ববাসীর কাছে প্রেরিত এমনি একটি আবেদন পত্রের অনুলিপি এখানে উপস্থাপন করলাম। উক্ত কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দের নামও এই আবেদনপত্রের শেষ পৃষ্ঠায় পরিদৃষ্ট।

AN APPEAL FROM THE BANGLADESH LIBERATION COUNCIL OF THE INTELLIGENTSIA

The Bangladesh Liberation Council of the Intelligentsia is an organization of the displaced teachers, scientists, poets, painters, writers, journalists and actors from Bangladesh who managed to escape the wrath of the West Pakistani army, which is responsible for one of history's blackest mass murders and purges.

The object of the Council is to support the war efforts of the Government of the People's Republic of Bangladesh to press for the attention of the World our case for independence, to document the crimes of West Pakistani army, to do educational work among our freedom fighters, and to find for, our members the means of bare subsistence while they work for the liberation movement.

The community from which our membership is drawn has been a special target of the military action that started on the night of March 25, 1971. A measure of the army's hostility to the intellectual community is its gunning down of twenty University teachers in cold blood before their wives and children. Their sins are their support for democratic and secular values, their opposition to dictatorship, their insistence on the linguistic and cultural individuality of the Bengalis, their articulation of the political, economic and philosophical basis of the Bangladesh Movement. The army sought to liquidate the intellectuals as a class along with the political leaders with a view to silencing the demand for greater autonomy for the Bengalis.

The demaud for autonomy arose from the wrongs and deprivation suffered for 23 years by Bengalis in Pakistan who formed its majority but had a very modest share in its prosperity. Their representation in the armed forces and higher echelon's of the civil service of Pakistan was negligible, and most of their foreign exchange earnings from jute was used to build industries in West Pakistan while Bangladesh served as a protected market for West Pakistan products. Bengalis wished to put an end to this colonial pattern of exploitation and demanded the right to control their economic resources for their own development. This threatened the privileges of the ruling capitalist-bureaucratic-military clique based in West Pakistan, whose 22 rich families controlled 80 % of national wealth.

When the general elections of the last December conceded under popular pressure, showed that the Bengali demand was almost unanimous, President Yahya Khan entered into hypocritical negotiations with Sheikh Mujibur Rahman, the Leader of the people of Bangladesh, whose party, the Awami League had secured 167 of the 169 National Assembly seats and a clear majority in the Assembly, for a political settlement. Under cover of these talks, which were prolonged, Yahya Khan however gave finishing touches to a two year old plot of putting down the constitutional demand with brute force. Yahya's medieval hordes in modern arms cracked down upon the unsuspecting people of Bangladesh around the midnight of March 25. The massacres and destruction that followed have no parllel in history.

Yahya's perfidy is aimed at denying the democratic process, that is, the right of the majority and perpetuation of the colonial stranglehold on Bangladesh. In furtherance of this aim, Islamabad has embarked upon a carefully thought out programme of genocide as a method of settling the problem. Its army has been killing unarmed Bengalis, women, children, the infirm and the old, with psychotic fury. It has so far killed a million and forced over seven million to flee to India and Burma to escape its brutalities. It has laid waste entire city blocks and wiped out entire villages. One of its favourite techniques of terror is to set fire to a village and then sadistically mow down the fleeing men and abduct the girls and subject them to dishonour and torture. In short, the West Pakistani army is carrying on a mission of murder, rape and looting on a scale that would have shamed an Attila or a Hitler.

The planned extermination of the people of Bangladesh is in progress. We believe that the intellectuals of the world have a duty towards humanity and, therefore, towards Bangladesh where humanity is in agony.

We appeal to intellectuals around the World :

1) to organize movements in their own countries to stop genocide in Bangladesh ;
2) to raise a voice of protest against Pakistan army's suppression of human rights and to move the International Commission of Jurists and the United Nations to take up the Bangladesh issue ;
3) to support our struggle against dictatorship and colonialism which has now been transformed into a struggle for complete independence ;
4) to create pressure upon their own governments to accord recognition to the Government of the People's Republic of Bangladesh ;
5) to create pressure upon Pakistan military authority to release Sheikh Mujibur Rahman and other political prisoners ;
6) to give financial support to our cause

President

Dr. A. R. Mallick---Vice-Chancellor, Chittagong University

Vice-Presidents

Dr. K. S. Murshid---Head, Department of English, Dacca University

Prof. Syed Ali Ahsan---Head, Department of Bengali, Chittagong University

Quamrul Hassan---Painter

Rahesh Dasgupta---Journalist

General Secretary

Zahir Raihan---Novelist and Film Director

Joint Secretary

Dr. M. Bilayet Hossain---Reader in Physics, Dacca University

Executive Secretaries

Hassan Imam---Actor
Sadeq Khan---Art Critic
Moudud Ahmed---Barrister
Dr. Motilal Paul---Economist
Brojen Das---International Sportsman
Wahidul Huq---Musician and Journalist
Alamgir Kabir---Journalist and Critic
Anupam Sen---Sociologist
Faiz Ahmed---Journalist
M. A. Khair---Film-maker
Kamal Lohani---Journalist
MusfafaMonwar---Painter and TV Producer

মুজিব নগরে গঠিত অন্যান্য বিভিন্ন সংগঠনও এমন বহু আবেদন নিবেদন এবং পুস্তক-পুস্তিকার মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল বিশ্বের সমর্থন লাভের জন্য কাজ করেছেন। বিশ্বের শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত বাংলাদেশ শ্রমিক লীগের এমনি একটি আবেদন পত্র পরবর্তী পৃষ্ঠায় তুলে দিলাম:

AN APPEAL TO THE WORKERS OF ALL NATIONS OF THE WORLD

The war for liberation of Bangladesh is going on. In this uneven war, on one side is the invading armed hordes of Yahya Khan killing, looting and plundering innocent and unarmed people of Bangladesh for the sake of perpetuating colonial hold on the 75 million people and on the other side is the unarmed people fighting and dying for justice and liberation.

The people's struggle will continue till the goal of achieving full freedom will come true.

In the following lines, the special position of the working class of Bangladesh in relation to the liberation movement is being narrated for enlightening the fellow brethren all over the world :

There are four million industrial workers in Bangladesh. These include workers in industries, communication sectors and other allied fields.

The working class people were the worst victims of the colonial rule perpetuated on Bangladesh by the rulling coterie of West Pakistan During the last 23 years, the Jagirdars-Landlords, industrial monopolists and exploiters of West Pakistan, with the active and willing help of the so-called Field-marshals, Generals and Air-marshals of the Armed Forces have been systematically exploiting the people of Bangladesh. The economic exploitation was accompanied with continuous and villainous attempts to destroy the distinct and long-cherished political and socio-cultural ideals of the Bengalees. This was done in order to break the backbone of our people, so that, they could never consolidate themselves into a homogeneous entity to assert their rights for economic, political and cultural emancipation. The exploitation and repression, in all its forms and features, gradually took a classic form of colonial rule. At this stage, in 1966, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman formulated and declared his historic 6 point programme to constructively combat the imminent disintegration of the people of Bangladesh. The Six-point programme was a comprehensive political formula to ensure economic, political

and cultural emancipation for the people of Bangladesh. The working class being the most conscious section among the masses, immediately saw in this programme a definite promise for economic emancipation and under the leadership of Sk. Mujib, came out in the forefront of the subsequent mass movements. As a matter of fact, in creating the overwhelming mass upsurge in favour of the 6 point programme in the late sixties in the face of extreme repression and intimidation let loose by the Ayub regime, in toppling his rule and freeing Sk. Mujib from the Agartala conspiracy case and later, in giving the Awami League a historic victory in the last general election, the workers and students of Bangladesh played the most decisive role.

Then again it was the workers and students who formed the hard core of the non-cooperation movement launched by the Sheikh for fighting against the Bhutto-Yahya conspiracy. And finally, when the armed might of Yahya Khan was let loose on the unsuspecting and the unarmed people of Bangladesh to put at naught their democratic rights, the war of liberation began. Here also, as in other previous occasions, the workers were the first to join the war of liberation as fighters and volunteers.

The carnage, the ruthless killings, unprecedented mass massacres perpetuated on our people to-day by Yahya Khan and his army have not been able to break the will and determination of the workers of Bangladesh.

About one lakh members of the working class in Bangladesh have been killed so far. Residential colonies of the industrial workers throughout the length and breadth of Bangladesh have been systematically gutted down. In Adamjee Jute Mills premises the invaders killed hundreds of workers in a mosque. The West Pakistani Army are now singling out leading workers and their families, killing them at sight, looting their meagre possessions upto the last grain of rice. Those who have escaped the initial onslaught of tanks and mortars are now fighting a slow and painful death due to lack of shelter and food.

In the face of all these odds and atrocities the workers are still continuing their struggle. The non-cooperation call given by the Bangabandhu is being continued in toto by our working class people. For the industrial and communication workers, non-co-operation is

an effective weapon to destroy the economic base of the invaders. The same weapon is, however, depriving the poor workers of their work and wages which they could have easily earned by agreeing to co-operate with Yahya. It is thus very clear indeed that the weapon of non-co-operation designed to weaken the enemy will eventually destroy the users of the weapon i.e. the 4 million workers of Bangladesh, if during the fighting period they are not sustained by help from their brethren all over the world.

We, therefore, appeal, on behalf of the fighting workers of Bangladesh, and in the name of humanity and justice to the working class of all nations of the world to come to our aid at this most crucial and fateful juncture of our struggle for freedom and economic emancipation.

1. We seek economic and material help of varied kinds.

2. We hope that the working people all over the world, through their respective organisations, will chalk-out an effective programme and launch immediate movements so that their Governments give recognition to the sovereign state of Bangladesh, with Bangabandhu Sk. Mujibur Rahman as head of the State.

3. We request our fellow workers of the world to create economic blockade against the Government of Pakistan. The international sea-mens fraternity may please refuge to work in Pakistani ship or other ships going to or coming from West Pakistan.

4. We will also request our fellow workers to start appropriate movements so that countries all over the world forthwith stop giving any aid, economic or military, to the Government of Pakistan.

5. We would request you to take initiative in forming an International Workers Co-ordination Forum for giving effective and long term assistance to the fighting people of Bangladesh.

We would request our fellow brethren to consider that time is very important for us and a moments delay in helping us today may cause us years of sufferings and subjugation. JAI BANGLA

Yours in all
Struggles for Justice and Freedom

THE WORKERS OF THE DEMOCRATIC
REPUBLIC OF BANGLADESH

SD/Md. Shah Jahan
Acting President
National Workers' League and
Member, Bangladesh Central
Workers' Action Committee.

SD/Abdul Mannan
General Secretary
National Workers' League and
Convenor, Bangladesh Central
Workers' Action Committee,
Mujibnagar, Bangladesh.

পুনরুল্লেখ করেই বলছি, মুজিব নগর এবং ভারতে অবস্থানরত বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীগণ এদেশের অন্যান্য দেশ প্রেমিক সংগঠনের পাশাপাশি স্বাধীনতা যুদ্ধের সমর্থনে জনমত সৃষ্টির জন্য সর্বাত্মক ভাবে কাজ করেছেন। তাঁদের অনেকে যুদ্ধের হাতিয়ার তুলে নিয়েছিলেন দেশকে শত্রুমুক্ত করার মহান শপথে। আবার অনেকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে মূল্যবান অবদান রেখেছেন। এমনি যেসব বুদ্ধিজীবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের বিবরণী এই গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

মুজিব নগর এবং ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীগণ যখন আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে এভাবে অবদান রেখেছিলেন, তখন অধিকৃত বাংলাদেশে আত্মগোপনকারী বুদ্ধিজীবীগণও বসেছিলেন না। তাঁরাও কাজ করছেন স্বাধীনতার জন্য। এমনি বুদ্ধিজীবীগণের মধ্যে ছিলেন কবি শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, অধ্যাপক আনোয়ার পাশা, কবি আল মাহমুদ প্রমুখ। কবি শামসুর রাহমানের কবিতা গুচ্ছ 'বন্দী শিবির থেকে' মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এমনি উল্লেখযোগ্য অন্য এক রচনা ছিল।

অধ্যাপক আনোয়ার পাশা রচিত 'রাইফেল, রুটি, আওরাত'। এটিও মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

আগেই উল্লেখ করেছি, '৪৮ থেকে '৭১ পর্যন্ত পূর্ব বাংলার প্রতিটি আন্দোলনের অগ্রভাগে ছিলেন এই অঞ্চলের ছাত্র এবং শিক্ষক সমাজ। '৭১-এ যে ক'জন ছাত্র নেতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথা পূর্ব বাংলার ছাত্র-জনতাকে দিয়েছিলেন সংগ্রামের পথ নির্দেশ এবং নেতৃত্ব, তাঁদের পুরোভাগে ছিলেন তৎকালীন স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি এবং বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি জনাব নূরে আলম সিদ্দিকী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি জনাব আ, স, ম, আবদুর রব, বাংলাদেশ ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শাহ্‌জাহান সিরাজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুল কুদ্দুস মাখন, প্রাক্তন ছাত্র নেতা জনাব সিরাজুল আলম খান এবং '৭০-এর নির্বাচিত তরুণ এম, এন, এ জনাব তোফায়েল আহমদ প্রমুখ। জনাব তোফায়েল আহমদই ঢাকার রেস কোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহ্‌রা-ওয়ার্দী উদ্যান) ১৯৬৯ সালে দু'লক্ষ জনতার সামনে শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু নামে ঘোষণা করেছিলেন। ২রা মার্চ, '৭১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের ঐতিহাসিক ছাত্র সভাতেই সবুজ পটভূমিকার ওপর লাল বৃত্তের মাঝে সোনার বাংলার সোনালী মানচিত্র খচিত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পতাকা উত্তোলন করেন জনাব আ, স, ম, আবদুর রব। ৩রা মার্চ, '৭১ অপরাহ্নে পল্টন ময়দানের জন সভায় স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা পত্র প্রচার করেন জনাব শাহ্‌জাহান সিরাজ।

মুজিব নগরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যে ক'জন সংগ্রামী ছাত্র নেতা বাংলাদেশের জনগণের উদ্দেশ্যে মূল্যবান ভাষণ রেখেছিলেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন সর্বজনাব নূরে আলম সিদ্দিকী, শাহ্‌জাহান সিরাজ এবং এম, এ, রেজা প্রমুখ।

এ দেশের স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার ছাত্র স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মুক্তিবাহিনী এবং এর অংগ সংগঠন মুজিব বাহিনীতে যোগ দিয়ে মাতৃভূমিকে হানাদার মুক্ত করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। শহীদ এবং পঙ্গু হয়েছেন অনেক ছাত্র। তাঁদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন আনসার, মুজাহিদ সহ শত শত কুলি-মজুর, নায়ের মাঝি, মিলকারখানার শ্রমিক, কৃষক তনয়, ব্যবসায়ী পিতার আদরের দুলাল (যারা স্কুল কলেজে পাঠ-রত ছিলেন না) এবং দেশপ্রেমিক আপামর জনতা। তাঁদের অনেকে প্রাণ দিয়েছেন এ দেশের স্বাধীনতার জন্য,

অনেকে হয়ে গেছেন পঙ্গু চিরদিনের জন্য, অনেকে আজো আরোগ্য লাভের আশায় পঙ্গুত্ব নিয়ে পড়ে আছেন হাসপাতালে।

এ দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর ভূমিকাকেও উপেক্ষা করা যায় না। রণাঙ্গনে অনেক মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা সংস্থা এগিয়ে এসেছিলেন আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা এবং শুশ্রূষার জন্য। শত্রু কবলিত বাংলাদেশে হাজার হাজার মা-বোনকে হারাতে হয়েছে তাঁদের সম্ভ্রম; একই সাথে অনেকে দিয়েছেন তাঁদের মূল্যবান জীবন।

যথার্থই কৃতজ্ঞ জাতি হিসেবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এসব নিবেদিত প্রাণ সন্তানদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন আমাদের সরকারের জাতীয় দায়িত্ব। এঁদের ত্যাগ এবং বীরত্ব গাঁথা লিপিবদ্ধ করা উচিত এদেশের ভবিষ্যত নাগরিকদের জন্য। অন্যথায় ভবিষ্যতে প্রয়োজনে অন্য কোনও যুদ্ধ পরিস্থিতি থেকে এদেশকে রক্ষা করার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে যথার্থ দেশপ্রেমিক যোদ্ধা এগিয়ে আসতে চাইবেন না।

২৫শে মার্চ, '৭১ রাতে বাংলার বুদ্ধিজীবী হত্যার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল যে গণহত্যা, হানাদারবাহিনী তারই চূড়ান্ত শেষ দিনটি বেছে নিয়েছিল ১৪ই ডিসেম্বর, '৭১। এইদিন তারা বাংলার শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী সন্তানদের যে নির্মম ভাবে হত্যা করেছে, তার উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কমই খুঁজে পাওয়া যাবে। ২৫শে মার্চ '৭১ থেকে ১৪ই ডিসেম্বর, '৭১ পর্যন্ত কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় সহ দেশের বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সে সকল বুদ্ধিজীবী, কলা-কুশলী, বেসরকারী সংস্থার মালিক, নিবেদিত সমাজসেবী প্রমুখ হানাদার বাহিনীর নির্মম হত্যার শিকার হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ডক্টর গোবিন্দ দেব, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক সন্তোষ ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, শহিদুল্লাহ্ কায়সার (সাংবাদিক-সাহিত্যিক), সিরাজউদ্দিন হোসেন (সাংবাদিক), ডঃ মনিরুজ্জামান, অধ্যাপক আনোয়ার পাশা, ডঃ আলীম চৌধুরী, ডাঃ ফজলে রাব্বি, ডক্টর আমিনুদ্দিন, ডাঃ মুরতাজা (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক), খোন্দকার আবু তালেব, এডভোকেট বীরেন্দ্রনাথ সরকার (রাজশাহী), অধ্যাপক রশীদুল হাসান, ডক্টর হাবিবুর রহমান (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক সুখরঞ্জন সমাদ্দার (রাজশাহী), এ, এন, এম গোলাম মোস্তফা (লাড়ু ভাই), নাজমুল হক (সাংবাদিক), অধ্যাপক মীর আবদুল কাইয়ুম (রাজশাহী), সিরাজুল হক খান, ডঃ মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ, ডঃ মুকতাদির, ফয়জুল মহী, ডঃ সাদেক, আবুল খায়ের, সাইদুল হাসান, নিজামুদ্দিন আহমদ,

আবুল বাশার, আবু সাঈদ (সাংবাদিক, রাজশাহী), সুরেশ পাণ্ডে (সমাজ সেবী, রাজশাহী) এবং অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন আহমদ প্রমুখ।

মীর্জাপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রখ্যাত দানবীর এবং সমাজসেবী আর, পি, সাহা, সাধনা ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সাধক অধ্যক্ষ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ এবং চট্টগ্রাম কুণ্ডেশ্বরী ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ নূতন চন্দ্র সিংহ ও এমনি হত্যার শিকার হয়েছিলেন।

যেসব বেতার কর্মী হানাদার বাহিনীর নিষ্ঠুর আঘাতে প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সর্বজনাব বজলুল হালিম চৌধুরী, (তৎকালীন আঞ্চলিক প্রকৌশলী, ঢাকা বেতার), আবদুল কাহ্হার চৌধুরী (তৎকালীন সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক, চট্টগ্রাম বেতার), মোহসীন আলী, (তৎকালীন বেতার প্রকৌশলী, রাজশাহী বেতার), মহিউদ্দিন হায়দার (তৎকালীন অনুষ্ঠান সংগঠক, রংপুর বেতার), হাবিবুর রহমান (তৎকালীন নিজস্ব শিল্পী, রাজশাহী বেতার) এবং আবদুল মতিন (তৎকালীন টাইপিষ্ট, রাজশাহী বেতার) প্রমুখ।

বাঙ্গালীর স্বাধীনতা আদায়ের লক্ষ্যে নেপথ্যে অন্যতম যে বীর সৈনিক নিজের জীবন পণ করেছিলেন, তিনি ছিলেন তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার এক নম্বর আসামী লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা চলাকালে পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এক নম্বর আসামী হিসেবে ঘোষণা করার পর নতুন ভাবে লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন চিহ্নিত হয়েছিলেন দুই নম্বর আসামী হিসেবে।

লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন বাহ্যতঃ "লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন"-এর প্রবক্তা হিসেবে কাজ করলেও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল "স্বাধীন বাংলা"। এরই লক্ষ্যে তিনি কাজ করেছেন মৃত্যুর শেষ দিন পর্য্যন্ত। ১৯৭১ সালের মার্চ প্রথম সপ্তাহে অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন সময়ে বঙ্গবন্ধুর বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে তিনি বঙ্গবন্ধুর সাথে এক জরুরী আলোচনায়ও বসেছিলেন। অবশ্য সে আলোচনার ফলাফল অজ্ঞাত থেকে যায়।

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রবক্তা এই বীর দেশপ্রেমিককে হানাদার বাহিনী ২৬শে মার্চ, '৭১ ভোর বেলায় তাঁর বাসগৃহের বারান্দায় টেনে নিয়ে পরপর পাঁচটি গুলির আঘাতে নির্মম ভাবে হত্যা করে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও যে সব নিবেদিত বুদ্ধিজীবী হানাদার বাহিনীর দোসরদের হাতে নির্মম হত্যার শিকার হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক এবং ঔপন্যাসিক জহির রায়হান, বিশিষ্ট নাট্য শিল্পী এবং চলচ্চিত্রাভিনেতা রাজু আহমদ প্রমুখ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সমর ব্যক্তিত্ব

যুদ্ধকালীন বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী সহ একাত্তরের রণাঙ্গনের ১১টি সেক্টর এবং ৩টি ব্রিগেড-এর অধিনায়কগণই শুধু নন, বিভিন্ন সেক্টরে যাঁরা অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করেছেন, তাঁরা সবাই আমাদের শ্রদ্ধেয়। স্ব স্ব পরিমণ্ডলে তাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন এক একজন সমর ব্যক্তিত্ব। ইচ্ছা ছিল জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী এবং লেঃ জেনারেল জিয়াউর রহমান সহ প্রত্যেকটি সেক্টরের কমাণ্ডার-গণের সাক্ষাৎকার, স্মৃতিচারণ বা অন্যান্য পূর্ণ তথ্য এই গ্রন্থে সংযোজন করব। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব হয়নি বলে আমি দুঃখিত। উদাহরণস্বরূপ জেনারেল ওসমানী সাহেবের কাছে সাক্ষাৎকার চেয়ে বেশ কিছুদিন আমি অপেক্ষা করে-ছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি সময় দিতে পারেননি। একাত্তরের রণাঙ্গনের অন্যতম অধিনায়ক লেঃ জেনারেল জিয়াউর রহমানের (প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি) সাক্ষাৎকার নেয়ার প্রস্তুতির আগেই তিনি আমাদের মাঝ থেকে চলে গেলেন একান্ত শোচনীয় ভাবে। রণাঙ্গনের আরো পাঁচজন অধিনায়ক আমাদের মাঝ থেকে এমনি হারিয়ে গেলেন সম্পূর্ণ এক দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতিতে। কাজেই রণাঙ্গনের অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য থেকে জাতি বঞ্চিত থেকে গেল চিরদিনের জন্য।

আলোচ্য অধ্যায়ে জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী প্রসঙ্গে কিছু তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এর পরই সংযোজন করেছি রণাঙ্গনের দুই অধিনায়ক মেজর জেনারেল কে. এম, শফিউল্লাহ্ বীর উত্তম এবং লেঃ জেনারেল মীর শওকত আলী বীর উত্তম-এর বিস্তারিত সাক্ষাৎকার। আগামীতে জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী এবং লেঃ জেনারেল জিয়াউর রহমান সহ রণাঙ্গনের অন্যান্য সেক্টরের অধিনায়কগণের বিস্তারিত তথ্য সমন্বয়ে 'রণাঙ্গনে সশস্ত্র বাহিনী' শিরোনামে পৃথক একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রকাশের আশা রাখছি।

জেনারেল আতাউল গণি ওসমান

জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী ছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেল। '৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধের আগেই তিনি তদানীন্তন পাকি-স্তান সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। অতঃপর তিনি রাজনীতিতে যোগদান করেছিলেন এবং '৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে তৎকালীন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

আগেই উল্লেখ করেছি মুজিব নগরে সদ্য গঠিত অস্থায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্ণেল (পরে জেনারেল) আতাউল গণি ওসমানীকে ১৭ই এপ্রিল, '৭১ আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ-এর সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ প্রদানের কথা ঘোষণা করেছিলেন। তবে এই আনুষ্ঠানিক নিয়োগের আগে থেকেই তিনি মুক্তি বাহিনীকে সংগঠনের কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। ঐ সময়ে কর্ণেল ওসমানীর ন্যায় একজন কীর্তিমান উর্দ্ধতন সামরিক অফিসারকে রণাঙ্গনে পাওয়া বাংলাদেশের মুক্তি বাহিনী তথা বাঙ্গালী জাতির জন্য ছিল অত্যন্ত গৌরবের কথা। এ সম্পর্কে লেঃ জেনারেল মীর শওকত আলী বলেন: 'জেনারেল ওসমানী ভারতীয় জেনারেলগণের সমকক্ষ ছিলেন, এবং কারো কারো সিনিয়ার ছিলেন। জেনারেল অরোরা যিনি ইষ্টার্ণ কমাণ্ডের (ভারতীয় বাহিনী) সি, ইন, সি ছিলেন, তাঁর চাইতেও জেনারেল ওসমানী সিনিয়ার ছিলেন এবং খুব সম্ভবতঃ জেনারেল ম্যানেক শ (ভারতীয় বাহিনীর তৎ-কালীন প্রধান সেনাপতি) থেকে জুনিয়ার ছিলেন। তিনি যদি না থাকতেন, আমার মনে হয় না, ভারতীয় সেনাবাহিনীর জেনারেলগণ আমাদের যে ভাবে সাহায্য করেছেন, সে ভাবে সাহায্য করতেন। কারণ আমরা অনেক জুনিয়ার ছিলাম। আমরা ছিলাম মেজর, আর তাঁরা ছিলেন জেনারেল এবং লেঃ জেনারেল''।

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীকে (মুক্তিবাহিনী) একটি পরিপূর্ণ প্রশাসনিক কাঠা-মোর মধ্যে সুশৃংখলভাবে গঠন করা ছিল সদ্য গঠিত অস্থায়ী বাংলাদেশ সর-কারের কাছে এক বিরাট চেলেঞ্জ স্বরূপ। কিন্তু জেনারেল ওসমানী এই চেলেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন। ঐ সময়েই তাঁর বয়স পঞ্চান্ন উত্তীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু বয়স তাঁকে হার মানাতে পারেনি। প্রায়ই তিনি রণাঙ্গনের সম্মুখভাগ পর্যন্ত চলে যেতেন স্বচক্ষে যুদ্ধের অগ্রগতি দেখার জন্য। এ ছাড়াও রণাঙ্গনের কঠোর নিয়মানুবর্তিতা থেকে মুহূর্তের জন্যও বিচ্যুত হতে তাঁকে দেখা যায়নি। দেখা গিয়েছে যে কোনও বিশৃংখলাকে তিনি কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে কখনো দ্বিধা বোধ করেননি।

জেনারেল ওসমানী বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান হিসেবে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ২৫শে সেপ্টেম্বর '৭১ জাতির উদ্দেশ্যে এক তাৎপর্যপূর্ণ ভাষণ প্রচার করেছিলেন। জেনারেলের সেদিনের ঐতিহাসিক ভাষণের পূর্ণ বিবরণী এখানে তুলে দিলাম :

TEXT OF RADIO TALK
OF
Colonel M. A. G. OSMANY, p.s.c.—M. N. A., Commander-in-Chief of Bangladesh (Mukti Bahini).

My revered countrymen, at home and abroad,

To-day we complete 6 months of the war imposed on us. As Commander-in-Chief of the Bangladesh Forces (MUKTI BAHINI) may I convey to you the greetings of the forces composed of your brave sons. These forces owe their allegiance to the people of Bangladesh through Govt. of the People's Republic of Bangladesh, composed of your elected representatives on whom the country expressly reposed their trust and confidence in the General Election of the 7th December 1970, held on the basis of Adult Franchise. You are the masters of the country and we are engaged in your service in defending your human rights and sovereignty.

The threat to your human rights and sovereignty emanates from the vile motive of the military junta in West Pakistan to occupy Bangladesh as a colony in flagrant violation of the United Nation's Charter of Human Rights and on Genocide and violation of the concept of Pakistan explicitly enunciated in the Lahore Resolution of the 23rd March 1940 which envisaged (Two) Independent and Sovereign States, one in the West and one in the East of the Sub-continent. This concept was endorsed by the people in the General Election of 1946 and was never amended. The people of Bangladesh have been consistently striving constitutionally to free themselves from the evils of colonialism, practised with the support of mercenary forces drawn from West Pakistan primarily West Punjab. *Eventually, at the first ever General Election held in Pakistan, on the 7th December, 1970,

*বাক্যটি অসংলগ্ন মনে হচ্ছে। সম্ভবতঃ তিনি বলতে চেয়েছিলেন ১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ তৎকালীন পূর্ব বাংলায় মোট ৯৯% সিট এবং পাকিস্তানে মোট ৮০% ভোট পেয়েছিলেন।

under the bayonets of General Yahya's Martial Law administration, the people of Bangladesh gave 99% of the seats from Bangladesh and 80% of the votes to Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and his party, the Awami League, which stood for freeing Bangladesh from colonialism and freeing Pakistan from inequities and for establishing democracy and rule of law.

The Awami League also secured absolute majority of the seats in the Parliament. Our freedom-loving people maintained absolute peace and the election was universally hailed as very fairly and freely held. But the results came as a surprise to the military junta who had mis-calculated that the Awami League would at best obtain 60% of the seat s from Bangladesh and the remaining 40% would be their lackeys with whose help they would have a pliable majority. Then what happened ? Mr. Bhutto came handy. In utter disregard of democratic practice and electoral obligations, he refused to attend the National Assembly Session called for the 3rd March 1971 at Dacca and threatened violence and disorder if the session was not postponed. His threat was respected by the military regime. Public resentment against this uncalled for postponement brought bullets on them. The people of Bangladesh then resorted to non-violent non co-operation of the regime which led to a peaceful transfer of de facto power to the peoples' representatives. Mr. Bhutto propounded his formula that power be transferred separately to the majority parties in West Pakistan and in what was then East Pakistan. This was a clear indication that a parliamentary majority based on Bengalis was not acceptable to those who matter in West Pakistan and, indeed, accepted that there are two separate nations—One in West Pakistan and the other in the East—in Bangladesh. With mounting socio-economic problems, in the face of political uncertainty, affecting the life and future of millions in the country, the spokesmen for the country—Sheikh Mujibur Rahman and the Awami League wanted a speedy political solution of the deadlock and suggested a formula on the basis of Bhutto's suggestion on the separate transfer of power. General Yahya agreed to the formula and to Awami League's suggestion for interim arrangements for the Federal Centre (this he has admitted in his broadcast of the 26th March 1971). But the colonial

rulers from West Pakistan did not want power and democratic rights to be given to the people of Bangladesh. Bhutto was subtly used to quibble over the trade and commerce arrangements and power for financial allocation, on which the people of Bangladesh had given an emphatic mandate during the General Election which no public representative could ignore. While the talks dragged on, Boeings and ships brought troops round the clock and then Yahya suddenly left Dacca on the evening of the 25th March 1971. Towards mid night came hoardes of Yahya's West Pakistani mercenary forces, screaming war cries and shouting and destroying everything in sight without warning. Mujib's house was raided with machine guns and other automatic fire and he was arrested. My own house was attacked with machine gun fire and the house broken into. I was lucky to escape. The orgy began. That night in the city at Dacca alone many thousands of men, women and children were killed. The genocide, in fact undeclared aggression, unleashed that night followed a preplanned pattern when millions including educationists, philosophers, scientists, doctors, promising youth (our hopes for tomorrow), labourers, poor bread-earners, children in mother's arms, unarmed Bengali Officers and Men of the regular forces were brutally done to death. Women including minor girls were raped and killed and many forced to walk naked. Places of worship were defiled and destroyed, rural homesteads and promising crops burnt and everything enshrined in the Charter of Human Rights and in the Geneva Convention was destroyed in what is undoubtedly the most brutal and heinous genocide in human history todate. The regime's aim is the extermination of Bengalis as an ethnic entity and the destruction of the intellectual leadership and fighting capability and potentials of the people of Bangladesh to reduce them to serfdom by sheer force of arms.

Against this genocide and naked aggression rose the peace-loving but brave people of Bangladesh "whose history", to quote Yahya himself, "is replete with outstanding examples of supreme sacrifice and deeds of valour in struggles against colonial power to attain freedom & independence", rose to fight his villainous hoardes. In this, civilians and servicemen all stood together to defend our

human rights, hearths and homes, the honour of our women, the lives of our intellectuals, youths and young ones. The brave men of the East Bengal Regiment (the Bengal Tigers), those of them who were valiantly led by their gallant officers to come out as battalions and survivors from amongst those who had been shot in their sleep or lined up unarmed and shot, to many of whom the people of West Pakistan more specifically those of Lahore—owe the successful defence of their homes in 1965 war, struck at the enemy on the rampage. The gallant men of the former East Pakistan Rifles (EPR) who could escape the West Pakistan Army's slaughter fought stout-heartedly. So did civilian volunteers—'Ansars' and 'Mujahids' who joined the regular forces whose auxilliary they are. The civil police were attacked during the early hours of 26th March by the enemy infantry supported by medium tanks. Despite the odds against them, the police stoutly fought the enemy at Rajarbagh police station for nearly 4 hours after which they disengaged and pulled out to reform and join the forces defending the unarmed people of Bangladesh in this undeclared and treacherous aggression against civil population. Police detachments in other parts of Bangladesh, who were not surprised, fought under our gallant & highly patriotic officers who quickly reorganised into operational commands which have grown into a well-knit command today and includes soldiers, sailors and airmen. That is why, the Bangladesh Forces are called 'MUKTI BAHINI' (Liberation Forces NOT Army). Besides regulars, fighting in the Bangladesh Forces are very large number of non-regulars, all citizens volunteers ('GONO BAHINI'), drawn from different walks of life--from highly educated university products and students to industrial workers and farmer boys--all fighting with a unity of purpose to destroy the occupation forces and defend the human rights of our people and the independence of Bangladesh. The technique of fighting has had to vary from time to time, to attain the best results in the prevailing situation. You will be proud to know, my countrymen, that your brave sons have established an epic record in the war. They have fought the enemy many times superior in number and fire power-with selfless dedication, grim determination and cold courage, taking a heavy toll of the enemy conservative y estimated at about 25,000

killed todate. Our action against the enemy is being vigorously pursued. The enemy, brave in using sophisticated modern weapons against unarmed men, helpless women and innocent childrens, killed in rapgni women after killing their husbands, proficient in murdering babies in the presence of their mothers and sons in front of their fathers, but totally devoid of humanism and having no faith in the direction of God, is today funked by the impact of the vigorous strikes on him by your gallant sons. He is frightened in moving out except in strength and even than with a protective screen of local people forced to move ahead of him. Even then he is not finding security. Our brave Mukti Bahini are killing the enemy in numbers daily. The rod of justice is also falling on the enemy agents and quislings. My sincere advice to them and to those in the enemy–organised armed bodies like 'Rajakars' is to desist from helping the murderers and the occupation forces and surrender to the 'MUKTI BAHINI' with their arms. They will be well-treated. Those who have to stay inside must help the 'MUKTI BAHINI' in everyway in destroying the enemy. They must maintain absolute secrecy about the activities of the 'MUKTI BAHINI' because any traitor can only expect justice with lightning speed.

To the valiant fighters of the Bangladesh Forces—'Mukti Bahini', composed of regulars 'NIYOMITO BAHINI' and citizen soldiers-'GONO BAHINI', I offer my heartiest congratulations. Our enemy has modern jet aircrafts, armour, heavy guns and sophisticated weapons obtained from the USA and the People's Republic of China. But we have TRUTH AND JUSTICE on our side. Fighting against odds, with grim determination and valour, you have attained unprecedented successes in the field.

In this, many have attained martyrdom, many have been wounded or disabled. But you have inflicted on the enemy 40 times more casualties in terms of enemy killed. You have prevented him establishing his writ beyond the cities and district towns, disabled him from taking out the economic resources of Bangladesh affecting his economic viability. His protected market in Bangadesh is today closed to him. As many as fifteen ships bringing him aid

which would help him sustain his repression has been successfully destroyed or damaged by you, providing a warning to those helping the perpetration of brutalities and denial of human rights. It is in recognition of our valiant performance that the Government has decided firstly, the following four gallantry awards shall be awarded for which recommendations have been called from commanders :-

a.	Gallantry of the Highest Order	- Cash Rs.	10,000.00
b.	Gallantry of a Very High Order	- Cash Rs.	5,000.00
c.	Gallantry of a Commendable Order	Cash Rs.	2,000.00
d.	Gallantry of an order worth recognition.	- Certificate of Gallantry	

Secondly, those who are killed in action, their next of kin will get an immediate cash grant and in addition the Government will arrange for their accommodation and food for which names have been called from commanders. After the war they will be given a monthly grant. Those disabled are being physically rehabilitated and will also be resettled in society.

Let there be NO complacence however about the task ahead. The inhuman, barbarous, Godless enemy has to be eliminated with the utmost speed. In this you all--all my country men-must re-dedicate yourselves. To those Bengali officers, soldiers, sailors, airmen, workers, students and youth (including those in refugee camps) who have not been able to actively participate in the liberation war so far, it is my appeal that you come forward now to defend the country and to avenge the rape of our mothers and sisters and the loot of the country's treasured resources. Remember, our war is a crusade as we are fighting for truth and justice.

To our countrymen abroad, I would like to express the appreciation and gratitude of the Forces for their dedicated and zealous efforts to rouse the consciousness of the great people of the countries they live in, to the magnitude of the heinous crime—genocide and denial of sovereign rights of the people of Bangladesh-and for their relentless efforts to raise monetary and other support. I appeal to you o make further vigorous efforts to raise much more but pray do not allow funds to be spent without our express advice and above all to

remain solidly united and determined in support of the liberation war. If you do so, we shall win sooner than is normally possible.

My respected countrymen, our victory is certain—we are fighting to carry out God's command, in defence of justice and truth, for the sovereign rights of 75 millions of the human race and to uphold the national flag of Bangladesh. And no power on earth can destroy or suppress 75 million people. The call of 75 million brings the Grace of God, his compassion and favour.

For victory we must always keep in view three things :-

a. **Faith** - Faith in the law of God—truth and justice have always won.

and

Faith in the strength of our own arms—there is NO obstacle NO block which you cannot destroy and attain complete victory. You certainly can and you will.

b. **Firm Determination** - to destroy the enemy quickly whatever the cost and defend the sovereign rights of our 75 million people and the independence of Bangladesh.

c. **Selfless and Vigorous Efforts** - selflessness and dedication are essential in this war because we have to win it, overcoming many a handicap, many an obstacle. We shall have to make vigorous efforts, individually and collectively (irrespective of our personal likes or political beliefs', night and day, to plan, prepare and strike and destroy the enemy. We must NOT relent till the last of the brutal enemy gives up his ghost. Remember, the enemy will try to create disunity amongst us through creating communal dissensions and misunderstanding among ourselves or between us and friendly countries. We shall have to be on guard.

There are millions of our people who have sought refuge in India having been evicted by the forces of repression. We are grateful to the Government and the people of India for the generous way they have received them and are temporarily looking after them at great

cost, despite India's own economic problems. Our people in these refugee camps in India may rest assured we shall see them back in their hearth and homes living free from fear or duress.

People of Bangladesh at Wars ! Ours is a National war in which the entire nation, irrespective of political beliefs, caste or creed stand united as one man. Its ideals are high, resolution hard as steel-WE WILL FREE BANGLADESH FROM THE OCCUPATION OF THE INHUMAN, GODLESS ENEMY TOTALLY DEVOID OF ALL ETHICS, WHATEVER BE THE COST.

There can be NO compromise NO solution except on the basis of the unconditional release of our beloved and inspiring leader Bangabandhu SHEIKH MUJIBUR RAHMAN, transfer of power to the elected representatives of the nation of 75 million people and the withdrawal of the West Pakistani forces from Bangladesh.

SO, WHEREVER YOU ARE IN BANGLADESH—IN THE RIVULETS, LAKES, FIELDS AND REMOTE RECESSES OF THE RURAL INTERIOR, ON THE RIVERINE HIGHWAYS, LAND ROUTES, RURAL MARKETS, INDUSTRIAL CENTRES, TOWNS AND CITIES--STRIKE THE ENEMY WITH WHATEVER YOU CAN FIND, STRIKE HIM HARD, DESTROY HIM, OBLITERATE ALL SEMBLANCE OF HIS EXISTANCE. FORWARD MY COUNTRYMEN, TO PROTECT THE LIVES AND HONOUR OF OUR MEN AND WOMEN, TO SECURE THE FUTURE OF OUR CITIZENS, WHATEVER BE THEIR RELIGION, CASTE OR CREED AND TO DEFEND THE INDEPENDENCE OF BANGLADESH.

To conclude, may I repeat the great Bengali poet KAZI NAZRUL ISLAM's call —

"Striking at the doors of dawn
We shall bring a brighter morn
* * * *
Singing the song of youth
We shall bring life to the vale of desolation
We shall give spirit anew
With vigour of arms anew."

JOY BANGLA

মেজর জেনারেল (অবঃ) কে, এম, শফিউল্লাহ্ বীর উত্তম

- রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট
- প্রথম সশস্ত্র সংঘর্ষ
- দ্বিতীয় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট
- বিদ্রোহ ও যুদ্ধযাত্রা
- তিন নং সেক্টারের অধিনায়ক
- এস্. ফোর্সের ব্রিগেড কমাণ্ডার
- আখাউড়ার পতন
- চূড়ান্ত বিজয়

৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনার জন্য বাংলাদেশের রণাংগনকে মোট ১১টি সেক্টারে ভাগ করা হয়েছিল। প্রতিটি সেক্টারের ভার ন্যস্ত ছিল এক একজন সেক্টার কমাণ্ডারের ওপর। মেজর শফিউল্লাহ্ ছিলেন তিন নম্বর সেক্টারের কমাণ্ডার। তাঁর সেক্টারের কেন্দ্রস্থল ছিল সিলেটের বিপরীত। সীমানা ছিল ঢাকা, ময়মনসিংহের একাংশ, টাঙ্গাইল, সিলেট এবং কুমিল্লার উত্তরাংশ ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমা। পরে এই ১১টি সেক্টার ছাড়াও ব্রিগেড আকারে তিনটি অতিরিক্ত ফোর্স গঠন করা হয়েছিল। এগুলির নামকরণ করা হয়েছিল ফোর্স অধিনায়কের নামের প্রথম অক্ষর নিয়ে। জেড্ ফোর্সের অধিনায়ক ছিলেন মেজর জিয়াউর রহমান (পরবর্তী কালে লেঃ জেনারেল এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি), কে ফোর্স-এর অধিনায়ক ছিলেন মেজর খালেদ মোশাররফ (পরে মেজর জেনারেল এবং ৭ই নভেম্বর ১৯৭৫ সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত) এবং এস্ ফোর্স-এর অধিনায়ক ছিলেন মেজর কে, এম, শফিউল্লাহ্। মেজর শফিউল্লাহ্ তাঁর পুরা বাহিনীকে এই এস্ ফোর্সের অধীনে নিয়ে এসেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি এস্ ফোর্স সংগঠনের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় সেপ্টেম্বর '৭১ থেকে তিন নম্বর সেক্টারের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল ক্যাপ্টেন পরে মেজর এ, এন, এম, নুরুজ্জামান-এর ওপর। ২৫শে মার্চ, '৭১ মেজর শফিউল্লাহ্ ছিলেন জয়দেবপুর দ্বিতীয় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্ট এর সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড। এই রেজিমেন্ট-এর পুরো বাহিনী নিয়ে তিনি তাঁর ছয়জন বাঙ্গালী অফিসার সহ স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। যুদ্ধ শেষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিয়োগক্রমে ১৫ই আগষ্ট, '৭৫-এর অভ্যুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত তিনি ছিলেন বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর চীফ অব ষ্টাফ। '৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য ১১টি সেক্টারের অন্যান্য প্রধানের সাথে মেজর (পরে মেজর জেনারেল) শফিউল্লাহ্‌কেও বীর উত্তম পদক প্রদান করা হয়।

মেজর জেনারেল (অবঃ) কে. এম, শফিউল্লাহ্ বীর উত্তম
(মেজর থাকা কালীন ছবি)

মেজর জেনারেল কে, এম, শফিউল্লাহ্ (বীর উত্তম) বর্তমানে কানাডায় বাংলাদেশ-এর হাই কমিশনার হিসেবে নিয়োজিত আছেন। এর আগে তিনি মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশের হাই কমিশনার নিয়োজিত থাকাকালে ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৮০ মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে তাঁর সরকারী বাসভবনে একান্ত আন্তরিক পরিবেশে বিশেষ এক সাক্ষাৎকারে জানার সুযোগ হয়েছিল '৭১-এর রণাংগনের বহু বিচিত্র তথ্য। ঐ সাক্ষাৎকারের তথ্যগুলি কোনও প্রকারে বিকৃত না করে শুধুমাত্র ঐতিহাসিক কারণে পাঠক কুলের সমক্ষে তুলে দিলাম :

প্র: মাননীয় হাই কমিশনার সাহেব, আপনি একজন মহান মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধ পরিচালক। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে আপনার বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য জাতি গৌরবান্বিত, আমরা ধন্য। কখন কি ভাবে আপনি এ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলেন ?

উ: এ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে বলতে হলে আমাকে অনেক পুরানো দিনের কথাও কিছু বলতে হয়। তবে এ ব্যাপারে সংক্ষেপে শুধু আমি এটুকু বলব যে আমরা সৈনিক হিসাবে এই শিক্ষাই পেয়েছিলাম যে সৈনিকের কাজ শুধু যুদ্ধ পরিচালনা শিক্ষা এবং রণাংগনে যুদ্ধ করা। এ ছাড়া রাজনীতি চর্চা সৈনিকের কাজ নয়। এ কাজকে সব সময় ভয় করে দূরে থাকার শিক্ষাই আমরা পেয়েছিলাম। কিন্তু উনিশ শ' সাতষট্টি সাল কিংবা তারও আগে থেকে যেভাবে দেশের পরিস্থিতির অবনতি ঘটছিল, আমরা ইচ্ছা করলেও এই পরিস্থিতি থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারিনি। সজ্ঞানেই হউক আর অজ্ঞানেই হউক রাজনীতি চর্চায় আমরা কিছু কিছু জড়িয়ে পড়েছিলাম। দ্বিতীয়তঃ, তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকচক্র কখনো আমাদের বিশ্বাস করতো না। কেন যে তারা বিশ্বাস করতো না সে কথা বলতে পারব না। আমরা অবিশ্বাসের কাজ তখনো কিছু করিনি। তাদের এ জাতীয় মনোভাবের জন্য দুঃখ হতো। তারপর যখন শেখ মুজিবের ছয় দফা আন্দোলন শুরু হ'ল ঐ ছয় দফার প্রত্যেক দফা পড়ে ক্রমে আমাদের ধারণা আরো সুদৃঢ় হয়েছিল যে আমরা আমাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলাম। বাঙ্গালীর অধিকারের জন্য বলার মত সাহস তখন বোধহয় অন্য কারো হয়নি, শেখ মুজিব ছাড়া। যেহেতু শেখ মুজিব এসব কথা বলেছেন এবং আমরাও বিশ্বাস করেছি, ; বোধহয় সে কারণেই পশ্চিম পাকিস্তানীরা আমাদের বিশ্বাস করতো না। পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে কথাবার্তা বলার সময় তারা কখনো আমাদের ওপর কোনও প্রকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বভার দিত না।

'৬৯-এর সামরিক শাসন প্রবর্তনের পর '৭০-এ যখন সাধারণ নির্বাচন হ'ল তখন মনে করেছিলাম পূর্ব পাকিস্তানে আমরা এতদিন যা পাইনি, তা' হয়ত আমাদের নবনির্বাচিত প্রতিনিধিগণের মাধ্যমে পাব। মনে করেছিলাম এহিয়া খান তার প্রতিশ্রুতি রাখবে। এই বিশ্বাস আমাদের ছিল এবং এই বিশ্বাস নিয়েই আমরা চলাফেরাও করেছি। '৭১-এ ঢাকাতে যখন এসেম্বলী বসার চূড়ান্ত ব্যবস্থার পরও হঠাৎ করে তা' বন্ধ হয়ে গেল, আমরা ভাবতে পারছিলাম না কেন এটা হ'ল। কয়েকদিনের মধ্যে এহিয়া খান ঢাকাতে এসে শেখ মুজিবের সাথে যখন কথাবার্তায় বসল, আমরা ভেবেছিলাম, বোধহয় এবার একটা বুঝাপড়া হয়ে যাবে। তবে এই কথাবার্তার সাথে সাথে দৃশ্যের অন্তরালে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যখন সৈন্য আনা হচ্ছিল, তখন ব্যাপারটি আমাদের একটু যন্ত্রণা দিচ্ছিল। আমরা লক্ষ্য করলাম, পাকিস্তান থেকে সদ্য আগত সৈন্যদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রাখার ব্যবস্থা হচ্ছিল। কাজেই এসব ঘটনায় আমরা সুস্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম যে ওরা আমাদের ওপর থেকে সাধারণ বিশ্বাসও হারিয়ে ফেলেছিল। পাকিস্তানী সামরিক শাসক চক্র ঢাকাতে বসেই গুরুত্বপূর্ণ অনেক সম্মেলন করেছে। এসব দেখেশুনে আমাদের সন্দেহ দিন দিন বাড়তে থাকল।

যখন আমাদের চোখের সামনে এসব ঘটনা ঘটছিল, তখন পর্যন্ত কোনও রাজনৈতিক দলের সাথে আমাদের কোনও কথাবার্তা হয়নি। এমন কি তাদের সাথে আমাদের জানাশুনাও ছিল না। তবে কোনও কোনও রাজনৈতিক দল বলে থাকেন যে আমাদের সাথে তাঁদের যোগাযোগ ছিল। সেটা হয়ত বিভিন্ন স্তরে ছিল। উর্দ্ধতন তেমন কোনও সামরিক অফিসারের সাথে তাঁদের যোগাযোগ ছিল না। এ জাতীয় সহযোগিতা তাঁরা চেয়েছেন কিনা আমার জানা নেই। হয়ত বা তাঁরা তখনো আমাদের পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেন নি। আমরা তাঁদের সাথে যোগ দিতে পারব কিনা এ সম্পর্কে তাঁদের কোনও সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না।

৩রা মার্চ একাত্তর-এর পর যখন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে এহিয়া খানের কথাবার্তা চলছিল, তখন একটা গুজব রটে গিয়েছিল যে জয়দেবপুরের দ্বিতীয় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে নিরস্ত্র করা হচ্ছিল। ঐ গুজবের সাথে সাথে জনগণ জয়দেবপুর থেকে টঙ্গী পর্যন্ত রাস্তায় ব্যারিকেড্ লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এটা ঘটেছিল ১৯শে মার্চ, '৭১। আমি তখন জয়দেবপুর দ্বিতীয় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকণ্ড-ইন-কমাণ্ড। জয়দেবপুরের লোকজনের সাথে কথাবার্তা বললাম, তাঁদের বুঝানোর চেষ্টা করলাম : আমরা ট্রেনিং নিয়েছি অস্ত্র ব্যবহার

করার জন্য, অস্ত্র জমা দেয়ার জন্য নয়। এতটুকু যদি বিশ্বাস করেন তবে আমাদের ব্যাপারে আপনারা আর কিছু করবেন না। এতদ্‌সত্ত্বেও তারা ব্যারিকেড্ লাগিয়ে যাচ্ছিলেন। কোনও কোনও জায়গায় আমরা ব্যারিকেড্ খুলে ফেললাম। কিন্তু তারা আবার লাগিয়ে দিলেন। ঢাকা আর্মি হেড কোয়ার্টারে কে বা কারা এই খবর জানিয়ে দিল। জানা মাত্রই ওখান থেকে ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আরবাব পুরা এক ব্যাটালিয়ানের ৭২টি এল, এম, জি নিয়ে গঠিত পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট-এর এক কোম্পানীকে নিয়ে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে জয়দেবপুর রওয়ানা দিল ব্যারিকেড্ উঠানোর জন্য। জয়দেবপুরের দিক থেকে ব্যারিকেড্ উঠিয়ে নেয়ার জন্য সে আমাদিগকে আদেশ দিল। ঢাকার দিক থেকে সে নিজেই ব্যারিকেড্ সরিয়ে আসছিল। ব্রিগেডিয়ার আরবাব জয়দেবপুর প্যালেসে পৌঁছার অল্পক্ষণ পরেই বেরুলো পরিদর্শনে। সে লক্ষ্য করলো যে প্যালেসে আমরা এমন ব্যবস্থা রেখেছি যে বাইরের যে কোনও আক্রমণকেই সহজে প্রতিহত করা সম্ভব। যথার্থই আমরা বাইরের কোনও আক্রমণের কথা চিন্তা করিনি। আমাদের একমাত্র ভয়ের কারণ ছিল ঢাকা আর্মি হেড্ কোয়ার্টার। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম ওরা যে কোনও মুহূর্তে সুযোগ পেলেই আমাদের নিরস্ত্র করতে আসবে। কাজেই আমরাও প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলাম তাদের কোন সুযোগ না দেয়ার জন্য। কিন্তু আমাদের আসল উদ্দেশ্য কি ছিল, তা'ত লোকজনকে বলা সম্ভব ছিল না। জাহানজেব আরবাব আরো লক্ষ্য করলো আমাদের জোয়ানেরা যে কোনও আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। সে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেছিল : এত প্রস্তুতি কেন? আমরা বলেছিলাম : বাইরে দেখছেন না লোকে আমাদের আক্রমণ করতে আসছে? তাদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যই আমরা এই ব্যবস্থা নিয়েছি। অপর পক্ষে জনগণ যে আমাদের কাছ থেকে অস্ত্র নেবেন না এটা আমরা জানতাম। ব্রিগেডিয়ার আরবাবকে আরো বুঝিয়েছিলাম : 'ভারতীয় আক্রমণ আশঙ্কার উর্দ্ধে নয়। প্রয়োজনে তড়িৎ গতিতে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য মুহূর্তে বর্ডারে চলে যাওয়ার জন্যও ছিল আমাদের ঐ প্রস্তুতি।' এসব দেখে ব্রিগেডিয়ার আরবাব উপস্থিত ভাবে আমাদের প্রশংসা করেছিল। কিন্তু সে মনে মনে এ কাজকে ভাল চোখে দেখেনি। সে জয়দেবপুর গিয়েছিল ব্যাটালিয়ানের পুরো স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। সুযোগ পেলেই সেদিন সে আমাদের নিরস্ত্র করতো। কিন্তু সে সুযোগ তাকে দেয়া হয়নি।

ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আরবাব জয়দেবপুর প্যালেসে আমাদের সাথে কথাবার্তা বলার সময়ই জনগণ রেল লাইনের ওপর একটি ব্যারিকেড্ তৈরী

করে নিয়েছিল। এটা দেখা মাত্রই সে আমাদিগকে আদেশ দিল কুড়ি মিনিটের মধ্যে ব্যারিকেড্ সরিয়ে ফেলার জন্য। আমরা লোক পাঠালাম। অনেক বুঝানোর পরও জয়দেবপুরবাসীরা ব্যারিকেড্ সরিয়ে নিল না। তারা বলল যে জয়দেবপুর থেকে অস্ত্র নিয়ে যাওয়ার জন্যই ঢাকা থেকে ফোর্স এসেছে। শেষ পর্যায়ে গোলাগুলি হ'ল তাদের সাথে। মানুষের গায়ে যেন গুলি না লাগে সেদিকে আমরা দৃষ্টি রেখেছিলাম। আমাদের জোয়ানেরা বেশীরভাগ গুলি করেছিল আকাশের দিকে। এতদ্‌সত্ত্বেও এই গোলাগুলির ফলে দু'জন জয়দেবপুরের অধিবাসী নিহত হয়েছিলেন। আমাদেরও দু' তিনজন সৈনিক আহত হয়েছিলেন।

ব্যারিকেড্ সরিয়ে দেয়ার পর ব্রিগেডিয়ার আরবাব ঢাকা ফিরে গিয়েছিল। ফিরে যাওয়ার সময় আমাদের বাহ্‌বা দিয়ে গেল, কিন্তু তার মনের মধ্যে তখনো প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল যে আমরা তার আশানুরূপ আক্রমণ চালাতে পারিনি। তার জিজ্ঞাসার উত্তরে আমরা বলেছিলাম: '৬৩ রাউণ্ড গুলি চালানো হয়েছে। এতে দু'জন আহত হয়েছে এবং দু'জন নিহত হয়েছে; তবে তাদের সংখ্যা আরো বেশীও হতে পারে।' সে ব্যাখ্যা চেয়েছিল: হোয়াই সিক্সটি থ্রি রাউণ্ড হ্যাড্ বিন ফায়ার্ড এণ্ড অন্‌লি টু কিল্ড? (কেন ৬৩ রাউণ্ড গুলি চালানো হলো এবং মাত্র দু'জন নিহত হ'ল)? এতে সে বুঝাতে চেয়েছিল আমরা বাঙ্গালীদের আরো বেশী সংখ্যায় মারতে পারিনি কেন? তাদের ধারণা এমনিতেই বদ্ধমূল ছিল যে বাঙ্গালীরা কখনো বাঙ্গালীদের মারবে না। আর এ কারণেই তারা আমাদের বিশ্বাসও করতো না। এসব ঘটনায় জড়িয়ে না পড়ে কি করে পারতাম?

প্র: ২৫শে মার্চ এহিয়া খানের লেলিয়ে দেয়া বাহিনী যখন ঢাকা সহ বাংলাদেশের সর্বত্র বাঙ্গালী হত্যাকাণ্ড শুরু করেছিল তখন তো আপনি জয়দেবপুর ছিলেন?

উ: হ্যাঁ, জয়দেবপুরই ছিলাম।

প্র: এ সময় অর্থাৎ ২৫শে মার্চ রাতে এহিয়া খানের আক্রমণের সময় আপনার মানসিক প্রতিক্রিয়া কি ছিল, অর্থাৎ আপনি কি ভাবছিলেন অনুগ্রহ করে বলুন?

উ: ২৫শে মার্চ-এর আক্রমণ প্রসঙ্গে বলতে যাওয়া আমার পক্ষে সহজ ব্যাপার নয়। এর আগে দু'একটি কথা বলার দরকার। ২৫শে মার্চ-এর আক্রমণের দু'তিন দিন আগের কথা। আগেই বলেছি আমি ছিলাম জয়দেবপুর সেকেণ্ড ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্ট-এর সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড। আমার ব্যাটালিয়ান কমাণ্ডার ছিলেন কর্ণেল মাসুদুল হোসেন খান। জাহানজেব আরবাব জয়দেবপুর

এসেছিল ১৯শে মার্চ '৭১। জয়দেবপুরের ঘটনার পরই পাঁচজন সৈনিক আমাদের ব্যাটালিয়ান থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। অপর পক্ষে ১৯শে মার্চ-এর ঐ ঘটনার দিন ৬৩ রাউণ্ড গুলি চালানোর পর মাত্র দু'জন জয়দেবপুরবাসী নিহত হয়েছিলেন। এসব ঘটনার প্রেক্ষিতে ব্যাটালিয়ান কমাণ্ডার মাসুদুল হোসেনকে কৈফিয়ত দিতে হয়েছিল। তিনি ছিলেন বাঙ্গালী। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল: ব্যাটালিয়ান নিয়ন্ত্রণে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। ২৩শে মার্চ ঢাকা হেড কোয়ার্টারে তাঁকে ডেকে পাঠানো হ'ল। আমি যেতে নিষেধ করেছিলাম। বলেছিলাম সেখানে গেলে আর আসতে দেবে না। ঘটনা ঠিক তাই হয়েছিল। কর্ণেল মাসুদুল হোসেন ঢাকা গেলেন। যাওয়ার সাথে সাথেই তাঁর কর্মস্থল হেড কোয়ার্টারে বদলী করে নেয়া হয়েছিল। নূতন ব্যাটালিয়ান কমাণ্ডার পাঠানোর পূর্ব পর্যন্ত আমাকে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য বলা হ'ল।

কর্ণেল মাসুদুল হোসেন এবং আমার চিন্তাধারা ছিল একই। তখনকার ঐ পরিস্থিতিতে ব্যাটালিয়ান এর পরবর্তী যে কোনও কর্মসূচী আমরা দু'জনে মিলে ঠিক করে নিতাম। ২৫শে মার্চ বিকেল প্রায় ৪টায় কাজী আবদুর রকীব নামে আর একজন নূতন ব্যাটালিয়ান কমাণ্ডার পাঠানো হ'ল। তিনিও বাঙ্গালী ছিলেন। কিন্তু তাঁর মনের অবস্থা কি ছিল, অর্থাৎ তিনি কি ভাবতেন আমরা জানতাম না। তাঁর চিন্তা ধারা ছিল আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তাঁর মনের অবস্থা না জেনে আমরাও তাঁর সাথে খোলাখুলি আলাপ করার জন্য সাহস পেলাম না। কাজেই আমরা একটা অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়েছিলাম। ঐ সময়ের মধ্যে ঢাকাতে কিছু ঘটে যাওয়ার সংবাদ পেলে তিনি কি ভূমিকা নিতেন তা ছিল আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। এমনি বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে এসেছিল ২৫শে মার্চ-এর কাল রাত্রি।

কাজেই ২৫শে মার্চ কখন কি ঘটেছিল আমরা কিছুই জানতে পারিনি। রাত প্রায় সাড়ে এগারটার দিকে কর্ণেল মাসুদ আমার সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করে জানালেন: শফিউল্লাহ্ আমি এখানে কিছু গুলির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। তোমাদের ওখানে কি হচ্ছে? আমি জানালাম: আমাদের এখানে কিছু হচ্ছে না। তবে গুলি কিসের গুলি? এই দুই তিনটি কথা বলার সাথে সাথেই টেলিফোনের লাইন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। তারপরই টিক্কা খান ব্যক্তিগতভাবে কাজী রকিবের সাথে কথা বলল। এটা হয়ত আমাদের সাথে কথাবার্তার প্রায় দুই মিনিট পর ঘটেছিল। টিক্কা খান কাজী রকিবকে টেলিফোনে জানাল: 'গাজীপুরে গণ্ডগোল হওয়ার খবর আমরা পাচ্ছি। সেখানে তুমি একটা কোম্পানী পাঠাও।' এখন দেখুন আমরা ছিলাম জয়দেবপুর। আমরা কিছু

জানতাম না। অথচ তারা কি করে জানল যে গাজীপুর অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরীতে গণ্ডগোল হচ্ছিল? আমাদের যা ফোর্স ছিল, তার একাংশকে গাজীপুর অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরীতে পাঠিয়ে আমাদের ফোর্সকে আরো ছোট করে দেয়াই ছিল আসল উদ্দেশ্য। ব্যাপারটি আমি এভাবে চিন্তা করেছিলাম। রাত সাড়ে এগারটার পর ঢাকার সাথে আমাদের সব টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছিল।

প্র: এহিয়া খানের হানাদার বাহিনী ২৫শে মার্চ দিবাগত রাতে ঢাকাতে যে নৃশংস অভিযান চালিয়েছিল এ ঘটনা আপনি কখন জানতে পারলেন?

উ: ঢাকাতে যে একটা কিছু ঘটেছে, তা আমরা ২৬শে মার্চ সকালে বুঝতে পেরেছিলাম। আমরা লক্ষ্য করেছিলাম একখানা হেলিকপ্টার ঢাকা থেকে জয়দেবপুর আসছিল আর যাচ্ছিল। পরে আমরা খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম রাজেন্দ্রপুর থেকে তারা হেলিকপ্টারে গোলাবারুদ বয়ে নিচ্ছিল। আমাদের মনে তখন প্রশ্ন জেগেছিল, হঠাৎ করে এত গোলাবারুদের প্রয়োজন কি কারণে হ'ল এবং কেনই বা এসব গোলাবারুদ রাস্তা বাদ দিয়ে হেলিকপ্টারে বয়ে নেওয়া হচ্ছিল?

প্র: ঐ সময়ে আপনাকে ঢাকাতে হেড্ কোয়ার্টারে ডেকে পাঠালে কি করতেন?

উ: আমি যেতাম না। যাওয়া নিরাপদও ছিল না। অন্য কোনও কাজের অজুহাত দিয়ে আমাকে ওখানে রেখে দিতে পারত।

প্র: প্রত্যক্ষ মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার কথা আপনি কখন চিন্তা করলেন এবং কখন আপনি জড়িয়ে পড়লেন?

উ: চিন্তা আমাদের ছিল। ২৬শে মার্চ আমি আমার ব্যাটালিয়ান কমাণ্ডারকে বললাম: আপনি ঢাকাকে বলে দিন ময়মনসিংহে অবস্থানরত আমাদের ট্রুপস্ চাপের মুখে আছে। তাদের সাহায্যের জন্য এখান থেকে আরো ট্রুপস পাঠাতে হবে। এই সুযোগে জয়দেবপুর থেকে আরো কিছু ট্রুপস্ ময়মনসিংহে সরিয়ে নেয়াই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। ইতিমধ্যেই আমাদের লোকজন এক রকম বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। ঐ পর্যায়ে তাদের পুনরায় একত্রিত করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু নূতন ব্যাটালিয়ান কমাণ্ডার উত্তর দিলেন এতে হেড্ কোয়ার্টার রাজী হবে না। আমি বলেছিলাম: আপনি কথা বলে দেখুন। কথা বলার পর অনুমতি দেয়া হয়নি। ২৬শে মার্চ দিবাগত রাতে আমি কাজী রকিবকে বলেছিলাম: আপনি যদি ব্যবস্থা না নেন, তবে এরপর আমাকে আর দোষারোপ করবেন না। ব্যাটালিয়ান-এর পরিস্থিতি খুব খারাপ।

*এলো ২৭শে মার্চ একাত্তর। সেদিন একজন জোয়ান ঢাকা থেকে পালিয়ে জয়দেবপুর এসেছিল। তাঁর কাছে সংবাদ পেলাম: 'সমস্ত বাঙ্গালী সৈন্যদের হাত-পা বেঁধে নিয়ে হানাদাররা গুলি করে হত্যা করছে। ঢাকার শহর ওরা ধ্বংস করে দিয়েছে।' এসব খবর পেয়ে আমি ব্যাটালিয়ান কমাণ্ডারকে বললাম: এখন আপনি কোন ব্যবস্থা নিন বা না নিন, আমি ব্যবস্থা নেবো। তিনি কিছুটা ভয় পেয়ে বললেন: কি ব্যবস্থা নেবেন? আমি বললাম: এখান থেকে ব্যাটালিয়ান নিয়ে আমি ময়মনসিংহ চলে যাবো। ওখানে গিয়ে আমরা একত্র হবো। কারণ ইতিমধ্যেই আমার ব্যাটালিয়ান ভাগ হয়ে কিছু অবস্থান নিয়েছে জয়দেবপুর প্যালেসে, কিছু রাজেন্দ্রপুর, কিছু চলে গিয়েছে টাঙ্গাইল এবং কিছু ময়মনসিংহ। এমনি পরিস্থিতিতে তাদের সবাইকে একত্র করাই আমার ইচ্ছা। কাজেই আমাকে একটা কিছু করতে হবে। প্রত্যুত্তরে কাজী রকিব বললেন: আমার পুরা পরিবার ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে রয়ে গিয়েছে। পাকিস্তানী সৈন্যরা ওদের সবাইকে মেরে ফেলবে। আমি তখন বলেছিলাম: আপনি ঢাকা চলে যান। ওখানে গিয়ে বলুন যে জয়দেবপুর ব্যাটালিয়ান আপনার কথা শুনছে না। তা'

---

*২৫শে মার্চ '৭১ বিকেলে উক্ত দ্বিতীয় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এর দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যাটালিয়ান কমাণ্ডার লে: কর্ণেল কাজী রকিবের মতে মেজর শফিউল্লাহ্ ২৮শে মার্চ পূর্বাহ্নে জয়দেবপুর ক্যান্টনমেন্ট ত্যাগ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে লে: ক: কাজী রকিব বলেন:

On 26th March '71 and 27th March '71, we remained indecisive. However, after witnessing the savagery of Army action at Tongi in the evening of 27th, March '71, I made up my mind to revolt. I conferred with Major Shafiullah (now Major General Retd.), Major Moin (now Maj. General Rtd.), Capt. Aziz (now Brigadier) and Subeder Nurul Haq (Later Honorary Captain Rtd.) on that night at about 9 P.M., gave out my decision to revolt and my plan for its execution.

On 28th March 1971, at about 10 A. M. according to my plan, Major Shafiullah moved to Tangail with Morter platoon and an Infantry platoon with the transport that was available.

I remained behind to co-ordinate move of other elements of the Battalion which had remained dispersed in that area. All these elements were to move out as per plan after evening of 28th March 1971. At 8 P. M. I personally gave the H-hr. (meaning the time to commence the move out) to be 8-45 P.M. After the time when the cross-firing started I became trapped in the hands of a lone non-Bengali surviving Officer and ultimately became captive in the hands of Pakistanis.

না হলে আমাদের সাথে চলুন। আর আপনি যদি এগুলির কোনও একটি বেছে নিতে ভয় পান, তবে আমরা আপনাকে এখানে বেঁধে রেখে চলে যাবো। তা' হলে হানাদার বাহিনী এখানে এসে এই অবস্থা দেখে বুঝবে যে আপনি আমাদের সাথে ছিলেন না। একথা বলে আমি তাঁকে বললাম : আপনি চিন্তা করতে থাকুন কি করবেন? ততক্ষণে আমি সমস্ত অর্ডার দিয়ে দিচ্ছি।

জয়দেবপুর ক্যান্টনমেন্ট ঘুরে ঘুরে সমস্ত জোয়ানদের বুঝালাম কি করে যেতে হবে, কি ভাবে সব কাজ গুছিয়ে অগ্রসর হতে হবে।

প্র: আপনি কি ধারণা করেছিলেন আপনার এই দুঃসাহসিক কাজের পেছনে অন্যান্য ক্যান্টনমেন্টের বাঙ্গালী সৈন্যদেরও পূর্ণ সমর্থন ছিল এবং তারাও আপনার মত এগিয়ে আসছিলেন হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য?

উ: আপনাকে শুধু এটুকু বলব যে আমরা অন্ধের মত কাজ করছিলাম। আমাদের ব্যাটালিয়ান নিয়ে আমি যখন টাঙ্গাইল পৌঁছি, তখন আমার মনের মধ্যে শুধু এই কথাটুকুই জেগেছিল—আমি কি একা, না আরো কেউ আছেন।

প্র: আপনার কথা থেকে বুঝতে পারছি, ইতিপূর্বে আপনি কারো কাছ থেকে কোনও নির্দেশ পাননি। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু হয়েছিল ২৬শে মার্চ '৭১ সন্ধ্যে ৭টা ৪০ মিঃ সময়ে। সেই সন্ধ্যায় সূচনা পর্বের অধিবেশনে চট্টগ্রাম বেতারের বর্ষীয়ান গীতিকার কবি আবদুস সালাম এক সংক্ষিপ্ত লিখিত ভাষণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সমর্থনে দেশবাসীর প্রতি আকুল আবেদন জানিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে একইদিন আনুমানিক অপরাহ্ণ দেড়টার সময় চট্টগ্রাম বেতার থেকে চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের তৎকালীন সভাপতি জনাব আবদুল হান্নান প্রায় পাঁচ মিনিট ব্যাপী এক অগ্নিবর্ষী ভাষণে পাকিস্তানী হানাদারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। পরদিন অর্থাৎ ২৭শে মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান (পরবর্তী কালে মহামান্য রাষ্ট্রপতি) সদ্য গঠিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণা প্রচার করেছিলেন। এসব আপনি শুনেছিলেন কি?

উ: না। ২৮শে মার্চই আমি প্রথম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনেছি। তবে মেজর জিয়াউর রহমানের ভাষণ যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছে সেকথা আমি পরে শুনেছি। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনার পরই প্রথম আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমরা একা নই। কাজেই আমাদের সাহস আরো বাড়ল।

প্র: আমরা পরবর্তীকালে শুনেছি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার বাণী ছাপানো হ্যাণ্ডবিল আকারে চট্টগ্রামে বিলি করা হয়েছিল ২৬শে মার্চ একাত্তর সকালের মধ্যে। ২৬শে মার্চ বিকেলেও চট্টগ্রামে এমনি শতাধিক হ্যাণ্ডবিল ছাড়া হয়েছিল। এই হ্যাণ্ডবিলে বঙ্গবন্ধুর বরাত দিয়ে বলা হয়েছিল যে, ২৫শে মার্চ রাতে শত্রুর হাতে বন্দী হওয়ার আগেই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। ওয়ারলেস্‌যোগে প্রেরিত বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার বাণী চট্টগ্রামের উপকূলে নোংগর করা এক বিদেশী জাহাজে প্রথম গৃহীত হয়েছিল। জাহাজের ক্যাপ্টেন সাথে সাথেই বঙ্গবন্ধুর এই বাণী টেলিফোনের মাধ্যমে চট্টগ্রামের আওয়ামীলীগ নেতা জহুর আহমদ চৌধুরীকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী ঐ রাতের মধ্যেই বঙ্গবন্ধুর বাণী হ্যাণ্ডবিল আকারে ছেপে নেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং একই সাথে তড়িৎ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য প্রত্যেক জেলার ডেপুটি কমিশনারকে ফোনে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ২৫শে মার্চ দিবাগত রাতে স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে আপনি কিছু জানতে পেরেছিলেন কি?

উ: এ জাতীয় কোনও খবর আমি পাইনি। ঐ সময় টাঙ্গাইলের ডেপুটি কমিশনার ছিলেন জনাব জালাল আহমদ। তিনিও আমাকে এ ধরনের কোনও কথা বলেননি। ২৯শে মার্চ বিকেলে আমি পৌঁছেছিলাম ময়মনসিংহ। ময়মনসিংহের ডেপুটি কমিশনার ছিলেন তখন জনাব হাসান। তিনিও আমাকে এ সম্পর্কে কিছু বলেননি। ২৯শে মার্চ আমি ময়মনসিংহের প্রশাসন আমার হাতে তুলে নিয়েছিলাম। আমার পুরো বাহিনী ময়মনসিংহ ঘিরে ওখানে পৌঁছে গিয়েছিল ৩০শে মার্চ একাত্তর।

প্র: ৩০শে মার্চ হানাদার বাহিনী চট্টগ্রামের কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে বিমান আক্রমণ চালিয়ে আকাশ থেকে বোমা ফেলেছিল। ফলে বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কর্মীগণ ওখান থেকে সরে যেতে বাধ্য হন। চট্টগ্রামের কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে বোমা ফেলার কথা আপনি শুনেছিলেন কি?

উ: আমি বোমা ফেলার কথা শুনিনি। তবে পূর্বদিন অর্থাৎ ২৯শে মার্চ আমরা যখন ময়মনসিংহ পৌঁছে যাই, তখন আমার ওয়ারলেস্‌ সেটটি আগের ফ্রিকুয়েন্সীতে ঢাকার সাথে সংযুক্ত ছিল। ঢাকাতে তখন কি কথাবার্তা হচ্ছিল ঐ ফ্রিকুয়েন্সীতে আমি জানার চেষ্টা করেছিলাম। ৩০শে মার্চ দু'টি গুরুত্বপূর্ণ কথোপকথন আমি শুনতে পেয়েছিলাম। তখনকার জি ও সি খাদেম হোসেন

রাজা চট্টগ্রাম থেকে তাঁর কর্ণেল টাককে বলছিল: "এখানে ওয়ারলেস্ ষ্টেশন দখল করার সময় আমাদের অনেক লোক আহত ও নিহত হয়েছে। চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা নেয়ার জন্য একটি সি-১৩০ এয়ারক্রাফ্ট পাঠানো হোক। যদি সি-১৩০ এয়ারক্রাফ্ট পাঠাতে অসুবিধা হয়, তবে অবশ্যই একটি হেলিকপ্টার চট্টগ্রাম নেভেল বেসে পাঠিয়ে দিতে হবে। আমি ঐ হেলিকপ্টারে ঢাকা ফিরে আসব।"

কাজেই চট্টগ্রামে যে ইতিমধ্যে একটা যুদ্ধ হয়েছে,—ঐ কথোপকথন থেকেই তা' আমরা বুঝতে পেরেছিলাম।

প্র: হানাদার বাহিনী কর্তৃক বঙ্গবন্ধুকে বন্দী করে করাচী নিয়ে যাওয়ার ঘটনা আপনি কখন জানতে পেরেছিলেন?

উ: বঙ্গবন্ধু যে কোথায়, তাঁকে যে কখন কোথায় নেওয়া হয়েছিল সে ঘটনা আমরা অনেক দিন পর্যন্ত জানতে পারিনি। শুনেছি, জুন-জুলাইর দিকে কোন এক পত্রিকায় বঙ্গবন্ধুর ছবি বের হয়েছিল। সে ছবিতে তাঁকে অন্য কয়েক জনের সঙ্গে দেখানো হয়েছিল।

প্র: আপনি বোধ হয় 'ডন' পত্রিকায় প্রকাশিত করাচী বিমান বন্দরে গ্রেফতারকৃত অবস্থায় বঙ্গবন্ধুর ছবির কথা বলছেন। ইতিপূর্বে বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছিল: 'বঙ্গবন্ধু আমাদের সাথে আছেন এবং তিনিই স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনা করছেন।' বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ঐ দাবীকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্যই 'ডন' পত্রিকায় বঙ্গবন্ধুর ছবি সহ তারা সংবাদ পরিবেশন করে প্রথম স্বীকার করেছিল যে ২৫শে মার্চ দিবাগত রাতেই বঙ্গবন্ধুকে বন্দী করার পর করাচী নেওয়া হয়েছিল এবং তাদের হাতেই তিনি পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী ছিলেন।

উ: ইতিপূর্বে আমরা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ যাঁকেই পেয়েছি, জিজ্ঞাসা করেছি বঙ্গবন্ধুর কথা। তাঁরা শুধু এটুকু বলতেন বঙ্গবন্ধু তাঁদের সাথে ছিলেন এবং তাঁরা জানতেন তিনি কোথায় অবস্থান করছিলেন।

প্র: অস্থায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার যে ১০ই এপ্রিল গঠিত হয়েছিল এবং ১৭ই এপ্রিল কুষ্টিয়ার বৈদ্যনাথ তলার আম বাগানে দেশী-বিদেশী সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে এই সরকার আত্মপ্রকাশ করেছিল এ সম্পর্কে আপনি কখন জানতে পেরেছিলেন?

উ: সরকার গঠন এবং আত্মপ্রকাশ দু'টাই আমার ভাল জানা ছিল। কারণ আমরা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার পর থেকেই আমাদের চিন্তা ছিল কি ভাবে

আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবো এবং কে আমাদের সমর্থন দেবে। আমাদের যদি কোনও সরকার না থাকে তবে কোন বিদেশী সরকার আমাদের সাহায্য দেবে না। কাজেই এজন্য আমাদের একটি সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তা আমরা উপলব্ধি করেছিলাম প্রথম থেকেই। সরকার গঠন প্রসংগে আমরা ৩১শে মার্চ হতেই জল্পনা কল্পনা শুরু করেছিলাম। ৩১শে মার্চই প্রথম আমার সাথে দেখা হয়েছিল খালেদ মোশাররফ-এর সাথে। তাঁর সাথেও পরামর্শ করেছিলাম। আমরা বলে আসছিলাম আমাদের সরকার গঠনের জন্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কোথায়? তাঁদের খুঁজে একত্রিত করার জন্য আমরা লোক পাঠিয়েছিলাম। একই সাথে আমরা যুদ্ধও চালিয়ে গিয়েছি। আমি কিশোরগঞ্জে সৈয়দ নজরুল ইসলামের জন্য লোক পাঠিয়েছিলাম। অপরদিকে নেতৃবৃন্দকে খুঁজে একত্রিত করার জন্য বর্ডারে বর্ডারে লোক পাঠিয়েছিলাম।

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে প্রথম আমি সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম জেনারেল ওসমানীর সাথে সিলেটে আমার হেড কোয়ার্টার তেলিয়া পাড়ায়। সেদিন ছিল ২রা এপ্রিল। তাঁকে বলেছিলাম যুদ্ধত আমরা করেই যাচ্ছি। কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক সমর্থন দরকার। আপনারা সরকার গঠন করুন। আমার ঐ সাক্ষাতের সময় জেনারেল রব ও ছিলেন। তাঁকেও বলেছিলাম সরকার গঠনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। অপরদিকে আমরা যে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলাম সে কথাও তাঁদের বলেছিলাম।

কয়েকদিনের মধ্যেই রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আগরতলায় একত্রিত হয়েছিলেন। তাঁরা ১০ই এপ্রিল সরকার গঠন করলেন। জেনারেল ওসমানীকে প্রধান সেনাপতি করা হ'ল। স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনার জন্য মোট চারটি সেক্টর করা হ'ল। এক নম্বর সেক্টরের কর্মস্থল ঘোষিত হ'ল চট্টগ্রাম: মেজর জিয়াউর রহমান এই সেক্টরের কমাণ্ডার থাকলেন। কুমিল্লা (বিপরীত) ঘোষিত হ'ল দুই নম্বর সেক্টর। কমাণ্ডার থাকলেন খালেদ মোশাররফ। সিলেট (বিপরীত) ঘোষিত হ'ল তিন নম্বর সেক্টর। কমাণ্ডার থাকলাম আমি। কুষ্টিয়াকে করা হ'ল চতুর্থ সেক্টর। এই সেক্টরের কমাণ্ডার থাকলেন মেজর ওসমান। এই চারটি সেক্টর এবং আনুষ্ঠানিক দায়িত্বপ্রাপ্ত চারজন কমাণ্ডারের নাম ১০ই এপ্রিল '৭১ রাতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছিল। তখন আমি আমার হেড্ কোয়ার্টার তেলিয়া পাড়া থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলাম।

সরকার গঠন করার পর নেতৃবৃন্দ চলে যান কোলকাতায় এবং ১৭ই এপ্রিল

আসেন কুষ্টিয়ার বৈদ্যনাথ তলায়। এদিনই এখানে দেশী-বিদেশী সাংবাদিকের উপস্থিতিতে অস্থায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল।

প্র: অনুগ্রহ করে আপনার সেক্টারের সীমানা প্রসংগে আর একটু ব্যাখ্যা দান করুন।

উ: আমার সেক্টারের কেন্দ্রস্থল ছিল সিলেট বিপরীত। সীমানা ছিল ঢাকা, ময়মনসিংহের একাংশ, টাঙ্গাইল, সিলেট এবং কুমিল্লার উত্তরাংশ (ব্রাহ্মণ-বাড়িয়া মহকুমা)।

প্র: আপনার অধীনস্থ সশস্ত্র বাহিনীকে কিভাবে সংগঠন করেছিলেন?

উ: আমার সাথে ছিল দ্বিতীয় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট। এই ব্যাটালিয়ান-এর সাথে ছয়জন বাঙ্গালী অফিসার যুক্ত ছিলেন। এ ছাড়া ময়মনসিংহে কিছু ইপিআর, কিছু পুলিশ এবং কিছু অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক আমাদের সাথে যোগ দিয়ে-ছিলেন। তাদের সবাইকে আমি আখাউড়া হয়ে তেলিয়া পাড়ায় আমার হেড্ কোয়ার্টারে নিয়েছিলাম। তেলিয়া পাড়ায়—অনেক ছাত্র আমার সেক্টারে যোগ দিয়েছিল। তাদের সবাইর জন্য তেলিয়া পাড়ায় একটি ট্রেনিং ক্যাম্প-এর ব্যবস্থা করেছিলাম। দু'সপ্তাহ ট্রেনিং দিয়ে তাদের আমরা যুদ্ধ ফ্রণ্টে পাঠালাম। তখন আমার ব্যাটালিয়ানের শক্তি ছিল মাত্র ৬০০। এই অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে পাকিস্তানের বিরাট বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা ছিল এক অসম্ভব কাজ। কারণ হানাদার বাহিনীর শুধু সৈন্যবলই ছিল না, অস্ত্র এবং যুদ্ধের অন্যান্য সরঞ্জামাদিও ছিল অনেক বেশী। আমাদের কাছে ছিল শুধু রাইফেল আর কিছু স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। অপরপক্ষে তাদের কাছে ছিল দূরপাল্লার অস্ত্র এবং এয়ারক্রাফ্ট।

জয়দেবপুর থেকে আমার ব্যাটালিয়ানকে ময়মনসিংহ নেয়ার পর আমি ঢাকার পূর্বদিক থেকে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম আক্রমণ চালিয়েছিলাম ৩০শে মার্চ '৭১। আমি ঢাকাকে পশ্চিম দিক অর্থাৎ সাভারের দিক থেকে আক্রমণ করিনি ইচ্ছাকৃত ভাবে। কারণ হানাদার বাহিনী আমার আক্রমণ ঐ দিক থেকেই হতে পারে ধরে নেয়াই স্বাভাবিক ছিল। আমি তখন ময়মনসিংহের দিকে ছিলাম। তাই তাদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্যই আমি ভৈরব, নরসিংদী হয়ে শীতলক্ষ্যা পাড়ি দিয়ে পূর্বদিক থেকে আক্রমণ চালিয়েছিলাম। আমার লক্ষ্যস্থল ছিল ঢাকা ক্যাণ্টনমেণ্ট। ময়মনসিংহ থেকে ট্রেনযোগে আমার ট্রুপসকে কে সাট্ল্ করে আমি নরসিংদী পাঠিয়েছিলাম। তখন আমার সৈন্য সংখ্যা ছিল ৬০০। আমার ট্রুপস্ বাসাবো পর্যন্ত পৌঁছে যায়—৩১শে মার্চ থেকে ১লা এপ্রিলের মধ্যে। যুদ্ধক্ষেত্রে খালেদ মোশাররফের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়ে

ছিল ঐ সময়ই। তিনি আমাকে ঢাকা যেতে বারণ করলেন এবং পরামর্শ দিলেন তাঁর সাথে একযোগে সিলেট যাওয়ার জন্য। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সিলেট সহ পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলি মুক্ত করার পর আমরা একত্রে ঢাকা যাবো। খালেদ মোশাররফের এই প্রস্তাবের পর আমি আমার সব ট্রুপস্ সরিয়ে ভৈরব নিয়ে এসেছিলাম। তবে কিছু সৈন্য আমি নরসিংদী এবং ডেমরা রোডের ওপর রেখে এসেছিলাম।

২রা এপ্রিল হানাদার বাহিনীর সাথে আমার প্রথম যুদ্ধ হয়েছিল পাঁচদোনায়। এটি নরসিংদী এবং তারাবোর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এই যুদ্ধে অনেক হানাদার সৈন্য হতাহত হয়েছিল। তারা দূর থেকে আরটিলারী শেলিং করেছিল আমাদের ওপর। তখন পাঁচদোনায় আমার শুধু একটি কোম্পানী ছিল। এই কোম্পানীকে সরিয়ে আমি ভৈরব নিয়ে এসেছিলাম। পরদিন ৩রা এপ্রিল মেজর জিয়াউর রহমান আমার হেড্ কোয়ার্টারে এসেছিলেন। কারণ ঐ সময় তাঁর পুরা ট্রুপস্ ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। তখন আমি তাঁকে আমার ব্যাটালিয়ান থেকে একটি কোম্পানী দিয়ে সহায়তা করি। খালেদ মোশাররফও তাঁকে একটি কোম্পানী দিয়েছিলেন। জিয়াউর রহমান সাহেব এই দু'টি কোম্পানী নিয়ে পুনরায় তাঁর হেড্ কোয়ার্টারে চলে যান ৪ঠা কি ৫ই এপ্রিল '৭১।

প্র: আপনার কাছে এ পর্যন্ত যা শুনলাম এগুলিকে একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেক্ষিত বা সূচনা পর্ব বলা যায়। অধিকতর ভয়াবহ যুদ্ধ পরিস্থিতিতে আমরা পৌঁছলাম মাত্র। সব চাইতে বড় যুদ্ধ আপনার কমাণ্ডে আপনি কোথায় করেছেন সে সম্পর্কে আমাকে একটু বলুন।

উ: বাংলাদেশের সীমানা ছেড়ে ভারতের মাটিতে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত হানাদার বাহিনীর সাথে আমার দু'টি ভয়াবহ যুদ্ধ হয়েছে। এ ছাড়া আরো অনেকগুলি ছোট বড় ভয়াবহ যুদ্ধ হয়েছে। এগুলির মধ্যে একটি সংঘটিত হয়েছিল আশুগঞ্জ ভৈরব বাজার এলাকায়। এ যুদ্ধে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী তিনটি ব্যাটালিয়ান এবং একটি আরটিলারী রেজিমেণ্ট ব্যবহার করেছিল। তদুপরি ৬টি এয়ারক্রাফ্ট ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে পূর্বাহ্ণ এগারটা পর্যন্ত এক নাগাড়ে (বিরামহীন ভাবে) ছয় ঘন্টা আমাদের ওপর বোমারু আক্রমণ চালিয়ে-ছিল। ঐ সময় নদীর উল্টা পাড়ে ভৈরবের আগে যে শাখা নদী আছে সেখানে পুল ভেঙ্গে আমার ট্রুপস্ 'পজিশন' নিয়েছিল। তাদের মধ্যে কিছু ছিল ভৈরবে, কিছু আশুগঞ্জ আর কিছু ছিল লালপুরে। এই সীমানায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দু'টি ব্যাটালিয়ানের একটি দল রেল লাইন ধরে আখাউড়ার দিকে এগিয়ে

এসেছিল। অপরটি এগিয়ে এসেছিল ভৈরব বাজারের দিকে। অন্য আর একটি ব্যাটালিয়ান নৌ-জাহাজযোগে এগিয়ে এসেছিল মেঘনা দিয়ে। এখানে সারাদিন যুদ্ধ হয়। যুদ্ধ শুরু হয়েছিল খুব ভোর থেকে। আমরা দিন শেষেও যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু শত্রু বাহিনীর দু'টি কোম্পানী কমাণ্ডো আমাদের পেছনে এসে 'পজিশন' নিয়ে ফেলেছিল। তাদের প্রতিহত করার জন্য পেছনে আমাদের আর কোনও লোক ছিল না। এ কারণে বাধ্য হয়ে আমার কোম্পানীকে ওখান থেকে সরিয়ে নিতে হয়েছিল। ভৈরব সীমানা থেকে কোম্পানী সরিয়ে নিয়ে আমরা আরেক প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলাম মাধবপুরে। সেখানেও প্রায় কুড়ি দিনের মত আমাদের যুদ্ধ হয়েছিল।

প্র: তখন আপনাদের প্রধান অস্ত্র কি ছিল?

উ: রাইফেল, স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র, আর কিছু রকেট লাঞ্চার এবং মর্টার।

প্র: এসব অস্ত্র আপনারা কিভাবে পেলেন?

উ: আমাদের ব্যাটালিয়ান সাথে বহন করে এনেছিল।

প্র: এ সময়ের মধ্যে আপনার সৈন্য সংখ্যা ছয় শতের ওপর আর কিছু বেড়েছিল কি?

উ: ভৈরব যুদ্ধ পরিচালনা করার সময় আমার সৈন্য সংখ্যা বেড়ে প্রায় দু'হাজারের ওপর হয়েছিল। কারণ পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে অনেক লোক এসে ক্রমে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন।

প্র: আশুগঞ্জ যুদ্ধে কতজন মুক্তি বাহিনী হতাহত হয়েছিল আপনার মনে হয়?

উ: সঠিক সংখ্যা আমার মনে নেই। তবে দশ কি বারজন হ'তে পারে।

প্র: আর হানাদার বাহিনী?

উ: অনেক। কারণ যুদ্ধে আমরা প্রথম থেকেই যে কৌশল অবলম্বন করেছিলাম, তা' ছিল আমরা তাদের শুধু বাধা দেবো, আর সুযোগ মত তাদের বাহিনীর ওপর আঘাত হানবো। দ্বিতীয়তঃ আমরা পদ্ধতিগত যুদ্ধে (কন্‌ভেনশনাল ওয়ার) জড়িয়ে না পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমাদের কৌশল ছিল: হিট্ হার্ড এণ্ড উইথড্র (সজোরে আঘাত হান এবং সরে পড়)। কারণ আমরা চাইনি যে আমাদের সৈন্য সংখ্যা কমে যাক। লোক বলই যে আমাদের মূল অস্ত্র কথাটি সব সময় আমাদের স্মরণে ছিল। এমনিতেই আমাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিকের সংখ্যা ছিল একান্তই সীমিত। পরবর্তীকালে এসব

প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সৈনিকগণকে দিয়ে গ্রামবাসীগণকে সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়াই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য।

প্র: এবার অনুগ্রহ করে মাধবপুরে সংগঠিত যুদ্ধ সম্বন্ধে কিছু বলুন।

উ: মাধবপুরে এক ব্রিগেড পাকিস্তানী সেনাবাহিনী এসে আমাদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছিল।

প্র: এসব যুদ্ধে আপনাদের রশদপত্র যেমন খাদ্য, ঔষধ ইত্যাদির যোগান কিভাবে হতো?

উ: রশদপত্র আমাদের ব্যাটালিয়ানের জন্য যা ছিল সেগুলি আমরা ট্রাক এবং ট্রেনযোগে সাথে নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু খাবারের জন্য আমরা কখনো চিন্তা করিনি। তবে কখনো না খেয়েও থাকিনি। জনগণই আমাদের জন্য খাবার তৈরী করে নিয়ে আসতেন।

প্র: অস্থায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে আপনারা কি ধরণের সাহায্য পেয়েছেন?

উ: সেটা ত আরো অনেক পরের কথা। সরকার গঠিত হওয়ার পর থেকেই আমরা প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত থেকে সাহায্য পেতে থাকি। রশদপত্রও পেতে থাকি। কিন্তু শক্তিশালী তেমন অস্ত্রশস্ত্র আমাদেরকে দেয়া হতো না। তবে যা'ই আমরা পেয়েছি, সেগুলির সদ্ব্যবহার আমরা করেছি।

প্র: নতুন করে যেসব মুক্তিযোদ্ধা আপনার সাথে যোগ দিয়েছিলেন, তাদের প্রথম প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাই কি আপনি তেলিয়া পাড়ায় করেছিলেন?

উ: হ্যাঁ। আমার হেড্ কোয়ার্টার তেলিয়া পাড়াতেই আমি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলাম। এখানে আমার ব্যাটালিয়ানের কয়েকজনকে আমি ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে বেছে নিয়েছিলাম। তাদের দিয়ে দুই সপ্তাহ প্রশিক্ষণ দেয়ার পর নতুন মুক্তি যোদ্ধাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিলাম। এখানে একটি কথা বলে রাখছি যে আমার ব্যাটালিয়ানকে নিয়ে আসার সময় আমি সব চাইতে বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলাম অস্ত্রের ওপর। রশদপত্রের ওপর আমরা তেমন নজর দেইনি। আমাদের কাছে যত অস্ত্র ছিল, আমরা সবই সাথে নিয়ে এসেছিলাম। কাজেই অস্ত্রের অভাব আমাদের কখনো ছিল না। যুদ্ধ ক্ষেত্রেও আমরা অস্ত্র হারাইনি।

প্র: ভারতে প্রশিক্ষণের যে প্রথম ব্যবস্থা হয়, সেখানে আপনার সেক্টরের ছেলেদের পাঠাননি?

উ: ভারতে প্রশিক্ষণ আমরা আমাদের লোক দিয়েই করেছি। কিন্তু কোনও কোনও জায়গায় যেখানে আমাদের লোকজন কম ছিল, সেখানে ভারতের

লোক দিয়েই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সীমান্ত এলাকায় চতুর্দিকে প্রশিক্ষণ ক্যাম্প করা হত। তবে এখানে একটি কথা যোগ করা দরকার। সেটা হ'ল আমরা আকস্মিক ভাবে লক্ষ্য করলাম কিছু লোক আমাদের রিফিউজি ক্যাম্প এবং ট্রেনিং ক্যাম্প থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছে। পরে জেনেছিলাম মুজিব বাহিনী নাম দিয়ে আর একটি বাহিনী গঠিত হয়েছিল। এই বাহিনীর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছিল ভারতের দেরাদুনে। কে এদের পরিচালনা করছিলেন সেকথা প্রথম দিকে আমরা জানতে পারিনি। তারা যুদ্ধক্ষেত্রে এসে যাওয়ার পরই আমরা এ ব্যাপারে জানতে পেরেছিলাম।

প্র: তৎকালীন অস্থায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং মুক্তি বাহিনীর কমাণ্ডার-ইন-চীফ এর সাথে কি ভাবে আপনি সম্পর্ক চালিয়ে গিয়েছিলেন?

উ: আমার যতটুকু মনে পড়ে কোলকাতায় জুলাই মাসে একটি কনফারেন্স হয়েছিল। এই কনফারেন্সে জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী ছাড়াও সেক্টর কমাণ্ডারগণ উপস্থিত ছিলেন। মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর জলিল সহ আমরা প্রত্যেকেই এতে উপস্থিত ছিলাম।

প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিন আহমদ এই কন্‌ফারেন্স উদ্বোধন করেছিলেন। আমাদের আলোচনার সমন্বয় সাধন করেছিলেন জেনারেল ওসমানী। ঐ কন্‌ফারেন্স দু'টিতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল আমরা কি পদ্ধতিতে যুদ্ধ চালিয়ে যাবো। সেক্টরগুলির সীমানাও আমাদেরকে ম্যাপের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হ'ল। যুদ্ধের সম্ভাব্য পদ্ধতি কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কেও আমাদের বলা হ'ল। তবে কৌশলগত ভাবে যুদ্ধ কি ভাবে চালাতে হবে সেটা আমাদের উপরই ছেড়ে দেয়া হয়েছিল।

প্র: এখন আপনার কাছে একটি প্রশ্ন রাখতে চাই। ইতিপূর্বে আপনি বলেছেন মুজিব বাহিনীর সংগঠন প্রসঙ্গে আপনারা কিছুই জানতেন না। কিন্তু যখন জানতে পারলেন তখন কি ভাবে আপনারা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন?

উ: যখন হয়ে গেছে, তখন আর প্রতিক্রিয়া জানিয়েই বা কি হ'ত। তারাও যুদ্ধক্ষেত্রে এসে গেল। তবে কোন কোন জায়গায়—তাদের সাথে নিয়মিত মুক্তি বাহিনীর সংঘর্ষ হয়েছে। তবে এ জাতীয় সংঘর্ষ পরস্পরের অবস্থান না জানার কারণে ভুল বশতঃ হয়েছিল, অর্থাৎ একে অপরকে ভুল বশতঃ শত্রুপক্ষ মনে করেছিল বলেই। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আমার বাহিনীর সাথে মুজিব বাহিনীর এ জাতীয় সংঘর্ষ হয়নি। কারণ আমি মুজিব বাহিনীর সাথে আগেই যোগাযোগ করে নিয়েছিলাম। তারা কোন্ দিক থেকে আক্রমণ চালাবে

তা' আমি পূর্বাহ্নেই জেনে নিতাম। তা'ছাড়া আমি কখনো কখনো মুজিব বাহিনীর ছেলেদের আমার হেড্ কোয়ার্টারে ডেকে নিয়েছি। উভয় দল থেকে ছেলেদের নিয়ে সম্মিলিত বাহিনী করে কখনো মুজিব বাহিনীর কোনও ভাল ছেলেকে ঐ সম্মিলিত বাহিনীর কমাণ্ডে রেখেছি, আবার কখনো আমার ছেলেদের তাদের কমাণ্ডে রেখেছি। এভাবে আমি উভয় দলের মধ্যে একটা সম্প্রীতি এবং একাত্মতা ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলাম। এক্ষেত্রে কে রাজনৈতিক দলের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে, বা পরিচালিত হয়নি ইত্যাদি চিন্তা কখনো আমাকে প্রভাবিত করেনি। বিভিন্ন মতের নেতৃবর্গ আমার কাছে ছেলেদের নিয়ে এসেছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ বেগম মতিয়া চৌধুরী এসেছিলেন তাঁর দলের ছেলেদের নিয়ে। আমি তাদের গ্রহণ করেছি এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে আমার বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করেছি।

প্র: আপনি বলেছেন ইতিপূর্বে সেক্টরগুলি ভাগ হয়ে গিয়েছিল। এমনি অবস্থায় মুজিব বাহিনীর ছেলেদের সেক্টর অনুযায়ী কিভাবে ভাগ করা হয়েছিল?

উ: আমার সেক্টরে যেসব মুজিব বাহিনীর ছেলে এসেছিল, আমি তাদেরকে আমার বাহিনীর সাথে আমার অধীনে নিয়েছিলাম।

প্র: একাত্তরের রণাঙ্গনে আপনার এলাকাধীন মুক্তি যুদ্ধ সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন একটি চিত্র আপনার কাছে পেলাম। এজন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। এ যুদ্ধে যে আমরা জয়ী হচ্ছি এটা আপনি কখন থেকে বুঝতে পেরেছিলেন? অর্থাৎ আমাদের পরাজিত হওয়ার আশঙ্কা যে এখন আর নেই, এবং হানাদার বাহিনী পুরোপুরিভাবে আমাদের করায়ত্তে এসে যাচ্ছে—এই ধারণা কখন আপনার মধ্যে এলো?

উ: এখানে একটা কথা বলে রাখছি, জুলাই, '৭১-এ মুজিবনগরে আমরা যে সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলাম, তখন আমরা ভেবেছিলাম জুলাই থেকে পরবর্তী কিছুদিন পথঘাট বর্ষার পানিতে পূর্ণ থাকবে; কাজেই ঐ সময় হানাদার বাহিনী তত তৎপর থাকতে সক্ষম হবে না। আমরা ভেবেছিলাম ঐ সুযোগ আমরা পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারব। কারণ আমাদের বিশ্বাস ছিল পানিতেই আমাদের আধিপত্য থাকবে। কিন্তু আমরা দেখলাম আমাদের ভাবনা সঠিক হয়নি। বরং উল্টাভাবে ঐ সময়ও হানাদার বাহিনী আমাদের চাইতে বেশী তৎপর ছিল। এর কারণ অবশ্য ছিল। নদী পথে চলাচলের জন্য ওদের কাছে প্রচুর দ্রুতগতি যান ছিল। অপরপক্ষে আমাদের কাছে নৌকা ছাড়া অন্য কোনও যান ছিল না। তবে অক্টোবর-নভেম্বর পর্যন্ত আমাদের অবস্থা খুবই ভাল হয়ে গিয়েছিল।

ততদিনে আমি অনেক ছেলেকে প্রশিক্ষণ দিয়ে আমার বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলাম। আমার বাহিনীতে তখন মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা বেড়ে প্রায় বিশ হাজারে দাঁড়িয়েছিল। আমি লক্ষ্য করেছি ঐ সময়ে পাকিস্তান বাহিনী এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলাচলের নিরাপত্তা পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলেছিল। ছোট গ্রুপে তাদের চলাচল এক রকম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কেবল বড় গ্রুপেই সীমিত ছিল তাদের যাতায়াত। নভেম্বর মাসের কাছাকাছি সময় থেকেই আমি আক্রমণ চালিয়ে হানাদার বাহিনীর কাছ থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলাম। এ ধরণের কয়েকটি আক্রমণ আমি চালিয়েছি মনোহরদি, পাকুন্দিয়া সহ বিভিন্ন এলাকায়।

প্র: ৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তান এবং হিন্দুস্তানের সাথে আনুষ্ঠানিক ভাবে যুদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পর আপনার রণ কৌশলে কোনও পরিবর্তন হয়েছিল কি?

উ: ৩রা ডিসেম্বরের আগেই আমি আমার ব্যাটালিয়ানকে একটি ব্রিগেডে রূপান্তর করতে সক্ষম হয়েছিলাম। শুধু তাই নয়, পাকিস্তান এবং হিন্দুস্তানের সাথে আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ ঘোষণার পূর্বেই আমি আমার ব্রিগেডকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে নামিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলাম। ছোট ছোট কয়েকটি আক্রমণ চালানোর পর আমি একটি বড় ধরণের আক্রমণ পরিচালনা করেছিলাম। আখাউড়া রেলওয়ে ষ্টেশনকে আমাদের আয়ত্তে নিয়ে আসাই ছিল এই আক্রমণ পরিচালনার উদ্দেশ্য। ৩০শে নভেম্বর আখাউড়ার উত্তর-পূর্ব দিক থেকে মুকুন্দপুর হয়ে আমি আক্রমণ শুরু করেছিলাম। ওখান থেকে অগ্রসর হয়ে আমি আখাউড়া পর্য্যন্ত পৌঁছেছিলাম ২রা ডিসেম্বর। আখাউড়া ষ্টেশনে আমি প্রবেশাধিকার নিয়ে ফেলেছিলাম ৩রা ডিসেম্বর। ঠিক এমনি অবস্থায় আমি শুনতে পেলাম পাকিস্তান হিন্দুস্তান যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে গিয়েছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আখাউড়াতে দুইটি পাকিস্তানী সেবার জেট বোমারু আক্রমণ শুরু করেছিল। কিন্তু তারা বেশী সময় ওখানে আক্রমণ অব্যাহত রাখতে পারেনি। ভারতীয় জঙ্গী বিমান তাদের ওপর পালটা আক্রমণ চালালে তারা ওখান থেকে সরে যায়। এমনিভাবে ভারতীয় বিমান আর পাকিস্তানী বিমান যেই মুহূর্তে আকাশ যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, ঠিক তখন আমরা পূর্ণ শক্তিতে আখাউড়া জয়ের জন্য ব্যস্ত ছিলাম।

প্র: ভারতীয় বাহিনী আপনাদের সাথে সংযুক্ত হওয়ার পর আপনাদের কি ধরণের সুবিধা হ'ন এবং আপনার কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তখন?

উ: ভারতীয় বাহিনী যখন আমাদের সহায়তায় এগিয়ে এসেছিল তখন আমি আখাউড়া দখলে ব্যস্ত ছিলাম। ৪ঠা ডিসেম্বর থেকে ভারতীয় বাহিনী পুরোপুরি আক্রমণ শুরু করেছিল। তখন থেকেই আমরা সম্মিলিতভাবে আক্রমণ চালিয়েছিলাম।

প্র: জগজিত সিং অরোরাকে ইষ্টার্ণ কমাণ্ডের সেনাপতি নিযুক্ত করার পর মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওসমানীর ভূমিকা কি হয়েছিল?

উ: এটা ছিল একটি সম্মিলিত কমাণ্ড। তাঁদের উভয়ের ক্ষমতা সমান ছিল।

প্র: সম্মিলিত মিত্র ও মুক্তিবাহিনী মিলে ১৬ই ডিসেম্বর '৭১ অর্থাৎ বিজয়ের মুহূর্ত পর্য্যন্ত আপনারা কিভাবে যুদ্ধ করলেন এবং কিভাবে ঢাকাতে প্রবেশ করলেন?

উ: আপনাকে বলেছি যে ৩রা ডিসেম্বর '৭১ ভারত এবং পাকিস্তান আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ ঘোষণার মুহূর্তেই আমি এক ব্রিগেড মুক্তিবাহিনী নিয়ে আখাউড়াতে অবস্থান নিয়েছিলাম। আমার পর পরই ভারতীয় বাহিনীর একটি ডিভিশনও আখাউড়া ঘিরে ভিতরে ঢুকে পড়েছিল। কাজেই আমাদের সম্মিলিত আক্রমণে পাকিস্তানী বাহিনীর মোট একটি ব্রিগেড ৫ই ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল। এটাই ছিল আমার সেক্টারে পাকিস্তানী বাহিনীর প্রথম আত্মসমর্পণ। তখন ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়ক আমাকে বললেন আমার বাহিনী নিয়ে আখাউড়া প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকার জন্য। তাঁর বাহিনী তিনি ভৈরবের দিকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জানালেন। আমি বললাম: আমি ত পেছনে থাকার জন্য আসিনি, আমি আগে চলে যাবো। তিনি তখন বললেন: তা'হলে ত আপনাকে নিজস্ব প্রবেশ পথ (ইণ্ডিপেনডেণ্ট এক্সেস) নিতে হবে। আমি তখন বলেছিলাম: যথার্থই আমিও নিজস্ব প্রবেশ পথই বেছে নেবো। আমি কি আপনার পেছনে যাবো নাকি? তখন তিনি আমাকে বললেন: আমরা আখাউড়া থেকে ভৈরব যাব, আর আপনি সিলেটের মাধবপুর এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল হয়ে ভৈরব যাবেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমি আমার বাহিনী নিয়ে মাধবপুর হয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল পৌঁছেছিলাম ৮ই ডিসেম্বর। তাঁরাও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার একই তারিখে পৌঁছেছিলেন। এখানে ছোট খাট একটি যুদ্ধ হয়েছিল। তারপর ভারতীয় বাহিনী চলে গিয়েছিলেন আশুগঞ্জের দিকে। আমি সরাইল থেকে আশুগঞ্জ পৌঁছেছিলাম ৯ই ডিসেম্বর। আশুগঞ্জে পাকিস্তানী বাহিনীর সাথে আমাদের যুদ্ধ হয় ৯, ১০ এবং ১১ই ডিসেম্বর। পাকিস্তানী

বাহিনী আমাদের সম্মিলিত বাহিনীর আক্রমণে টিকতে না পেরে ভৈরব বাজারের দিকে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। যাওয়ার সময় তারা ভৈরবের পুল ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয়। তখন ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়ক আমাকে বললেন: আপনি ভৈরবে পাকিস্তানী বাহিনীর ফরটিন্‌থ ডিভিশনকে ঘিরে রাখুন। আমরা ঢাকার দিকে অগ্রসর হচ্ছি। তখন আমি বলেছিলাম: ফরটিন্‌থ ডিভিশনকে ঘিরে রাখার জন্য কিছু ফোর্স রেখে আমিও ঢাকা যাব। তিনি তখন বললেন: আমাদের ফোর্স ত হেলিকপ্টারে নরসিংদী যাচ্ছে, আপনি কিভাবে যাবেন? তখন আমি বলেছিলেন: ঠিক আছে আমি হেঁটে চলে যাব। ভারতীয় বাহিনী তাঁদের ফোর্স হেলিকপ্টার যোগে নরসিংদী পাঠালেন। ভৈরবে পাকিস্তানী বাহিনীকে ঘিরে রাখার জন্য আমি ১১নং ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে রেখেছিলাম। আমার বাকী মুক্তিবাহিনী নিয়ে আমি ওখান থেকে লালপুর চলে এসেছিলাম। লালপুর থেকে নৌকাযোগে নদী অতিক্রম করে এসেছিলাম রায়পুরা। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে পেঁৗছি নরসিংদী। নরসিংদী এসে দেখি ভারতীয় দুই ব্রিগেড বাহিনী ইতিমধ্যে এই এলাকা দখল করে রেখেছে। ভারতীয় দুই ব্রিগেডের একটি ছিল ৩১১ মাউনটেন ব্রিগেড, আর একটি ছিল ৭৩ মাউনটেন ব্রিগেড। তখন ভারতীয় বাহিনীর কমাণ্ডার আবার আমাকে বললেন: আপনি নরসিংদী থাকুন, আমরা ঢাকা যাচ্ছি। এবারও আমি বললাম: নরসিংদীতে আমার থাকার কোন প্রয়োজন নেই। আমিও ঢাকা যাব। নরসিংদীর সব যানবাহন ভারতীয় বাহিনী নিজেরা নিয়ে এসে ডেমরা পেঁৗছেন। আমি তখন পায়ে হেঁটে নরসিংদী থেকে ভোলতা পুলের নিকট এলাম। সেখান থেকে কোণাকুণি পথে আমি রূপগঞ্জ দিয়ে শীতলক্ষ্যা ও বালু অতিক্রম করে ডেমরার পেছনে গিয়ে উঠলাম। ১৩ই ডিসেম্বর আমার বাহিনীর একাংশ ডেমরার পেছনে এবং অপর অংশ বাসাবো অবস্থান নেয়। কার্যতঃ তখন থেকেই আমরা ঢাকাকে অবরোধ করে রেখেছিলাম।

প্র: অন্যান্য যে সব মুক্তিবাহিনী বিভিন্ন সেক্টরে যুদ্ধরত ছিলেন তাদের অবস্থা তখন কি ছিল? তাদের মধ্যেও কি কেহ ঢাকার দিকে এগিয়ে আসছিলেন?

উ: ময়মনসিংহে মুক্তিবাহিনীর যে সেক্টর ছিল তারাও তখন ভারতীয় বাহিনীর সাথে ঢাকার দিকে এগিয়ে আসছিলেন। অন্যান্য বাহিনী তাদের যার যার সেক্টর মুক্ত করে স্ব স্ব সেক্টরেই থাকা সাব্যস্ত হয়েছিল। উদাহরণ-স্বরূপ মেজর জিয়াউর রহমানের ওপর ভার ছিল সিলেট দখল করা। কাজেই তাঁর কাজই ছিল সিলেট দখল করে সেখানে অবস্থান নেয়া।

প্র: খালেদ মোশাররফ, কাদের সিদ্দিকী এবং মেজর জলিল তখন কোথায় ছিলেন?

উ: খালেদ মোশাররফ তখন আর যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলেন না। কারণ তিনি শত্রু পক্ষের গুলিতে আহত হয়েছিলেন। তাঁর বাহিনীকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। এক অংশ চট্টগ্রামের দিকে এবং অপর অংশ চাঁদপুরের দিকে। ভারতীয় বাহিনীর সাথে তাদের ভাগ করে দেয়া হয়েছিল। আমার ফোর্সকে আমি ভাগ করতে দেইনি। মেজর জিয়াউর রহমান ও তাঁর ফোর্সকে ভাগ করতে দেননি। আমি আগেই উল্লেখ করেছি আমার ফোর্স থেকে ১১নং ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে আমি ভৈরব রেখে এসেছিলাম। বাকি দু'টি ব্যাটালিয়ান এবং সেক্টর ট্রুপ্‌স্‌ নিয়ে আমি ঢাকার চতুর্দিকে অবস্থান নিয়েছিলাম।

প্র: ১৬ই ডিসেম্বর, '৭১ আপনি কোথায় ছিলেন?

উ: ডেমরাতে আমাদের মুখোমুখি পাকিস্তানী যে বাহিনী ছিল, তারা দুপুর সাড়ে বারটা পর্যন্ত অস্ত্র সমর্পণ করেনি। সাড়ে বারটার পর সেখানে পাকিস্তানী বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছিল। তখন আমাকে বলা হ'ল এয়ারপোর্টে যাওয়ার জন্য; বিকেল সাড়ে তিনটার সময় বাংলাদেশ হেড কোয়ার্টার্স থেকে বিশেষ প্রতিনিধি গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ, কে, খোন্দকার সহ জেনারেল অরোরা আসছেন। তাঁদের অভ্যর্থনা জানানোর দায়িত্ব দেয়া হ'ল আমার ওপর। ডেমরা থেকে পাকিস্তান আর্মির একখানা গাড়ী নিয়ে আমি এয়ারপোর্ট চলে গেলাম।

প্র কিন্তু তখনো ত পাকিস্তানী বাহিনী আত্মসমর্পন করেনি। আপনি কিভাবে এয়ারপোর্ট গেলেন? সাথে কি কোন ফোর্স নিয়েছিলেন?

উ: না না আমি কোন ফোর্স নিয়ে যাইনি। আমার সাথে শুধু একজন আর্ডারলী ছিল।

প্র: এয়ারপোর্ট তখনো হানাদার বাহিনী কর্তৃক বেষ্টিত ছিল কি?

উ: না। ঐ সময় এয়ারপোর্ট অকেজো অবস্থায় পড়েছিল। তবে পাকিস্তানী কিছু লোক তখনো সেখানে ছিল। ইতিমধ্যেই ভারতীয় বাহিনী এয়ারপোর্টে অবস্থান নিয়েছিলেন। কাজেই নিরাপত্তার কোনও অসুবিধা হয়নি।

প্র: তারপর?

উ: সেখানে গিয়ে দেখি জেনারেল নিয়াজী এবং জেনারেল জ্যাকবসহ ভারতীয় বাহিনীর কয়েকজন অফিসার জেনারেল অরোরার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। জেনারেল জ্যাকব ছিলেন ইষ্টার্ণ কমাণ্ডের সি, ও, এস (চীফ অব ষ্টাফ)। জেনারেল অরোরা আমাদের প্রতিনিধি গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ, কে, খোন্দকার

এবং আরো কয়েকজন অফিসার সমভিব্যাহারে কয়েকটি হেলিকপ্টার নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে ঢাকা বিমান বন্দরে অবতরণ করলেন। কিন্তু এই দলের মধ্যে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জেনারেল ওসমানীকে দেখলাম না। বাংলাদেশের পক্ষে ছিলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ, কে, খোন্দকার এবং বাংলাদেশ হেড কোয়ার্টারস্-এর কয়েকজন কর্মকর্তা।

প্রঃ এয়ারপোর্টে আপনার সাথে সেক্টার কমাণ্ডারগণের মধ্যে আর কে ছিলেন?

উঃ মেজর হায়দার ছিলেন। কাদের সিদ্দিকীও ছিলেন।

প্রঃ বিমান বন্দর থেকে আপনারা সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে কখন এসে পৌঁছলেন?

উঃ বিকেল সাড়ে চারটার মধ্যে আমরা বিমান বন্দর থেকে সরাসরি এখানে এসে পৌঁছেছি।

প্রঃ সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে পাকিস্তানী বাহিনী ক'টার সময় আত্মসমর্পণ করেছিল?

উঃ বিকেল সাড়ে পাঁচটার সময়।

প্রঃ আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণের সময় সেখানে আপনি কোন্ মর্যাদায় ছিলেন।

উঃ আমি ছিলাম সেক্টার কমাণ্ডার হিসেবে। বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ছিলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ, কে, খোন্দকার। ভারতীয় বাহিনীর পক্ষ থেকে ছিলেন ইষ্টার্ণ কমাণ্ড-এর জি, ও, সি লেঃ জেনারেল জগজিত সিং অরোরা, ইষ্টার্ণ কমাণ্ড-এর এয়ার চীফ, ইষ্টার্ণ কমাণ্ড-এর ন্যাভেল চীফ, ইষ্টার্ণ কমাণ্ড-এর চীফ অব ষ্টাফ জেনারেল জ্যাকব এবং কোর কোর কমাণ্ডার জেনারেল সগৎ সিং।

প্রঃ আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণের পর আপনারা কোনও সম্মেলন বা আলোচনায় বসলেন কি? অর্থাৎ আপনারা যাঁরা কমাণ্ডে ছিলেন, কোনও বৈঠকে বসলেন কি?

উঃ (উত্তর পাইনি)।

প্রঃ জেনারেল ওসমানী সাহেব কখন ঢাকা এসে পৌঁছলেন?

উঃ পাঁচদিন পর।

প্রঃ সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর আপনাদের দায়দায়িত্ব কি ওখানেই শেষ হয়ে গেল?

উঃ না না শেষ হয়নি। আমার ট্রুপস্‌কে আমি অর্ডার দিয়ে এসেছিলাম যে তারা সবাই ঢাকা এসে পৌঁছবে। আমার একটি ব্যাটালিয়নকে আমি থাকতে দিলাম ভিখারুন্নেসা গার্লস স্কুলে। আর একটি ব্যাটালিয়নকে থাকার ব্যবস্থা করলাম ষ্টেডিয়ামে।

প্রঃ ১০ই জানুয়ারী '৭২ বঙ্গবন্ধু ঢাকা ফিরে এলেন। ১৭ই জানুয়ারী, '৭২ ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশ থেকে ভারতে চলে গেলেন। তখনকার অভিজ্ঞতা অনুগ্রহ করে একটু বলুন।

উঃ আমরা যখন ঢাকা আসি, তখন আমরা সম্মিলিত হেড্ কোয়ার্টারের অধীনে ছিলাম। পুরো ঢাকা ক্যাণ্টনমেণ্টই তখন ভারতীয় বাহিনী দখল করে অবস্থান নিয়েছিলেন। সেখানে আমাদের থাকার জন্য আর কোনও জায়গা অবশিষ্ট ছিল না। ভারতীয় বাহিনী তখন আমাদের বলতে চেয়েছেন যে ঐ সময় 'টেনসন' অর্থাৎ উত্তেজনা ভাব খুব বেশী ছিল। কারণ পাকিস্তানী বাহিনীর হাতে তখনো অস্ত্র ছিল। কাজেই মুক্তিবাহিনীকে তাঁদের সাথে এক জায়গায় রাখা সঠিক হত না বলে তাঁরা অভিমত প্রকাশ করেছিলেন।

প্রঃ তখনো কি পাকিস্তানী বাহিনীকে আপনারা নিরস্ত্র করেননি?

উঃ আত্মসমর্পণের প্রতীক হিসেবে কিছুমাত্র অস্ত্র নেয়া হয়েছিল। কামান সহ ভারী মারণাস্ত্র সমর্পিত হয়েছে আরো সাতদিন পর।

প্রঃ ১৭ই জানুয়ারী, '৭২ ভারতীয় বাহিনী চলে যাওয়ার পর আপনাদের 'পজিশন' কি হ'ল?

উঃ জেনারেল ওসমানী তখন আর্মি হেড্ কোয়ার্টারে চলে এলেন।

প্রঃ ঐ সময় বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর যে কাঠামো হয়েছিল সে সম্পর্কে অনুগ্রহ করে বলুন।

উঃ ঢাকা ক্যাণ্টনমেণ্ট হ'ল, আমাদের আর্মি হেড্ কোয়ার্টার। এস্ ফোর্স অর্থাৎ আমার ফোর্স থাকল ঢাকাতে। কে ফোর্স কুমিল্লাতে, জেড ফোর্স সিলেট, সিক্সথ সেক্টার দিনাজপুরে, সেভেনথ্ সেক্টার বগুড়াতে, ৮ম ও ৯ম সেক্টার যশোরে এবং ১নং সেক্টার চট্টগ্রামে।

সেক্টারগুলিতে নিয়মিত বাহিনীর লোকের সংখ্যা খুবই কম ছিল। নিয়মিত বাহিনীর লোককে আমরা রেগুলার আর্মি ফোর্সে নিয়ে এলাম। এরপর আমরা প্রস্তাব দিয়েছিলাম সেক্টারের বাকি লোকদেরও নিয়মিত বাহিনীর মধ্যে নিয়ে আসার জন্য। আমরা আরো জানতে চেয়েছিলাম কারা নিয়মিত বাহিনীতে থাকতে চান বা চলে যেতে ইচ্ছা করেন।

প্র: ইতিপূর্বে নিয়মিত বাহিনীও অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করেছিলেন কি?

উ: যুদ্ধের সময় আমরা নিয়মিত বাহিনী ছাড়া ও গেরিলা বাহিনী গড়ে তুলেছিলাম। তাদেরকে আমরা অস্ত্র দিয়ে দেশের অভ্যন্তরে পাঠিয়েছিলাম। শুধু এই গেরিলা বাহিনীই অস্ত্র সমর্পণ করেছিলেন। নিয়মিত বাহিনী অস্ত্র সমর্পণ করেনি।

প্র: যারা অস্ত্র সমর্পণ করলেন, তাদের তালিকা আপনারা রেখেছিলেন কি?

উ: আমার সেক্টরে যারা ছিলেন, এখনো পর্যন্ত তাদের তালিকা রয়েছে।

প্র: অন্যান্য সেক্টরেরও নাম তালিকা পাওয়া যাবে কি?

উ: থাকার কথা।

প্র: আপনার মতে মোট মুক্তি যোদ্ধার সংখ্যা কত ছিল?

উ: তালিকাভুক্ত পঁচাশি হাজারের কম নয়। এ ছাড়া যাদের নাম তালিকায় ছিল না, তাদের সংখ্যাও প্রায় অনুরূপ হবে।

প্র: পরবর্তীকালে মুক্তি যোদ্ধাদের সার্টিফিকেট কতজন পেয়েছেন বলে আপনার মনে হয়?

উ: ন'লাখের কাছাকাছি।

প্র: এটা কি করে সম্ভব হ'ল?

উ: কারণ মুক্তি যোদ্ধার সার্টিফিকেট সঠিক পদ্ধতিতে প্রদান করা হয়নি। সার্টিফিকেটগুলি ইস্যু করা উচিত ছিল আর্মি হেড্ কোয়ার্টার থেকে। আমরা যারা সেক্টার কমাণ্ডে ছিলাম তাদের ওপরই ক্ষমতা প্রদান করা উচিত ছিল সার্টিফিকেট বিতরণের। কিন্তু এসব সার্টিফিকেট বিতরণের ক্ষমতা দেয়া হ'ল হোম সেক্রেটারীকে। হোম সেক্রেটারী আমাদের সাথে যোগাযোগ না করে সরাসরি ক্যাম্প-এর সাথে যোগাযোগ করে সার্টিফিকেট বিতরণ করেন। ফলে অসংখ্য সার্টিফিকেট সম্পূর্ণ এক বিভ্রান্তিকর অবস্থায় বিতরণ করা হয়েছে। তখন হোম সেক্রেটারী ছিলেন জনাব তসলিম।

প্র: জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী বা আপনারা এটা মেনে নিলেন?

উ: এটা আমরা মানি নি। এখনো মানি না।

প্র: যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করেও মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দাবী করছেন, তাদের সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?

উ: আর্মি হেড্ কোয়ার্টারে এখনো তাদের তালিকা রয়েছে। এ তালিকা দিয়ে এখনো পর্যন্ত যাচাই করা যায়, কারা মুক্তিযোদ্ধা আর কারা মুক্তিযোদ্ধা

ন'ন। তবে এই তালিকা ছাড়াও কিছু লোক ছিলেন যারা মুক্তি যোদ্ধাদের সরাসরি সমর্থন এবং সহযোগিতা দান করেছেন। উদাহরণস্বরূপ আমরা গ্রামে লোক পাঠিয়েছিলাম গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনার জন্য। এসব গ্রামে কিছু সংখ্যক লোক ছিলেন যাদের সহযোগিতা না পেলে গেরিলা পদ্ধতিতে তারা মুক্তিযুদ্ধ করতে পারতেন না। ঐসব সমর্থকদেরও হয়ত একটি তালিকা প্রস্তুত আবশ্যক।

প্র: এখানে একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন এসে যাচ্ছে। আমি মুজিব নগর থেকে ফিরে আসার পর কিছুদিন ঢাকা বেতারের চার্জে ছিলাম। এর আগে অবশ্য আমি আপনাকে বলেছিলাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের পরিচালনার ভার আমার ওপর ন্যাস্ত ছিল। পরবর্তীকালে প্রায় বৎসরাধিক কাল আমি ঢাকা বেতারের সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক হিসেবে এই বেতারের প্রশাসনের দায়িত্ব পালন করেছি। ঐ সময় ষ্টাফ রিক্রুটমেণ্টকালে আমি লক্ষ্য করেছিলাম জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী কর্তৃক স্বাক্ষরকৃত ছাপানো ফরমে কোনও কোনও প্রার্থী নিজেরাই তাদের নিজ এবং পিতার নাম বসিয়ে দিয়েছে। তারা জেনারেল ওসমানী কর্তৃক স্বাক্ষরকৃত এমনি খালি ফরম কোথা থেকে এবং কিভাবে পেল? যথার্থই এ জাতীয় স্বাক্ষরযুক্ত খালি ফর্মে নাম এবং পিতার নাম ঠিকানা লিখে অনেকেই রাতারাতি মুক্তিযোদ্ধা বনে গিয়েছেন। অনেকে এই অজুহাতে বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী সংস্থা গুলিতে চাকুরী সহ অন্যান্য সুবিধাদি আদায় করে নিয়েছেন।

জেনারেল ওসমানী সাহেব এ ধরনের সার্টিফিকেট প্রসঙ্গে কোনও প্রতিবাদ করেছেন বলেও আমরা শুনিনি। মেজর জলিলের স্বাক্ষরিত সার্টিফিকেটও আমরা দেখেছি। এই প্রেক্ষিতে আপনার মন্তব্য জানতে পারি কি?

উ: অনেকেই অনেক কিছু করেছেন।

প্র: মুক্তিযোদ্ধার নামে মিথ্যা সার্টিফিকেট উপস্থাপন করে অনেকে বিভিন্ন ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ সম্পর্কে আপনার প্রতিক্রিয়া কি?

উ: যারা সত্যিকারের মুক্তিযোদ্ধা তারা কিন্তু কখনো সার্টিফিকেটের জন্য আসেনি।

প্র: তাই বলে সমাজে সম্মানের সাথে তাদের বাঁচার দাবী উপেক্ষা করা যায় কি?

উ: এজন্যই ত তারা মারা পড়েছেন।

প্র: একজন যথার্থ মুক্তিযোদ্ধা একজন ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাকে কিভাবে মেনে নিতে পারেন?

উ: (উত্তর পাই নি)।

প্র: একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র কি ধরনের ভূমিকা পালন করেছে বলে আপনি মনে করেন?

উ: আমরা মনে করি, আমরা যে ভাবে মাঠে যুদ্ধ করেছি যেভাবে একটা অভিযান সফল হওয়ার পর পুনরায় অভিযান চালানোর জন্য সাহস পেয়েছি, প্রেরণা পেয়েছি, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রও আমাদের সে রকম প্রেরণা দিয়েছে। আমরা অপারেশন থেকে ফিরে এসে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শুনতে কখনো ভুল করি নি। কি সংবাদ আছে, কোথায় কি ঘটছে এসব খবরাদি আমরা জেনে নিতাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে।

প্র: স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে রণাংগনের যেসব খবরাদি পরিবেশিত হতো, সেগুলি কি আপনারা সব বিশ্বাস করতেন? কখনো কি আপনাদের ধারণা হয়েছে যে কিছু কিছু সংবাদ শুধুমাত্র আপনাদের উৎসাহিত করার জন্য বাড়িয়ে বলা হতো?

উ: আমার সেক্টার সম্বন্ধে যখন সংবাদ পরিবেশিত হতো, তখন আমরা ত জানতাম কতটুকু সংবাদ বেশী বা কম বলা হয়েছে। যুদ্ধের সংবাদ বেশী সব সময় বলা হয়। তবে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে এমন কিছু বেশী বলা হতো না।

প্র: যেসব বীর সৈনিক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাদের সম্পর্কে আপনার কোনও বক্তব্য রয়েছে কি?

উ: বীর সৈনিক বলতে আপনি কাকে বুঝাচ্ছেন?

প্র: যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং পরোক্ষ ভাবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেছেন।

উ: আমি বলি যারা আমাদের সাথে মুক্তিযুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন তাদের প্রত্যেকেই বীর সৈনিক ছিলেন। আমি সংক্ষেপে দু' একটি উদাহরণ দিচ্ছি। একবার আমি দুলু মিঞা নামে এক যুবককে একটি চা বাগানে আক্রমণ চালানোর জন্য পাঠিয়েছিলাম। তার একটি বদ অভ্যাস ছিল। মাঝে মধ্যে সে তারি খেতো। ঐ চা-বাগানে শ্রমিকদের রাখা তারি তার হাতে পড়েছিল। সে ঐ তারি খেয়ে মাতাল হয়ে গিয়েছিল। এমনি অবস্থায় সে তার অস্ত্র নিয়ে নিজ লোকদেরই আক্রমণ করে বসেছিল। যা হউক তার এলাকার কমাণ্ডার অতি কষ্টে তার হাতের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাকে আমার কাছে ধরে এনেছিলেন। আমি দুলুকে নির্দেশ দিয়েছিলাম আমার হেড্ কোয়ার্টার ছেড়ে চলে যাওয়ার

জন্য। অন্যথায় তাকে গুলি করব বলেছিলাম। সে তখন আমার কাছে তার ভুলের জন্য মাফ চাইল। কিন্তু তাকে আমি বলেছিলাম: এ ধরণের অপরাধ মাফ করা সম্ভব নয়। কারণ ভবিষ্যতেও সে এমনি অপরাধ করতে পারে। সে আমার পায়ে ধরে কেঁদে ফেলল এবং অনুনয় করল আর একবার তাকে সুযোগ দানের জন্য। এমনি অবস্থায় তাকে থাকার অনুমতি দিলাম। কিন্তু তার কমাণ্ডার তাকে কোনও প্রকারেই গ্রহণ করতে রাজী হলেন না। আমি তাকে অন্য কমাণ্ডারের অধীনে কাজ করতে দিলাম।

এই ঘটনা ঘটেছিল ২১শে জুন, '৭১ সিলেটের তেলিয়া পাড়ায়। এর অল্প দিন পরই আমরা তেলিয়াপাড়া থেকে হেড্ কোয়ার্টার তুলে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম। তখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চারটি ব্যাটালিয়ান সম্মিলিত ভাবে আমাদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয় দুলু তার কোম্পানীর একটি মাত্র মেশিন গানের সাহায্যে পুরা এক ব্যাটালিয়ান পাকিস্তানী বাহিনীকে থামিয়ে রেখেছিল। সে তার এলাকায় পাকিস্তানী বাহিনীকে আক্রমণ চালাতে দেয়নি। অনবরত সে তার মেশিন গান দিয়ে গুলি চালানো অব্যাহত রেখেছিল। শত্রুপক্ষের গুলি এসে তার পেটে লেগেছিল এবং তার গুলির আঘাতে এক পা ভেঙ্গে গিয়েছিল। আমি ওখানে গিয়ে দেখলাম যদি দুলু অমনি ভাবে অনবরত গুলি চালানো অব্যাহত না রাখতো, তবে তার পুরা কোম্পানীকেই পাকিস্তানী বাহিনী ঘিরে ফেলত। শুধু মাত্র তার একক প্রচেষ্টাতেই—আমার কোম্পানীটি ওখান থেকে বের হয়ে আসতে পেরেছিল। আমি দেখলাম শত্রুর

গুলির আঘাতে দুলু মিঞার পেট ছিঁড়ে রক্ত পড়ছে। এমনি অবস্থায়ও সে এক-হাতে ফায়ার করছে এবং অপর হাত দিয়ে পেট চেপে ধরে রেখেছে। আমাকে দেখেই সে কেঁদে উঠল এবং বলল: "স্যার, আপনি যে আমাকে যুদ্ধ করার জন্য সুযোগ দিয়েছিলেন এজন্য আমি আপনার কাছে ঋণী। এই যে আমার গায়ের কাপড়টি আছে এটি অন্ততঃ শেখ মুজিবকে দেখাবেন। তিনি বলেছিলেন: 'তোমরা রক্ত দেয়ার জন্য তৈরার হয়ে যাও।' আমি রক্ত দিয়েছি, আমি এখন মৃত্যুর পথে। আমার মৃত্যু হলে আমাকে বাংলাদেশের মাটিতে কবর দেয়ার ব্যবস্থা করবেন।"

এই দুলু মিঞার কথাই বলছি। ছেলেটি আমাদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ পেয়েছে মাত্র দুই সপ্তাহ। দুই সপ্তাহ প্রশিক্ষণ নিয়ে সে যুদ্ধ করেছে। নিঃস্বার্থ ভাবে আত্মদান করে গেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য। এমনি নিঃস্বার্থ ভাবে আত্মদান করেছে আমাদের অগণিত মুক্তিযোদ্ধা, অগণিত দুলু মিঞা।

কাজেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে মুক্তি যোদ্ধাদের অবদান উপলব্ধির বিষয়। এটা বলে বুঝানো সম্ভব নয়। যারা সামনে ছিলেন এবং দেখেছেন তারাই শুধু উপলব্ধি করতে পারবেন মুক্তিযোদ্ধাদের এ অবদান কত বড় ছিল, কত মহান ছিল।

প্র: মুক্তিযোদ্ধাগণের অবদানের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য আমাদের কি কর্তব্য রয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

উ: আমি ত মনে করি যদি মুক্তিযোদ্ধারা এমনি নিঃস্বার্থভাবে এগিয়ে না আসত, তবে আমরা আজকে যে স্বাধীন বাংলাদেশ লাভ করেছি, এ বাংলাদেশ কখনো স্বাধীনতার আলো দেখতো না। তারা না থাকলে পৃথিবীর মানচিত্রে আজকের এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম কখনো হতো না। আমরা ভাল ভাল গদি নিয়ে আছি, ব্যবসা-বাণিজ্য বা বিভিন্ন উপায়ে অনেক টাকার মালিক হয়ে আজকে মুক্তিযোদ্ধা ভাইদের অবহেলা করছি, শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের কোনও খবর পর্যন্ত নিচ্ছি না। আমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত যে আমরা তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে, ন্যায্য সম্মান থেকে বঞ্চিত করছি।

প্র: আমরা অনেক দেরী করে ফেলেছি। যথার্থই আমরা মুক্তিযোদ্ধা বা শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে তাদের ন্যায্য পাওনা এবং সম্মান দেইনি। অনেক মুক্তিযোদ্ধাই আজ বেকার। অনেকেই পরিবার পরিজন নিয়ে কষ্ট করছেন। শহীদ এবং পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের অবস্থা আরো শোচনীয়। এ মুহূর্তে আমরা কি করতে পারি? তাদের দুর্দশা লাঘবের জন্য কোনও কর্মপন্থা আমরা নিতে পারি কি?

উ: মুক্তিযোদ্ধারা যে প্রেরণা নিয়ে কাজ করেছিল, এখনো আমরা তাদের সেই প্রেরণার সদ্ব্যবহার করতে পারি। দেশ গঠনে যুব শক্তি এবং জনশক্তির প্রয়োজন অনস্বীকার্য। জাতির এই মহান কর্মকাণ্ডে মুক্তিযোদ্ধাদের কাজে লাগিয়ে আমরা যথার্থ জনশক্তির অভাব পুরণ করতে পারি। অপর পক্ষে আমরা বেকার মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রম এবং নিষ্ঠার প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করতে পারি।

প্র: যাঁরা জীবন দান করে গেছেন, তাঁদের স্মৃতিকে আমরা কি ভাবে ধরে রাখতে পারি? ইতিমধ্যে সাভার এবং মীরপুরে তাঁদের উদ্দেশ্যে দুটি স্মৃতি সৌধ নির্মাণ করা হয়েছে। এ জাতীয় স্মৃতিসৌধই কি শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান প্রদর্শনের জন্য আপনি যথেষ্ট মনে করেন?

উ: আমি ত মনে করি শুধু মাত্র স্মৃতিসৌধ নির্মাণই শহীদ মুক্তিযোদ্ধা-দের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য যথেষ্ট নয়। তাছাড়া শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদেরকে পৃথক করে দেখে তাদের জন্য পৃথক পৃথক স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করাও আমার বিবেচনায় যুক্তিযুক্ত নয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য যাঁরা আত্মদান করে গেছেন তাঁদেরকে পৃথক ভাবে না দেখে একই শ্রেণীভুক্ত করাই বাঞ্ছনীয়। কারণ তাঁদের সবাইরই পবিত্র লক্ষ্য ছিল এক---স্বাধীনতা এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। আর এরই লক্ষ্যে তাঁরা দান করে গেছেন তাঁদের মূল্যবান জীবন। কাজেই শ্রেণী বিন্যাস করে শহীদী আত্মার প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করা হচ্ছে না।

প্র: ১৬ই ডিসেম্বর, '৭১ সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানের যে স্থানটিতে হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছিল সে স্থানটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য আপনার চিন্তার মধ্যে কিছু আছে কি?

উ: আমার মনে হয় এই স্থানটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা উচিত। এই স্থানটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনেক বেশী। শুধুমাত্র পাকিস্তান বাহিনীর আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণের কারণেই নয়, এখানেই উড়ানো হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা।

প্র: বাংলাদেশের বর্তমান এবং ভবিষ্যত জনগণ ও যুব শ্রেণীর উদ্দেশ্যে আপনি কি ভাবছেন?

উ: আমি মনে করি রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত নেতৃবর্গ যুব শ্রেণীর যথার্থ সদ্ব্যবহার করছেন না। বরং এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদ তাদেরকে আপন স্বার্থ উদ্ধারের কাজে খাটাচ্ছেন। দেশ গঠন করার জন্য সঠিক ভাবে তাদেরকে কাজে লাগানো হচ্ছে না। গঠনমূলক কাজে তাদেরকে নিয়োজিত করা আবশ্যক।

প্র: একাত্তরের রণাঙ্গনে সংঘটিত আপনার কোনও একটি লোমহর্ষক বা ভয়াবহ অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে জানতে ইচ্ছে করে।

উ: লোমহর্ষক বা ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা বলতে গেলে ৬ই ডিসেম্বর, '৭১ এর একটি ঘটনা উল্লেখ করতে হয়। এটি ঘটেছিল মাধবপুরের কাছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ১৬ কি ১৭ জনের একটি দল ট্রাকযোগে সিলেট থেকে পালিয়ে যাচ্ছিল। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলের কাছাকাছি একটি জায়গায় আমরা গাড়িটিকে দাঁড়াতে বলি। ঐ সময় আমরা সরাইলের দিকে যাচ্ছিলাম। আমরা পাকিস্তানী বাহিনীটিকে আত্মসমর্পণ করতে বললাম। তারা আত্মসমর্পণ করতে গিয়েই আকস্মিক ভাবে গোলাগুলি শুরু করে দিল। কারণ আমরা সংখ্যায়

মধ্যে এখনো যাঁরা বেকার অবস্থায় আছেন, আমরা আশা করি আর দেরী না করে সরকার তাঁদের প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা নেবেন। যাঁরা পঙ্গু অবস্থায় চিকিৎসার অভাবে আজো ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর প্রহর গুনছেন, আমরা আশা করি সরকার কাল বিলম্ব না করে সত্বর তাঁদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা নেবেন। যথার্থই একটি মর্যাদাশীল জাতি হিসেবে আমরা যাতে বেঁচে থাকতে পারি, সে দোয়াই আপনি আমাদের জন্য করবেন।

উঃ নিশ্চয়ই, একটি মর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য সব সময়ই আমার দোয়া এবং শুভেচ্ছা আছে এবং থাকবে। এখানে একটি কথা যোগ করতে চাই। যেসব মুক্তিযোদ্ধা পদস্খলিত হয়েছে, তাদেরকে আমাদের অনেকটা ক্ষমার চোখে দেখতে হবে। আমার বিশ্বাস একজন সত্যিকারের মুক্তিযোদ্ধা কখনো বিপথে যেতে পারে না। যারা বিপথগামী হয়েছে, তাদের কেউই ইচ্ছাকৃত ভাবে বিপথে যায়নি। কেন তারা বিপথে গিয়েছে সেটা আমাদের যাচাই করে দেখা উচিত।

প্রঃ মাননীয় হাই কমিশনার সাহেব, আপনার কাছে একাত্তরের রণাঙ্গনের অনেক তথ্য জানতে পারলাম। এসব তথ্য শুধু আমার কাছে নয়, বাংলাদেশের জনগণের কাছে এক অমূল্য সম্পদ। এই সাক্ষাৎকারের সুযোগ দানের জন্য আপনাকে জানাই অনেক ধন্যবাদ।

উঃ ধন্যবাদ।

মেজর জেনারেল (অবঃ) সি, আর, দত্ত বীর উত্তম

একাত্তরের রণাঙ্গনের চার নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক ছিলেন মেজর সি, আর, দত্ত। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর রণাঙ্গনে তাঁর বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য অন্যান্য সেক্টরের কমাণ্ডারের ন্যায় মেজর (পরবর্তীকালে মেজর জেনারেল) সি, আর, দত্তকেও বীর উত্তম পদকে ভূষিত করা হয়। তাঁর সেক্টর সীমানা ছিল সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চল, খোয়াই, শায়েস্তাগঞ্জ রেল লাইন বাদে পূর্ব ও উত্তর দিকে সিলেট ডাউকি সড়ক পর্যন্ত। যুদ্ধ শেষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিয়োগ ক্রমে তিনি রংপুর ১২ ব্রিগেড কমাণ্ডারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি বাংলাদেশ রাইফেলস্-এর মহা-পরিচালক, চীফ অব লজিষ্টিক্স (প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার), মুক্তি যুদ্ধ কল্যাণ ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান ও জেলা গ্যাজেটিয়ারের প্রধান সম্পাদক হিসেবে নিয়োজিত থাকার পর সম্প্রতি দ্বিতীয় দফায় বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন।

মেজর জেনারেল দত্তের একটি বিস্তারিত সাক্ষাৎকার এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশের আশা রয়েছে।

লেঃ জেনারেল (অবঃ) মীর শওকত আলী, বীর উত্তম

লেঃ জেনারেল (অবঃ) মীর শওকত আলী বীর উত্তম

- ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট
- স্বাধীনতা যুদ্ধের সূত্রপাত
- জেনারেল জিয়া ও আমি
- বেতারে প্রথম বিদ্রোহী কণ্ঠ
- স্বাধীনতার ঘোষক কে
- চট্টগ্রাম রণাঙ্গনের কমাণ্ডার
- পাঁচ নম্বর সেক্টারের কমাণ্ডার
- প্রথম ভয়াবহ যুদ্ধ
- আমার রক্ষা ব্যূহ
- রামগড় ছেড়ে সাবরুম
- মিজো উপজাতি আওয়ামী লীগ সংগ্রাম পরিষদ
- আমাদের রণ কৌশল
- ৩রা ডিসেম্বর—চিরাচরিত যুদ্ধ শুরু
- সম্মিলিত মিত্র ও মুক্তি বাহিনী
- মুক্তিযোদ্ধা কারা
- স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র
- প্রেরণার স্থায়ী উৎস
- আল্লাহ্‌র ওপর বিশ্বাস
- কি শিক্ষা পেলাম
- বিজয়ের কৃতিত্ব কার
- বেগম মীর শওকতের সাথে কিছুক্ষণ

'৭১-এর রণাঙ্গনের পাঁচ নম্বর সেক্টারের অধিনায়ক ছিলেন মেজর মীর শওকত আলী। তাঁর সেক্টার সীমানা ছিল সিলেট জেলার পশ্চিমাঞ্চল (সিলেট/ডাউকী থেকে সুনামগঞ্জ ও বাঁ দিকে বার্সোরা নামক স্থান পর্যন্ত), এক কথায় বলা যায় ডাউকী থেকে ময়মনসিংহের সীমান্ত পর্যন্ত। ২৫শে মার্চ, '৭১ মেজর মীর শওকত আলী ছিলেন চট্টগ্রামের ষোল শহরে ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টে। এই রেজিমেন্টের সেকণ্ড-ইন্‌-কমাণ্ড ছিলেন মেজর (তৎকালীন) জিয়াউর রহমান। মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে তিনি ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙ্গালী অফিসার ও সৈনিকদের নিয়ে ২৫শে মার্চ '৭১ রাতেই স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। '৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য ১১টি সেক্টারের অন্যান্য প্রধানের সাথে মেজর (পরে লেঃ জেনারেল) মীর শওকত আলীকেও বীর উত্তম পদক প্রদান করা হয়।

জুলাই '৮১তে তাঁকে লে: জেনারেল পদে উন্নীত করার পরপরই সেনাবাহিনী থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। লে: জেনারেল (অব:) মীর শওকত আলী, বীর উত্তম, বর্তমানে পশ্চিম জার্মানীতে বাংলাদেশের হাই কমিশনার হিসেবে নিয়োজিত আছেন। ইতিপূর্বে বাংলাদেশের হাই কমিশনার হিসেবে মিশরে প্রথম দায়িত্বভার নেয়ার আগেই ২১শে জুলাই '৮১ রণাঙ্গনের তথ্যবহুল এই সাক্ষাৎকারটি আমি নিয়েছিলাম।

প্র: কখন কি ভাবে আপনি একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলেন?

উ: ১৯৭১ সালের জানুয়ারী মাসে কোয়েটা ষ্টাফ কলেজ থেকে আমাকে চট্টগ্রামের ষোল শহরে ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টে পোষ্টিং দিয়ে পাঠানো হয়। মার্চ, '৭১-এর প্রথম ভাগে আমি ছুটিতে ছিলাম। ১৫ই মার্চ-এর দিকে যখন অসহযোগ আন্দোলন খুব জোরদার হচ্ছিল এবং ইতিপূর্বে ৭ই মার্চ, '৭১ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোহ্রাওয়ার্দী উদ্যানে ভাষণ দিলেন, তখন থেকেই আমরা বাঙ্গালী সৈন্যরা চিন্তা করছিলাম যে একটা গণ্ডগোল বাঁধবে এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য আমাদের সবাইকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। চট্টগ্রামের ষোল শহরে ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমাণ্ডার ছিলেন তখন কর্ণেল জানজুয়া। মেজর জিয়াউর রহমানও (পরবর্তীকালে লে: জেনারেল এবং রাষ্ট্রপতি) ছিলেন এই ব্যাটালিয়ানের সেকেণ্ড-ইন্-কমাণ্ড। জেনারেল জিয়া এবং আমি ছাড়াও ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টে আরো কয়েকজন বাঙ্গালী অফিসার ছিলেন। ১৫ই মার্চ '৭১-এর দিকে আমি এই ব্যাটালিয়ানে যোগদান করি। ২৫শে মার্চ, '৭১ রাত থেকে যখন হত্যাকাণ্ড শুরু হয়, তখন স্বভাবতঃই আমি বাঙ্গালী হিসেবে আমার যা কর্তব্য সেটাই করেছি। এতে জড়িয়ে পড়ার মত কিছুই নেই। এটা কর্তব্য ছিল। সমস্ত বাঙ্গালীর সৈন্যেরই কর্তব্য ছিল এটা। সবাই এতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কিছু কিছু সৈন্য হয়ত সুযোগ পাননি কিংবা কিছু সংখ্যক সৈন্য আগেই ধরা পড়ে গিয়েছিলেন। আমাদের যেহেতু বাঙ্গালী ব্যাটালিয়ান ছিল সেই জন্য আমরা ধরা পড়িনি। আমরা আমাদের কর্তব্য করেছি মাত্র। ২৫শে মার্চ, '৭১ রাতে যখন জেনারেল জিয়াকে চট্টগ্রাম বন্দরের দিকে পাঠানো হ'ল মূলতঃ সেই সময় থেকেই স্বাধীনতা যুদ্ধ আমাদের পক্ষ থেকে শুরু হয়।

উক্ত দুর্যোগের রাত প্রায় ১১-৩০ মিনিট সময়ে আমরা টেলিফোনে জানতে পারলাম যে ঢাকায় হত্যাকাণ্ড শুরু হয়ে গিয়েছে। স্বভাবতঃই আমরা ধরে নিলাম ঢাকায় যখন হত্যা কাণ্ড শুরু হয়েছে, নিশ্চয় এটা সারা বাংলাদেশ ব্যাপী শুরু হয়ে গিয়েছে। কারণ সেনাবাহিনীতে মাত্র এক জায়গায় তাদের পরিকল্পনা

কার্যকর করে না; এ জাতীয় পরিকল্পনা সব জায়গাতেই একই সময় কার্যকর করাই স্বাভাবিক। আমাদের কর্তব্য আমরা আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম। কারণ ২৫শে মার্চের আগে থেকেই আন্দোলনের যে রূপ নিচ্ছিল, সে সবে যখনই আমাদের নিযুক্ত করা হতো ব্যারিকেড সরানোর জন্য কিংবা জনগণকে হটানোর জন্য, আমরা তাদের বিরুদ্ধে কাজ কখনো ঠিকমত করতাম না। কার্যতঃ আমরা সেই চূড়ান্ত অসহযোগের সময় থেকেই আন্দোলনের প্রতি আমাদের সমর্থন জানাতে শুরু করি। কাজেই ২৫শে মার্চ, '৭১ রাতে যখন হানাদার বাহিনী বাঙ্গালী হত্যাকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তখন আমাদেরও তাৎক্ষণিক ভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া বাদে অন্য কোনও বিকল্প ছিল না।

বাঙ্গালী হত্যাকাণ্ড শুরু হওয়ার খবর দিয়ে সম্ভবতঃ আমাদের কাছে প্রথম টেলিফোন করেছিলেন চট্টগ্রামের হান্নান ভাই (চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের তৎকালীন সভাপতি)। সম্ভবতঃ তিনিই চট্টগ্রামে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছিলেন।

আগেই বলেছি, জেনারেল জিয়া এবং আমি একই ব্যাটালিয়ানে ছিলাম। তিনি যেহেতু আমার চাইতে সিনিয়র ছিলেন, সেহেতু তিনিই আমাদের কমাণ্ডারের দায়িত্ব পালন করেছেন। আমি তাঁর দু'নম্বর হিসেবে কাজ করেছি। স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা পর্যায়ে আমরা যে একই ব্যাটালিয়ানে ছিলাম, এটা অনেকেই হয়ত জানেন না। বেশীর ভাগ জনসাধারণের ধারণা আমরা আলাদা ছিলাম। আমরা একই সঙ্গে ছিলাম এবং একই সঙ্গেই বিদ্রোহ করেছিলাম। জেনারেল জিয়াউর রহমানও তাঁর বিবৃতিতে উল্লেখ করেছেন: 'আমি বিদ্রোহ করে পোর্ট থেকে ফিরে এসেই শওকাতের কাছে এলাম, এবং শওকাত আমার সাথে হাত মিলালো'।

প্র: এই যে দুঃসাহসিক কাজ আপনারা করলেন এর পেছনে অন্যান্য ক্যান্টনমেন্টের বাঙ্গালী সৈন্যদেরও পূর্ব সমর্থন ছিল এবং তাঁরাও আপনাদের মত এগিয়ে আসছিলেন এটা আপনারা বুঝেছিলেন কি?

উ: এটা আমি বলতে পারবো না। কারণ রাজনীতিতে আমি কখনো জড়াতাম না। কিন্তু এটা রাজনীতি ছিল না। এটা ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধ। এতে জাতির জীবন মরণের প্রশ্ন জড়িত হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া অন্যান্য সেক্টার থেকে বাঙ্গালী সৈন্যরা এগুচ্ছিলেন কিনা সে তথ্য আমাদের জানার উপায় ছিল না। সে তথ্য জানা না জানার গুরুত্ব দেয়ার সময়ও তখন আমাদের ছিল না। এমনকি তখন আমার বাবা-মা ছিলেন, আমার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েকে নিয়ে কুমিল্লায়। তাঁদের নিরাপত্তা সম্পর্কে চিন্তা করার অবকাশও তখন আমাদের ছিল না। কাজেই তাৎক্ষণিক ভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমরা আমাদের

কর্তব্য করেছি মাত্র। অবশ্য আমরা ভেবেছি অন্য সবাইও হয়ত আমাদের মত এগিয়ে আসছিলেন। শুধু ক্যান্টনমেন্টেই নয়, আমরা মনে করেছি সমস্ত বাঙ্গালীই এই যুদ্ধে ছিলেন। কারন এটা ছিল বাঙ্গালী জাতির প্রশ্ন ; বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্বের প্রশ্ন।

প্র : এখানে একটি রাজনৈতিক প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। আপনারা এই যে যুদ্ধ শুরু করলেন, এ যুদ্ধে আপনারা আওয়ামী লীগের কাছ থেকে কোনও প্রকারের নির্দেশ বা উপদেশ পেয়েছিলেন কি? কারণ আওয়ামী লীগই তখন সারা দেশে অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন।

উ : নির্দেশের কথা বলতে পারবো না। সেটা অন্য কেউ হয়ত পেতে পারেন। কিন্তু একটা সমর্থনত তখন সারা দেশেই ছিল। আমরা সেনাবাহিনীর শৃংখলার ভিতরে থেকে যতটুকু পেরেছি, যখন থেকে আন্দোলন শুরু হোলো যখন থেকে বঙ্গবন্ধু বাঙ্গালী জাতির স্বাধীনতার ব্যাপারে বলতে শুরু করলেন এবং ছয়দফা দিলেন, তখন থেকেই আমরা খুব খুশী, যে শেষ পর্যন্ত আমরা বাঙ্গালীকে একটি জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব।

প্র : আওয়ামী লীগের কেউ আপনাদের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন কি?

উ : আমার সাথে কেউ যোগাযোগ করেননি। তবে পরে যোগাযোগ করেছেন।

প্র : বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা বেতারে কখন প্রচারিত হয়েছে বলে আপনি বলতে চান?

উ : এটা একটা বিতর্কিত প্রশ্ন। বেতারে স্বাধীনতা ঘোষণা যেটা নিয়ে সব সময় বিতর্ক চলতে থাকে যে জেনারেল জিয়া করেছেন, না আওয়ামী লীগ থেকে করেছেন ; আমার জানা মতে সব চাইতে প্রথম বোধ হয় চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে হান্নান ভাইর কণ্ঠই লোকে প্রথম শুনেছিলেন। এটা ২৬শে মার্চ '৭১ অপরাহ্ন দু'টার দিকে হতে পারে। কিন্তু যেহেতু চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের প্রেরক যন্ত্র খুব কম শক্তিসম্পন্ন ছিল, সেহেতু পুরা দেশবাসী সে কণ্ঠ শুনতে পাননি। কাজেই যদি বলা হয়, প্রথম বেতারে কার বিদ্রোহী কণ্ঠে স্বাধীনতার কথা উচ্চারিত হয়েছিল, তা'হলে আমি বলব যে চট্টগ্রামের হান্নান ভাই সেই বিদ্রোহী কণ্ঠ। তবে এটা সত্য যে পরদিন অর্থাৎ ২৭শে মার্চ, '৭১ মেজর জিয়ার ঘোষণা প্রচারের পরই স্বাধীনতা যুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ মোড় নেয়।

প্র : এবারে বলুন স্বাধীনতার ঘোষক কে ছিলেন?

উ : আপনার বিবেককেই জিজ্ঞাসা করুন। এটা অনস্বীকার্য্য যে ২৫ এবং ২৬শে মার্চ, '৭১-এর চরম মুহূর্তে প্রতিটি বাঙ্গালীর মনেই স্বাধীনতার কথা

প্রতিধ্বনিত হয়েছে। সেই হিসেবে প্রতিটি বাঙ্গালী সেদিন হয়ে উঠেছিল স্বাধীনতার এক একজন ঘোষক। কিন্তু কে সেই মহান নেতা যিনি সেদিন অন্তরালে থেকেও প্রতিটি বাঙ্গালীকে যোগিয়েছিলেন এই সাহস? কার আহ্বানে বাঙ্গালী সেদিন পেয়েছিল স্বাধীনতার প্রেরণা? ৭ই মার্চ, '৭১ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (পরবর্তীকালে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান) কে জাতিকে স্বাধীনতার ডাক শুনিয়েছিলেন? ২৬শে মার্চ '৭১ সন্ধ্যা হতে পরবর্তী সময়ে চট্টগ্রামের মূল বেতার কেন্দ্র থেকে নিরাপদ দূরত্বে কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে অবস্থান করে যারা স্বাধীনতার কথা বললেন, বিভিন্ন ঘোষণা প্রচার করলেন, কে তাঁদের সেদিনের প্রেরণার উৎস দিলেন? কার পক্ষে তারা প্রচার করেছিলেন সে সব ঘোষণা, স্বাধীনতার কথা? কাজেই বলুন কে আমাদের স্বাধীনতার স্থপতি? কে বা কারা ঘোষক ছিলেন, সেটা কি শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতা ছিল না? এই আনুষ্ঠানিকতার বিতর্কে আমি জড়িয়ে পড়তে চাই না।

প্রশ্ন : ২৭শে মার্চ, '৭১ মেজর জিয়াউর রহমান কি পরিস্থিতিতে কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে সংগঠিত বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে গেলেন এবং স্বাধীনতা ঘোষণা পাঠ করলেন?

উ : ২৫শে মার্চ, '৭১ রাতে ঢাকার হত্যাকাণ্ডের খবর পাওয়ার পরই আমরা চট্টগ্রামে আমাদের অধীনস্থ সমস্ত ব্যাটালিয়নকে হাতে নিয়েছিলাম। আমরা ভেবে দেখলাম যে নুতন পাড়া ক্যান্টনমেন্টে পাকিস্তান বাহিনী নিয়ন্ত্রিত ট্যাঙ্ক ছিল। আমরা ছিলাম ষোল শহরে মাত্র দু'মাইল দূরত্বে। আমরা দেখলাম, আমাদের হাতে কোনও ট্যাঙ্ক ছিল না এবং কোনও অস্ত্রশস্ত্রও আমাদের অর্থাৎ ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের হাতে ছিল না। ইতিপূর্বেই ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট পাকিস্তানে চলে যাবে বলে অধিকাংশ অস্ত্রই পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। আমাদের হাতে শুধু ছিল কিছু রাইফেল এবং এল-এম-জি ধরনের স্বল্প সংখ্যক অস্ত্র। ভারী কোনও অস্ত্র ছিল না। আমার সাথেই জেনারেল জিয়া আলাপ করলেন। আমরা আলাপ করে দেখলাম যে আমরা যদি ষোল শহর বিল্ডিং-এর ভিতর অবস্থান করি এবং এই অবস্থায় যদি ট্যাঙ্ক আসে, তা'হলে আমরা ট্যাঙ্ক ঠেকাতে পারব না। কারণ ট্যাঙ্ক ঠেকানোর মত কোন অস্ত্রই আমাদের কাছে ছিল না। ট্যাঙ্ক থেকে দু'তিনটা গোলা ছুঁড়লেই আমাদের অনেক সৈন্য মারা যাবে। তখন আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমাদের ঐ এলাকা থেকে বাইরে চলে যাওয়া উচিত এবং নিরাপদ দূরত্ব থেকে হেড্ কোয়ার্টার বেস্ বানানো উচিত। এ ছাড়া আমাদের অধীনস্থ জোয়ানদের শপথ নেয়া উচিত। শপথ নিয়ে পুরো

ব্যাপারটা বুঝিয়ে তারপর যুদ্ধে যাওয়া উচিত। আমরা সোজা প্রথমে গেলাম কালুরঘাট। সেখানে ভোর রাতের দিকে আমরা মার্চ করে গেলাম। তখন খুব কুয়াশা ছিল এবং আল্লাহ্‌র কি ইচ্ছা সেদিন অর্থাৎ ২৬শে মার্চ, '৭১ সকাল ৮টা কি ৯টা পর্যন্ত কুয়াশা ছিল। কালুরঘাটে পৌঁছে আমরা সবাই কন্‌ফারেন্স করলাম। এতে কিছু বি-ডি-আর অফিসার এবং জোয়ানও ছিলেন। এই কন্‌ফারেন্সে সিদ্ধান্ত নেয়া হ'ল যে আমরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে চট্টগ্রাম রক্ষার জন্য পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাব। আমাদের আক্রমণের মূল লক্ষ্যবস্তু ছিল পোর্ট এবং ক্যান্টনমেন্ট। এই সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় আওয়ামী লীগের কিছু নেতৃবৃন্দ আমাদের সাথে এসে যোগ দিয়েছিলেন। এইত গেল ২৬শে মার্চ '৭১-এর কথা। ঐদিন আমরা খোঁজখবর নিয়েছিলাম কোথায় কি ঘটছিল। আমি একখানা জীপ নিয়ে পুরা শহর ঘুরে দেখলাম। আমি টহল দেয়ার সময় আগ্রাবাদের মোড়ে আমার জীপের ওপর একটি এল, এম, জি বার্স্ট ফায়ার এলো। আমি কোনও প্রকারে জীপ ঘুরিয়ে ফেরত গেলাম এবং জেনারেল জিয়াকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করলাম এবং সেভাবে আমাদের দলকে নিয়োজিত করলাম।

২৭শে মার্চ, '৭১ মনে হয় জেনারেল জিয়া বুঝতে শুরু করলেন যে বেতারে একটা ঘোষণা প্রচার করা দরকার। ঐ তারিখেই সন্ধ্যায় কালুরঘাট ট্রান্সমিটার থেকে এটা করলেন তিনি। বেশ কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতাও ঐ সময় খুব তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রফেসার নুরুল ইসলাম, আতাউর রহমান খান কায়সার, হান্নান ভাই এবং এম, আর, সিদ্দীকী। তাঁরাও সম্ভবতঃ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে রেডিওতে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে কিছু প্রচারিত হওয়া উচিত। অপরদিকে জেনারেল জিয়া কি বলবেন তার একটা খসড়াও প্রস্তুত করে নিলেন। ২৭শে মার্চ, '৭১ সন্ধ্যার পর চট্টগ্রামের কালুরঘাট ট্রান্সমিটার থেকে প্রচারিত হ'ল জেনারেল জিয়ার (তৎকালীন মেজর) ভাষণ।

প্রঃ আমি যতদূর তথ্য সংগ্রহ করেছি চট্টগ্রামের ডাক্তার আনোয়ার আলী, তাঁর স্ত্রী মন্‌জুলা আনোয়ার, চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের তৎকালীন নিজস্ব শিল্পী জনাব বেলাল মোহাম্মদ প্রমুখ চট্টগ্রামে বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সংগঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং জনাব বেলাল মোহাম্মদ মেজর জিয়াউর রহমানকে তাঁর ষোল শহরের ছাউনী থেকে ঐ ধরনের কিছু প্রচারের জন্য অনুরোধ করে এনেছিলেন। এ সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন কি?

উঃ এটা হতে পারে। চট্টগ্রামের জনগণ এবং চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের সবাই

তখন অসহযোগ আন্দোলনে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। কাজেই তাঁরা যে এটা করতে পারেন এ সম্পর্কে আমার কোনও সন্দেহ নেই। আমি তখন সৈন্যদের সংগঠনের কাজে খুব ব্যস্ত ছিলাম। এ কারণে বেতার সংগঠন সম্পর্কে আমার তেমন কোনও ধারণা নেই।

প্রঃ ৩০শে মার্চ '৭১ হানাদার বাহিনী বোমারু বিমান থেকে চট্টগ্রামের কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে বোমা ফেলে ট্রান্সমিটারটি বিকল করে দিয়েছিল। এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

উঃ আমি সেদিন কয়েক ঘন্টার জন্য পটিয়া গিয়েছিলাম। ওখানে আমার প্রধান কাজ ছিল ছাত্র-জনতাকে যুদ্ধের জন্য সংগঠন করা। বোমা ফেলার পর কয়েকজন বেতার কর্মী তাঁদের একটি ওয়ারলেস সেট সরিয়ে পটিয়াতে আমার কাছে নিয়ে এসেছিলেন। কিছু লোক, কিছু বি, ডি, আর কিছু আর্মি এবং কয়েকজন বেতার কর্মী সমন্বয়ে ছিল এই দল। তাঁরা ঐ ওয়ারলেস সেট নিয়ে আমাকে বললেন যে মেজর জিয়া বলেছেন এটাকে রামগড় পাঠিয়ে দিতে। আমি কিছু সৈন্য দিলাম। তারা বান্দরবনের পথে ওয়ারলেস সেটটি নিয়ে চলে গেলেন।

প্রঃ ১০ই এপ্রিল, '৭১ অস্থায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়েছিল এবং ১৭ই এপ্রিল, '৭১ কুষ্টিয়ার বৈদ্যনাথ তলার আম বাগানে দেশী-বিদেশী সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে এই সরকার আত্মপ্রকাশ করেছিল। এ সম্পর্কে আপনি কখন জানতে পেরেছিলেন এবং আপনার মন্তব্য কি?

উঃ যখন এই ঘটনা ঘটে তখন আমি ছিলাম কালুরঘাটে। সেখানে ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং বি-ডি-আর এর কিছু সৈন্য নিয়ে আমি তখন যুদ্ধরত। সরকার গঠন এবং আত্মপ্রকাশের ঘটনা আমি জানতে পেরেছি ভারত সীমান্তে পার হয়ে যাওয়ার পর (২রা মে, '৭১)। ঐ সময় পর্যন্ত আমাদের হাতে কোনও রেডিও সেট বা সংবাদাদি জানার জন্য কোনও মাধ্যম ছিল না। কাজেই ভারত সীমান্তে আসার পূর্ব পর্যন্ত আমার পক্ষে কিছুই জানার উপায় ছিল না।

কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধের সব চাইতে আমার বড় দুঃখ এই যে ১৭ই এপ্রিল, '৭১ যে সময়ে মেহেরপুরে ভারত সীমান্তের একেবারে কাছে রাজধানীর কথা ঘোষণা করা হল এবং নেতৃবৃন্দ সরকার গঠন সহ অন্যান্য আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এবং পরিচিতি উপস্থাপন করলেন, তখন থেকে কক্স বাজার, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি এবং সমস্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা এপ্রিলের শেষ পর্যন্ত আমার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ছিল। এতবড় এলাকা ছেড়ে তারা ওখানে সীমান্তের কাছে কেন হেডকোয়ার্টার

ঘোষণা করতে গেলেন, রাজধানী বানাতে গেলেন সেটাই আমার কাছে আশ্চর্য্য লাগল। দুঃখ আমার এটাই যে যাঁরা খুব তাড়াতাড়ি সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে গেলেন তাঁদের নামই বিভিন্নভাবে প্রচারিত হ'ল। আমি তখন উল্লিখিত এলাকাগুলি আমার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রেখে পুরা ব্যাটালিয়ান এবং বি-ডি-আরকে নিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তান বাহিনীর সাথে যুদ্ধরত। অথচ আমার নাম আপনি বাংলাদেশ ডকুমেন্টের কোথাও দেখবেন না। আপনি একজন ক্যাপ্টেন-এর নামও দেখবেন। কিন্তু সেক্টার কমাণ্ডার হিসেবে আমার নাম দেখবেন না। আমি আজো বুঝতে পারছি না, আপনি যখন স্বাধীনতা যুদ্ধ করলেন, তখন দেশের অভ্যন্তরে যতক্ষণ পারা যায় যুদ্ধ না করে কেন আপনি বর্ডার অতিক্রম করে ভারতে চলে গেলেন।

প্র: একজন সেক্টার কমাণ্ডার হিসেবে আপনি কখন কিভাবে কাজ শুরু করলেন?

উ: আগেই বলেছি প্রথম আমি জেনারেল জিয়ার সাথে এক নম্বর সেক্টারে সেকণ্ড-ইন্-কমাণ্ড অর্থাৎ দুই নম্বর হিসেবে কাজ শুরু করি। ৩১শে মার্চ, '৭১-এর পর জেনারেল জিয়া আমার সাথে আর ছিলেন না। তিনি রামগড় হয়ে সীমান্তের ওপারে চলে গিয়েছিলেন। কাজেই ৩০শে মার্চ, '৭১-এর পর থেকে উল্লিখিত সেক্টারের পুরো বাহিনীর কমাণ্ড আমার হাতে এসে পড়ে। আমি, বি-ডি-আর, ছাত্র-জনতা এবং আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছা সেবক দল নিয়ে গঠিত বাহিনী নিয়ে ২রা মে, '৭১ পর্যন্ত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থেকে আমি পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেছি। ২রা মে, '৭১ বিকেলে আমরা সীমান্তের ওপারে চলে গিয়েছিলাম। কিছুদিন পর জেনারেল ওসমানী সাহেব আমাকে ডেকে বললেন: সিলেট এলাকায় আমাদের কোনও সেক্টার খোলা হয়নি এবং সিলেটের সুনামগঞ্জ, ছাতক এবং সালুটিকর এইসব এলাকার অনেক বি-ডি-আর এবং সৈন্য বিশৃংখল অবস্থায় আছেন। কাজেই তিনি আমাকে অবিলম্বে শিলং চলে যেতে বললেন। তিনি নির্দেশ দিলেন ওখান থেকে আমি ছাতক এবং সুনামগঞ্জ এলাকায় গিয়ে যেন যুদ্ধ সংগঠন করি।

প্র: আপনার আনুষ্ঠানিক নিযুক্তি এবং সেক্টার সম্পর্কে ব্যাখ্যা দান করুন।

উ: সরকার গঠিত হওয়ার পর আমাকে পাঁচ নম্বর সেক্টারের কমাণ্ডার নিযুক্ত করা হ'ল। এলাকা দেয়া হ'ল ডাউকী থেকে সুনামগঞ্জেরও বাঁ দিকে বার্সোরা নামক স্থান পর্যন্ত। এক কথায় বলা যায় ডাউকী থেকে ময়মনসিংহের সীমান্ত পর্যন্ত ছিল আমার সেক্টার সীমানা। সিলেট গিয়ে আমি দেখলাম আমাদের

লোকজন খুব বিশৃংখল অবস্থায় ছিলেন, তাদের জন্য ওখানে না ছিল কোনও রশদপত্র, না ছিল কোনও যুদ্ধ সংগঠন।

আমি আমার এলাকাটিকে পাঁচটি সাব সেক্টারে ভাগ করে দিয়েছিলাম। এই সাব সেক্টারগুলি ছিল ডাউকী, ভোলাগঞ্জ, শেলা, বালাত এবং বার্সোরা। আমি বুঝলাম যে বিদেশের মাটিতে বসে দেশে যুদ্ধ করা যায় না। কাজেই সবদিকে আক্রমণ চালিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে জায়গা করে নেয়াই আমি আমার প্রধান কর্তব্য মনে করলাম। এরি প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সীমান্তের দশ মাইল অভ্যন্তরে আক্রমণ পরিচালনা করলাম এবং আমরা সফল হ'লাম। এক পর্যায়ে আমরা সুরমা নদীর উত্তর ভাগে পুরা অংশ আমাদের দখলে নিয়ে এলাম। আমরা আমাদের হেডকোয়ার্টার স্থাপন করলাম বাঁশতলায় (ছাতকের উত্তরে বাংলাদেশেরই একটি এলাকা)। সিলেট থেকে নদীপথে যেসব ছোট ছোট বার্জ এবং ছোট ছোট জাহাজ রশদপত্র নিয়ে ঢাকার দিকে যেতো সেগুলিকে আমরা পথে ধরতাম এবং রশদপত্রাদি কেড়ে নিয়ে কিছু আমাদের কাজে লাগাতাম এবং কিছু বাংলাদেশ হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিতাম। সেখান থেকে এসব রশদপত্রাদি অন্য সাব সেক্টারে চলে যেতো।

প্র: আপনার এই সংগঠন পর্যায় কোন্ মাস থেকে শুরু হয়েছিল?

উ: এসব হুবহু দিন তারিখ আমার মনে নেই। তবে ধরুন মে-জুন, '৭১ কিংবা অনুরূপ সময় হতে পারে।

প্র: শুরুতে আপনার সৈন্য সংখ্যা কতজন ছিল? তখন নূতনদের প্রশিক্ষণের কি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন?

উ: প্রথমে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, বি-ডি-আর, পুলিশ এবং মুক্তিযুদ্ধে উৎসাহী কিছু ছাত্র-জনতা সহ প্রায় চারশত লোক পেলাম। বর্ডারের ওপারে এবং বাঁশতলায় আমরা ট্রেনিং ক্যাম্প করলাম। ভারত থেকে দু'একজন জেনারেল এসেছিলেন তাঁরাও কয়েকটি ট্রেনিং ক্যাম্প সংগঠন করলেন। দেশের অভ্যন্তর থেকে যাঁরা ওখানে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্য থেকে শক্ত সামর্থদের বেছে নিয়ে ট্রেনিং দেয়া হ'ল। আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে এক পর্যায়ে এই সংখ্যা প্রায় বার হাজারে গিয়ে দাঁড়ালো।

প্র: আপনার কমাণ্ডে সব চাইতে ভয়াবহ যুদ্ধ কোথায় এবং কখন সংগঠিত হয়েছিল?

উ: প্রথম ভয়াবহ যুদ্ধ হয়েছিল কানুরঘাটে ১১ই এপ্রিল, '৭১। ঐ সময়

জেনারেল জিয়া আমার সাথে ছিলেন না। তিনি ৩০শে মার্চ '৭১-এর পরই রামগড় চলে গিয়েছিলেন।

এই যুদ্ধ পরিচালনা আমার কমাণ্ডে হয়। সৈন্য ছিলেন অষ্টম বেঙ্গল রেজিমেণ্ট, বি, ডি, আর এবং স্থানীয় কিছু স্বেচ্ছাসেবী যেমন ছাত্র, শ্রমিক এবং অন্যান্য যাঁরা অস্ত্র সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন এমন কিছু লোকজন। আমার বিপক্ষে ছিল পাকিস্তান বাহিনীর দু'টি ব্রিগেড। এ ছাড়া কর্ণফুলীতে তাদের যে নৌ-জাহাজ ছিল সেটি তারা শঙ্খনদী হয়ে কালুরঘাটের কাছাকাছি নিয়ে এসে ওখান থেকে নেভেল গান দিয়ে আমাদের এলাকায় বম্বিং শুরু করে দিয়েছিল। তাদের ব্রিগেড-এর যে আর্টিলারী ছিল সেই আর্টিলারী দিয়েও তারা বম্বিং করতে থাকে ১০ই এপ্রিল, '৭১ থেকে। ১১ই এপ্রিল তাদের কিছু সৈন্য মহিলার পোষাক এবং কিছু সৈন্য সিভিল এর পোষাক পরে জয়বাংলা বলতে বলতে আমাদের দিকে অর্থাৎ কালুরঘাটের পুলের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। চট্টগ্রামে আমাদের পক্ষে এবং তাদের বিপরীতে ছিলেন ক্যাপটেন হারুন, শমসের মবিন চৌধুরী, লেঃ মাহফুজ এবং অন্য কয়েকজন অফিসার। এই অবস্থায় আমাদের লোকজন প্রথমে বুঝতে পারেননি তারা পাকিস্তানী। যখন শত্রু জয়বাংলা বলতে বলতে একেবারে কালুরঘাটের পুলের ওপর চলে এলো, তখনই মাত্র আমাদের লোকজন বুঝতে পারলেন যে তারা সিভিলিয়ান বা মহিলা কেউ ন'ন। তখন আমাদের পক্ষ ফায়ার করতে শুরু করলেন। শত্রু পক্ষের গোলার আঘাতে ক্যাপটেন হারুন এবং শমসের মবিন আহত হলেন। মাহফুজ চলে আসতে পেরেছিলেন। কালুরঘাট ছেড়ে আমরা পটিয়ার দিকে চলে এলাম।

প্রশ্ন : তখন আপনারা মোট কতজন ছিলেন?

উ : আমরা প্রায় সাড়ে তিনশ'র মত ছিলাম। এই যুদ্ধে পাকিস্তান বাহিনী পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল। ব্রিগেডিয়ার মিঠঠা খান হেলিকপ্টার থেকে ওদের পক্ষে এই যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল (পরে জেনেছি)।

প্র : এই যুদ্ধে আপনাদের প্রধান অস্ত্র কি ছিল?

উ : আমাদের কিছু রাইফেল ছিল, কিছু এল, এম, জি এবং দু'টি তিন ইঞ্চি মর্টার ছিল। এই মর্টার দুটির কোনও অবলোকন ব্যবস্থা Aiming Side ছিল না। আন্দাজে ছুঁড়তে হ'ত।

প্র : আপনাদের পক্ষে হতাহত কেমন হয়েছেন?

উ : আমাদের পক্ষে তেমন হতাহত হননি। ওদের পক্ষে কতজন হতাহত হয়েছিল তা-ও বলা মুস্কিল, তবে সংখ্যা অনেক বেশী ছিল। ইতিপূর্বে ৮ই এপ্রিল

আর একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। তখন পাক বাহিনীর একটি দল কালুরঘাটের প্রায় এক মাইল উত্তরে একটি কৃষি ভবনে দখল নিয়েছিল। পাক বাহিনীর শক্তি ছিল একটি প্লাটুন। পাক সেনারা ওখানে এসে পড়ায় শহরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থানরত আমাদের সৈন্যের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। আমি কয়েকজন অফিসারকে পাক বাহিনীর প্রতিরক্ষা ব্যূহের ওপর আক্রমণ চালাবার জন্য বললে কেউ তখন এগুতে উৎসাহিত হলেন না। তবে আমার কথা মোতাবেক লেঃ শমসের মুবিন চৌধুরী কিছু সৈন্য নিয়ে আক্রমণ পরিচালনা করেছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হতে পারেননি। উপরন্তু এই আক্রমণ পরিচালনা কালে নায়েক নায়েব আলী পাক বাহিনীর গুলিতে নিহত হয়েছিলেন। এমনি অবস্থায় আমি নিজে মাত্র ১০ জন সৈন্য নিয়ে ৯ই এপ্রিল হাওলাদার হামনু মিঞা, নায়েক তাহের এবং ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্টের কয়েকজন বি, ডি, আর সহ সকাল ৮-৩০ মিঃ সময়ে কৃষি ভবনে অবস্থানরত পাক ঘাঁটি আক্রমণ করি। আমার আক্রমণে প্রায় ২০ জন পাক সেনা (১ জন ক্যাপটেন ও ১ জন সুবেদার সহ) নিহত হয় এবং তারা ঐ পোষ্ট ছেড়ে পালিয়ে যায়।

প্র : তারপর?

উ : তারপর আমি কালুরঘাট ব্রীজের চট্টগ্রামের দিক পূর্ণ দখল করেছিলাম।

১০ই এপ্রিল, '৭১ খবর পেলাম পাক সেনাবাহিনী পটিয়ার কালা পুলের দিক থেকে আমাদের ওপর আক্রমণ করবার চেষ্টা করছে। আমি তখনই ক্যাপটেন খালেকু জ্জামান চৌধুরীকে কিছু সৈন্য দিয়ে পটিয়ার কালাপুলে পাঠালাম। ১১ই এপ্রিল ভোরবেলা আমি নিজে পটিয়ার কালাপুলের অবস্থা জানতে গেলাম। ঐ তারিখ সকাল ৮-৩০ মিঃ সময়ে ক্যাপটেন ওয়ালি আমাকে খবর পাঠালেন পাক সেনারা প্রায় সাত থেকে আটশত সৈন্য নিয়ে কালুরঘাট আক্রমণ করেছে; ক্যাপটেন হারুন গুরুতররূপে আহত, লেঃ শমসের মুবিন চৌধুরীর কোনও খবর পাওয়া যাচ্ছে না; সবাই ছত্রভঙ্গ। পাকবাহিনীর অপর দল চট্টগ্রামের কাপ্তাই রোডে লেঃ মাহফুজের ওপর আক্রমণ করেছে। এ সংবাদ পেয়ে আমি ওয়ালীকে বললাম, "আমাদের লোকদের একত্রিত করবার চেষ্টা কর, পরিস্থিতি ভালভাবে জেনে নাও, আমি আসছি।" সকাল ৯টার দিকে আমি কালুরঘাট এসে পৌঁছাই। ওখানে গিয়ে আমি মেজর জিয়ার সাথে ওয়ারলেসে যোগাযোগের চেষ্টা করলাম।

পরে আমি তাদের সবাইকে পিছনে সরে আসতে বললাম। লেঃ মাহফুজকে মদনঘাট ডিফেন্সে অবস্থান করতে বললাম যতক্ষণ না আমার কালুর-

ঘাটের ডিফেন্সের সবাই পিছু হটতে পারে। আমরা সবাই কালুরঘাট থেকে পটিয়াতে একত্রিত হলাম। এবং সেখান থেকে সবাই বান্দরবন রওয়ানা হই। আমার সাথে সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় ৪৫০ জন। (তৎকালীন ই, পি, আর, পুলিশ এবং বেঙ্গল রেজিমেন্ট সহ)।

আমরা ১২ই এপ্রিল বান্দরবন পৌঁছেছিলাম। ঐ তারিখেই কাপ্তাই হয়ে রাঙ্গামাটি পৌঁছি। রাঙ্গামাটিতে আমরা ডিফেন্স নেবার পর মহালছড়িতে ব্যাটালিয়ান হেডকোয়ার্টার স্থাপন করলাম। লেঃ মাহ্‌ফুজ শত্রুর ওপর আঘাত হেনে চলেছিল। কিন্তু পাক বাহিনীর ব্যাপক আক্রমণে টিকে থাকা দুরূহ বুঝে পার্শ্ববর্তী নোয়াপাড়া নামক স্থানে ডিফেন্স নেয়। সেখান থেকে তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাতে সার্থকতার সঙ্গে ডিফেন্স নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করলেন। শেষ পর্যন্ত আমার নির্দেশ মোতাবেক ১৪ই এপ্রিল লেঃ মাহ্‌ফুজ তার ২০০এর কিছু বেশী সৈন্য নিয়ে মহালছড়িতে আমার সঙ্গে মিলিত হন। ছুটি ভোগরত ক্যাপটেন আফতাব কাদের (আর্টিলারী) আমার কাছে ঐ তারিখে আসেন। বঙ্গ-সন্তান সাহসী বীর ক্যাপটেন আফতাব কাদেরকে মেজর জিয়া আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। তাকে আমার সৈন্যদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অফিসারের নেতৃত্বে ডিফেন্স নিতে পাঠালাম।

আমার রক্ষা ব্যূহকে যেসব স্থানে অবস্থান দিলাম সেগুলি ছিল:—

১। ক্যাপটেন আফতাব কাদেরের নেতৃত্বে প্রায় ১০০ সৈন্য রাঙ্গামাটির ঘাগড়াতে।

২। ক্যাপটেন খালেকুজ্জামান চৌধুরীর নেতৃত্বে ১০০ শত সৈন্য রাঙ্গামাটির মধ্যস্থলে বুড়িঘাটে।

৩। লেঃ মাহ্‌ফুজের নেতৃত্বে প্রায় ১০০ সৈন্য রাঙ্গামাটির বরকলের মধ্যস্থলে।

৪। সুবেদার মুত্তালিবের নেতৃত্বে প্রায় ১০০ সৈন্য রাঙ্গামাটি কুতুবছড়ি এলাকাতে।

অপরদিকে ১৫ই এপ্রিল পাক বাহিনী রাঙ্গামাটি শহরে পৌঁছে যায়। রাজা ত্রিদিব রায় পাক বাহিনীকে আহ্বান করে আনলেন।

১৬ই এপ্রিল-এর মধ্যে আমাদের সবাই নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান নিলেন। ক্যাপটেন ওয়ালীকে মেজর জিয়ার নির্দেশানুযায়ী রামগড় পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। ঐদিনই ক্যাপটেন কাদের তাঁর বাহিনী নিয়ে ঘাগড়া রেষ্ট হাউজে একজন অফিসার সহ এক প্লাটুন পাক বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। অত্যন্ত সফলতার

সঙ্গে ক্যাপটেন কাদের পাক বাহিনীর অফিসার সহ প্রায় ২০জন পাক সৈন্যকে নিহত করতে সমর্থ হ'ন। বাকী পাক সৈন্য পালিয়ে যায়। অপরদিকে আমাদের মুক্তিবাহিনীর পক্ষে কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। ক্যাপটেন কাদের নিরাপদে তাঁর ঘাঁটিতে ফিরে আসেন। ১৭ই এপ্রিল পাক বাহিনীর প্রায় ২০ জন সৈন্য একটি লঞ্চযোগে রেকি করতে বেরিয়েছিল। ক্যাপটেন খালেকুজ্জামান ওৎ পেতে ছিলেন। কিছুক্ষণ পরই পাক সেনারা বুঝতে পেরেছিল যে তারা মুক্তি বাহিনীর রক্ষাব্যূহের কাছাকাছি চলে এসেছে। পাক সেনারা গুলি ছোঁড়া শুরু করে। কিন্তু ক্যাপটেন খালেকুজ্জামান তবুও চুপ করেছিলেন। সম্পূর্ণ লঞ্চটি তাঁর এলাকায় চলে আসা মাত্রই তিনি গুলি চালানো শুরু করলেন। এতে লঞ্চসহ অধিকাংশ পাক বাহিনী ধ্বংস হয়ে যায়। কয়েকজন পালাতে সমর্থ হয়েছিল। এই যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর ২জন মাত্র আহত হয়েছিলেন।

১৮ই এপ্রিল পাক সেনারা ২টি লঞ্চে ও একটি স্পীডবোটে সৈন্য নিয়ে চিঙ্গী নদী দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। লেঃ মাহ্‌ফুজের কিছু সৈন্য হঠাৎ গুলি ছুঁড়ে বসেন। পাক সেনারা কিছু ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে পিছু হটে দূরে গিয়ে ডিফেন্স নিয়ে লেঃ মাহ্‌ফুজের ওপর আর্টিলারী আঘাত হানতে থাকে। উভয় পক্ষের সংঘর্ষে লেঃ মাহ্‌ফুজের কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। তবে পাক সেনাদের কিছু ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু তাদের চাপ আমাদের ওপর ক্রমে বাড়তে থাকে।

১৮ই এপ্রিল বিকেল ৩টায় সুবেদার মুত্তালিব তাঁর দল নিয়ে কুতুবছড়িতে পাক বাহিনীর ৬টি চলমান সৈন্য ভর্তি ট্রাকের ওপর এ্যাম্বুশ করে। এই এ্যামবুশে ৩০ থেকে ৪০ জন পাক সেনা নিহত ও দুই তিনটি গাড়ী ধ্বংস হয়।

১৯শে এপ্রিল ৩টায় পাক সেনাদের একটি বড় রকমের দল ক্যাপটেন খালেকুজ্জামান চৌধুরীর ওপর বুড়িঘাটে ব্যাপক ভাবে আক্রমণ করে। পাক সেনারা ঐ সময়ে একটি দ্বীপ থেকে তিনটি মর্টার ছুঁড়েছিল। তাদের বাহিনী ব্যাপক ভাবে আক্রমণ চালিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। এমনি পরিস্থিতিতে ক্যাপটেন খালেকুজ্জামান কিছুতেই থাকতে পারছিলেন না। তখন ল্যান্স নায়েক মুন্সী আবদুর রব (৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট) অটোমেটিক হাতিয়ার মেশিন গান হাতে তুলে নিয়ে বললেন, আমি গুলি চালিয়ে যাচ্ছি, আপনি বাকী সৈন্যদের নিয়ে পিছু হটে যান। ক্যাপটেন খালেকুজ্জামান প্রায় ১০০ মুক্তিবাহিনী নিয়ে নিরাপদে পিছু হটলেন। কিন্তু ল্যান্স নায়েক মুন্সী আবদুর রব পাক বাহিনীর সেলের আঘাতে প্রাণ হারালেন। সেদিন মুন্সী আবদুর রব যদি এমনি গুলি চালানো অব্যাহত না রাখতেন তা'হলে ঘটনার মোড় অন্যদিকে যেতো। স্বাধীনতার

পর আবদুর রব মুন্সীকে সরকার বীর শ্রেষ্ঠ উপাধি দিয়েছিলেন। ২০শে এপ্রিল লেঃ মাহ্ফুজ ঐ স্থানে যান এবং মুন্সীর ছিন্ন দেহের অংশ বিশেষ এবং কিছু গোলাবারুদ নিয়ে ঘাঁটিতে ফিরে আসেন। ঐ দিন আমি লেঃ মাহ্ফুজকে বরকলে পাঠিয়েছিলাম মিজো উপজাতিকে আমাদের স্বার্থে কাজ করার পক্ষে মত বিনিময়ের জন্য। লেঃ মাহ্ফুজ বহু কষ্টে সুভলং পর্যন্ত পৌঁছে খবর পেলেন যে পাকিস্তানীরা মিজোদের ইতিমধ্যেই হাত করে নিয়েছে। আমি আরো খবর পেলাম পাক বাহিনী মিজোদের নিয়ে মহালছড়ির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ২১শে এপ্রিল পাক বাহিনীর একটি কোম্পানী বন্দুক ভাঙ্গা নামক স্থানে লেঃ মাহ্ফুজের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সংঘর্ষে পাক সেনারা পিছু হটে চলে যায়। আমাদের কোন ক্ষতি হয়নি।

২৩শে এপ্রিল পাক বাহিনীর প্রায় ২০০ সৈন্য রাঙ্গামাটি থেকে মহালছড়ির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। আমি ক্যাপ্টেন কাদের এবং লেঃ মাহ্ফুজকে পাঠালাম প্রতিরোধ করার জন্য। ২৪শে এপ্রিল কুতুকছড়ি নামক স্থানে অফিসারদ্বয় পাক বাহিনীর মুখোমুখী হয়। এই যুদ্ধে পাক বাহিনী বেশ কিছু ক্ষতি স্বীকার করে।

২৫শে এপ্রিল খবর পেলাম চিঙ্গী নদী এবং নানিয়ার চর বাজার হয়ে পাক বাহিনী মহালছড়ি অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে। মহালছড়ি আমাদের ব্যাটালিয়ান হেডকোয়ার্টার ছিল।

২৬শে এপ্রিল ক্যাপ্টেন কাদের, ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান ও লেঃ মাহ্ফুজকে কিছুটা পিছিয়ে যেতে বললাম। ঐ তারিখেই ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামানকে নানিয়ার চর বাজারে বড় পাহাড়ের ওপর ডিফেন্স নিতে বলেছিলাম। কারণ ঐ পথই পাক সেনাদের অগ্রসর হওয়ার সম্ভাব্য এলাকা ছিল। লেঃ মাহ্ফুজকে ডিফেন্সে রাখলাম রিজার্ভে পাল্টা আক্রমণের জন্য এবং প্রয়োজনে ক্যাপ্টেন জামানকে সাহায্যের জন্য। ক্যাপ্টেন কাদেরকে পাঠালাম সড়ক পথে পাক বাহিনীর গতিপথ রুদ্ধ করার জন্য। ২৭শে এপ্রিল ভোরবেলা হাবিলদার তাহের, সিপাহী বারী এবং করপোরাল করিমের সংগে ৮/১০ জন লোক দিয়ে রেকী পেট্রোলে পাঠালাম। এই দলটি ভুল বশতঃ মিজোদের আড্ডায় ঢুকে পড়েছিল। সৌভাগ্যবশতঃ মিজোরা তখন একটি হাতী কেটে খাওয়াতে ব্যস্ত ছিল। রেকী পার্টি পালিয়ে আসতে সমর্থ হয়। আমাদের দলটি পরে হেডকোয়ার্টার মহালছড়িতে পৌছায়। ঐ তারিখ বেলা ১২-৩০ মিঃ সময়ে ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান চৌধুরীর অবস্থানের ওপর মিজোরা আক্রমণ চালিয়েছিল। ফলে উভয় পক্ষে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। আক্রমণের চাপ বাড়তে

থাকে মিজোদের পক্ষ থেকে। মিজোরা ছিল সংখ্যায় অনেক। এই অবস্থায় আমি লেঃ মাহ্ফুজকে প্রায় ১০ জন সৈন্য দিয়ে ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামানের সাহায্যে পাঠিয়েছিলাম। লেঃ মাহ্ফুজ ওখানে পৌঁছেই ডিফেন্স নিয়ে নতুনভাবে আক্রমণ চালাতে থাকেন। কিন্তু ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান তাঁর সাথীদের গুলি ফুরিয়ে যাওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন পথে পিছু হটে আসেন। আধ ঘণ্টা গুলি বিনিময়ে লেঃ মাহ্ফুজ ১৫০ জন মিজোকে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু অপরপক্ষে সব বাধাকে অগ্রাহ্য করে অসংখ্য মিজো সমুদ্রের ঢেউএর মত সামনের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। লেঃ মাহ্ফুজকে মিজোরা চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছিল। খবর পেয়ে ক্যাপ্টেন কাদের এবং ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান লেঃ মাহ্ফুজকে উদ্ধার করে আনার জন্য অগ্রসর হলেন। আমরা তখন হেডকোয়ার্টারের চারি পার্শ্বে ডিফেন্স পাকা করছিলাম। এমনি পরিস্থিতিতে ২৭শে এপ্রিল বেলা অপরাহ্ন ৩টায় পাক বাহিনীর ১১ এবং পাঞ্জাবের ২টি কোম্পানী সহযোগে প্রায় ১১০০ এগার শত মিজো ব্যাপকভাবে আমাদের ওপর আক্রমণ চালায়। পাক বাহিনী ৬টি মর্টার দিয়ে আক্রমণ চালাতে থাকে। চারিদিকে শুধু আগুন আর আগুন। আমি ক্যাপ্টেন খালেক, ক্যাপ্টেন কাদের, ফারুক প্রমুখকে এলাকা ভাগ করে দিয়ে মহালছড়ি হেডকোয়ার্টার রক্ষা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করলাম। পাক সেনারা মিজোদের দিয়ে ক্রমাগত অগ্রসর হতে থাকে আধুনিক মারণাস্ত্র নিয়ে। অথচ আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য উপযোগী কোনও ভারী মর্টার আমার কাছে ছিল না। মাত্র থ্রি নট থ্রি রাইফেল ও সামান্য হালকা মেশিন গান দিয়ে আক্রমণ চালালাম। ক্যাপ্টেন কাদের তাঁর এলাকাতে যুদ্ধ করতে করতে শত্রুর গুলিতে শহীদ হলেন। বৃষ্টির মত গুলির মধ্যে শওকত, ফারুক ও সিপাহী ড্রাইভার আব্বাস গাড়ীতে ক্যাপ্টেন কাদেরের মৃতদেহ নিয়ে রামগড় ফিরে এলেন। ক্যাপ্টেন কাদেরের মৃতদেহ রামগড় রেখে বাকী সৈন্যরা আমার কাছে চলে আসেন। আমরা তখন এমনি এক অবস্থায় ছিলাম, যখন আমার সমস্ত বাহিনী নিয়ে ঐ পরিস্থিতিতে পিছু হটা সম্ভব ছিল না। তাই সন্ধ্যা পর্যন্ত আক্রমণ চালিয়ে যেতে হয়েছিল। ঐ তারিখে রাতের আঁধারে মহালছড়ি ছেড়ে সমস্ত সৈন্য নিয়ে আমরা খাগড়াছড়ি নামক স্থানে এসে পৌঁছলাম এবং ডিফেন্স নিলাম।

২৮শে এপ্রিল খাগড়াছড়ি থেকে আমি মেজর জিয়ার সাথে ওয়ারলেসের মাধ্যমে যোগাযোগ করে আমাদের অবস্থার কথা বর্ণনা করলাম। ঐদিন পাক বাহিনীর একটি দল আমাদের অবস্থান দেখে গুইমারা হয়ে রামগড়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। আমি আমার বাহিনী নিয়ে গুইমারাতে ডিফেন্স নিলাম। আমাদের তখন শক্তি

ছিল প্রায় ৪৫০ জন। আমি মানিকছড়ির রাজার সঙ্গে দেখা করলাম। রাজা আমাদের সাথে যোগ দিলেন। তিনি আমার সঙ্গে বিশদ আলোচনা করে মগদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করবেন বলে জানালেন। রাজা পাকিস্তানীদের খবরাখবর দিলেন। সমগ্র মগ উপজাতি আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন। চাকমা উপ-জাতিদেরও হয়ত আমাদের সাহায্যে পেতাম। কিন্তু রাজা ত্রিদিব রায়ের বিরোধীতার জন্য তারা আমাদের বিপক্ষে চলে যায়। মিজোরা বেশ কিছু আগেই আমাদের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধের ন'মাস মগ-উপজাতি আমাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করেছে।

২৯শে এপ্রিল রাতে মেজর জিয়া আমাদের রামগড়ে চলে আসতে বললেন। কারণ ইতিমধ্যে পাক বাহিনীর একটি দল করের হাট হিয়াকু হয়ে রামগড়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। অপর দল শুভপুর ব্রীজে ক্রমাগত আঘাত হানছিল। আর একটি দল আমাদের পিছু পিছু আসছিল গুইমারা হয়ে রামগড়ের পথে। মেজর জিয়া করেরহাটে ক্যাপটেন ওয়ালীকে পাঠালেন এবং আমাদের চলে আসতে বললেন। আমরা ২৯শে এপ্রিল রওয়ানা হয়ে রাত ২টায় সমস্ত সৈন্য নিয়ে রামগড়ে পৌঁছা-লাম। ৩০শে এপ্রিল মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি কর্ণেল (পরবর্তীকালে জেনারেল) এম. এ. জি ওসমানী রামগড়ে আমাদের দেখে গেলেন এবং চট্টগ্রামের সমস্ত খবরাখবর নিলেন। কর্ণেল ওসমানী খুব খুশী হলেন। আমাকে নির্দেশ দিলেন যেকোন প্রকারেই অন্ততঃ আরো দু'দিন রামগড়কে মুক্ত রাখার জন্য, যাতে করে নিরীহ জনতা সহ সবাই নিরাপদে ভারতে আশ্রয় নিতে পারি।

আমি ক্যাপটেন খালেকুজ্জামান, সুবেদার মুত্তালেব এবং লেঃ মাহ্ফুজকে তাদের বাহিনী নিয়ে ক্যাপটেন ওয়ালির সাহায্যার্থে হিয়াকুল পাঠালাম পাক বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে। উভয় পক্ষে তুমুল সংঘর্ষ হয়। পাক বাহিনীর একটি ব্রিগেড তিন দিক থেকে রামগড় আক্রমণ করে। ২রা মে আমাদের রামগড় হারাতে হয়। ঐদিনই আমরা সবাই ভারতের সাবরুমে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়ে-ছিলাম। সময় তখন সন্ধ্যা ৬টা।

প্র: আপনি এইসব যুদ্ধ চলাকালে রশদপত্র কিভাবে সংগ্রহ করেছিলেন?

উ: আওয়ামী লীগ সংগ্রাম পরিষদ এই দায়িত্ব নিয়েছিলেন। কোনও সমস্যা ছিল না। এই কৃতিত্ব অবশ্যই তাদের দিতে হবে। স্থানীয় লোকজন আওয়ামী লীগ সংগ্রাম পরিষদের পরিচালনায় আমাদের খাওয়া দাওয়ার যাবতীয় ব্যবস্থা করেছিলেন।

প্র: আওয়ামী লীগ সংগ্রাম পরিষদ কখন থেকে আপনাদের সহযোগিতায় এসেছিলেন?

উ: শুরু থেকেই এবং সব জায়গায়। যেখানেই আমরা যুদ্ধ করেছি, সেখানেই তারা এগিয়ে এসেছেন। অর্থাৎ ২৫শে মার্চ, '৭১ থেকে ২রা মে, '৭১ পর্যন্ত যতদিন আমি দেশের অভ্যন্তরে থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করেছি, ততদিন আওয়ামী লীগ সংগ্রাম পরিষদ আমাদের রশদপত্র এবং খাদ্য সরবরাহের পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

প্র: সরকার গঠিত হওয়ার পরের কথা বলুন।

উ: সরকার গঠিত হওয়ার পর আমাকে সিলেটে পাঠানো হ'ল ৫নং সেক্টারের কমাণ্ডার হিসেবে। এলাকাটি ছিল দুর্গম। গাড়ী চলাচল করতে অসু-বিধা হতো। সবটাই ছিল হাওর এবং বিল এলাকা। সুনামগঞ্জ-ছাতক এলাকায় হয় নৌকা, নতুবা পায়ে হেঁটে, নতুবা সাতার কেটে এদিক ওদিক চলাচল করতে হ'ত। এসব জায়গায় সাংবাদিকও তেমন আসতেন না। সরকারের পক্ষ থেকেও লোকজন তেমন আসতেন না। একবার একজন কর্মকর্তা এসেছিলেন তিনি ছিলেন নুরুল কাদের খান, যুদ্ধকালীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্থা-পন সচিব। তিনি শিলং পর্যন্ত এসেছিলেন এবং ওখানেই তাঁর সাথে আমার দেখা হয়েছিল। জেনারেল ওসমানী সাহেব দু'বার এসেছিলেন, এবং আমার সাথে রণাঙ্গন পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছিলেন। তিনি পায়ে হেঁটে আমার এলাকার গুরুত্বপূর্ণ রণাঙ্গনসমূহ পরিদর্শন করেছিলেন। গণপ্রজা-তন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিন আহমদ সাহেবও একবার এসে আমাকে দেখে গিয়েছিলেন। তিনিও পায়ে হেঁটে আমার সেক্টারের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেছিলেন।

প্র: সেক্টার বলতে কোন্ পর্যন্ত বুঝাচ্ছেন?

উ: বাংলাদেশের ভিতরে বাঁশতলা বলে একটি জায়গা আছে। তাজুদ্দিন সাহেব ওখানে এসেছিলেন।

প্র: মুক্তিযোদ্ধাদের আপনি কোথায় এবং কিভাবে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন?

উ: বাংলাদেশের ভিতরে আমাদের অনেকগুলি ক্যাম্প ছিল। সে সব ক্যাম্পে আমাদের সৈন্যরা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিতেন। আবার ভারতের অভ্যন্তরে সীমান্তের কাছাকাছি এলাকায়ও কিছু প্রশিক্ষণ ক্যাম্প ছিল। সে সব ক্যাম্পে ভারতীয় সৈন্যরা প্রশিক্ষণ দিতেন।

কাজেই মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষণের দু'টি উৎস ছিল। একটি ছিল যেটা আমি

নিজে সংগঠন করে বাংলাদেশ থেকে এনে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতাম। আর একটা ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর মাধ্যমে আমাদের সরকার সরাসরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে মুক্তিযোদ্ধাদের পৃথক পৃথক ভাবে আমাদের কাছে পাঠাতেন।

প্র: জেনারেল আতাউল গনি ওসমানীকে কমাণ্ডার-ইন্-চীফ হিসেবে ঘোষণা করার পর আপনি কি ভাবে তাঁর সাথে সম্পর্ক চালিয়ে গিয়েছিলেন?

উ: আগেই বলেছি জেনারেল ওসমানী সাহেবের সাথে সর্ব প্রথম আমার দেখা হয়েছিল রামগড়ে। তবে এর আগেও ওয়ারলেসে দু'একবার তাঁর নির্দেশ আমি পেয়েছি মহালছড়িতে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায়। তখন আমি বড় রকমের একটি যুদ্ধে লিপ্ত ছিলাম। ঐ সময় তিনি আমাকে রামগড়ে চলে আসতে বলেছিলেন। আমি তাঁকে জানিয়েছিলাম: পুরো পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা আমার দখলে আছে। কাজেই আপনারা কেন পার্বত্য এলাকায় চলে আসছেন না? তিনি পরামর্শ দিলেন: এটা ঠিক হবে না। আমরা সবাই মিলে আবার নতুনভাবে সংগঠন করে যুদ্ধ চালিয়ে যাবো। জেনারেল ওসমানী সাহেবের নির্দেশানুযায়ী মহালছড়ির যুদ্ধের পর আমি রামগড়ে চলে গেলাম। জেনারেল ওসমানী ওপার থেকে রামগড়ে এলেন। সেখানেই বাংলাদেশের মাটিতে তাঁর সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল। জে: ওসমানী সাহেব আমাকে খুব প্রশংসা করলেন এবং বললেন: আরো দু'দিন রামগড় আটকে রাখতে হবে। তারিখটি ছিল ৩০শে এপ্রিল, ১৯৭১। আগেই বলেছি ২রা মে '৭১ বিকেলে আমরা ভারতীয় এলাকায় চলে গিয়েছিলাম। রামগড়কে আরো দুদিন আটকিয়ে রাখার জন্য বলার কারণ ছিল আমাদের মুক্তিবাহিনী যে সব রণসম্ভার নিয়েছিলেন সেগুলি পার করার জন্য এবং সীমান্তে আটকে পড়া নিরীহ জনগণকে নিরাপদে ভারতে পার করে নিয়ে যাওয়ার জন্য দু'দিনের প্রয়োজন ছিল।

প্র: মুজিব বাহিনী প্রসঙ্গে কিছু বলুন। সেক্টরত আগেই ভাগ হয়ে গিয়েছিল। নতুন এই বাহিনীকে আপনারা কিভাবে গ্রহণ করলেন?

উ: আমি কখনো রাজনীতিতে মাথা ঘামাতাম না। পাকিস্তানেও নয়, একাত্তরের যুদ্ধের সময়ও নয়, এখনো নয়। আমার কাজ ছিল যুদ্ধ করা। যে সৈন্য আমাকে দেয়া হত তাই দিয়ে আমি যুদ্ধ করতাম। কোন কমাণ্ডারই কখনো চান না মূল সংগঠনের বাইর থেকে এসে কেউ মাতব্বরি করুক। মাঝে মাঝে দেখতাম কিছু ছেলে আমার অবগতি ছাড়া আমার এলাকায় ঘুড়ে বেড়াতো। একবার এমনি এক দলকে আমি ধরে ফেললাম। তারা ছিল প্রায় তিরিশ জনের

মত। ধরে ফেলার পর তারা বললেন যে তারা বাংলাদেশেরই বাহিনী এবং তারা মুজিব বাহিনী। আমি ঠিক ব্যাপারটা গ্রহণ করতে পারলাম না। আমি বললাম: আমার এলাকায় তোমরা ঘুরে বেড়াচ্ছ আমার অবগতি ছাড়া। অস্ত্র নিয়ে তোমরা ভিতরে ঢুকবার চেষ্টা করছ। এটা আমি দেবো না।

প্র: আপনি এর আগে মুজিব বাহিনী সম্পর্কে শুনেননি।

উ: শুনেছিলাম। কিন্তু তেমন কিছু ধারণা ছিল না। শুনেছিলাম অন্য সেক্টরে তারা কিছু করছিলেন, কিন্তু আমার এলাকায় ছিলেন না। আমি এক কথা এসব ব্যাপারে। আইনের বাইরে কিংবা নিয়মশৃংখলার বাইরে কোন কাজ আমি পছন্দ করি না। সেই কারণে আমার এলাকায় অনেক পরেই তাদেরকে পাঠানো হয়েছিল। পাঠানোর সাথে সাথেই তারা ধরা পড়েছিলেন। ধরা পরার পর আমি জানতে পেরেছিলাম যে সরাসরি এটা কেউ করছিলেন বাংলাদেশ এর প্রধান কার্যালয় থেকে। আমি পরিষ্কারভাবে প্রধান কার্যালয়কে জানিয়ে দিয়েছিলাম যেন ওদের আমার এলাকায় পাঠানো না হয়।

প্র: বাংলাদেশের রণাঙ্গনকে মোট ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল। প্রতিটি সেক্টরে ছিলেন একজন কমাণ্ডার। সেক্টর কমাণ্ডারগণের সম্মতি ছাড়াই কি মুজিব বাহিনী গঠিত হয়েছিল?

উ: এতে আমাদের কোনও সমর্থন ছিল না।

প্র: জেনারেল ওসমানী সাহেবের সমর্থন ছিল?

উ: আমি এটা নিয়ে কখনো মাথা ঘামাইনি।

প্র: মুজিব বাহিনী প্রসঙ্গে আপনাদের কোনও মিটিং হয়নি?

উ: না। কোনও মিটিং হয়নি।

প্র: মুজিব বাহিনী রণাঙ্গনে এসে যাওয়ার পর প্রথমতঃ আপনি তাদের ধরে ফেললেন। তারপর কি হ'ল?

উ: আমি তাদেরকে ফেরত পাঠিয়ে দিলাম। আমি তাদেরকে বললাম:

Go back where you came from.

প্র: মুক্তি যুদ্ধে যে আপনারা জয়ী হচ্ছিলেন, এটা কখন বুঝতে পেরেছিছিলেন?

উ: অক্টোবর-নভেম্বরের দিকে। একটা সময় খুব খারাপ এসেছিল জুন-জুলাই মাসে। তখন অনেকে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এমন কি আমাদের এম, এন, এ-গণ পর্যন্ত বলতে শুরু করেছিলেন: 'ভাই আর কি দেশে ফিরে যাওয়া যাবে?' কিন্তু আমরা হতাশাগ্রস্ত ছিলাম না। আমরা সব সময় আশাবাদী

ছিলাম। কারণ এতে জড়িত ছিল বাঁচা মরার প্রশ্ন। হয় দেশ উদ্ধার করতে হবে, নইলে দেশ জাতি সবই গেল। তবে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর-এর দিকে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে আমরা জয়ের দিকে যাচ্ছি এবং আমরা জিতবই; দু'মাস লাগতে পারে, ছয় মাস লাগতে পারে, আমরা আমাদের নিজেদের শক্তিতে জিতব। এ জন্য ভারতীয় সৈন্যের প্রয়োজন হবে না।

প্র: পাকিস্তানী বাহিনীর তুলনায় আপনাদের সৈন্য বলতে খুব কম ছিল এবং অস্ত্রও ছিল খুবই সীমিত। আপনাদের প্রধান রণকৌশল সম্পর্কে কিছু বলুন।

উ: রণকৌশল যা সাধারণত হওয়া উচিত, তাই ছিল। শুরুর দিকে যেহেতু আমরা ছোট ছোট দলে গিয়েছিলাম, তাই তখন গেরিলা রণকৌশলকে আমরা প্রধান অবলম্বন হিসেবে বেছে নিয়েছিলাম। কারণ যুদ্ধের নিয়মই হ'ল যখন কোনও বড় শত্রুর সাথে আপনি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে চান, তখন আপনি যদি চিরাচরিত যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন করে থাকেন, তাঁহলে আপনি হারবেন। সে স্থলে আপনাকে চিরাচরিত যুদ্ধরীতি ভঙ্গ করে যুদ্ধ করতে হবে। অর্থাৎ গেরিলা যুদ্ধ করতে হবে। এই পদ্ধতিতে আমরা শত্রুদের বড় বড় বাহিনীর উপর আচমকিতে গুলি চালিয়ে পালিয়ে যেতাম। ওতে শত্রুপক্ষের হতাহতের সংখ্যা অনেক বেশী হত। অপর পক্ষে আমাদের কিছু হতো না। আমাদের মূল রণ-কৌশলই ছিল, এই গেরিলা পদ্ধতিতে পাকিস্তান বাহিনীকে রোজ একটু একটু আঘাত করে ওদের শক্তি কমিয়ে দেয়া এবং ওদের অসংগঠিত করে দেয়া, ওদের রশদপত্র নষ্ট করে দেয়া ইত্যাদি। আমরা জানতাম যে একটা সময় আসবে যখন আমরা নিয়মিত বাহিনী গঠন করে ওদের আক্রমণ করে আমাদের দেশ পুনরুদ্ধার করতে পারব।

প্র: শত্রুবাহিনী থেকে আপনারা কি পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে নিয়েছিলেন?

উ: প্রচুর। শুরুর দিকে আমাদের যা কিছু অস্ত্রশস্ত্র ছিল তাই দিয়ে যুদ্ধ করতাম। পরের দিকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আমরা অনেক অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলা-বারুদ ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলাম। যখন আমরা আকস্মিক আক্রমণ চালাতাম, তখন তারা পালিয়ে যেতো। তারা পালিয়ে যাওয়ার পর যা অস্ত্রশস্ত্র পড়ে থাকত সব আমরা নিয়ে নিতাম।

প্র: ৩রা ডিসেম্বর, '৭১ পাকিস্তান এবং হিন্দুস্তানের সাথে আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ ঘোষণার পর আপনার রণকৌশলের কোনও পরিবর্তন হয়েছিল কি?

উ: হ্যাঁ। তখন আমরা চিরাচরিত যুদ্ধে (conventional war) লিপ্ত হয়ে গেলাম। ৩রা ডিসেম্বরের পর প্রথম আমরা দখল করলাম টেংরাটিলা। তারপর দখল করলাম ছাতক, তারপর সুনামগঞ্জ। এরপর আমরা সমস্ত বাহিনী সুরমা নদীর এপারে পার করে সোজা সিলেটের দিকে ধাবিত হ'লাম। আমরা লালাকাছি পর্যন্ত দখল করলাম। তখনই পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণের কথা ঘোষিত হয়ে গেল।

প্র: জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরাকে ইষ্টার্ণ কমাণ্ডের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করার পর মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওসমানীর ভূমিকা কি হয়েছিল?

উ: জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরাকে কমাণ্ড দেয়ার পর জেনারেল ওসমানীই আমাদের জানালেন যে এখন জেনারেল অরোরার নেতৃত্বে যৌথ কমাণ্ড হচ্ছে। কাজেই আমাদের এলাকার নিযুক্ত ভারতীয় জেনারেলগণের সাথে ঐ সময় থেকে সংযোগ রক্ষা করে যুদ্ধ করার জন্য তিনি আমাদের পরামর্শ দিলেন।

প্র: জেনারেল ওসমানী সাহেব আর কমাণ্ড করতেন না?

উ: করতেন। তবে সরাসরিভাবে আমাদের এমন কোনও বেতারযন্ত্র ছিল না সব সময় যোগাযোগ রক্ষা করে চলার জন্য।

প্র: সম্মিলিত মিত্র ও মুক্তিবাহিনী মিলে ৩রা ডিসেম্বর '৭১ থেকে, ১৬ই ডিসেম্বর, '৭১ অর্থাৎ বিজয়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আপনারা কি ভাবে যুদ্ধ করলেন এবং কিভাবে ঢাকা প্রবেশ করলেন?

উ: যুদ্ধনীতির কথাত ইতিমধ্যেই বললাম। ঢাকার এলাকায় প্রবেশকালে কোন কোন এলাকায় মুক্তিবাহিনী ছিলেন। আবার অনেকগুলি জায়গা ছিল যেখানে ভারতীয় বাহিনী ছিলেন না, শুধু মুক্তিবাহিনীই ছিলেন। আমার সেক্টারের একমাত্র ডাউকী সাব-সেক্টারে ভারতীয় বাহিনীর একটি ব্যাটালিয়ান গিয়েছিলেন। এছাড়া মূল সিলেট এলাকায় ভারতীয় বাহিনী তাদের ব্যাটালিয়ান নিয়োগ করে-ছিলেন। কিন্তু সুনামগঞ্জ, টেংরাটিলা ছাতক এ সব এলাকাতে একমাত্র মুক্তি-বাহিনীই এককভাবে প্রবেশ নিয়েছিলেন।

প্র: ঢাকার দিকে কারা এগিয়েছিলেন?

উ: ঢাকার দিকে মেজর হায়দার ছিলেন।

প্র: যেহেতু আমি সিলেট সেক্টারে ছিলাম, কাজেই এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানা নেই।

প্র: ১৬ই ডিসেম্বর, '৭১ আপনি কোথায় ছিলেন?

উ: সিলেট ছিলাম।

প্র: ১৬ই ডিসেম্বর, '৭১ পাকিস্তান বাহিনীর আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণের পর আপনারা অর্থাৎ সেক্টার কমাণ্ডারগণ আনুষ্ঠানিকভাবে একত্রিত হয়েছিলেন কি?

উ: জ্বি। জেনারেল ওসমানী সাহেব আমাদের ঢাকায় সম্মেলনে ডেকেছিলেন।

প্র: কোন তারিখে?

উ: এটা আমার মনে নেই। তবে জেনারেল ওসমানী সাহেব বলতে পারেন। তাঁর ডায়রীতে হয়ত এসব লেখা থাকতে পারে। এই সম্মেলনে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম কি ভাবে মুক্তিযোদ্ধাগণকে পুনর্বাসন করা হবে, কারা নিয়মিত সেনাবাহিনীতে থাকবেন, সেনা বাহিনী কিভাবে সংগঠন করা হবে, কোন্ কোন্ এলাকায় কোন্ কোন্ সেক্টার কমাণ্ডার থাকবেন ইত্যাদি। এই বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমাদের পোষ্টিং হ'ল।

এই সম্মেলনে জেনারেল ওসমানী সাহেব আমাকে একটি অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ভবিষ্যতে আমাদের সেনাবাহিনীকে কিভাবে সংগঠন করা উচিত এবং কতখানি সম্প্রসারণ করা উচিত এটার একটা পেপার তৈয়ার করতে বললেন আমাকে। এছাড়া পুরো সেনা বাহিনীকে সংগঠনের জন্য জেনারেল ওসমানী সাহেব বেশ কয়েকটি কমিটি বানিয়ে দিয়েছিলেন। আমরা এসব সাংগঠনিক কাজ করলাম।

প্র: দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আপনাকে কোথায় নিয়োগ প্রদান করা হয়েছিল?

উ: প্রথমে সিলেটের এরিয়া কমাণ্ড দেয়া হল। ওখানে আমার প্রধান কাজ ছিল সমস্ত সৈন্যকে একত্রিত করা। সেটা করলাম। তার কিছুদিন পর আমাকে বলা হ'ল চট্টগ্রামে খুব গোলমাল হচ্ছে এবং চট্টগ্রামের অনেক অস্ত্রশস্ত্র অন্যের হাতে চলে যাচ্ছে। আমি যেন ওখানে গিয়ে পুরা চট্টগ্রাম এলাকা নিয়ন্ত্রণ করি। তখন আমাকে চট্টগ্রামের এরিয়া কমাণ্ডারের দায়িত্ব দেয়া হ'ল।

প্র: ১৭ই জানুয়ারী, '৭২ ভারতীয় বাহিনী চলে যাওয়ার পর বঙ্গবন্ধু মুক্তিযোদ্ধাগণকে অস্ত্র সমর্পণ করার জন্য নির্দেশ দিলেন। তখন কারা অস্ত্র সমর্পণ করেছিলেন?

উ: আমাদের কথা ছিল আমাদের অধীনস্থ যারা ছিলেন তারা অস্ত্র সমর্পণ করবেন। অস্ত্র সমর্পণ মানে আমাদের অধীনস্থ যারা অস্ত্র নিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন আমরা সে সব অস্ত্র নিয়ে যথাযথ অস্ত্র ভাণ্ডারে জমা রাখলাম।

প্র: আমরা জেনেছি শুধু গেরিলা বাহিনী অস্ত্র সমর্পণ করেছিলেন। কিন্তু নিয়মিত বাহিনী অস্ত্র সমর্পণ করেননি। এ সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

উ: নিয়মিত বাহিনীত অস্ত্র সমর্পণ করার প্রশ্ন উঠে না। অস্ত্র রাখার ক্ষমতা তাদের দেয়াই থাকে।

প্র: অস্ত্র সমর্পণের পর গেরিলা বাহিনীকে আপনারা কোথায় পাঠালেন? তারা কি বাড়ী চলে গেলেন?

উ: তারা ক্যাম্পে ক্যাম্পে থাকলেন। তারপর ক্ষমতাসীন রাজনীতিকগণ এসব দায়িত্ব হাতে নিলেন। কাজেই অস্ত্র সমর্পণের পর গেরিলা বাহিনীকে পুনর্বাসনের দায়িত্ব তাঁদের হাতেই চলে গিয়েছিল। তাঁরাই জানতেন গেরিলা বাহিনীকে কোথায় কিভাবে পুনর্বাসন করা হচ্ছে। অবশ্য আমার মনের ইচ্ছা ছিল যে এদেরকে নিয়ে ভবিষ্যতে সেনাবাহিনী, বি, ডি, আর এবং পুলিশ গড়ে তোলা উচিত।

প্র: আপনার বাহিনীতে মোট মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা কত ছিল?

উ: শেষের দিকে ১৬ই ডিসেম্বর '৭১ পর্যন্ত বিশ পঁচিশ হাজার হয়েছিল।

প্র: তালিকাভুক্ত মুক্তিযোদ্ধা কতজন ছিল বলে আপনার ধারনা?

উ: দশ বার হাজার। বাকী দশ বার হাজার ছিল তালিকার বাইরে।

প্র: তালিকাভুক্ত মুক্তিযোদ্ধাগণের হিসাব আপনার কাছে আছে?

উ: ছিল। এসব তালিকা সেনা বাহিনীতে জমা দেয়া হয়েছে।

প্র: আপনি কি মনে করেন এখনো এসব তালিকা আছে?

উ: এটা আমি কি করে বলি? কিন্তু আপনি যদি জিজ্ঞাসা করেন মুক্তিযোদ্ধা কারা? আমার একটা অভিমত আছে মুক্তিযোদ্ধা সম্বন্ধে। আমার এলাকার আমি মনে করি যত বেসামরিক জনসাধারণ ছিলেন, অত্যন্ত নগণ্য সংখ্যক কিছু ব্যক্তি যারা ইচ্ছাকৃত ভাবে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সাথে সহযোগিতা করেছে এবং লুটতরাজ কিংবা পাকিস্তানী সৈন্যদের ব্যভিচারে সহযোগিতা করেছে, তারা ব্যতীত আমি বলব আমার সিলেট এলাকায় তালিকাভুক্ত এবং তালিকাবিহীন মুক্তি বাহিনী বাদেও যতজন লোক ছিলেন সবাই আমার মুক্তি বাহিনী ছিলেন। এমনকি রাজাকাররাও মুক্তি বাহিনী ছিলেন।

প্র: রাজাকার মুক্তি বাহিনী হওয়ার কথাটি অনুগ্রহ করে বুঝিয়ে বলুন।

উ: কারণ এরাও সাহায্য করত। রাতে এসে আমাদের খবর দিয়ে দিত, কিংবা আমরা গেলে তারা ইসারা দিয়ে আমাদের বলে দিত পাকিস্তানী সৈন্য আছে কিনা, কিংবা তাদের অবস্থান কোথায় ইত্যাদি। পুনরুক্তি করেই বলছি

যারা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে পাকিস্তানীদের সাহায্য করত, এমন কিছু রাজাকার ছাড়া বাকী সবাইকে আমি মনে করি মুক্তিযোদ্ধা।

প্র: একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র কি ধরনের ভূমিকা পালন করেছে বলে আপনি মনে করেন?

উ: আমি মনে করি ২৫শে মার্চ, '৭১ থেকে ২রা মে, '৭১ পর্যন্ত যখন আমি দেশের অভ্যন্তরে থেকে পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি, তখনো বিচ্ছিন্নভাবে হলেও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তারপর যখন পূর্ণাঙ্গভাবে মুজিব নগরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সংগঠিত হ'ল তখন থেকে ত বটেই। যখনই আমরা হতাশ হতাম, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র খবর, গান এবং অন্যান্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপস্থাপনের মাধ্যমে আমাদিগকে প্রচুর উৎসাহ প্রদান করত। আমার মনে হয় '৭১-এর যুদ্ধের বিরাট একটা অংশ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র করেছে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের বিভিন্ন ধারার অনুষ্ঠান, বিচ্ছুর ব্যাপার ইত্যাদি যদি না থাকত, তবে আমাদের মনোবল এত বেশী হ'ত না।

প্র: স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কোন্ অনুষ্ঠান আপনার কাছে সব চাইতে ভাল লাগত?

উ: আমার কাছে বিচ্ছুর অনুষ্ঠানটি ভাল লাগত।

প্র: মানে ঐ চরমপত্র?

উ: হ্যাঁ চরমপত্র।

প্র: আর কোনও অনুষ্ঠান ভাল লাগত? যেমন জল্লাদের দরবার, অগ্নি-শিখা ইত্যাদি।

উ: ঐ গুলিও ভাল লাগত। কিন্তু বিচ্ছুর অনুষ্ঠানটি যেহেতু যুদ্ধে আমাদের বিজয় এবং শত্রুপক্ষের পরাজয়ের সাথে সম্পর্ক রেখে ঢাকার কথ্য ভাষায় পরিবেশিত হ'ত, এবং যেহেতু আমি নিজেও পুরাতন ঢাকার পরিবেশে বড় হয়েছি, সেজন্য আমার কাছে ভাল লাগত।

প্র: সংবাদ?

উ: খুবই ভাল লাগত। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রই আমাদের মনোবলকে অক্ষুণ্ণ রেখেছিল।

প্র: গান?

উ: এই যে 'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা' ইত্যাদি গান অপূর্ব ছিল। এগুলি আমাদের সাংঘাতিক ভাবে উদ্বুদ্ধ করত।

প্র: স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে যে সব সংবাদ পরিবেশিত হ'ত, সবই বিশ্বাস করতেন?

উ: কিছুটা আমরা মনে করতাম খুবই ভাল করছে দিয়ে, আবার কোন কোন সময় মনে হ'ত একটু বাড়িয়ে বলছে।

প্র: আপনার সেক্টারের যে সব সংবাদ পরিবেশিত হ'ত সেগুলি কি আপনি মনে করতেন সবই সঠিকভাবে বলা হত?

উ: কিছুটা কখনো কখনো একটু বেশীই বলা হতো। আমরা খুশী হতাম তাতে। এটার প্রয়োজন ছিল।

প্র: মুক্তিযোদ্ধাগণের অবদানের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য আমাদের কি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

উ: সবচেয়ে বড় কথা দেশের জন্য যুদ্ধ করার পর মুক্তিযোদ্ধাদের কিছু চাওয়া উচিত নয়। দেশের জন্য যুদ্ধ করেছে, সেটাই তাদের সব চাইতে বড় ত্যাগ, এবং দেশ স্বাধীন হয়েছে সেটাই তাদের সব চাইতে বড় পাওনা। কিন্তু আমি এটাও মনে করি, দেশের লোক যদি মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান না দিয়ে থাকেন, এবং তাদেরকে পুনর্বাসন না করেন, তা'হলে ভবিষ্যতে এদেশের জন্য কেউ যুদ্ধ করবেন না।

প্র: যাঁরা জীবন দান করে গেছেন তাঁদের স্মৃতিকে আমরা কি ভাবে জিইয়ে রাখতে পারি?

উ: সাধারণ ভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও দেখা গিয়েছে দেশের জন্য যাঁরা জীবন দান করে গেছেন, তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আলাদা ভাবে কবরস্থান করে দেয়া হয়েছে। এসব কবরস্থানে শহীদ যোদ্ধাদের তালিকা রাখা হয়। কিন্তু আমাদের মুক্তিযুদ্ধে শাহাদত প্রাপ্তদের জন্য কোনও কবরস্থান করা হয়নি। যেহেতু যেখানে যেখানে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের কবর আছে, সেগুলিকে নিশ্চয়ই সংরক্ষণ করা উচিত। প্রত্যেক বছর ১৬ই ডিসেম্বর এবং ২৬শে মার্চ তাঁদের সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা এবং তাঁদের কবর বা স্মৃতি ফলকের কাছে গিয়ে তাঁদের স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। এ কাজ শুধু তাঁদেরকে সম্মান প্রদানের জন্য নয়, আমাদেরও স্বার্থ আছে। আমি যদি আমার দেশের বীরকে সম্মান করতে না জানি, তবে ভবিষ্যতে আমার জীবনে আমার দেশে বীর বা দেশপ্রেমিক হবে না। সে স্থলে সেখানে থাকবে শুধু টাউটের দৌরাত্ম্য।

প্র: সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে যেখানে পাক বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছিল, সেখানে আমরা কোনও কিছু করতে পারি কিনা?

উঃ করা উচিত। এমন কোনও স্মৃতি ফলক যেখানে স্থাপন করা উচিত যা আমাদের পুরো দেশের ভিতর নেই। এটার একটা স্বাতন্ত্র থাকা বাঞ্ছনীয়। সবাই যেন এটা দেখে একটা দেশাত্মবোধক প্রেরণা পেতে পারি। তাঁছাড়া এমনি স্মৃতিফলক বা স্মৃতিসৌধ আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য প্রেরণার স্থায়ী উৎস হওয়া ছাড়াও থাকবে স্থায়ী ইতিহাস হয়ে, ত্যাগের ইতিহাস, বীরত্বের ইতিহাস, দেশপ্রেমের ইতিহাস।

প্রঃ ভারতের মাটিতে আপনি জেনারেল (তৎকালীন মেজর) জিয়া সহ একসাথে কত দিন যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন?

উঃ প্রায় মাসাধিক কাল। ২রা মে, '৭১ থেকে জুন, '৭১-এর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত।

প্রঃ তারপর?

উঃ তারপর আমাকে সিলেটে পাঁচ নম্বর সেক্টরের কমাণ্ড দেয়া হ'ল। অবশ্য ঐ সেক্টারের ভার নেয়ার আগে আমাকে এক নম্বর সেক্টারের কমাণ্ড নেয়ার জন্য বলা হয়েছিল। ২রা মে, '৭১ আমি যখন রামগড় হয়ে ভারতের মাটিতে চলে গেলাম, তখন নেতৃবৃন্দ জেনারেল ওসমানী সাহেবকে বলেছিলেন: মেজর শওকত চট্টগ্রামে পুরা যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। কাজেই এক নম্বর সেক্টারের কমাণ্ড তাকে দেয়া হউক। জেনারেল ওসমানী সাহেব তাই করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু মেজর জিয়া ছিলেন আমার সিনিয়র, তাই জেনারেল সাহেবের কাছে আমি নিজেই আপত্তি তুলেছিলাম এই পোষ্টিং পরিবর্তন করে জিয়া সাহেবকেই এখানে রাখার জন্য। আমার প্রস্তাবে কিন্তু ওসমানী সাহেব খুশী হতে পারেন নি। পরিবর্তে তিনি মেজর রফিককে এক নম্বর সেক্টারে নিয়েছিলেন। অল্পদিন পর আমাকে ৫নং সেক্টারের কমাণ্ড দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন ভারতের শিলং অর্থাৎ সিলেটের বিপরীতে।

প্রঃ মেজর জিয়া কোথায় গেলেন?

উঃ জেনারেল ওসমানী সাহেব তাঁকে জেড্ ফোর্স সংগঠনের ভার দিলেন। জিয়া সাহেব ময়মনসিংহের উত্তরে তুরা নামক স্থানে স্থাপন করেছিলেন তাঁর জেড্ ফোর্স-এর প্রধান কেন্দ্রস্থল।

প্রঃ এবারে রণাঙ্গনের দু'একটি অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানতে চাই। আপনারা ঘুমাতেন কি করে?

উঃ মাটিতে। কখনো গাছ তলায়, কখনো বাঁশের মাচায়। এমনি মাচাং বানিয়ে ওপরে খর দিয়ে ঢেকে দিতাম। সাধারণতঃ রাতে ঘুমানো সম্ভব হতো না।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দু'টি অপারেশন-এর ফাঁকে দিনের বেলায় কিছু সময় ঘুমিয়ে নিতাম। সাধারণতঃ সৈনিকের পোষাকেই ঘুমিয়ে পড়তাম। অবশ্য সৈনিকের পোষাক বলতে একটি খাঁকি হাফ প্যান্ট এবং এক জোড়া বুটই আমার পরনে থাকত। এ প্রসঙ্গে আপনাকে একটি ঘটনা বলি। আমি রামগড় থেকে সীমান্ত অতিক্রম করার পর (২রা মে, '৭১ থেকে জুন, '৭১-এর মাঝামাঝি সময়ে) জেনারেল ওসমানী সাহেব ওখানে গিয়েছিলেন আমাদের দেখতে। আমি তখন অপারেশনে ব্যস্ত। আমার পরণে শুধু একটি খাঁকি হাফ্ প্যান্ট এবং পায়ে এক জোড়া বুট ছিল। গায়ে কোনও গেঞ্জি পর্যন্ত ছিল না। মাথা থেকে সমস্ত শরীর ছিল ধুলাময়। খবর পেয়ে ঐ অবস্থায়ই জেনারেল সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম। এই একটি মাত্র ঘটনা থেকেই অনুমান করতে পারেন কি অবস্থায় আমরা যুদ্ধ করেছি।

প্রঃ রণাঙ্গনে এক নাগাড়ে কত সময় পর্যন্ত না ঘুমিয়ে কাটিয়েছিলেন?

উঃ তিন দিন তিন রাত।

প্রঃ কোথায়?

উঃ রামগড়ের উল্টা দিকে সাবরুম নামক স্থানে। মে, '৭১ থেকে জুন '৭১-এর মাঝামাঝি সময়ে।

প্রঃ সব চাইতে ভয়াবহ যুদ্ধ আপনি কোথায় করেছেন?

উঃ সবগুলিই ভয়াবহ, সবগুলিই লোমহর্ষক।

প্রঃ আপনি অত্যন্ত কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং আশ্চর্য-জনক ভাবে বেঁচে গিয়েছেন, এমন দু'একটি ঘটনা জানতে চাই।

উঃ এটা একবার হয়নি। বহুবার হয়েছে। এটা বলে শেষ করা যাবে না। বহুবার পাকিস্তানী সৈন্যরা আমার নাকের ডগা দিয়ে অতিক্রম করে গিয়েছে, ধান ক্ষেতে আমি শুয়ে রয়েছি, হামাগুঁড়ি দিয়ে কিংবা বুকে ভর দিয়ে আমাকে বের হয়ে আসতে হয়েছে। বহুবার ঘেরাওর ভিতর পড়ে গিয়ে-ছিলাম, আবার বের হয়ে গিয়েছি। এই যুদ্ধে একটা বিরাট প্রমাণ, বিরাট বিশ্বাস আল্লাহ্র ওপর আমার বেড়ে গিয়েছে: আমি দেখলাম যে যার মৃত্যু নেই, সে মরতে পারে না, সে যেমন অবস্থায় থাকুক না কেন বেঁচে আসবে। অনেক সময় দেখা গিয়েছে সম্মুখের লোক মারা যায়নি, অথচ পেছনের লোক বেশী মারা গিয়েছে।

প্রঃ একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ থেকে আমরা আর কি শিক্ষা পেলাম?

উঃ আপনারা কি শিক্ষা পেয়েছেন আমি জানি না। তবে আমি ব্যক্তিগত

ভাবে একটা শিক্ষা পেয়েছি। এদেশের লোক কেউ কারো ভালো চায় না। আমরা খুবই পরশ্রী কাতর। আমরা যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য সম্মান দিতে জানি না। সবসময় আমরা নিজেদের স্বার্থে মিথ্যা বলতে জানি, মিথ্যা বলে প্রচার করতে পারি। আমরা কেউ কাউকে মানতে চাই না। শৃংখলা আমাদের ভিতরে নেই।

প্র: এখানে একটা কথা যোগ করতে চাই। '৭১ এসেছে অনেক পরে। ১৭৫৭ সালকে যদি আমরা আমাদের স্বাধীনতার সূর্যাস্তের যুগ ধরে থাকি এবং যদি ধরি '৭১-এ সেই অস্তমিত সূর্য দীর্ঘ প্রায় দু'শ বছরের পথ পরিক্রমায় স্বাধীনতার সূর্য হয়ে উদিত হয়েছে, এই যে মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান রয়ে গেল, আমরা বিভিন্ন সময় বিদ্রোহ করেছি, কখনো কখনো অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছি, কিন্তু লক্ষ্যনীয় যে '৭১-এর মত দীপ্ত তেজে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে আমাদের পূর্ব পুরুষগণ কখনো সাহস করেননি। একাত্তরে আমরা সার্বিক ভাবে মরণপণ যুদ্ধে অস্ত্র হাতে এগিয়ে গিয়েছি এদেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য, স্বাধীনতার জন্য। আমরা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিলাম। সারা বাংলাদেশ পরিণত হয়েছিল রণাঙ্গনে। কে কিভাবে এগুচ্ছিলেন কিংবা আদৌ এগুচ্ছিলেন কিনা, তার কোনও পরিচ্ছন্ন ধারনা না থাকা সত্বেও আমরা যুদ্ধ করেছি, শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছি এবং শেষ পর্যন্ত তিরিশ লাখ বাঙ্গালীর রক্তের বিনিময়ে এদেশকে আমরা শত্রুমুক্ত করেছি, আমরা বিজয়ী হয়েছি।

এটাও কি একটা শিক্ষা নয় যে, যে জাতি স্বাধীন ভাবে বাঁচতে চায়, তাকে কোনও শক্তি দাবিয়ে রাখতে পারে না ?

উ: না। কিন্তু এ স্বাধীনতা যুদ্ধ পাকিস্তানই করেছে। আমরা করিনি। কারণ পাকিস্তান যদি আমাদের আক্রমণ না করত, পথে-ঘাটে আমাদের না মারত, আমরা অস্ত্র হাতে তুলে নিতাম না। বাঙ্গালীকে না খোঁচালে বাঙ্গালী কিছু করে না। এত স্বার্থপর বাঙ্গালী, যখন জানে যে নিজের স্বার্থ বিপন্ন, তখনই যুদ্ধ করে, এর আগে যুদ্ধ করে না। যথার্থই স্বাধীনতা লাভের পর বাস্তব মূল্যবোধ এবং নীতির ওপর যদি আমরা থাকতাম, তবে আমাদের এই অবস্থা হতো না। স্বাধীনতার পর আমি দেখতে পাচ্ছি, আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা কেউ কোনও সঠিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হইনি।

প্র: আপনি কি তা'হলে বলতে চান যে আমরা সত্যিকারের কোনও শিক্ষাই পাইনি ?

উ: কোনও শিক্ষাই পাইনি।

প্র: আপনার আশাবাদ কি মোটেই নেই যে এদেশের লোক একদিন সুন্দর হবে, সুখী হবে ?

উ: হ্যাঁ আমি আশাবাদী। একদিন আল্লাহ্‌র রহমত হবে এদেশের ওপর। এদেশ সঠিক নেতৃত্ব পাবে। নিঃস্বার্থ নেতৃত্ব পাবে; যাঁরা মূল্যবোধকে ব্যক্তি স্বার্থের উর্দ্ধে স্থান দিয়ে দেশকে চালিয়ে নিয়ে যাবেন, কিন্তু যারা ব্যক্তিস্বার্থে, দলীয় স্বার্থে, কিংবা একটা গোষ্ঠি স্বার্থে জড়িয়ে পড়বেন না। সেদিন বাংলাদেশে কিছু হবে। এর আগে কিছু হবে না।

প্র: আমরা প্রায়ই বলতে শুনি, বিশেষ করে যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি, কিংবা অংশ গ্রহণ করেন নি, তাদের কাছ থেকে যে ভারতই আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন; স্বাধীনতার পেছনে আমাদের বাঙ্গালী সৈন্যদের তেমন কোনও কৃতিত্ব নেই। এ সম্পর্কে আপনার মত কি ?

উ: ভারত যদি এদেশ স্বাধীন করতে পারতেন তা'হলে আমাকে বলুন ১৯৬৫ সালে ভারত জয়ী হলেন না কেন ? আপনি এ প্রশ্নের জবাব দিন। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের সময় পাকিস্তান ত আরো দুর্বল ছিল। অপর দিকে ভারত চীনের কাছে ১৯৬২ সালে পরাজিত হয়েছে। তখন হয়ত তাদের সেনাবাহিনী অত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছিল না। তারপর ভারত একটা শিক্ষা পেয়েছিলেন যে '৬২ সালে তারা হেরেছিলেন। পরবর্তীকালে ভালভাবে উন্নত রণ কৌশল আয়ত্ব করলেন তারা। তারপর '৬৫ সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ হ'ল। পাকিস্তান তখন শক্তিশালী ছিল না। এতদ্‌সত্বেও ভারত পাকিস্তানের লাহোর বা অন্য কোনও এলাকা দখল করতে পারলেন না কেন ?

প্র: এ প্রসঙ্গে আর একটু ব্যাখ্যা দান করুন।

উ: যে কোনও যুদ্ধে গেরিলা রণ কৌশল চালিয়ে একটি সৈন্য দলকে যদি আপনি দুর্বল করে ফেলেন, তা'হলে শেষ পর্যন্ত আপনার জয় অবশম্ভাবী। ধরুন, পাকিস্তানীরা যুদ্ধ করেছিল বাংলাদেশে, প্রত্যেক বাঙ্গালী তাদের শত্রু ছিল। এই অবস্থায় আর কয়েক মাস পর পাকিস্তানী বাহিনী এমনিতেই আত্ম-সমর্পণ করত। ভারতীয় সেনাবাহিনী সাহায্য করলো কি না করলো, তাতে কিছুই যেতো আসতো না। এটাই আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যজনক যে ডিসেম্বর, '৭১-এ আমরা চাইনি যে ভারতীয় বাহিনী আমাদের পক্ষে পাকিস্তানীদের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করুক। আমরা চেয়েছি, আমরা আরো কিছুদিন লাগত না হয়, যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করব। ভারতীয় বাহিনী এলো কেন ?

প্র: ১৯৭১ সালের মুক্তি যুদ্ধের বা মুক্তি বাহিনীর এই যে অবদান

এটা লিপিবদ্ধ হলো না কেন? জনসাধারণকে জানতে দেয়া হলো না কেন মুক্তিযোদ্ধাদের প্রকৃত ভূমিকা কি ছিল?

উ: বিশেষ কিছু ক্ষমতাবান ব্যক্তি বা কোনও গোষ্ঠি স্বার্থ, কিংবা রাজনৈতিক চাতুরী। আর যদি রাজনৈতিক চাতুরীই না হ'ত তাঁ'হলে আমাদের দেশে একের পর এক প্রেসিডেণ্টই বা কেন মারা যাচ্ছেন? আর কেনই বা এত গোলযোগ? কেনই বা এত লোক ধরাধরি? এ আজকে ওকে ধরে, কাল ও একে ধরে? যখনই কেউ ক্ষমতায় আসেন, তখন কিছু না কিছু গণ্ডগোল চলতে থাকে। সবকিছু যদি সত্য পথে চলত তবে কেন এসব হচ্ছে? আমি'ত মনে করি, মুক্তিযোদ্ধাদের সঠিক মুল্যায়নের মধ্যেই নিহিত রয়েছে এদেশের মঙ্গল। আল্লাহ্ই বলেছেন: প্রত্যেককেই তার যোগ্যতা অনুসারে ইজ্জত দিতে হবে। কাজেই যদি যোগ্য ব্যক্তির স্থান দেয়া না হয়, তার পরিণতি কখনো ভাল হয় না।

তবে এটাও বলা অন্যায় হবে যে ভারত আমাদের সাহায্য করেন নি। ভারত আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। আমি ভারতকে বেশী দোষ দেই না এইজন্য যে আমরাই যদি সঠিক ভাবে আচরণ করতে না পারি, তাঁ'হলে অন্য জাতিকে দোষ দিয়েত কোন লাভ নেই। ভারত আমাদিগকে সাহায্য করেছেন, যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।

প্র: পাকিস্তান বাহিনী বহু অস্ত্রশস্ত্র আত্মসমর্পণের পর বাংলাদেশে রেখে গিয়েছিলো। সেগুলি কি সব বাংলাদেশে রয়ে গেল?

উ: নাহ্। বেশীর ভাগই ভারতীয় বাহিনী নিয়ে গিয়েছেন।

প্র: এতে কি বুঝা যাচ্ছে?

উ: যে কোনও দখলদার সেনাবাহিনী বিজিত দেশের জিনিষপত্র নিয়ে যাবেই। আপনি যদি আটকিয়ে রাখতে না পারেন, তবে অন্যে কি করবে?

প্র: আমাদের মুক্তি বাহিনী ত দেশকে জয় করলেন। তাঁরা আটকিয়ে রাখতে পারলেন না?

উ: ভারতীয় বাহিনীও সাথে ছিলেন।

প্র: সাথে ছিলেন। কিন্তু আপনারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যেতে দিলেন কেন?

উ: আমরা দেইনি। আমরা যথাসম্ভব আটকিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছি। তবে সরকারী নীতি কি ছিল কিংবা ওপরের পর্যায়ে কি বুঝাপড়া হয়েছিল, সেটা আমরা জানতাম না। অবশ্য আমাদের হাতে যেসব অস্ত্র ছিল, সেগুলি আমরা দেইনি।

প্র: এসব অস্ত্রশস্ত্র ফিরিয়ে আনার জন্য আপনারা বা বাংলাদেশ সরকার কি কোনও চেষ্টা পর্যন্ত করেননি? বৈদেশিক মুদ্রায় এসব অস্ত্রশস্ত্র খরিদে বাংলাদেশকেই ত টাকার সিংহ ভাগ বহন করতে হয়েছে।

উ: হ্যাঁ। আমাদের সেনাবাহিনী অনেক চেষ্টা করেছেন, পরে সরকারও চেষ্টা করেছেন। ফলে কিছু অস্ত্রশস্ত্র ভারত ফেরত দিয়েছেন। তবে খুব বেশী নয়।

প্র: সামরিক এবং অন্যান্য যানবাহন?

উ: যানবাহনও বেশীর ভাগ ভারতীয় বাহিনী নিয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে এদিক সেদিক দু'একটা হয়ত ফেরত দিয়েছেন। তবে যুদ্ধের চিরাচরিত নিয়মই হল: বিজয়ী বিজিতের সম্পদ নেবেই। ভারতীয় বাহিনীও নিয়েছে। এটাই যুদ্ধের চিরাচরিত নিয়ম। আমাদের জিনিষ আমরা আটকিয়ে রাখতে না পারলে অন্যকে দোষ দিয়ে লাভ কি? তবে মুক্তিবাহিনী একেবারে চুপও ছিলেন না। অনেক জায়গায় কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র এবং যানবাহন হস্তগত করা নিয়ে অনেক গণ্ডগোল এবং বিশ্রী ঘটনাও ঘটেছে মুক্তিবাহিনী কমাণ্ডার এবং ভারতীয় কমাণ্ডারগণের সাথে।

প্র: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল আতাউল গনি ওসমানী সম্পর্কে আপনার কাছে কিছু জানতে চাই।

উ: আমি যখন একজন সৈনিক এবং একজন অফিসার আমার সিনিয়র সম্পর্কে মন্তব্য করা আমার উচিত নয়। আমি মন্তব্য করছি না। তবে সত্যের খাতিরে বলতে হচ্ছে যে জেনারেল ওসমানীকে আমাদের দেশ ঠিক যথাযথ ভাবে স্বীকৃতি দেয়নি। অনেকে অনেক কথা বলতে পারেন যে তিনি বুড়ো মানুষ ছিলেন। কিংবা অনেকে বলবেন আপনাকে যে তিনি সম্মুখ রণাঙ্গনে যাননি। এসবই মিথ্যা কথা। একজন প্রধান সেনাপতি, প্রত্যেক দিন সম্মুখ রণাঙ্গনে যুদ্ধ দেখতে যান না। তাঁর যতটুকু যাওয়ার প্রয়োজন ছিল, তিনি ততটুকু গিয়েছেন। জেনারেল ওসমানী সাহেব আমার সেক্টারে গিয়েছেন। প্রত্যেকের সেক্টারেই কয়েকবার করে রণাঙ্গনের পুরো সম্মুখভাগ পর্যন্ত গিয়েছেন। তাঁর কাজ ছিল পরিকল্পনা আর নির্দেশ প্রদান। সেটা তিনি করেছেন। আর একটা কথা আমি আপনাকে বলি। জেনারেল ওসমানী ভারতীয় জেনারেলগণের সমকক্ষ ছিলেন এবং কারো কারো সিনিয়র ছিলেন। জেনারেল অরোরা যিনি ইষ্টার্ণ কমাণ্ডের সি-ইন্-সি ছিলেন, তাঁর চাইতেও জেনারেল ওসমানী সিনিয়র ছিলেন এবং খুব সম্ভবতঃ জেনারেল ম্যানেকশ থেকে জুনিয়র ছিলেন। তিনি যদি না থাকতেন আমার মনে হয় না ভারতীয় সেনা

বাহিনীর জেনারেলগণ আমাদের যেভাবে সাহায্য করেছেন, সেভাবে সাহায্য করতেন। কারণ আমরা অনেক জুনিয়র ছিলাম। আমরা ছিলাম মেজর। আর তাঁরা ছিলেন জেনারেল এবং লেঃ জেনারেল। কাজেই জেনারেল ওসমানীকে আমাদের বেশী প্রয়োজন ছিল। আমি ব্যক্তিগত ভাবে অনুভব করি যে, 'বঙ্গবীর' আখ্যাটি তাঁকে দেয়া হয়েছিল শুরুতে, যথার্থই তিনি এটা পাওয়ার যোগ্যতা রাখেন। তাঁকে অবশ্যই 'বঙ্গবীর' খেতাব দেয়া উচিত। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর পুরো দেশে কেউ একবারও চিন্তা করলেন না যে সমস্ত সেক্টার কমাণ্ডারকে 'বীর উত্তম' খেতাব প্রদান করা হয়েছে। আর যিনি প্রধান সেনাপতি, ঐ বুড়ো বয়সে অবসরপ্রাপ্ত একজন ব্যক্তি যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাদিগকে পথ নির্দেশ করতে এসেছিলেন, তাঁকে কোনও খেতাব দেয়া হ'ল না। এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক, অত্যন্ত অন্যায়। This country must learn to give correct reward to the correct people. যথাযথ ব্যক্তিকে যথাযথ ভাবে পুরস্কৃত করার শিক্ষা অবশ্যই এই দেশকে লাভ করতে হবে। অন্যথায় এই দেশে ভবিষ্যতে কেউ আন্তরিকতা এবং বিশ্বস্ততার সাথে যুদ্ধ করবেন না। আমার ব্যক্তিগত অনুভূতি হচ্ছে: জেনারেল ওসমানী 'বঙ্গবীর' আখ্যায়িত হওয়ার জন্য যথার্থই দাবীদার; হতে পারে অন্য কেউ হয়ত অন্যভাবেও চিন্তা করতে পারেন। কারণ জেনারেল ওসমানী সব সময় একজন যথার্থ সৈনিক হিসেবেই আচরণ করেছেন। তাঁর আচরণ যথার্থই একজন কমাণ্ডারের মত ছিল। কাজেই তাঁর মেজাজ হয়ত অনেকেই সহ্য করতে পারেন নি। আমি বলতে পারি একজন নিয়মনিষ্ঠ সৈনিকই জেনারেল ওসমানীর সাথে খুব ভালভাবে কাজ করতে পেরেছেন। কিন্তু একজন বিশৃংখল অফিসারের পক্ষে তাঁর সাথে কাজ করতে যাওয়া যথার্থই কঠিন ছিল।

এখানে আর একটা কথা যোগ করি। '৭১ এর যুদ্ধ চলাকালে জেনারেল ওসমানী আমাকেও বিপদে ফেলেছিলেন। তিনি আমাকে কমাণ্ড থেকে এক রকম সরিয়ে দিয়েছিলেন। আমার সাথে তাঁর কিছু বিতর্ক হয়েছিল। পরে অবশ্য আমাদের ভুল বুঝাবুঝির অবসান হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলার ছিল না। বরং আমি তাঁর কাছে ঋণী এইজন্য যে তিনি আমাকে শৃংখলার মধ্যে থাকতে বাধ্য করেছেন। আমি মনে করি সেনাবাহিনীর মধ্যে শৃংখলা রক্ষার খাতিরে একজন জেনারেলের পক্ষে এ জাতীয় কঠোর ব্যবস্থা নেয়া ছাড়া একটি সেনাবাহিনী চলতে পারে না। সেনাবাহিনী প্রধানকে অবশ্যই প্রয়োজনে কঠোর হতে হবে।

প্রঃ আপনার জানা মতে আর কারো বিরুদ্ধে তিনি এ জাতীয় ব্যবস্থা নিয়েছিলেন কি?

উঃ হ্যাঁ। বিশৃংখলা তিনি কোন কালেই সহ্য করতেন না। ফলে প্রয়োজনীয় এ্যাকশন তিনি সবসময়ই নিয়েছেন।

প্রঃ জেনারেল জিয়াউর রহমান সাহেবকে (তৎকালীন মেজর) চট্টগ্রাম এক নম্বর সেক্টার থেকে সিলেট এবং পরবর্তীকালে তেলিয়াপাড়ায় বদলী করার পেছনেও কি জেনারেল ওসমানী সাহেবের একই কঠোরতার নীতি কাজ করেছে?

উঃ (জেনারেল মীর শওকত আলী সাহেব এই প্রশ্নের উত্তর দেন নি।)

প্রঃ জেনারেল শওকত সাহেব, '৭১-এর রণাঙ্গন প্রসঙ্গে আপনার কাছে অনেক মূল্যবান তথ্য জানলাম। এ জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

উঃ ধন্যবাদ।

বেগম শওকত আলী

লেঃ জেনারেল মীর শওকত আলীর সাক্ষাৎকার শেষে বেগম শওকত আলীর সাথেও কিছুক্ষণ আলাপ করেছিলাম একাত্তরের রণাঙ্গন প্রসঙ্গে।

প্রঃ ১৯৭১ সালে যখন যুদ্ধ শুরু হল, এবং যুদ্ধে যখন আপনার স্বামী জড়িত হয়ে পড়লেন, আপনি কি তাঁর সাথে চট্টগ্রাম ছিলেন?

উঃ না। আমি কুমিল্লা ছিলাম।

প্রঃ পুরা যুদ্ধের সময় কি আপনি কুমিল্লায় ছিলেন?

উঃ না। পুরা যুদ্ধের সময় নয়। ৫ই জুন, '৭১ তাঁর কাছ থেকে প্রথম খবর পেয়েই আমি ভারতে চলে গিয়েছিলাম।

প্রঃ যুদ্ধ শুরু হ'ল ২৫শে মার্চ, '৭১ থেকে। আপনি কখন জানলেন যে আপনার স্বামী যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন।

উঃ জুন, '৭১।

প্রঃ ২৫শে মার্চ, '৭১ থেকে জুন, '৭১ পর্যন্ত সময়ে আপনার স্বামীর অবস্থান সম্পর্কে কি ভেবেছিলেন?

উঃ তিনি যুদ্ধ করেছিলেন, এ ধারণা আমার ছিল। কিন্তু আমি খবর পাচ্ছিলাম না কেন সে কথা বুঝতে পারছিলাম না। পরে আমরা ভাবলাম হয়ত তিনি সীমান্ত অতিক্রম করেননি, পার্বত্য এলাকার কোথাও থেকে যুদ্ধ করছেন, যে কারণে আমার সাথে কোনও সংযোগ রাখতে পারছেন না। আর একটা ধারণা করেছিলাম যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রচার থেকে হয়তবা তাঁর নাম ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন রাখা হয়েছিল। কারণ নাম ঘোষিত হওয়ার পর পাক সেনাবাহিনী কর্তৃক আমাদের পুরা পরিবারকে ধরে নিয়ে যাওয়ার আশংকা ছিল।

প্র: আপনার স্বামী কোথায় কি অবস্থায় ছিলেন সে সম্পর্কে আপনি একটা বিরাট ভাবনার মধ্যে ছিলেন। এতদ্ সত্ত্বেও কি আপনি স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য কোনও প্রকারের কাজ করেছেন?

উ: সীমান্ত অতিক্রমের আগে কিছু করিনি। তবে সীমান্ত অতিক্রম করার পর আমি কাজ করেছি। যারা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, কিংবা যারা মাত্র পালিয়ে এসেছিলেন, অসহায় অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, খাওয়া নেই, কাপড় নেই, তাদের আমার দেখাশুনা করতে হয়েছে, খাবার এবং কাপড় দিতে হয়েছে।

প্র: আপনি কিভাবে সীমান্ত অতিক্রম করলেন?

উ: প্রথমে আমার স্বামী শাহ্ আলম নামের একজন গেরিলা নেতাকে কুমিল্লায় আমার খোঁজে পাঠান। তিনি আমাকে দেখে গেলেন, কিন্তু কিছু বলেন নি। আমার স্বামী আমার অবস্থান সম্পর্কে সঠিক জানার পরই পুনরায় শাহ্ আলমকে একদল গেরিলা সহ আমার কাছে একখানা চিরকুট লিখে কুমিল্লা পাঠালেন। চিরকুটে উল্লেখ ছিল, আমরা অর্থাৎ আমি, আমার তিন নন্দ, দুই সন্তান এবং শ্বশুর-শ্বাশুড়ী যে অবস্থায় থাকি সে অবস্থায়ই যেন মুহূর্তমাত্র দেরী না করে শাহ্ আলম এবং গেরিলা দলের সাথে চলে যাই। নির্দেশ অনুযায়ী আমরা মুহূর্ত বিলম্ব না করে যে অবস্থায় ছিলাম সে অবস্থায় তাদের সাথে বের হয়ে এসেছিলাম।

প্র: সীমান্তের ওপারে কোথায় গিয়ে উঠলেন এবং আপনার স্বামীর সাথে কখন দেখা হ'ল?

উ: আমরা আগরতলা গিয়ে উঠেছিলাম। তবে আমার স্বামীর সাথে সীমান্তের কাছাকাছি এলাকায় দেখা হয়েছিল। আমাদের এগিয়ে নেয়ার জন্য তিনি সীমান্ত পর্যন্ত এসেছিলেন।

(জে: শওকত: আমি এসেই আর কি পার করে নিয়ে গেলাম)

প্র: ভারতে অবস্থানের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কিছু বলুন।

উ: প্রথমে আমরা আগরতলা গিয়ে উঠেছিলাম। শ্বশুর-শ্বাশুড়ী, নন্দ এবং আমার দুই বাচ্চাকে নিয়ে আমরা সেখানে ছোট একটি ভাড়া করা বাসায় থাকতাম। আগরতলায় আমার স্বামীর সাথে আমাদের কদাচিৎ দেখা হতো। কারণ যুদ্ধ নিয়েই তিনি ব্যস্ত থাকতেন। প্রথম দিকে ঘুমানো এবং খাওয়ার জন্য আমরা পৃথক চাটাই পর্যন্ত সংগ্রহ করতে পারিনি। এমনকি মশারী ছাড়াই কয়েক রাত কাটাতে হয়েছিল। প্রথম দিকে আমাদের কারো পায়ে এক জোড়া সেণ্ডেল পর্যন্ত ছিল না। আগরতলায় আমরা প্রায় পাঁচ মাস ছিলাম। তারপর

চলে গিয়েছিলাম শিলং। আমার শ্বশুর-শ্বাশুরী এবং নন্দ চলে গিয়েছিলেন গৌহাটি। শিলং-এ দুই বাচ্চাকে নিয়ে আমি একটি মাত্র কক্ষ ভাড়া করেছিলাম। আমাদের রন্ধন, শয়ন এবং বসা সব ঐ একটি মাত্র কক্ষে করতে হতো। প্রায় কুড়িদিন থাকার পর বিরক্ত হয়ে একদিন বাসা ছেড়ে দিয়েছিলাম। ঐ সময় জনাব মোস্তফা নামীয় শ্রীমঙ্গল চা বাগানের প্রাক্তন ম্যানেজার আমাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। বাসা ছেড়ে দেয়ার পর একদিন সকাল আটটা থেকে দুই বাচ্চা এবং মোস্তফা সাহেবকে নিয়ে আমরা সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত বাসা খুঁজে বেড়িয়েছি। উপায়ান্তর না দেখে রাতে দৈনিক একশত টাকা ভাড়ায় একটি হোটেল কক্ষে উঠতে হয়েছিল আমাদিগকে। শিলং-এর ঐ সময়ের শীতের প্রথম রাত্রে আমি বাচ্চাদের গায়ে এক টুকরো শীতের কাপড় পর্যন্ত তুলে দিতে পারিনি। ওখানে তিন দিন থাকার পর ভারতীয় সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে আমরা আমি ব্যারাকে দেড়কক্ষ বিশিষ্ট একটি থাকার জায়গা পেয়েছিলাম। ঐ দেড়কক্ষ সংগ্রহ করতে জনাব মোস্তফাকে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল।

প্র: ঐ ব্যারাকে আর কোনও বাঙালী পরিবার ছিলেন কি?

উ: ছিলেন। হিন্দুস্তান এবং পাকিস্তান আনুষ্ঠানিক ভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে (ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ) মুক্তিযুদ্ধের গতিও বেড়ে গিয়েছিল অনেক বেশী ব্যাপকভাবে। ঐ সময়ে আমাদের কয়েকজন সামরিক অফিসার গুরুতর রূপে আহত হয়ে হাসপাতালে নীত হয়েছিলেন। ফলে তাঁদের কয়েক-জনের পরিবারকেও থাকতে দেয়া হয়েছিল ঐ আমি ব্যারাকে।

প্র: ভারতে অবস্থান কালের আর কোনও ঘটনা এ মুহূর্তে বেশী মনে পড়ে কি?

উ: আমরা আগরতলায় অবস্থানকালে জিয়া সাহেব একদিন আকস্মিক ভাবে আমাদের বাসায় এসে উপস্থিত। পরণে যুদ্ধের পোষাক। এসেই বললেন: ভাবী আমি কয়েকদিন ঘুমুইনি। আপনি কিছুক্ষণ বাইরে বসুন। আমি ঘুমাবো। আমি বাচ্চাদের নিয়ে বাইরে গাছতলায় চলে গেলাম। জিয়া সাহেব প্রায় দুঘন্টা ঘুমিয়ে পুনরায় রণাঙ্গনে গেলেন। আজ তিনি নেই। আজীবনের স্বল্পভাষী এবং রক্ষণশীল মনের অধিকারী তৎকালীন মুক্তিযোদ্ধা মেজর জিয়াউর রহমান সাহেবের (পরবর্তীকালে মহামান্য রাষ্ট্রপতি) আবদারের স্মৃতি আজ তাঁহার অনুপস্থিতিতে দ্বিগুণ করে মনের কোণে ভীড় জমায়। যুদ্ধের এমনি অনেক ঘটনা আজ স্মৃতি হয়ে আছে। আবার অনেক ঘটনা চলে যাচ্ছে স্মৃতির অন্তরালে।

প্রসঙ্গে আর একটি কথা যোগ করতে চাই। আমরা আগরতলা পৌঁছার পর

সম্পূর্ণ কপর্দকহীন ছিলাম। আগেই বলেছি এমনকি পায়ের এক জোড়া সেণ্ডেল পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারিনি। কোনও রন্ধন সামগ্রী ছিল না, পরনের এক সেট করে কাপড় ছাড়া আর কিছুই আমরা সাথে নিতে পারিনি। আমরা আগরতলায় পৌছার পরদিন জিয়া সাহেব এসে আমার হাতে এক হাজার টাকা দিয়া বলেছিলেন: ভাবী এ টাকা দিয়ে সাংসারিক জরুরী জিনিস পত্র কেনাকাটা করুন। সপ্তাহ খানেক পর এসে তিনি আরো এক হাজার টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন। ঐ টাকা গুলি আমাদের দুঃসময়ে খুবই কাজ দিয়েছিল। জিয়া সাহেব এমনিতেই মাঝে মধ্যে আমার স্বামীর সাথে আকস্মিক ভাবে এসে শাক-তরকারী যাই হোক চেয়ে খেয়ে নিতেন। কোনও তরকারী না থাকলে ডিম ভাজা করে দিতাম। দু'জনেই আবার চলে যেতেন উর্দ্ধশ্বাসে রণাঙ্গনে। স্বাধীনতা যুদ্ধের ন'মাস জিয়া সাহেবের স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন অধিকৃত বাংলায় ক্যান্টনমেন্টে হানাদার পাক বাহিনীর হাতে বন্দিনী। তাঁর এক ছেলেকেও পাক সৈন্যরা আটক করে রেখেছিল। যখনই জিজ্ঞাসা করতাম: ভাই, ভাবী এবং বাচ্চার কোনও খবর পেলেন কি? উত্তরে শুধু হাসতেন, কোনও জবাব দিতেন না। স্বাধীনতা যুদ্ধের এমনি অনেক কথা এ মুহূর্তে মনে পড়ছে।

প্র: ১৯৭১ সালের যুদ্ধে আপনার কি আশা ছিল?

উ: যুদ্ধের পর বাংলাদেশ স্বাধীন হবে এই আশাই ছিল।

প্র: বাংলাদেশের মাটিতে আপনি কখন ফিরে এলেন?

উ: যতদূর মনে পড়ে ২৮ কি ২৯শে ডিসেম্বর, '৭১।

প্র: এসে প্রথম কোথায় উঠলেন?

উ: ছাতক।

প্র: ঢাকাতে কখন এলেন?

উ: ঢাকায় আমি আসিনি। ছাতক থেকে সিলেট হয়ে কুমিল্লা চলে গেলাম। কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রাম।

প্র: আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন এবং কিছু কিছু স্বচক্ষে হয়ত দেখেছেনও, অধিকৃত বাংলাদেশের মা-বোন যথেষ্ট কষ্ট করেছেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু সরকার নির্যাতীতা মা-বোনকে বীরাঙ্গনা খেতাব দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

উ: আল্লাহ্‌র কাছে হাজার শোকর যে আমরা এক রকম নিরাপদে ভারতের মাটিতে পৌঁছে গিয়েছিলাম। কিন্তু অধিকৃত বাংলাদেশের মা-বোনের কথা শুনে সব সময় খুব খারাপ লাগত। বঙ্গবন্ধু সরকার মহিলাদের পুনর্বাসনের জন্য অনেক

কিছু করেছেন। তবে তাদের বীরাঙ্গনা খেতাব না দিলেই বোধ হয় ভাল হ'ত। কারণ এই খেতাব দিয়ে পরোক্ষভাবে কিছু কিছু নির্যাতীতা মহিলাকে জন সমক্ষে চিহ্নিত করা হয়েছে।

প্র: বীরাঙ্গনার কোনও ক্যাম্পে আপনি গিয়েছিলেন কি?

উ: না। আমার সে রকম সুযোগ হয়নি।

প্র: স্বাধীনতার কিছুদিন পর বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্ট এলাকার মহিলা সেনা কল্যাণ সমিতি গঠিত হয়েছিল। এসব কোনও সংগঠনের সাথে আপনি জড়িত ছিলেন কি?

উ: ছিলাম। আমার স্বামী যখন যে এলাকায় থাকতেন সব এলাকাতেই আমাকে মহিলাদের জন্য কিছু করতে হয়েছে।

প্র: আপনার জীবনের সব চাইতে বড় গর্ব কি?

উ: বড় গর্ব ত আমার স্বামী।

প্র: তিনি কি বীর যোদ্ধা বলেই?

উ: শুধু বীর যোদ্ধাই ন'ন। অন্য দিকেও তাঁর অনেক গুণ রয়েছে। আমার শ্বশুর সাহেব সবসময়ই দোয়া করে বলেন: আল্লাহ্ যেন সবার ঘরে এ রকম একটা ছেলে দেন। এ সম্পর্কে বলতে গেলে তাঁর ছেলেবেলা থেকে আজ পর্যন্ত অনেক ঘটনাই বলতে হয়। যেমন আগেই আমি বলেছি, মানুষ হিসেবে যেটা আমি দেখেছি, সেটা তাঁর কর্তব্যপরায়ণতা, যা তিনি কখনো অবহেলা করেননি। মা-বাপের প্রতি, দেশের প্রতি, চাকুরীর প্রতি, ছেলেমেয়ে, চাকর-বাকর, অধস্তন কর্মচারী সবারই প্রতি তিনি বিশ্বস্ততা এবং ভালবাসা দেখিয়েছেন।

প্র: আপনাকে ধন্যবাদ।

উ: ধন্যবাদ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মুক্তি বাহিনীর পরিচিতি

সামরিক অফিসারদের তালিকা

'৭১-এর রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাগণের একটি পূর্ণ তালিকা প্রণয়নের প্রধান দায়িত্ব গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের। এই মহান দায়িত্ব পালনে সরকার আর কাল বিলম্ব না করে এগিয়ে এলেই আমরা সুখী হবো। রণাঙ্গনের এক নম্বর সেক্টারের অধিনায়ক (জুন-ডিসেম্বর) মেজর (অব:) রফিকুল ইসলাম, বীর উত্তম মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সামরিক অফিসারদের একটি তালিকা সম্প্রতি তাঁর প্রণীত 'লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে' (এ টেল অব মিলিয়নস্) গ্রন্থে সন্নিবেশ করেছেন। মেজর (অব:) রফিকুল ইসলামের উক্ত গ্রন্থ যথার্থই ভবিষ্যত জাতির জন্য মুক্তিযুদ্ধের একটি অনন্য দলিল। তাঁর এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত তালিকার আলোকে মুক্তিবাহিনীতে অংশ গ্রহণকারী সামরিক অফিসারদের নাম তাঁদের পদমর্যাদা সহ নিম্নে উপস্থাপন করলাম:

হেড কোয়ার্টার:

জেনারেল (অব:) এম, এ, জি, ওসমানী (সশস্ত্র মুক্তি বাহিনীর প্রধান সেনাপতি)
এয়ার ভাইস মার্শাল (অবসরপ্রাপ্ত) এ, কে, খন্দকার, বীর উত্তম
মেজর জেনারেল আবদুর রব, বীর উত্তম (মরহুম)
মেজর জেনারেল (অব:) নুরুল ইসলাম
কর্ণেল (অব:) এ, টি, এম, সালাউদ্দিন, বীর প্রতীক
উইং কমাণ্ডার শামসুল আলম, বীর উত্তম
লে: ক: (অব:) এম, এ, ওসমান চৌধুরী
লে: ক: এম, এনামুল হক (মরহুম)
লে: ক: এম, আবদুল মালেক মোল্লা
স্কোয়াড্রন লীডার (অব:) বদরুল আলম, বীর উত্তম
মেজর ফজলুর রহমান
মেজর (অব:) ফাত্তাহ চৌধুরী
ফ্লা: লে: মতিউর রহমান, বীর শ্রেষ্ঠ (নিহত)

মেজর শামসুল আলম, বীর প্রতীক
ক্যাপ্টেন এস, মঈনুদ্দিন আহমদ, বীর প্রতীক
লে: আনোয়ার হোসেন, বীর উত্তম (শহীদ)
লে: শেখ কামাল ('৭৫-এর সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত)

সেক্টর নং—১

মেজর (অব:) রফিক-উল-ইসলাম বীর উত্তম, সেক্টার কমাণ্ডার
মেজর জেনারেল শামসুল হক, এ, এম, সি; পরে হেড কোয়ার্টার বি, ডি, এফ
ব্রিগেডিয়ার হারুন আহমেদ চৌধুরী, বীর উত্তম
কর্ণেল (অব:) খুরশিদউদ্দিন আহমেদ
লে: ক: আবু ইউসুফ মো: মাহফুজুর রহমান, বীর বিক্রম, পি, এস, সি ('৮১তে সামরিক আদালতে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত)
এয়ার কমোডর সুলতান মাহমুদ, বীর উত্তম, পি, এস, সি,
পরে হেড কোয়ার্টার বি, ডি, এফ
উইং কমাণ্ডার শাখাওয়াত হোসেন
মেজর (অব:) এনামুল হক
মেজর (অব:) শমসের মবিন চৌধুরী, বীর বিক্রম
মেজর (অব:) কামরুল ইসলাম
মেজর লতিফুল আলম চৌধুরী
মেজর শওকত আলী, বীর প্রতীক (চাকুরীচ্যুত)
মেজর ফজলুর রহমান
মেজর রফিকুল ইসলাম
ক্যাপ্টেন আফতাব কাদের, বীর উত্তম (শহীদ)
ক্যাপ্টেন শামসুল হুদা (মৃত)
ক্যাপ্টেন মনসুরুল আমিন (চাকুরীচ্যুত)

সেক্টর নং—২ এবং 'কে' ফোর্স

মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ, বীর উত্তম সেক্টার কমাণ্ডার (পরবর্তী কালে "কে" ফোর্স এর অধিনায়ক)
ব্রিগেডিয়ার (অব:) এম, এ, মতিন, বীর প্রতীক
কর্ণেল আনোয়ারুল আলম

কর্ণেল (অব:) শওকত আলী
কর্ণেল আইনুদ্দিন, বীর প্রতীক
কর্ণেল এম. আশরাফ হোসেন, পি, এস, সি
লে: ক: গাফফার, বীর উত্তম (চাকুরীচ্যুত)
লে: কর্ণেল (অব:) বাহার
লে: কর্ণেল এ, টি, এম, হায়দার, ('৭৫-এর সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত)
লে: ক: মাহবুবুর রহমান, বীর উত্তম ('৮১ তে সামরিক বিদ্রোহে নিহত)
লে: ক: হারুনুর রশীদ, বীর প্রতীক
লে: ক: ফজলুল কবীর
লে: ক: (অব:) আকবর হোসেন, বীর প্রতীক

লে: ক: ইমামুজ্জামান, বীর বিক্রম
লে: ক: (অব:) জাফর ইমাম, বীর বিক্রম
লে: ক: দিলারুল আলম, বীর প্রতীক (চাকুরীচ্যুত)
লে: ক: শহীদুল ইসলাম, বীর প্রতীক
লে: ক: এ, টি, এম, আবদুল ওয়াহাব, পি, এস, সি
লে: ক: (অব:) মোখলেছুর রহমান
লে: ক: মোস্তফা কামাল
লে: ক: (অব:) জয়নুল আবেদীন
মেজর মালেক
মেজর সালেক চৌধুরী, বীর উত্তম (মৃত)
মেজর (অব:) এ, আজীজ পাশা
মেজর (অব:) বজলুল হুদা
মেজর (অব:) দিদার আনোয়ার হোসেন
মেজর সৈয়দ মিজানুর রহমান (চাকুরীচ্যুত)
মেজর (অব:) হাশমী মোস্তফা কামাল
মেজর জামিলউদ্দীন এহসান, বীর প্রতীক
মেজর জিল্লুর রহমান
ক্যাপ্টেন (অব:) হুমায়ুন কবীর, বীর প্রতীক
ক্যাপ্টেন (অব:) আখতার, বীর প্রতীক
ক্যাপ্টেন (অব:) সীতারা বেগম, বীর প্রতীক
ক্যাপ্টেন (অব:) মমতাজ হাসান, বীর প্রতীক

লে: (অব:) শাহরিয়ার হুদা
লে: আজিজুল ইসলাম বীর বিক্রম (শহীদ)

সেক্টর নং—৩ এবং 'এস' ফোর্স

মেজর জেনারেল (অব:) কে, এম, শফিউল্লাহ্, বীর উত্তম পি, এস, সি
সেক্টর কমাণ্ডার (পরবর্তীকালে 'এস'' ফোর্সের অধিনায়ক)
ব্রিগেডিয়ার (অব:) নুরুজ্জামান, বীর উত্তম
মেজর জেনারেল মঈনুল হোসেন চৌধুরী, বীর বিক্রম
ব্রিগেডিয়ার এ, এস, এম, নাসিম, বীর বিক্রম, পি, এস, সি
কর্ণেল আবদুল মতিন, বীর প্রতীক, পি, এস, সি
কর্ণেল মতিউর রহমান, বীর প্রতীক
কর্ণেল সুবেদ আলী ভুঁইয়া, পি, এস, সি
কর্ণেল আজিজুর রহমান, বীর উত্তম, পি, এস, সি
লে: ক: এস, এম, গোলাম হেলাল মোর্শেদ খান, বীর বিক্রম পি, এস, সি
লে: কর্ণেল এজাজ আহামেদ চৌধুরী
লে: ক: ইব্রাহিম, বীর প্রতীক
লে: ক: (অব:) আবদুল মানান, বীর বিক্রম
মেজর মনসুরুল আমিন মজুমদার
মেজর আবুল হোসেন
মেজর শামসুল হুদা বাচ্চু
মেজর নজরুল ইসলাম, বীর প্রতীক
মেজর (অব:) নাসিরুদ্দিন
মেজর কামাল
মেজর সাঈদ আহমেদ, বীর প্রতীক
মেজর সৈয়দ আবু সাদেক
ক্যাপ্টেন মঈন
ক্যাপ্টেন কামাল
ক্যাপ্টেন আহমেদ আলী
লে: আই, এফ, বদিউজ্জামান, বীর প্রতীক (শহীদ)
লে: আনিস হায়াদ (অব:)
লে: কবিরউদ্দিন (চাকুরীচ্যুত)
লে: সেলিম হাসান (শহীদ)

সেক্টর নম্বর--৪

মেজর জেনারেল (রিলিজড), সি, আর দত্ত, বীর উত্তম সেক্টর কমাণ্ডার
কর্ণেল আবদুর রব, পি, এস, সি
লে: ক: (অব:) শরিফুল হক ডালিম, বীর উত্তম
স্কোয়াড্রন লীডার (অব:) কাদের
লে: ক: (অব:) খায়রুল আনম
লে: ক: (অব:) এ, এম, রশিদ চৌধুরী, বীর প্রতীক
লে: ক: (অব:) সাজ্জাদ আলী জহির, বীর প্রতীক
লে: ক: (অব:) এ, এম, হেলালুদ্দিন পি, এস, সি

মেজর (অব:) আবদুল জলিল
মেজর এম, এম, কে, জেড, জালালাবাদী
মেজর নিরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
মেজর (অব:) জহিরুল হক, বীর প্রতীক
মেজর ওয়ালিউজ্জামান
লে: আতাউর রহমান

সেক্টর নম্বর--৫

লে: জেনারেল (অব:) মীর শওকত আলী বীর উত্তম, পি, এস, সি
সেক্টর কমাণ্ডার

মেজর (অব:) মোসলেমউদ্দিন
মেজর তাহেরুদ্দিন আখুঞ্জি
মেজর এস, এম, খালেদ (চাকুরীচ্যুত)
মেজর আবদুর রউফ, বীর বিক্রম
মেজর মাহবুবুর রহমান
ক্যাপ্টেন হেলাল

সেক্টর নম্বর-- ৬

এয়ার ভাইস মার্শাল এম কে, বাশার, বীর উত্তম (বোমরু বিমান মহড়া কালে দুর্ঘটনায় নিহত)

এয়ার ভাইস মার্শাল (অব:) সদরুদ্দিন, বীর প্রতীক
কর্ণেল নওয়াজেশউদ্দিন, পি-এস-সি ('৮১তে সামরিক আদালতে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত)
লে: কর্ণেল নজরুল হক, বীর প্রতীক
লে: ক: (অব:) সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান

লে: ক: দেলওয়ার হোসেন, বীর প্রতীক, পি, এস-সি ('৮১তে সামরিক আদালতে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত)
লে: ক: মতিউর রহমান, বীর বিক্রম পি-এস-সি (মৃত)
মেজর মোহাম্মদ আবদুল্লাহ্
মেজর মাস্নুর রহমান, বীর প্রতীক.
মেজর মেসবাহউদ্দিন আহমেদ, বীর বিক্রম
লে: সামাদ বীর উত্তম (শহীদ)
ফ্লা: লে: ইকবাল

সেক্টর নম্বর--৭

লে: কর্ণেল (অব:) কাজী নুরুজ্জামান, বীর উত্তম সেক্টর কমাণ্ডার
ব্রিগেডিয়ার (অব:) গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী, বীর বিক্রম পি, এস, সি
কর্ণেল এম, আবদুর রশিদ, বীর প্রতীক, পি, এস, সি, ('৮১তে সামরিক আদালতে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত)
মেজর নাজমুল হক (মৃত)
মেজর বজলুর রশিদ (চাকরীচ্যুত)
মেজর আবদুল কাইয়ুম খান (চাকুরীচ্যুত)
মেজর (অব:) এ, মতিন চৌধুরী
মেজর আমিনুল ইসলাম
মেজর (অব:) রফিকুল ইসলাম
মেজর (অব:) আউয়াল চৌধুরী
ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর, বীর শ্রেষ্ঠ (শহীদ)
ক্যাপ্টেন (অব:) কামরুল হক
ক্যাপ্টেন (অব:) ইদ্রিস

সেক্টর নং--৮

মেজর জেনারেল এম, এ, মঞ্জুর, বীর উত্তম, পি, এস, সি সেক্টর কমাণ্ডার ('৮১তে সামরিক বিদ্রোহে নিহত)
ব্রিগেডিয়ার শামসুদ্দিন আহমদ
কর্ণেল এম, হুদা, বীর বিক্রম (মৃত)
লে: ক: এ, আর, আজম চৌধুরী, বীর প্রতীক
লে: ক: মুস্তাফিজুর রহমান, বীর বিক্রম

মেজর এম, শফিকউল্লাহ্, বীর প্রতীক
মেজর অলক কুমার গুপ্ত, বীর প্রতীক
মেজর ফজলুর রহমান
মেজর মুজিবুর রহমান
স্কোয়াড্রন লীডার ইকবাল রশিদ
মেজর এনামুল হক
মেজর মো: মোস্তফা (অব:)
মেজর রওশন ইয়াজদানী, বীর প্রতীক (মরহুম)
ফ্ল: লে: জামালুদ্দিন চৌধুরী
ক্যাপ্টেন তৌফিক-ই-এলাহি চৌধুরী
ক্যাপ্টেন মাহবুবুর রহমান
ক্যাপ্টেন আবদুল ওয়াহাব
ক্যাপ্টেন আবদুল হালিম

সেক্টর নং—৯

মেজর এম, এ, জলিল (অব:) সেক্টর কমাণ্ডার
মেজর জিয়াউদ্দিন (চাকুরীচ্যুত)
মেজর (অব:) শাহজাহান ওমর, বীর উত্তম
মেজর (অব:) মেহেদী আলী ইমাম, বীর বিক্রম
মেজর আহসানউল্লাহ্ (চাকুরীচ্যুত)
ক্যাপ্টেন (অব:) শচীন কর্মকার
মেজর সৈয়দ কামালুদ্দিন
ক্যাপ্টেন (অব:) নূরুল হুদা
ক্যাপ্টেন (অব:) শামসুল আলম, বীর প্রতীক

সেক্টর নং—১১

কর্ণেল এম, আবু তাহের, বীর উত্তম সেক্টর কমাণ্ডার,
(সামরিক আদালতে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত)
লে: ক: আবদুল আজিজ, পি, এস, সি
উইং কমাণ্ডার (অব:) হামিদুল্লাহ্, বীর প্রতীক
মেজর নূরুন নবী
মেজর তাহের আহমেদ, বীর প্রতীক

মেজর মিজানুর রহমান, বীর প্রতীক
মেজর (অব:) মো: আসাদুজ্জামান
মেজর (অব:) মাহবুবুর রহমান
মেজর গিয়াস আহমেদ (৮১ তে সামরিক আদালতে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত)
মেজর মইনুল ইসলাম, (চাকুরীচ্যুত)

"জেড্ ফোর্স"

লে: জে: জিয়াউর রহমান বীর উত্তম, পি, এস, সি, ফোর্স কমাণ্ডার,
জেড্ ফোর্স এর অধিনায়ক ('৮১তে চট্টগ্রামে বিদ্রোহী সামরিক
অফিসারদের হাতে নিহত)
ব্রিগেডিয়ার মহসীনউদ্দিন আহমেদ, বীর বিক্রম পি-এস-সি, (প্রাক্তন ১ নম্বর সেক্টর)
('৮১ তে সামরিক আদালতে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত)
ব্রিগেডিয়ার (অব:) এ, জে, এম, আমিনুল হক, বীর উত্তম (প্রাক্তন ২ নম্বর সেক্টর)
ব্রিগেডিয়ার (অব:) খালেকুজ্জামান চৌধুরী (প্রাক্তন ১ নম্বর সেক্টর)
কর্ণেল (অব:) সাফায়াত জামিল, বীর বিক্রম (প্রাক্তন ২নং সেক্টর)
কর্ণেল (অব:) আনোয়ার হোসেন, বীর প্রতীক
কর্ণেল (অব:) অলি আহম্মদ, বীর বিক্রম (প্রাক্তন ১নং সেক্টর)
কর্ণেল আমিন আহমেদ চৌধুরী, বীর বিক্রম, পি-এস-সি।
কর্ণেল (অব:) বি, জি, পাটোয়ারী, বীর প্রতীক, পি-এস-সি
লে: কর্ণেল মাহবুবুল আলম, বীর প্রতীক
লে: কর্ণেল (অব:) মোদাচ্ছের হোসেন খান, বীর প্রতীক
লে: কর্ণেল এস, এম, ফজলে হোসেন
লে: কর্ণেল সাদেক হোসেন
লে: কর্ণেল এস, আই, এম, বি, নুরুন্নবী খান, বীর বিক্রম (চাকুরীচ্যুত)
লে: কর্ণেল (অব:) এস, এইচ, এম, বি, নুর চৌধুরী, বীর বিক্রম
লে: কর্ণে। আবদুল হালিম
লে: কর্ণেল এম, জিয়াউদ্দীন, বীর উত্তম (রিলিজড্)
মেজর (অব:) এ, কাইউম চৌধুরী
মেজর (অব:) আনিসুর রহমান
মেজর (অব:) সৈয়দ মুনিবুর রহমান
মেজর আবু বকর, বীর প্রতীক
মেজর (অব:) মনজুর আহমেদ, বীর প্রতীক

মেজর ওয়ালিউল ইসলাম, বীর প্রতীক (প্রাক্তন ১নং সেক্টর)
মেজর হাফিজুদ্দিন, বীর বিক্রম
স্কোয়াড্রন লীডার (অব:) লিয়াকত, বীর উত্তম
মেজর (অব:) ওয়াকার হাসান, বীর প্রতীক
ক্যাপ্টেন মাহবুবুর রহমান, বীর উত্তম (শহীদ)
ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন মমতাজ, বীর উত্তম (শহীদ)
লে: রফিক আহমদ সরকার (শহীদ)
লে: ইমদাদুল হক, বীর উত্তম (শহীদ)

অষ্টম পরিচ্ছেদ

হানাদারের বন্দী শিবিরে

লেঃ কর্ণেল (অবঃ) মাসুদুল হোসেন খান
জয়দেবপুর দ্বিতীয় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের তৎকালীন
বাঙ্গালী কমাণ্ডিং অফিসার
(২৩শে মার্চ '৭১ পর্যন্ত)

অষ্টম পরিচ্ছদ

হানাদারের বন্দী শিবিরে

লেঃ কর্ণেল মাসুদুল হোসেন খান

'৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে লেঃ কর্ণেল মাসুদুল হোসেন খান ছিলেন হানাদার বাহিনীর বন্দী শিবিরে। ইতিপূর্বে '৭০-এর সেপ্টেম্বর থেকে '৭১-এর ২৩শে মার্চ পর্যন্ত তিনি ছিলেন জয়দেবপুর দ্বিতীয় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্ট-এর বাঙ্গালী কমাণ্ডিং অফিসার। কর্ণেল মাসুদ তাঁর সুদীর্ঘ সৈনিক জীবনে ছিলেন সেনাবাহিনীর নিয়ম শৃংখলার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু তাঁর অপরাধ, একই সাথে তিনি ছিলেন একজন খাঁটি বাঙ্গালী। কাজেই পাকিস্তানের সামরিক চক্র ছিল তাঁর ওপর সন্দিহান। তাই তারা ২৩শে মার্চ '৭১ তাঁকে ব্রিগেড হেড্ কোয়ার্টারে মিটিং-এর অজুহাতে সরিয়ে নিয়ে যায় ঢাকা ক্যাণ্টনমেণ্টে। তারপর ২৪শে মার্চ, '৭১ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর '৭১ পর্যন্ত তাঁকে আটক রাখা হয় পাকিস্তানের বিভিন্ন বন্দী শিবিরে। অক্টোবর '৭১ তাঁকে ঢাকা ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। কিন্তু ফিরে এসেও তিনি মুক্তি পাননি। ১৬ই ডিসেম্বর '৭১ বাংলাদেশ স্বাধীন হলো। কিন্তু সেদিনও সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি ছিলেন ঢাকা ক্যাণ্টনমেণ্টে আটক। তাঁর মানসিক অবস্থা তখন চরমে। সন্ধ্যার পর মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে তিনি পালিয়ে এলেন ঢাকা ক্যাণ্টনমেণ্ট-এর বাইরে।

অনেক ভাগ্য বিপর্যয়ের পর কর্ণেল মাসুদুল হোসেন খান বর্তমানে বাংলাদেশ সেনা কল্যাণ সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োজিত আছেন। ৭ই জানুয়ারী '৮২ রোববার বিকেলে তাঁর সাথে আলাপ করলাম একাত্তরের রণাঙ্গন ও তাঁর বন্দী জীবন প্রসঙ্গে মহাখালীস্থ তাঁরই ভাড়া করা বাসভবনে।

প্রঃ কর্ণেল মাসুদুল হোসেন খান, আপনি কখন জয়দেবপুর দ্বিতীয় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্টের কমাণ্ডিং অফিসার হিসেবে দায়িত্বভার নিয়েছিলেন?

উঃ '৭০-এর সেপ্টেম্বর।

প্রঃ মাত্র তিন মাস পরই ৭ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছিল দেশব্যাপী প্রথম সাধারণ নির্বাচন। সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর জন্য ছ-দফা ভিত্তিক স্বায়ত্ত

শাসনের দাবী ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী-লীগের নির্বাচনী ইশ্তাহার। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক চক্র বাঙ্গালীর এই দাবীকে চিহ্নিত করেছিল বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হিসেবে। তারা চেয়েছিল বাঙ্গালীর স্বাধিকারের দাবীকে চিরদিনের জন্য স্তব্ধ করে দিতে; তাই তারা বদ্ধপরিকর হয়েছিল আওয়ামী লীগ সহ এদেশের বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলিকে উৎখাত করতে বাংলার মাটি থেকে।

এমনি অবস্থায় '৭০-এর নির্বাচন-প্রাক্কালে বাঙ্গালী সৈনিকদের প্রতি পাকিস্তানী সামরিক চক্রের আচরণ কেমন ছিল এবং আপনার অধীনস্থ বাঙ্গালী সৈনিকদের মধ্যে আপনি কি ধরনের মানসিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেছেন?

উ: তখন পূর্বাঞ্চলীয় বাঙ্গালী সৈনিকদের মানসিক অবস্থা কেমন ছিল তার উদাহরণ হিসেবে একটি ঘটনা আমি আপনাকে বলব। আপনি মেজর শফিউল্লাহ্‌র (বর্তমানে অব: মেজর জেনারেল) সাক্ষাৎকারেই জেনেছেন যে জাহানজেব আরবাব ছিলেন আমাদের ব্রিগেড কমাণ্ডার। ১৮ পাঞ্জাব, ৩২ পাঞ্জাব এবং দ্বিতীয় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্ট—এই তিন বাহিনী নিয়ে গঠিত ব্রিগেড এর কমাণ্ডার ছিলেন তিনি। এই তিন বাহিনীর মধ্যে জ্যেষ্ঠতা অনুযায়ী ৩২ পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট ছিল আমাদের ওপর। জাহানজেব আরবাবের অধীনস্থ উক্ত ব্রিগেডের সাথে ছিল আরটিলারী, ইঞ্জিনিয়ার্স, সিগন্যাল, এ, এস, সি (সরবরাহ কোর), মেডিক্যাল অর্ডন্যান্স এবং বিদ্যুৎ ও কারীগরী প্রকৌশলী। মূলতঃ এসব নিয়েই গঠিত হয়ে থাকে একটি পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ বহর বা ব্রিগেড।

আমাদের ব্রিগেড হেড্ কোয়ার্টার ছিল ঢাকা ক্যাণ্টনমেণ্টে। '৭০-এর নির্বাচনের মাত্র কয়েকদিন আগে ব্রিগেড কমাণ্ডার-এর পক্ষ থেকে দ্বিতীয় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্ট-এর কমাণ্ডার হিসেবে সরাসরি আমার কাছে এক চিঠি পাঠানো হ'ল। চিঠিতে ছিল: "এটা বুঝা যাচ্ছে যে আপনার অধীনস্থ কোনও কোনও ট্রুপ্স্ আসন্ন নির্বাচনের ব্যাপারে রাজনৈতিক দল দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। তাদের কেহ কেহ রাজনৈতিক দলগুলিকে বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা প্রদান করছে। এটা খুবই অন্যায়। কাজেই আপনি অবশ্যই নিশ্চিত থাকুন যে সামরিক পোষাক পরিহিত কোনও ব্যক্তি যেন রাজনীতিতে প্রভাবিত না হ'ন।"

আসলে তাঁরা আওয়ামী লীগের কথাই বলতে চেয়েছে। এই চিঠি শুধুমাত্র আমাকেই লিখা হয়েছিল। ব্রিগেডের অন্য কোনও ইউনিটের কমাণ্ডারগণকে লিখা হয়নি। স্পষ্টতঃই, তাদের ভয় এবং সন্দেহ শুধুমাত্র বাঙ্গালী ইউনিটের প্রতিই ছিল, এতে আমি খুবই ক্ষুব্ধ হ'লাম। সাথে সাথেই এই চিঠির স্বাক্ষরকারী

ব্রিগেড মেজর-এর কাছে প্রতিবাদ পত্র পাঠালাম। উত্তরে জানালাম: "যেভাবে চিঠিখানা আমাকে লিখা হয়েছে, তাতে প্রতীয়মান হয় যে শুধুমাত্র দ্বিতীয় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্ট-এর ট্রুপ্সই সন্দেহের পাত্র। অন্য ইউনিট প্রধানকেও এ চিঠি পাঠালে আমার তেমন ক্ষোভের কারণ থাকত না"।

আমার প্রতিবাদ পত্র পেয়ে ব্রিগেড কমাণ্ডার আমাকে হেড্ কোয়ার্টারে ডেকে পাঠালেন। তিনি জানতে চাইলেন: 'মাসুদ, তুমি কেন এই চিঠিকে এত ব্যতিক্রমধর্মী মনে করছ?' বললাম: 'আপনি কি আপনার তিনটি সন্তানকে একই চোখে দেখবেন না? আপনার ত আরো ব্যাটালিয়ান ইউনিট রয়েছে। তারা ত কোনও চিঠি পাননি? এভাবে এক তরফা চিঠি দিয়ে আমার ট্রুপ্স্-এর লোকদের ক্ষেপিয়ে দেয়া হচ্ছে না কি?' ইত্যাদি।

নির্বাচনকালে পুরা ময়মনসিংহ এবং টাঙ্গাইল জেলা আমার অধীনে দেয়া হয়েছিল। কার্যতঃ আমি ছিলাম ঐ এলাকার সামরিক প্রশাসক। ঐ সময় ব্রিগেডিয়ার আরবাব একবার আমাকে দেখতে এলেন। আমার ট্রুপ্স্ পরিদর্শন কালে তিনি ট্রুপ্স্-এর সামরিক এবং বেসামরিক লোকদের কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করলেন: কিস্‌কো ভোট দেগা। তারা বলেছে: 'ভোটের সময়ই আমরা সিদ্ধান্ত নেবো। তা'ছাড়া আমরা ত এখানে কর্মরত আছি। ভোটার তালিকায় ত আমাদের নাম রয়েছে দেশের বাড়ীতে, ইত্যাদি। আবার হয়ত উৎসাহী দু'একজন বলেছে: স্যার, আওয়ামী লীগের জোরই ত বেশী দেখতে পাচ্ছি।'

তারপর নির্বাচন হয়ে গেল। আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে বিপুল ভোটে জয়ী হলো। পাকিস্তানের মোট আসন সংখ্যায়ও আওয়ামী লীগের সংখ্যাধিক্য থাকল। কিন্তু আমরা ছিলাম সেনাবাহিনীর লোক, যে দলই সরকার গঠন করুক, তাদের প্রতি অনুরক্ত থাকাই ছিল আমাদের কাজ।

অল্পদিন পরই জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকা নিয়ে কৃত্রিম ভাবে পরিস্থিতি ঘোলাটে করা হ'ল। আমাদের পূর্বাঞ্চলীয় সেনাবাহিনীর মধ্যেই ইচ্ছে করে এই উত্তেজনা পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছিল। তারপর, আপনার হয়ত স্মরণ আছে যে লাহোর বিমান বন্দরে একটি ভারতীয় বিমান ছিনতাইকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা আরো বাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। এরপর থেকে পি, আই, এর সরাসরি ফ্লাইট বন্ধ করে দেয়া হ'ল। সিংহল হয়ে এসব ফ্লাইট চলতে থাকল। অপরদিকে চীন-ভারত সীমান্তে উত্তেজনা যত ছিল না, তার কয়েক গুণ বাড়িয়ে পত্র-পত্রিকা এবং বেতার-টেলিভিশনে জোর অপপ্রচার শুরু হ'ল। এই ঘোলাটে পরিস্থিতিকে পাকিস্তান তার নিজের কাজে ব্যবহার করল

এমনি ভাব সৃষ্টি হ'ল যে ভারত যে কোনও মুহূর্তে পাকিস্তানের সীমানায় সংঘর্ষ বাঁধিয়ে দিতে পারে। কাজেই শুরু হ'ল সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ। সেখানেও দেখা গেল শুধুমাত্র পূর্ব পাকিস্তানেই এই নির্দেশ কার্যকরী হচ্ছিল।

এ সময় ২৭ কি ২৮শে ফেব্রুয়ারী '৭১ আমাদের ব্রিগেডের ইউনিটসমূহের কমাণ্ডিং অফিসারগণের এক সম্মেলন ডাকা হ'ল। এই সম্মেলনে আমাকে বলা হ'ল: ভারত পশ্চিম বাংলার সীমানায় কয়েক ডিভিশন সৈন্য সমাবেশ করেছে। আসাম এবং সিলেট বর্ডারেও তারা সৈন্য পাঠিয়েছে। তা'ছাড়া দেশের বর্তমান উত্তেজনা পরিস্থিতিত তুমি দেখতেই পাচ্ছ। এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার জন্য আমাদের হাতে দুটি পরিকল্পনা রয়েছে। এক, যে কোনও মুহূর্তে প্রয়োজনে ভারতীয় বাহিনীকে বাধা দেয়ার জন্য তোমার কিছু ট্রুপ্সকে বর্ডারে চলে যেতে হবে। দুই, বাকী কিছু ট্রুপ্স থাকবে জয়দেবপুরে প্রয়োজনে দেশের যেকোনও আইন শৃংখলা পরিস্থিতিকে আয়ত্তে রাখার জন্য।

১লা মার্চ, '৭১ এহিয়া খান আকস্মিক ঘোষণায় ৩রা মার্চ, '৭১ আহুত জাতীয় পরিষদ অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করলেন। আপনার হয়ত মনে আছে ঐ সময় ঢাকা ষ্টেডিয়ামে ক্রিকেট খেলা হচ্ছিল। এই আকস্মিক ঘোষণায় ক্রিকেট-এর খেলার মাঠ মুহূর্তে পরিণত হয়েছিল এক দুর্বার গণ বিস্ফোরণে। মিছিল করে সবাই ভীষণ উত্তেজনায় মাঠ ছেড়ে বের হয়ে এলেন। খেলা আর হ'ল না। কিছুক্ষণ পরই আমার কাছে নির্দেশ এল তাৎক্ষণিকভাবে দুটি কোম্পানীকে টাঙ্গাইল এবং মধুপুরে পাঠিয়ে দেয়া হউক। আমার অধীনে চারটি রাইফেল কোম্পানী ছিল। এই আদেশ অনুসারে আমি এই কোম্পানীর একটি টাঙ্গাইল এবং আর একটি ময়মনসিংহ-জামালপুরের মাঝামাঝি মধুপুরে পাঠালাম। কাজেই আর দুটি মাত্র কোম্পানী ছিল তখন আমার হেড্ কোয়ার্টার জয়দেবপুরে। আমাকে আরো বলা হল: তোমাকে বর্ডারে যেতে হলে তুমি টাঙ্গাইল এবং মধু-পুর হয়ে যাবে। আর যদি আভ্যন্তরীণ আইন শৃংখলা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য তোমাকে ময়মনসিংহ যেতে হয়, তবে তাৎক্ষণিক ভাবে তাও করার জন্য তৈয়ার থাকতে হবে। যে কোম্পানীকে টাঙ্গাইল রাখা হ'ল সেখানেও নির্দেশ থাকল ঐ কোম্পানী যেন মধুপুর হয়ে ময়মনসিংহ অগ্রসর হওয়ার জন্য তৈয়ার থাকে। আগেই উল্লেখ করেছি বাকী দুটি কোম্পানীকে পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় আমার হেড্ কোয়ার্টার জয়দেবপুর রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

১লা মার্চ '৭১ বিকেলের মধ্যেই আমাকে এইসব ব্যবস্থা চূড়ান্ত করতে হ'ল। কাজেই কোম্পানী সরানোর কাজে আমি তাৎক্ষণিক ভাবে নিয়োজিত হয়েছিলাম।

আমাকে আরো নির্দেশ দেয়া হ'ল: মেজর শফিউল্লাহ্‌কে টাঙ্গাইল এবং মধুপুরের দায়িত্ব দিয়ে অবিলম্বে টাঙ্গাইল পাঠিয়ে দেয়া হউক।

প্র: এর অর্থ?

উ: অর্থাৎ আমরা দুইজন যেন একসাথে না থাকি। কৌশলে আমার সেকণ্ড-ইন্-কমাণ্ডকেও আমার কাছ থেকে সরিয়ে নেয়াই ছিল আসল উদ্দেশ্য। তারা আমাকে বুঝাল: মেজর শফিউল্লাহ্ টাঙ্গাইল থেকে মধুপুরে অবস্থিত কোম্পানী এবং প্রয়োজনে তোমার হেড্ কোয়ার্টার জয়দেবপুরের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারবে।

নির্দেশানুযায়ী ২রা মার্চ '৭১ আমার অধীনস্থ দুটি কোম্পানীকে বাইরে পাঠালাম। মেজর শফিউল্লাহ্ চলে গেল টাঙ্গাইল। তার সাথে ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী একজন কোম্পানী কমাণ্ডার। মেজর নুরুল ইসলামকে (বর্তমানে অবসর প্রাপ্ত মেজর জেনারেল এবং প্রাক্তন মন্ত্রী) কোম্পানী কমাণ্ডার করে পাঠালাম মধুপুর (ময়মনসিংহ)। মেজর শফিউল্লাহ্‌কে নিযুক্ত করলাম এই দুটি কোম্পানীর দায়িত্বে। তার ষ্টেশন থাকল টাঙ্গাইল।

প্র: মেজর শফিউল্লাহ্ কখন জয়দেবপুর ফিরে এলেন?

উ: ফিরে আসেননি। তিনি মাঝে মধ্যেই প্রশাসনিক এবং অন্যান্য কার্যোপলক্ষে জয়দেবপুর আমার সাথে দেখা করতে আসতেন। তার কর্মস্থল টাঙ্গাইল থেকে মধুপুরের কোম্পানী নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বভারও আমি তাকে দিয়ে-ছিলাম এবং বলেছিলাম প্রয়োজনে ঐ কোম্পানীকে তিনি ময়মনসিংহও পাঠাতে পারবেন।

মেজর শফিউল্লাহ্‌র সাথে আমার যোগাযোগের জন্য একটি বিশেষ বেতার সেট ছিল। এই সেট ব্রিগেড পর্যায়ে সংযুক্ত ছিল। অর্থাৎ আমার ওপরস্থ ব্রিগেড কমাণ্ডার আমাদের কার্যবিধি সহজেই জেনে নিতে পারতেন এই সেটের সাহায্যে।

ইত্যবসরে আমি আর এক নির্দেশ পেলাম। আমাকে বলা হ'ল উদ্বৃত্ত পুরোনো অস্ত্রশস্ত্র ঢাকা ক্যাণ্টনমেণ্ট হেড্ কোয়ার্টারে জমা দেয়ার জন্য। আমাদের কাছে ৩ ইঞ্চি মর্টার এবং রাইফেল সহ বেশ কিছু পুরোনো অস্ত্রশস্ত্র ছিল। এগুলি ছিল বৃটিশ এবং আমেরিকার তৈরী। এসব অস্ত্রশস্ত্র জমা দেয়ার পূর্বেই 'চাইনিজ অরিজিন'-এর নূতন অস্ত্রশস্ত্র আমরা পেয়েছিলাম।

প্র: 'চাইনিজ অরিজিন'-এর অস্ত্রশস্ত্র পাঠানোর পেছনে কি রহস্য ছিল?

উ: রহস্য কিছুই ছিল না। একটা দেশ অন্য আর এক দেশ থেকে এমনি অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের জন্য ব্যবসায় ভিত্তিক দ্বিপক্ষীয় চুক্তিতে স্বাক্ষর করে থাকে।

চীনের সাথে পাকিস্তানের এ ধরনের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী তারা এখানে এসে আমাদের গাজীপুর অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরীতেই এসব অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করতে সাহায্য করত।

স্পষ্টতঃই ঐ নির্দেশের আসল উদ্দেশ্য ছিল অতিরিক্ত কোনও অস্ত্রশস্ত্র আমাদের হাতে যেন না থাকে তা নিশ্চিত করা। পুরাতন অস্ত্রশস্ত্র ফেরত দেয়ার ঐ নির্দেশ আমি পেয়েছিলাম আনুমানিক ১৩ই মার্চ '৭১। কাজেই এজন্য আমাকে প্রস্তুতি নিতে হয়েছিল।

আমরা নির্দেশ মানতে বাধ্য হয়েছিলাম। কিন্তু শেখ মুজিব আহূত অসহযোগ আন্দোলনের কারণে এটা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। ঐ সময়ে রেশন ছিল না, সরবরাহ ছিল না। গাড়ীর চলাচল ব্যাহত হচ্ছিল। রেলগাড়ী পর্যন্ত ছিল না। রেলগাড়ীতে বুকিং হ'ত না, ইত্যাদি। এসব অসুবিধা সত্ত্বেও ১৫ই মার্চ '৭১ এর মধ্যে অস্ত্র জমা দেয়ার জন্য আমাকে নির্দেশ দেয়া হ'ল। কাজেই বাধ্য হয়ে আমি দুই লরী (৩ টন করে) এসব পুরোনো অস্ত্রশস্ত্র ঢাকা হেড্ কোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। সাথে ছিলেন আমার কোয়ার্টার মাষ্টার। তিনি ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানী। কিন্তু শ্রমিকের অভাবে তারা এসব মাল অর্ডন্যান্স ডিপোতে নামাতে পারেননি। সব অস্ত্র আবার জয়দেবপুর ফেরত এল। আমিও এই অজুহাতে এসব অস্ত্র জয়দেবপুর রেখে দিয়েছিলাম।

৪ঠা কি ৫ই মার্চ '৭১ পর্যন্ত আমার ট্রুপস্-এর কোনও লোক বেতন পান নি। সরবরাহও বন্ধ ছিল। আমাদের এসব অসুবিধার কথা আমরা ঢাকা হেড্ কোয়ার্টারকে জানিয়েছিলাম। তখন একদিন হেলিকপ্টারে জি-ও-সি মেজর জেনারেল খাদেম হোসেন আমাদের পরিদর্শনে এসেছিলেন। সাথে তিনি আমার ট্রুপদের জন্য ভিন্ন এক খাত থেকে বেতনের টাকাও এনেছিলেন। কারণ, তখন ব্যাংক থেকে টাকা ওঠানো যাচ্ছিল না। জি-ও-সি জয়দেবপুর প্যালেসের সামনের মাঠে হেলিকপ্টার নিয়ে নামলেন। আমি তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম: স্যার, ঢাকার খবর কি? বললেন: এ সম্পর্কে তিনি পরে আলাপ করবেন। তিনি প্যালেসের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ঘুরে ট্রুপস্দের দেখলেন। তারপর আমরা অফিসার্স মেসে গিয়ে বসলাম। মেজর শফিউল্লাহ্ও ঘটনাক্রমে সেদিন জয়দেবপুর ছিলেন। আমার অন্যান্য অফিসারও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে জয়দেবপুরে আমার ইউনিটে মোট সতের জন অফিসার ছিলেন। তাঁদের মধ্যে চার কি পাঁচ জন ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানী। আর বাকী সবাই ছিলেন বাঙ্গালী। চা খেতে খেতে জি-ও-সি নিজেই কথা শুরু

করলেন। বললেন: মাসুদ, তুমি ঢাকার অবস্থা জানতে চেয়েছিলে। ওখানকার অবস্থা এখন অনেকটা নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু আমরা প্রেসিডেন্টকে জানিয়ে দিয়েছি যে স্বয়ং তিনি এসে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা দেখে যাওয়া উচিত। কারণ আমরা মনে করি, শুধুমাত্র সামরিক হস্তক্ষেপই যথেষ্ট নয়। এটা একটা রাজনৈতিক ইস্যু। কাজেই সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান হওয়াই বাঞ্ছনীয়। জি-ও-সিকে খুবই মলিন দেখাচ্ছিল। তাঁর কথা থেকেই বুঝলাম যে ঢাকার অবস্থা দ্রুত অবনতির দিকে চলে যাচ্ছিল।

পরে জানতে পেরেছিলাম আমরা বলতে তিনি জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুবকেও বুঝিয়েছেন। জেনারেল সাহেবজাদা ছিলেন পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ডার (কমাণ্ডার, ইষ্টার্ণ কমাণ্ড) এবং পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক প্রশাসক। এখানে উল্লেখ্য যে প্রাক্তন গভর্ণর ভাইস এডমিরাল এস, এম, আহসানও ঠিক এ ধরনের কথা বলেছিলেন যে শুধুমাত্র সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান সম্ভব ছিল না। জিজ্ঞাসা করলাম: প্রেসিডেন্ট কখন পূর্ব পাকিস্তান পরিদর্শনে আসতে পারেন বলে আপনি মনে করেন? বললেন: দু' একদিনের মধ্যে। অন্যথায় অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। পরে দেখলাম তিনি ঠিকই বলেছেন। তারপর, টিক্কা খান ঢাকা এলেন। ৭ই মার্চ, '৭১ শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার রেস্ কোর্স ময়দানে বক্তৃতা করলেন। ইতিপূর্বে জেনারেল ইয়াকুবের পদত্যাগের খবরও আমি পেয়েছিলাম। আমাকে এ খবর দিয়েছিলেন মেজর আলী আহমদ খান। ইনি আমার ব্যাটালিয়নের একজন বাঙ্গালী এবং ইষ্টার্ন কমাণ্ড হেড কোয়ার্টারের একজন ষ্টাফ অফিসার ছিলেন। বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাহায্য ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সমন্বয়কারী (জয়েন্ট কো-অরডিনেটর) হিসেবে নিযুক্ত আছেন। জেনারেল ইয়াকুব চলে যাওয়ার আগে জয়দেবপুর ক্যান্টনমেন্টে এসেছিলেন। ঐ সময় তিনি আমার ট্রুপস্কে বাংলাতে সম্বোধন করেছিলেন। উল্লেখ্য যে জেনারেল ইয়াকুব ভাল বাংলা জানতেন।

পূর্ব পাকিস্তানে কি হতে যাচ্ছিল তখনো আমাদের তেমন ধারনা ছিল না। তবে একটি ধারনা বদ্ধমূল হয়েছিল যে সামরিক প্রশাসন আরও তীব্র হতে পারে। পাকিস্তানের সামরিক শাসকচক্র গণ-প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠন করতে হয়ত দেবে না।

প্র: দেশের রাজনীতির প্রতি আপনি উৎসাহিত হওয়ার পেছনে আপনার ওপর কোনও রাজনৈতিক প্রভাব ছিল কি, বা কোনও রাজনৈতিক নেতা আপনার সাথে যোগাযোগ করেছিলেন কি?

উঃ না। তবে স্থানীয় কিছু ব্যক্তি আমার কাছে এসেছিলেন। অপর দিকে আমাদের ইউনিটের নীচের র‍্যাঙ্ক-এর লোকজন যেমন—সুবেদার, সুবেদার মেজর—এঁরা স্থানীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাকে অবহিত করতেন। এ ছাড়া স্থানীয় আওয়ামী লীগের একজন কর্মী জনাব হাবিবুল্লাহ্ আমার সাথে যোগাযোগ রাখতেন। (বর্তমানে ইনি বি, এন, পি'র একজন স্থানীয় নেতা এবং এম, পি)। রাজনৈতিক অঙ্গনে কি হচ্ছে, না হচ্ছে, কি সমঝোতা হচ্ছে ইত্যাদি খবর তাঁরা এসে আমাদের দিতেন। আগেই বলেছি, তখন সারা দেশে অসহযোগ আন্দোলন চলতে থাকায় আমরা বাইরের সরবরাহ পেতাম না। এমনকি বাজারের মাছ, গোস্ত, তরী তরকারী ইত্যাদি পর্যন্ত আমরা পেতাম না। জনাব হাবিবুল্লাহ্ এবং তাঁর সহকর্মীগণ তখন আমাদের যথেষ্ট সহযোগিতা দান করেছেন। তাঁরা আমাদের স্বপক্ষে স্থানীয় লোকজনকে বুঝাতেন। পরোক্ষভাবে তাঁরা অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি আমাদের সমর্থন আশা করতেন।

প্রঃ আমরা ইতিপূর্বে মেজর শফিউল্লাহ্‌র (পরবর্তীকালে মেজর জেনারেল এবং প্রাক্তন সেনাবাহিনী প্রধান) সাথে সাক্ষাৎকারে জেনেছি ১৯শে মার্চ '৭১ ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আরবাব জয়দেবপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট পরিদর্শনে এসেছিলেন। ঐ সময়ে তাঁর ক্যাণ্টনমেণ্ট পরিদর্শন ছিল একটি অজুহাত মাত্র। জয়দেবপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট-এর দ্বিতীয় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্টকে নিরস্ত্র করাই ছিল তাঁর আসল উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে অনুগ্রহ করে মন্তব্য করুন এবং জাহানজেব আরবাবের জয়দেবপুর পরিদর্শন কালীন কিছু ঘটনা বলুন।

উঃ অনুমান ঠিকই করেছেন। জাহানজেব আরবাব টঙ্গী ব্রীজ পার হওয়ার পূর্বেই প্রথম ব্যারিকেড্-এর সম্মুখীন হয়েছিলেন। ওখান থেকেই তিনি ওয়ারলেসে আমাকে নির্দেশ দিলেন জয়দেবপুরের দিক থেকে ব্যারিকেড্ সরিয়ে অগ্রসর হওয়ার জন্য। টঙ্গী থেকে তিনি নিজেই ব্যারিকেড্ সরিয়ে আসছেন জানালেন। আমার দিক থেকে দু'তিনটি ব্যারিকেড্ সরাতেই দেখলাম তিনি জয়দেবপুর পৌঁছে গিয়েছেন। জয়দেবপুর-গাজীপুর রাস্তার মোড়েই আমরা তাঁর সাক্ষাৎ পেলাম। তিনি যখন জয়দেবপুর প্যালেসে পৌঁছলেন, তখন বেলা দুপুর প্রায় ১২টা।

একজন কর্ণেল (তিনি ৩১ ফিল্ড রেজিমেণ্ট-এর কমাণ্ডার ছিলেন) সহ কয়েকজন মেজর এবং ক্যাপ্টেন তাঁর সাথে ছিলেন। পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী আমরা

ব্রিগেডিয়ার আরবাব সহ এইসব সামরিক অফিসারদের জন্য দ্বি-প্রহরের খাবারের ব্যবস্থা করেছিলাম। এ ছাড়া আমি ধরে নিয়েছিলাম সাথে উর্দ্ধে একটি প্লাটুন (প্রায় তিরিশ জন সৈনিক নিয়ে গঠিত) থাকবে। কিন্তু লক্ষ্য করলাম, দুই ট্রাক ভর্তি সৈন্য তাঁর সাথে এসেছে। এটা ছিল একটা কোম্পানীর চাইতেও বেশী। সাধারণতঃ উর্দ্ধে ১০০ সৈনিক নিয়ে গঠিত হয় একটি কোম্পানী।

অপরদিকে আমাদের ব্যাটালিয়নের শক্তি ছিল প্রায় নয় শত সৈনিক। কিন্তু তারা ছিল এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে। তাদের কেউ ছিল ময়মনসিংহ, কেউ গাজীপুর, কেউ টাঙ্গাইল।

ব্রিগেডিয়ার আরবাব আমার সাথে খেতে যাওয়ার আগে জয়দেবপুর প্যালেস ঘুরে ঘুরে আমার সৈনিকদের অবস্থান দেখলেন। বাইরের সম্ভাব্য যে কোনও আক্রমণ বা দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য আমি তাদেরকে সম্পূর্ণ তৈরী রেখেছিলাম।

প্রঃ তা'হলে এ ধরনের দুরভিসন্ধির আশঙ্কা কি আপনার ছিল?

উঃ আশঙ্কা ত ছিলই। কাজেই আমরা এমনি আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সে ভাবে তৈরীও ছিলাম। এইসব প্রস্তুতির কারণ ব্রিগেডিয়ার আরবাব আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। কাজেই আমাকেও গা বাঁচিয়ে উত্তর দিতে হয়েছিল। তাঁকে বুঝিয়েছিলাম, স্থানীয় যে কোনও বিশৃংখলা ছাড়াও সম্ভাব্য ভারতীয় আক্রমণ প্রতিরোধের জন্যই ছিল আমাদের এই প্রস্তুতি।

প্রঃ গোলাগুলি কখন হ'ল?

উঃ জাহানজেব আরবাব ঢাকা ফিরে যাবার মুহূর্তেই লক্ষ্য করলাম জয়দেবপুরবাসী একটি মালগাড়ী (রেলগাড়ী) লেভেল ক্রসিং এর ওপর এনে রাস্তা ব্লক করে দিয়েছিলেন। আরবাব আমাকে নির্দেশ দিলেনঃ শক্তি প্রয়োগ কর এবং ব্যারিকেড্ সরিয়ে নাও। তখন আমি বলেছিলামঃ আপনি আমার অতিথি। আমি যদ্দুর পারি কৌশলের মাধ্যমে ব্যারিকেড্ সরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করছি। আমার ওপর ভরসা রাখুন। কিন্তু হঠাৎ লক্ষ্য করলাম তাঁর হুকুম পেয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তাঁর বাহিনী আমার ঠিক পেছনে এবং পাশে এসে পজিশন নিয়েছে। তিনি আমাকে বিশ্বাস করেননি। কারণ ইতিমধ্যেই তিনি লক্ষ্য করেছেন আমি জয়দেবপুরবাসীর সাথে যোগাযোগ করছিলাম। স্থানীয় আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব হাবিবুল্লাহ্‌র সাথেও তখন আমার আলাপ হয়েছিল।

জাহানজেব আরবাব পুনরায় আমাকে আদেশ দিলেনঃ এখুনি গুলি চালাও। চরম শক্তি প্রয়োগ কর। তখন আমি মেজর মঈনকে (বর্তমানে মেজর জেনারেল অবঃ

এবং ফিলিপাইন্স্-এ বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত) ডেকে বললাম: তুমি সিগনাল দিয়ে, হুইসাল বাজিয়ে জয়দেবপুরবাসীকে সরে যাওয়ার জন্য সতর্ক করে দাও এবং মাইক দিয়ে বলে দাও সরে না গেলে আমরা গুলি চালাতে বাধ্য হবো। আমরা তাদেরকে সতর্ক করে দিলাম। মেজর মঈনকে বলেছিলাম: একান্ত প্রয়োজনে এক বা দুই রাউণ্ড গুলি চালাবে, কিন্তু অবশ্যই দৃষ্টি রাখবে যেন কারো গায়ে বা মাথায় গুলি না লাগে। আমার ধারণা ছিল ফায়ারিংএর শব্দ শুনে লোকজন সরে যাবে। এসব ফায়ারিংএর সময় সাধারণতঃ নাম ধরে বলতে হয় যেমন হাওয়ালদার (নাম) এক রাউণ্ড, নায়ক (নাম) এক রাউণ্ড গুলি চালাও ইত্যাদি। আমরা ফায়ারিংএর চাইতে নাম ধরে ডাকাডাকি করলাম বেশী। চোখের ইসারায় বলেছিলাম আকাশে গুলি চালাতে। উদ্দেশ্য ছিল লোককে আতঙ্কিত করা, ওখান থেকে সরিয়ে দেয়া। কিন্তু লোকজন ওখান থেকে সরল না। জাহানজেব আরবাব আমাকে বললেন: মাসুদ, তোমার লোকজন আকাশে গুলি চালাচ্ছে। তুমি কি তোমার ট্রুপ্স্‌কে এ ভাবেই প্রশিক্ষণ দিয়েছ? তখন তিনি চিৎকার শুরু করলেন: 'আমি চাই যে তাদের গায়ে গুলি লাগুক। আমি চাই লোকজনকে গুলি করে হত্যা করা হোক।'

তখন আমি উভয় সঙ্কটে। আমি আবার মঈনকে বললাম: মঈন তুমি গুলি চালিয়ে যাও। চোখ দিয়ে ইসারা করলাম, অর্থাৎ তুমি জান কি করতে হবে। আবার দুই তিন রাউণ্ড ফায়ার হ'ল। ঐ সময় জনসাধারণের দিক থেকে ২২ রাইফেল ও সট গানের গুলি আসতে লাগল। তাদের কাছে আরও ছিল রাম দাও, বল্লম ইত্যাদি। যখন উল্টো দিক থেকে ফায়ার এবং বল্লম ছুটে আসতে শুরু করল, তখন ব্রিগেডিয়ার আরবাব তাঁর নিজ সৈন্যদের গুলি চালানোর আদেশ দিলেন। তারা এল, এম, জি এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ শুরু করল। আমরা পড়ে গেলাম মধ্যে। পেছনে এবং পাশে জাহানজেব আরবাবের সৈন্যদল এবং সামনে জয়দেবপুরবাসী। তখন আমাদের পাশ দিয়ে এমনকি মাথার ওপর দিয়ে সমানে গুলি চলল। জয়দেবপুরবাসীর পয়েণ্ট টু টু এবং সট গানের গুলিতে আমার কেবল পাশেই আমার ট্রুপ্স্‌এর কয়েকজন আহত হল।

এভাবে প্রায় এক ঘণ্টার মত জয়দেবপুরবাসীর সাথে গুলি বিনিময় হ'ল। ব্রিগেডিয়ার আরবাবের সৈন্যদল গুলি চালানো তীব্রতর করার পর ক্রমে লোকজন সরে গিয়েছিল। তখন লেবেল ক্রসিং থেকে মালগাড়ীটিকে বহু কষ্টে হাতে ঠেলে সরিয়ে নেয়ার পর তিনি তাঁর সৈন্যদল সহ ঢাকা ফিরে গেলেন।

উক্ত সংঘর্ষে ৩।৪ জন জয়দেবপুরবাসী নিহত হয়েছিলেন। অপরপক্ষে

আমার ট্রুপ্স্‌এর লোকজন ছাড়াও ব্রিগেডিয়ার আরবাবের কয়েকজন সৈনিকও আহত হয়েছিল। ফায়ারিং চলাকালে রেশন নিতে টাঙ্গাইল থেকে আমাদের একখানা ট্রাক আসছিল। জয়দেবপুরবাসী ভুল বুঝে গাড়ীটিকে থামিয়ে প্রথমে চাকার পাম্প ছেড়ে দেয়, তারপর চাকার টায়ারগুলি কুপিয়ে নষ্ট করে দেয়া ছাড়াও ট্রাকটিতে আমাদের যে ক'জন বাঙ্গালী সৈন্য প্রহরার জন্য ছিল তাদের হাতিয়ার গুলিও কেড়ে নেয়।

এখানে একটি কথা বলে রাখা দরকার। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা মোটামুটি খবর রাখলেও ট্রুপ্স্ সাধারণতঃ এসব ঘটনা সম্পর্কে খুব একটা জানার সুযোগ পেতো না। কাজেই এসব অবস্থা দেখে আমাদের ট্রুপ্স্‌এর কিছু বাঙ্গালী সৈন্য হতভম্ব হয়ে গেল। এমনকি ১৯শে মার্চ, '৭১ বিকেলে আমার অধীনস্থ পাঁচ কি ছয় জন বাঙ্গালী সৈন্য তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পালিয়ে গেলো। পরেও তাদের আর কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায়নি।

প্র: মেজর জেনারেল শফিউল্লাহকে (তৎকালীন মেজর) আপনি টাঙ্গাইল এবং মধুপুরের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ১৯শে মার্চ '৭১ তিনি কি করে জয়দেবপুর এলেন?

উ: ১৬ই কি ১৭ই মার্চ, '৭১ তিনি প্রশাসনিক কোনও কাজে আমার সাথে দেখা করার জন্য এসেছিলেন। তখন আমি তাকে বিভিন্ন কাজের অজুহাতে জয়দেবপুর রেখে দিয়েছিলাম।

প্র: কিন্তু তখন তাঁর ডিউটি এলাকাত আর জয়দেবপুর ছিল না।

উ: কাকে কখন কোথায় ডিউটিতে দেবো এটাত আমার নিজের ইচ্ছাধীন ছিল। পরিস্থিতি বুঝেই শফিউল্লাহকে আমি আর টাঙ্গাইল যেতে দেইনি। তাছাড়া আমাদের মধ্যে ত সার্বক্ষণিক একটা সমঝোতা কাজ করছিলই।

প্র: মেজর জেনারেল শফিউল্লাহর সাক্ষাৎকারে জেনেছি আপনাকে ২৩শে মার্চ, '৭১ ঢাকা হেড্‌ কোয়ার্টারে ডেকে নেয়া হয়েছিল। ওখান থেকে আপনি আর ফিরে আসতে পারেননি। তখন মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ্ সহ অনেকেই আপনাকে ঢাকা যেতে নিষেধ করেছিলেন। এতদ্‌সত্বেও আপনি কেন এবং কি পরিস্থিতিতে ঢাকা ক্যাণ্টনমেণ্টে গেলেন মন্তব্য করুন।

উ: ঢাকা ব্রিগেড হেড্‌ কোয়ার্টারের কয়েকজন উর্দ্ধতন অফিসার যেমন ব্রিগেড কমাণ্ডার, ব্রিগেড মেজর, চীফ অফিসার ২৩শে মার্চ, '৭১এর আগে থেকেই আমাকে বলে আসছিলেন: মাসুদ, তুমি ত অনেকদিন থেকেই তোমার

পরিবার পরিজনকে দেখতে আসছ না। তাদের একবার দেখে যাও। তাছাড়া এই অবসরে ঢাকাতে দুই এক দিন বেড়ানোও হবে ইত্যাদি। ইত্যবসরে ১৯শে মার্চ, '৭১এর পর তারা আমাকে আবার ডাকল। বলল: ২৩শে মার্চ, '৭১ বিকেল ৪টার ব্রিগেডের কমাণ্ডিং অফিসারগণের একটা মিটিং ডাকা হয়েছে। ১৮ পাঞ্জাব, ৩২ পাঞ্জাব, ৩১ ফিল্ড রেজিমেণ্ট-এর সি-ও সবাইকে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য যে এ জাতীয় মিটিং বা সম্মেলন মাঝে মধ্যে হ'ত। একে বলা হ'ত 'ও' গ্রুপ কনফারেন্স। কাজেই আমি ২৩শে মার্চ, '৭১ জীপ নিয়ে ঢাকা হেড কোয়ার্টার চলে এলাম। তখন অনেকে বলেছিলেন (মেজর শফিউল্লাহ্ও): স্যার, যাবেন না। কিন্তু, সব কিছু বিবেচনা করে আমাকে শেষ পর্যন্ত যেতে হ'ল। আমি মনে করেছিলাম হয়ত আমাকে ১৯শে মার্চ, '৭১এর ঘটনার জন্য একটা ব্যাখ্যা দিতে হতে পারে। ঐদিন বিকেল প্রায় ৪টার সময় মিটিংএ যোগদানের জন্য আমি ব্রিগেড হেড্ কোয়ার্টারে এসে ব্রিগেড মেজরের সাথে দেখা করলাম। জিজ্ঞাসা করলাম: ব্রিগেড কমাণ্ডার কোথায়? তখন তিনি বললেন: স্যার, ব্রিগেড কমাণ্ডার ঢাকা শহর এলাকায় আছেন। তিনি খুব ব্যস্ত। এ সময় কোনও মিটিং হবে না। আপনি আগামী কাল সকালে আসুন। আজ রাত বরং ঢাকায় গিয়ে বিশ্রাম নিন। কাজেই আমি বাসায় ফেরত গেলাম।

আসলে (যা আমি পরে বুঝতে পেরেছি) ঐ সময় ব্রিগেডিয়ার আরবাব ঢাকায় গণ হত্যার নীল নক্সা বাস্তবায়নের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ঢাকা শহরময় তখন বিরাট উত্তেজনা, অসহযোগ আন্দোলন চলছে, বিভিন্ন জায়গায় গণ মিছিল, ব্যারিকেড্। এগুলিকে ব্যাহত করার জন্য সব ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছিল। ১৮ পাঞ্জাব এবং ৩২ পাঞ্জাব ইউনিটকে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, এমনকি নরসিংদি পর্যন্ত অপারেশন-এর কাজে পাঠানো হ'ল।

পরদিন অর্থাৎ ২৪শে মার্চ '৭১ সকাল বেলা আমি ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আরবাব-এর সাথে দেখা করলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন: 'কর্ণেল মাসুদ, ইষ্টার্ণ কমাণ্ড-এর কমাণ্ডার লেঃ জেনারেল টিক্কা খান সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে তুমি আর জয়দেবপুর যাবে না। এখন থেকে তোমাকে ঢাকার ষ্টেশনে হেড্ কোয়ার্টারের সাথে সংযুক্ত করা হ'ল। পরিবর্তে কর্ণেল রকিব জয়দেবপুর যাবে এবং তোমার স্থলাভিষিক্ত হবে। অর্থাৎ জয়দেবপুর দ্বিতীয় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্ট-এর দায়িত্বভার নেবে'। বললাম: কর্ণেল রকিবের হাতে দায়িত্বভার বুঝিয়ে দেয়ার জন্য হলেও ত আমাকে একবার জয়দেবপুর যেতে হয়। তখন তিনি বললেন: না না তোমাকে যেতে হবে না। তোমাদের ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্টের সেক্টার

কমাণ্ডার, ব্রিগেডিয়ার মজুমদার চট্টগ্রাম থেকে আসছেন। তিনি জয়দেবপুর যাবেন এবং সৈনিকদের মনোবল ফিরিয়ে আনার জন্য তিনিই আনুষ্ঠানিক ভাবে তাদের সম্বোধন করবেন। কাজেই কর্ণেল রকিবের চার্জ নেয়ার ক্ষণটি তিনিই দেখবেন। বললাম: এ জাতীয় ঘটনা ত আর কখনো শুনিনি। জয়দেবপুরের সামরিক ইউনিট কমাণ্ডার হ'লাম আমি। অন্য কমাণ্ডার কেন যাবেন চার্জ বুঝিয়ে দেবার জন্য। তিনি তখন বললেন: ব্রিগেডিয়ার মজুমদার হলেন তোমাদের "পাপা টাইগার" (ব্যাঘ্র কুলের পিতা) তোমার সৈন্যদলের মনোবল ফিরিয়ে আনার জন্য তাঁর উপদেশ খুবই প্রয়োজন। কাজেই তুমি আর জয়দেবপুরের কথা ভেবো না। এখানেই থাক। আগামীকাল থেকে হেড্ কোয়ার্টার রিপোর্ট কর এবং ষ্টেশন কমাণ্ডারের নির্দেশ অনুযায়ী চল। আজ বিকেলে তুমি ইচ্ছা করলে ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের সাথেও দেখা করতে পার। বিকেলে তিনি আমার বাসায় আসছেন, ইত্যাদি।

ঐ দিনই অর্থাৎ ২৪শে মার্চ, '৭১ বিকেলে আমি ব্রিগেডিয়ার আরবাবের বাসভবনে গেলাম। সেখানে ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের সাথেও সাক্ষাৎ হ'ল. ব্রিগেডিয়ার মজুমদার আমার কাছে জয়দেবপুরের ঘটনাবলী সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আমি তাঁকে বললাম। তখন তিনি মন্তব্য করলেন: তা'হলেত তোমাকেও চার্জ হস্তান্তরের জন্য আমার সাথে যেতে হয়। পরদিন অর্থাৎ ২৫শে মার্চ, '৭১ পূর্বাহ্নেই আমরা যাওয়ার জন্য সাব্যস্ত করলাম। ব্রিগেডিয়ার মজুমদার নিজেও জাহানজেব আরবাবকে অনুরূপ ভাবে অনুরোধ করলেন তাঁর সাথে আমাকে দেয়ার জন্য। কিন্তু ব্রিগেডিয়ার আরবাব বললেন: না না মজুমদার, কর্ণেল মাসুদের অনেক অসুবিধা আছে। তা ছাড়া তার বিশ্রামের প্রয়োজন। এসব বলে তিনি আমাকে জয়দেবপুর যাওয়া থেকে নিবৃত্ত করলেন।

বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসের সব চাইতে ভয়াবহ ২৫শে মার্চ, '৭১এর সন্ধ্যায় এহিয়া খান ঢাকা ক্যাণ্টনমেণ্টে এসেছিলেন। সেখানে জেনারেল টিক্কা খানের বাস ভবনে নৈশ ভোজের অজুহাতে ঐ সন্ধ্যায় তিনি উর্দ্ধতন সামরিক অফিসারদের সাথে এক গোপন বৈঠক করেছেন এবং ওখানে বসেই ২৫শে মার্চ, '৭১ রাতের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের চূড়ান্ত নীলনক্সা শেষবারের মত যাচাই করে নিয়েছিলেন। স্পষ্টতঃই কোন্ দিক থেকে আক্রমণ করতে হবে, কি ভাবে আক্রমণ করতে হবে ইত্যাদি যাবতীয় নির্দেশ দিয়েই তিনি রাত্রি ৮টার দিকে গোপনে ঢাকা ত্যাগ করলেন।

প্রঃ ২৫শে মার্চ, '৭১ এর রাতে আপনি ছিলেন ঢাকা ক্যান্টনমেণ্টে। ঐ রাতে ঢাকা শহরের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে আপনি কতটুকু বুঝতে পেরেছিলেন?

উঃ ২৪শে মার্চ, '৭১ থেকেই আমার মন খুব খারাপ ছিল। ওরা আমার কাছ থেকে কমাণ্ড কেড়ে নিল। ঢাকা আর্মি হেড্ কোয়ার্টার থেকে আমাকে একটা চিঠিও দিল যে আমাকে কমাণ্ড থেকে অব্যাহতি দেয়া হ'ল। সেদিন রাতেই আমার মনে হ'ল যেন আমি জ্বর জ্বর বোধ করছিলাম। পরদিন অর্থাৎ ২৫শে মার্চ, '৭১ সকালে আমি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের চীফ সার্জন মেজর হামিদুর রহমানের সাথে যোগাযোগ করলাম। তিনিও বাঙ্গালী (বর্তমানে ঢাকা হলি ফ্যামিলি হাসপাতালের পরিচালক)। তাঁকে আমার অসুস্থতার কথা বললাম। মেজর হামিদ ঔষধপত্র নিয়ে আমাকে দেখতে এলেন এবং তিনদিন বিশ্রামের জন্য লিখিত সার্টিফিকেট দিলেন। সাথে সাথেই সার্টিফিকেটখানা আমি ষ্টেশন হেড্ কোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিলাম। কাজেই ২৫, ২৬, এবং ২৭শে মার্চ, '৭১ আমি ক্যান্টনমেন্টের বাসাতেই এক রকম শয্যাশায়ী ছিলাম। তবু আমি ঢাকা এবং জয়দেবপুরের খবরাখবর জানার জন্য মানসিক ভাবে খুবই অস্থির ছিলাম। এসব খবরাদির জন্য মেজর শফিউল্লাহ্‌র সাথেও প্রতিদিন দু'একবার টেলিফোনে যোগাযোগ করেছি। ২৫শে মার্চ, '৭১ রাত বারটার দিকে আমি গোলাগুলির আওয়াজ শোনা মাত্রই তাঁকে টেলিফোন করেছিলাম জয়দেবপুরের খবরাখবর জানার জন্য। অবশ্য আমরা বেশীক্ষণ কথা বলতে পারিনি। যদিও আমি কমাণ্ডে ছিলাম না, কিন্তু আমার মন প্রাণ ত সব ওখানেই পড়েছিল। আমি শুধু তাঁকে বলতে পেরেছিলাম ঢাকার আকাশে অস্বাভাবিক আলো দেখতে পাচ্ছি এবং প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ শুনতে পাচ্ছি। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: কি ধরনের গুলির আওয়াজ? আমি বলেছিলাম: 'সব ধরনের যা' তুমি চিন্তা করতে পার,' যেমন অটোমেটিক ফায়ার, রাইফেল ফায়ার, মর্টার ফায়ার, ফিল্ডগান ফায়ার, মেশিনগান, লাইট মেশিনগান, ট্যাঙ্ক ফায়ার, ইত্যাদি। এ জাতীয় কয়েকটি কথা বলতেই লাইন কেটে গিয়েছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে আওয়াজ শুনেই আমি বুঝতে পারলাম কয়েকটি ট্যাঙ্ক বনানীর রাস্তা দিয়ে ঢাকার দিকে চলে গেল।

প্রঃ আপনাকে কত তারিখ করাচী নিয়ে গিয়েছিল?

উঃ এর পরের টুকু শুনবেন না? ২৩শে মার্চ, '৭১ ঢাকা আসার পর থেকেই বেসামরিক পোষাক পরিহিত সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের লোক আমার বাসার প্রহরায় ছিল। এদের দু'একজনকে আমি আগে থেকেই চিনতাম। আমার বাসার পাশেই ছিল আই, এস, আই (ইন্টার সার্ভিসেস ইনটেলিজেন্স)এর একটি বিশ্রামাগার। কাজেই ওখানে তাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কিছু করা ছিল অসম্ভব। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে আমার ব্যাটালিয়ান-এরই এক প্রাক্তন অফিসার ছিল। 'সাইগল

তার নাম। তার পিতা ছিলেন পাঞ্জাবী, কিন্তু মা ছিলেন বাঙ্গালী। সে আর্মি এভিয়েশন্‌স্ ইউনিটে থাকত। প্রায়ই আমার কাছে আসত এবং বিভিন্ন খবরাদি দিত। মেজর জিয়া যে বিদ্রোহ করেছিলেন এবং ২৭শে মার্চ, '৭১ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে তাঁর কণ্ঠে স্বাধীনতা ঘোষণার কথা প্রচারিত হয়েছিল, সে কথাও আমাকে প্রথম সাইগল এসে বলেছিল। সে বলল: 'স্যার, আপনি কি এদের সাথে যোগ দেবেন না?' সে আমাকে গোপনে জয়দেবপুর বা অন্য কোনও ইপ্সিত জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্যও প্রস্তাব দিল। কিন্তু তখন এসব অনেকটা অবিশ্বাস্যও ছিল। অধিকন্তু তার মনের ভিতর তখন কি ছিল সেটাত বুঝার উপায় ছিল না। তা'ছাড়া আমার পরিবারের বাকী সদস্যদের ক্যান্টনমেন্টে ফেলে ঐ পরিবেশে পালিয়ে যাওয়ার যে কোনও প্রচেষ্টা ছিল ঝুঁকিপূর্ণ।

প্রঃ এবার বলুন আপনাকে কি অবস্থায় এবং কখন করাচী নিয়ে গেল?

উঃ ২৮ কি ২৯শে মার্চ, '৭১ প্রথমে আমাকে বাসা থেকে ষ্টেশন হেড কোয়ার্টারে এবং ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের এক আর্মি কোয়ার্টার গার্ডে নিয়ে গেল। সাধারণ সৈন্য কোনও অন্যায় করলে সাজা দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদেরকে এসব কোয়ার্টার গার্ডে রাখা হয়। আমাকেও নিয়ে সাধারণ সৈন্যের মত ৩২ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের কোয়ার্টার গার্ডে রাখল। এই পাঞ্জাব রেজিমেন্টেরই ভূতপূর্ব কমাণ্ডার ছিলেন কর্ণেল রকিব। কাজেই আমার তখনকার মনের অবস্থা কি ছিল বুঝতেই পারছেন। ওখানে আমাকে রাখা হ'ল ৭ই এপ্রিল '৭১ পর্যন্ত। তারপর হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে গেল করাচী।

প্রঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে কোয়ার্টার গার্ডে থাকাকালীন আপনার ওপর কোনও অত্যাচার হয়েছিল কি?

উঃ অত্যাচার মানে খাওয়া-দাওয়া ঠিকমত দিত না।

প্রঃ করাচীতে নিয়ে কি করল?

উঃ ওখানে নিয়েও মালীর ক্যান্টনমেন্টের এক কোয়ার্টার গার্ডে রাখল।

প্রঃ করাচী কতদিন থাকলেন?

উঃ দু'দিন।

প্রঃ তারপর?

উঃ ওখান থেকে প্লেনে নিয়ে গেল লাহোর। লাহোর এয়ারপোর্টে পৌঁছার পর কয়েকজন আর্মি অফিসার এলো আমাদিগকে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

প্র: আমাদিগকে বলতে আপনি কি বুঝাচ্ছেন?
উ: আমার সাথে একই প্লেনে ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ছিলেন। করাচী-
লাহোর রুটেই আমি আকস্মিক ভাবে তাঁর সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। ইতিপূর্বে তাঁর
চলাচল সম্পর্কে আমি ছিলাম সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তাঁর পরিবারের সদস্যবৃন্দও
একই সাথে ছিল।

প্র: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ত্যাগের আগে আপনার পরিবারের সদস্যদের
দেখে আসতে পেরেছিলেন কি?
উ: না। তবে আসার আগে তারা শুধু আমার স্ত্রীর সাথে টেলিফোনে
কথা বলার অনুমতি দিয়েছিল। তা-ও শুধু বলার জন্য যে মাত্র কয়েক দিনের
ডিউটিতে আমি বাইরে যাচ্ছি। কিন্তু গন্তব্যস্থল বলতে দেয়নি।

প্র: তারপর?
উ: লাহোর থেকে আমাকে নিয়ে গেল খরিয়ান। ওখানে আমাকে
প্রিজনার অব ওয়ার ক্যাম্পে রাখল দীর্ঘদিন।

প্র: সেখানে কি তারা আপনাকে কোনও কাজ দিল?
উ: না। আমরা ছিলাম বন্দী। একটি ছোট্ট কক্ষে আমাকে রাখল।
আমার পাশের কক্ষেই থাকতেন ব্রিগেডিয়ার মজুমদার, তাঁর স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ে
নিয়ে।

প্র: ওখানকার ব্যবহার কেমন ছিল?
উ: কখনো ভাল, কখনো মন্দ। তবে ওখানে মোটামুটি ঠিকমত খেতে
দিত। মাঝে মধ্যে খবরের কাগজ দিত পড়ার জন্য। তবে যেসব খবর আমার
জন্য ছিল গৌরবের, আনন্দের সে খবর আমাকে দেখাত না। পাকিস্তান
সরকারের হোয়াইট পেপার বেরুলে তা পড়তে দিত।

প্র: প্রশ্নোত্তরের জন্য (ইনটেরোগেশন) ডাকত কি?
উ: ডাকত। মাঝে মধ্যে ঝিলামে এক রেষ্ট হাউসে নিয়ে যেতো। সেখানেও
ইনটেরোগেট করত।

প্র: খারাপ ব্যবহার কি ধরনের হতো?
উ: যেমন ধরুন, একবার আমার দাঁতে ব্যথা হ'ল। আমি ওখানকার
একজন সামরিক অফিসারকে জানালাম আমাকে দাঁতের ডাক্তারের কাছে নিয়ে

যাওয়ার জন্য। দ্বিতীয়বার বলার সাথে সাথেই সে আমার মুখে এক ঘুসি বসিয়ে
দিল। ফলে আমি একটি দাঁত হারালাম। তারপর প্রশ্নোত্তরের জন্য প্রায় দশ
বার ঘণ্টা বসিয়ে রাখত। সারা রাত উচ্চ শক্তি সম্পন্ন বাল্ব জ্বালিয়ে রাখত।
এসব করত কথা বের করার জন্য। ইনটেরোগেশন চলাকালে চা-সিগারেট
দূরের কথা, দু-বেলা খাবারও ঠিকমত খেতে দিত না। আবার যখন ইচ্ছা হ'ত,
তখন হয়ত দু'চার দিন ঠিকমত খেতে দিত, চা-সিগারেট দিত। কখনো বা
আমি ইনটেলিজেন্স থেকে আমার কোনও পুরোনো বন্ধুকে নিয়ে এলো ফুসলিয়ে
আমার থেকে কথা বের করার জন্য। তারা আমাকে বলতো যে সত্য কথা
বললে আমাকে ছেড়ে দেবে, প্রমোশন দেবে ইত্যাদি।

এমনি নানান কৌশল তারা আমার ওপর চালাত। কিন্তু আমি তাদের
মন মত চলতে পারতাম না। তাছাড়া তাদের মন মত চলার বা তাদের বলার
আমার কিছু ছিল না। আদতেই আমি কিছু জানতাম না। অথচ তারা সন্দেহ
করতো যে আমার সাথে শেখ মুজিবের সরাসরি যোগাযোগ ছিল, পূর্ব পাকি-
স্তানকে আলাদা করার জন্য তাঁর সাথে আমার গোপন যোগ-সাজশ ছিল ইত্যাদি।

প্র: আপনার সাথে ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ছাড়া আর কে ছিলেন?
পাকিস্তানে ইতিপূর্বে কর্তব্যরত বন্দী অন্যান্য বাঙ্গালী সামরিক অফিসার বা সৈনিকও
ওখানে ছিলেন কি?

উ: আমি কাউকেই দেখিনি? যদিও আমি ব্রিগেডিয়ার মজুমদারসহ
লাহোরে একই জেলে ছিলাম, প্রকৃতপক্ষে আমি তাঁকেও বন্দী অবস্থায় দেখিনি।
এখানে উল্লেখ থাকে যে খরিয়ান থেকে আমাদেরকে পরবর্তীকালে লাহোর নিয়ে
গিয়েছিল।

যখন তারা দেখলো মিলিটারী ইনটেরোগেশন-এর মাধ্যমেও তারা আমার
কাছ থেকে কিছু বের করতে পারছিল না, তখন তারা নূতন কৌশল অবলম্বন
করল। আপনি সম্ভবত: কর্ণেল ইয়াসীনকে চেনেন। ইনিই তৎকালীন পূর্ব
পাকিস্তানের গভর্ণরের পরিদর্শন টিমের সাথে ছিলেন। কর্ণেল ইয়াসীনকেও
বন্দী করে পাকিস্তান নিয়ে গিয়েছিল। তারা বলল কর্ণেল ইয়াসীন একটি বিবৃতি
দিয়েছেন এবং এতে উল্লেখ করেছেন যে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক বিদ্রোহ করার
পেছনে আমিই নাকি প্রধান উদ্যোক্তা ছিলাম। এই বিবৃতির দোহাই দিয়ে তারা
বলল: 'আপনি অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেল ওসমানী, জেনারেল এম, আই, মজিদসহ
সব অবসরপ্রাপ্ত বাঙ্গালী সামরিক অফিসার এবং পূর্ব পাকিস্তানে কার্যরত

তৎকালীন উর্দ্ধতন বাঙালী সামরিক অফিসার ও তাঁদের স্ত্রীদের জয়দেবপুর বন ভোজের অজুহাতে ডেকেছিলেন। তাঁদের স্ত্রীগণ যখন খাবার তৈরীতে ব্যস্ত ছিলেন, তখনই আপনারা পূর্ব পাকিস্তানকে আলাদা করে নেয়ার গভীর ষড়যন্ত্র এবং পরিকল্পনা পাকা করে নিয়েছিলেন।' আমি বললাম : এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা, আমি কখনো এ জাতীয় ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিলাম না। আমি কোনও বনভোজেও তাদের ডাকিনি। বললাম : কর্ণেল ইয়াসীন কোথায়? তিনি যদি এই রকম বিবৃতি দিয়ে থাকেন আমি তাঁর সম্মুখীন হবো এবং সামনাসামনি তাঁর এই মিথ্যা অপবাদের প্রতিবাদ করব। তারা বলল : ঠিক আছে, তিনি আমাদের সাথেই আছেন। লাহোর ফোর্ট জেলেই তাঁকে রাখা হয়েছে। ওখানে আপনাকে নিয়ে যাবো।

উল্লেখ্য যে কর্ণেল ইয়াসীনকে ২৫শে মার্চ, '৭১এর আগে ইষ্টার্ণ কমাণ্ডের কোর হেড্ কোয়ার্টারের একজন ষ্টাফ অফিসার হিসেবে বদলী করা হয়েছিল। আমাকে বলা হল : 'ঠিক আছে আপনি তা'হলে লাহোর যাওয়ার জন্য তৈরী থাকুন।' তারপর জুলাই, '৭১-এর শেষ কি আগষ্ট '৭১-এর শুরুতে আমাকে নিয়ে এলো লাহোর ফোর্ট জেলে। আমি ভেবেছিলাম আমাকে সত্যিই কর্ণেল ইয়াসীনের সাথে দেখা করতে দেবে। কিন্তু কোথায় কি? ওখানে যাওয়ার পরই শুরু হ'ল আমার ওপর শারীরিক নির্যাতন। প্রথম দিন অবশ্য আমাকে বিশ্রাম নিতে বলেছিল। পরদিন সকালে আমাকে নিয়ে গেল এক অফিসে। সেখানে ছিল সব বেসামরিক প্রশ্নকারী (ইন্‌টেরোগেটার)। কেউ বলল সে স্পেশাল ব্রাঞ্চ-এর পরিদর্শক, কেউ বলল ডি, এস, পি ইত্যাদি। পরে আমি জানতে পেরেছিলাম সেটি ছিল তাদের ইনটেরোগেশন সেন্টার। তারা আমাকে বলল : কর্ণেল মাসুদ, আপনার কি হয়েছে? আপনি এখানে কেন এসেছেন, ইত্যাদি। বললাম : আমি জয়দেবপুর দ্বিতীয় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্টের কমাণ্ডিং অফিসার ছিলাম। ২৩শে মার্চ, '৭১ আমাকে ওখান থেকে সরিয়ে ঢাকা ক্যাণ্টনমেণ্টে আনা হয়েছিল। ওখানে কিছুদিন কোয়ার্টার গার্ডে রাখল। পরবর্তী কালে বন্দী অবস্থায় করাচী আনল। তারপর নিয়ে গেল লাহোর, মিলাম এবং খরিয়ান প্রভৃতি বন্দী শিবিরে। এখন এখানে নিয়ে এসেছে কর্ণেল ইয়াসীনের সাথে সাক্ষাতের জন্য। তখন তারা বলল : 'জরুর উন্‌সে মোলাকাত হোগা বাদমে। লেকিন আপ বাতাইয়ে ক্যায়া আপনে কিয়া হ্যায়?' আমি আমার কথা বললাম। তখন ওরা বলল : 'নেহি নেহি সব ঝুটা হ্যায়।' তুমি আসল ঘটনা গোপন করছ। তখন তারা আমার চুল ধরে মার শুরু করে দিল, নখের ভিতর সুঁচ ফুটানো, গায়ে

সিগারেটের ছেঁক দিল। এমনি নির্যাতন ও মারধোরের প্রেক্ষিতে বিবৃতি প্রদানের জন্য আমাকে তারা বাধ্য করল। অপরদিকে আমার দ্বিতীয় ছেলেটি তখন গুরুতররূপে অসুস্থ ছিল। সে তখন ছিল ঢাকা সি, এম, এইচ-এ (ক্যাণ্টনমেণ্টের হাসপাতাল) ডি. আই লিষ্টে (ডানজারাসলী ইল) অর্থাৎ গুরুতররূপে অসুস্থদের তালিকায়। সেই খবর প্রথম আমি তাদের মাধ্যমে পেলাম দেড় মাস পর। এর আগে দীর্ঘদিন কোনও খবর আমি পাইনি। বেশীর ভাগ সময় আমি ছিলাম খরিয়ান ও ফোর্ট জেলে। অথচ আমার ঠিকানা ছিল কেয়ার অব মিলিটারী ইন্‌টেলিজেন্স ডাইরেক্টরেট, জি, এইচ, কিউ, রাওয়ালপিণ্ডি। তারা আমাকে চিঠিখানা দিল। আমাকে একটি টেলিগ্রামও দেখাল এবং বলল : তোমার ছেলে মরণাপন্ন অবস্থায় রয়েছে। বললাম : আমিত সব সময় আমার ছেলেমেয়েদের জন্য উদ্বিগ্ন থাকতাম। কিন্তু আমাকে এসব খবর জানাতো না। তখন তারা বলল : 'ঠিক আছে এখন তুমি জানলে তোমার ছেলে অসুস্থ। তুমি যদি তোমার ছেলেকে সত্যিই দেখতে ইচ্ছুক হও, তবে কর্ণেল ইয়াসীনের বিবৃতিকে সমর্থন করেই বের হয়ে আস। তখন আমাদের আর কিছুই বলার থাকবে না।' তারা আমাকে কর্ণেল ইয়াসীন স্বাক্ষরিত একটি বিবৃতিও দেখাল। ওখানে লেখা ছিল : জয়দেবপুরে ষড়যন্ত্র হয়েছে। ঢাকা বিমানবন্দর কিভাবে দখল করতে হবে তার পরিকল্পনার কথাও ঐ বিবৃতিতে উল্লেখ ছিল। আমি চাপের মুখে দিশেহারা হয়ে ঐ বিবৃতি সমর্থন করলাম। তখন আমার অবশ্য বুঝতে বাকী থাকল না যে তারা কর্ণেল ইয়াসীনকেও এমনি ভয় দেখিয়ে তার ওপর অত্যাচার চালিয়ে ঐ বিবৃতি সই করিয়ে নিয়েছিল। তারা আমাকে ভয় দেখালো : মাসুদ, তুমি এবং তোমার পরিবার আমাদের হাতের তালুর মধ্যে। আমরা যে কোনও সময় তোমার পরিবার এবং তোমাকে শেষ করে দিতে পারি। কাজেই বিবৃতি দিয়ে বের হয়ে আসাই তোমার একমাত্র পথ খোলা রয়েছে। লক্ষ্য করলাম ওখানকার উর্দ্ধতন অফিসার যারা আমাকে জানতো তাদের দু'একজনও এলো। তারা ভদ্রভাবে বলল : 'মাসুদ, তুমি বল। কিছু বললেই তোমাকে ছেড়ে দেয়া হবে। তুমি ফিরে গিয়ে তোমার পরিবার পরিজনের সাথে মিলিত হও।' তখন আমি এক রকম পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলাম। দুশ্চিন্তা এবং অত্যাচারে দীর্ঘদিন ধরে আহার-নিদ্রা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছিলাম। কাজেই আমি বিবৃতিতে স্বাক্ষর করলাম।

প্র : বিবৃতি দেয়ার পর আপনাকে কখন ঢাকা নিয়ে এলো?

উ : ৮ই অক্টোবর, '৭১।

প্র : আপনার বাসায় নিয়ে এলো?

উ: আমিত ভেবেছিলাম এখানে এনে আমাকে ছেড়ে দেবে। ঢাকা পৌঁছার পর এক মেজর আমাকে প্রহরা দিয়ে প্রথমে বাসায় নিয়ে গেল। উদ্দেশ্য, আমার পরিবার পরিজনকে দেখানো। পরিবার-পরিজন অর্থ আমার মা, আমার ছেলেমেয়ে। আমার স্ত্রী কিন্তু আমার অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে হাসপাতালে ছিল। বাসায় কিছুক্ষণ থাকার পর আমাকে নিয়ে গেলো হাসপাতালে। হাসপাতাল থেকে আসার পথে আমাকে বাধা দিল। বলল: তুমি বাসায় থাকতে পারবে না। ওখানে থাকা তোমার জন্য নিরাপদ হবে না। আমাকে নিয়ে অফিসার্স মেসে রাখল। এটি ছিল অর্ডন্যান্স অফিসার্স মেস। ওখানে একটা গেষ্ট রুম ছিল। সেই রুমে আমাকে রাখল। পাশে আর এক রুমে বেগম জিয়াও ছিলেন তাঁর দুই সন্তানসহ। বেগম জিয়া এবং আমাকে একই গার্ড কমাণ্ডার দেখাশুনা করত।

প্র: বেগম জিয়ার সাথে আপনার আলাপ হ'ল?
উ: না। তবে তাঁকে দূর থেকে দেখেছি। তাঁর ছেলেদেরকে লনে খেলা-ধুলা করতে দেখেছি।

প্র: ওখানে কবে পর্যন্ত ছিলেন?

উ: ১৬ই ডিসেম্বর '৭১ পর্যন্ত। এমনকি ঐ দিন সন্ধ্যা পর্যন্তও আমাকে ওখানে আটকে রেখেছিল। ওদের বলেছিলাম: 'তোমাদের বাহিনী ত ইতিমধ্যেই আত্মসমর্পণ করেছে। এখন আর আমাকে আটক রেখে লাভ কি?' তখন তারা বলল: 'না না তোমাকে ছাড়ার জন্য আমরা রাওয়ালপিণ্ডি থেকে কোনও নির্দেশ পাইনি।' বললাম: 'তোমরা ত আত্মসমর্পণ করেছ। এখন আর রাওয়ালপিণ্ডির সাথে যোগাযোগ করবে কি করে?' বুঝলাম ওরা আমাকে স্বেচ্ছায় ছাড়বে না। আমার ভয় হ'ল হয়ত বা ওরা আমাকে শেষ মুহূর্তে হত্যা করতে পারে। তাই আমি ঐ অবস্থায় সময় নষ্ট না করে ক্যান্টনমেন্টের বাইরে চলে আসার জন্য বুদ্ধি আঁটিতে লাগলাম। সারা বিকাল চিন্তা ভাবনা করলাম। উল্লেখ্য যে, ইফতিখার নামে একজন পাকিস্তানী মেজর আমাকে আগে থেকেই চিনত। সেখানে তার সাথে আমার দেখা হ'ল। আমিত কয়েদী। আমার চারধারে পাকিস্তানী গার্ডস্। তবে আমার একটা ভরসা ছিল। দূর থেকে লক্ষ্য করেছিলাম ভারতীয় গার্ডস্রা ক্যান্টনমেন্টে তাদের চারিদিকে এসে গিয়েছে। কাজেই বন্দীদশা থেকে বের হয়ে আসার জন্য আমি তৈরী হলাম। এখানে একটি কথা উল্লেখ করা দরকার যে ৮ই অক্টোবর থেকে ১৪ই ডিসেম্বর পর্যন্ত বিশেষ অনুমতিক্রমে আমার

সর্বকনিষ্ঠ ছেলেকে (অসুস্থ ছেলেটির ছোট) আমার সাথে রেখেছিলাম। তার কাপড়চোপড় এবং খেলনা ইত্যাদি আনা নেয়ার কালে সুযোগ বুঝে আমি বাসা থেকে একটি ছোট রেডিও সেট আনিয়ে নিয়েছিলাম। আমার পরামর্শক্রমে আমার স্ত্রী ঐ রেডিও সেটের ভিতর আমার পিস্তলটি লুকিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। পিস্তলটি আমার পকেটে রেখেছিলাম। তখন ঐ পিস্তলটিই ছিল জীবন-যুদ্ধে আমার একমাত্র সম্বল। শেষ মুহূর্তের যে কোনও সতর্কমূলক ব্যবস্থার জন্য ঐ পিস্তল আমি নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলাম। প্রয়োজনে পিস্তলটি একবার হলেও চালাবো এই ছিল আমার প্রতিজ্ঞা। ঠিক এমনি অবস্থায় দেখা পেয়েছিলাম ইফতিখারের। আমি তাকে বললাম: 'দেখ, আমাকে এ ভাবে আটক করে রেখেছে। এখন আর আমাকে আটক করে রাখার কোন কারণ থাকতে পারে?' সে আমার প্রতি সদয় হ'ল এবং বলল: 'আমি আপনাকে বের হওয়ার জন্য সাহায্য করব।' সন্ধ্যার ঠিক পরে ইফতিখারসহ আমি বারান্দা পেরিয়ে বাইরে যাওয়ার জন্য সামনের লনে এলাম। একজন পাঞ্জাবী গার্ড তখন আমার গতিবিধি লক্ষ্য করছিল। ইতিমধ্যেই ইফতিখার আমাকে বের করে নেয়ার জন্য সুবিধা মত জায়গাও দেখে এসেছিল। আমরা এগুতেই গার্ড বলল: 'সাব কিধার যাতা হ্যায়'। তখন ইফতিখার বলল: 'ঠিক হ্যায় হামারা সাথ হ্যায়। হাম দেখ রাহা হ্যায় সাবকো। ফিকির মাৎ করো।' পরক্ষণেই আমরা একটা ব্যারাকের পাশ দিয়ে বাইরে এলাম। ইফতিখার তখন আমাকে বলল: 'এখন আপনি যেতে পারেন। আমাদের পাকিস্তানী ট্রুপ্স আর বাধা দেবে না। তবে ভারতীয় ট্রুপ্স্ বাধা দিতে পারে। সেটা আপনাকে চালিয়ে নিতে হবে।' ইফতিখারের গায়ে শীতের কাপড় ছিল না। বের হয়ে আসার সময় আমার জ্যাকেটটি ওকে দিয়ে এসেছিলাম। আগেই ওকে বলেছিলাম যে আমাকে বের করে আনতে পারলে, আমার গায়ের জ্যাকেটটি তাকে দেবো। অন্যভাবে বলা যায়, আমার গায়ের জ্যাকেটটি ইফতিখারকে দিয়েই আমি ক্যান্টনমেন্ট থেকে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলাম।

প্র: ভারতীয় বাহিনী আপনাকে প্রশ্ন করল না?

উ: আমি বের হয়ে আসার কালে এক শিখ জোয়ান আমাকে প্রশ্ন করলেন: কোন্ হ্যায় আপ? বলেছিলাম: 'আমি বাঙ্গালী কর্ণেল মাসুদুল হোসেন খান; জয়দেবপুর দ্বিতীয় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমাণ্ডিং অফিসার ছিলাম। এতদিন হানাদার বাহিনী আমাকে আটক করে রেখেছিল।' আমার পরিচয় দিতেই তিনি বললেন: 'ঠিক হ্যায় আপ আপনা বাল-বাচ্চাকা সাথ মোলাকাত করো'।

প্র: ১৬ই ডিসেম্বর '৭১ এর পরের ঘটনা বলুন। অর্থাৎ আপনি কি চাকুরীতে পুনর্বহাল হলেন?

উ: বাসায় এসেই আমি জানলাম কর্ণেল শফিউল্লাহ্ (তখন তিনি কর্ণেল ছিলেন) ঐদিন সন্ধ্যার আগেই আমার বাসায় এসেছিলেন এবং আমার খোঁজ নিয়ে জেনেছিলেন যে আমি তখনো ক্যান্টনমেন্টে আটক ছিলাম।

কাজেই ফিরে এসেই পাশের বাসা থেকে কর্ণেল শফিউল্লাহ্ সহ অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করলাম। কর্ণেল শফিউল্লাহ্র সাথে তাৎক্ষনিকভাবে যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। মনে পড়ে পরের দিন তিনি আমার এক আত্মীয়ের মারফত জানা মাত্রই ক্যান্টনমেন্ট থেকে সপরিবারে আমাদিগকে চলে আসার জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কাজেই আমরা ঐ রাতেই ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট-এর বাসা ছেড়ে এলাম।

প্র: আপনি বাংলাদেশ সরকারের কাছে কখন রিপোর্ট করলেন এবং তারা আপনাকে কি ভাবে গ্রহণ করলেন?

উ: পরের দিনই আমি কর্ণেল শফিউল্লাহ্র সাথে দেখা করলাম। তিনি ঢাকা সেক্টরের দায়িত্বে ছিলেন। বললাম: 'আমিত এলাম।' তিনি বললেন: 'স্যার, আপনি আসুন এবং আমাদের সাথে যোগ দিন।' আমি যোগ দিলাম।

২১শে কি ২২শে ডিসেম্বর '৭১ জেনারেল ওসমানী ঢাকা ফিরে এলেন। আমি তাঁর সাথে দেখা করলাম এবং সব বিস্তারিত বললাম। তিনি আমাকে আর্মি ফোর্সেস হেডকোয়ার্টারে থাকতে নির্দেশ দিলেন। কিছুদিন পর, জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে হয়ত হবে জেনারেল ওসমানী আমাকে প্রথম নিয়োগপত্র দিলেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামের সামরিক সচিব হিসেবে। কাজেই আমি নুতন দায়িত্বভার বুঝে নেয়ার জন্য বঙ্গ ভবনে যাওয়ার উদ্যোগ নিলাম। ঐ সময় প্রতিরক্ষা সচিব ছিলেন জনাব এস. এ. সামাদ। তিনিও আমাকে টেলিফোন করে পরামর্শ দিলেন যেন নির্দেশানুযায়ী অচিরেই অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট এর সামরিক সচিবের দায়িত্ব ভার বুঝে নেয়ার জন্য সরাসরি বঙ্গ ভবনে চলে যাই। কিন্তু ঠিক পরপরই পুনঃনির্দেশ পেলাম জেনারেল ওসমানীর কাছ থেকে। তিনি বললেন: 'মাসুদ, তুমি বঙ্গ ভবনে যেও না। জাষ্টিস আবু সাঈদ চৌধুরী এখন নুতন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন। একজন সাংবিধানিক লোক হিসেবে তিনি অত্যন্ত কঠোর। তিনি মনে করেন যে একজন বিতর্কিত ব্যক্তি সেখানে যাওয়া ঠিক হবে না।'

আমি তখন বিতর্কিত ব্যক্তি হয়ে গেলাম। কেউ বললেন আমি পাকিস্তানী-দের সহযোগিতা দান করেছি। কেউ আবার উল্টাটি বলে আমার প্রতি সহানুভূতি

দেখালেন। তখন আমি যেন সবাইর করুণার পাত্র। জেনারেল ওসমানীর একজন প্রাইভেট সেক্রেটারী দরকার ছিল। তিনি আমাকে ডেকে জানতে চাইলেন রাষ্ট্রপতির মিলিটারী সেক্রেটারী হওয়ার পরিবর্তে কমাণ্ডার-ইন্-চীফ এর প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবে নিয়োগ পরিবর্তনে আমার কোনও আপত্তি আছে কি না? বললাম: 'আমি সৈনিক, যে ভাবে নির্দেশ দেবেন সেভাবেই আমি কাজ করবো।'

কথানুযায়ী জেনারেল ওসমানী আমার নিয়োগ পরিবর্তন করে আমাকে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবে নিলেন। তিনি বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর কমাণ্ডার-ইন্-চীফ হিসেবে বহাল থাকার শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর প্রাইভেট সেক্রে-টারীর পদে আমি কাজ করেছি। সশস্ত্র বাহিনীর পদ থেকে অব্যাহতি নেবার কেবল আগেই তিনি আমাকে সেনাবাহিনীর চীফ অব এডমিনিষ্ট্রেটিভ ষ্টাফ পদে নিয়োগ প্রদান করেছিলেন। উল্লেখ্য যে তখন আমি হেডকোয়ার্টারে ডাইরেক্টার অব পারসনেল, মিলিটারী সেক্রেটারী, এডজুটেন্ট জেনারেল, কোয়ার্টার মাষ্টার জেনারেল, মাষ্টার জেনারেল অব অর্ডন্যান্স প্রভৃতি পদের প্রশাসনিক সমন্বয় বিধান করতেন চীফ অব এডমিনিষ্ট্রেটিভ ষ্টাফ। সেপ্টেম্বর, '৭২ পর্যন্ত আমি এই পদে ছিলাম।

তারপর হঠাৎ একদিন চিঠি পেলাম যে আমার চাকুরীর আর কোনও প্রয়োজন নেই। আমাকে বাধ্যতামূলক ভাবে অবসর প্রদান করা হ'ল।

এখানে আরো আগের একটি কথা মনে পড়ছে। পাকিস্তানের কারাগার থেকে শেখ সাহেব ফিরে এলেন ১০ই জানুয়ারী, '৭২। তখন জেনারেল ওসমানী বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সব উর্দ্ধতন অফিসারকে বঙ্গবন্ধুর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য বঙ্গ ভবনে নিয়ে গেলেন। আমিও যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আমার মত আরও দু'চার জন সামরিক অফিসারও এমনি যাওয়ার জন্য তৈরী ছিলেন। তখন জেনারেল ওসমানী বললেন: 'মাসুদ, না না তোমরা যাচ্ছ না, শুধুমাত্র মুক্তি যোদ্ধারা যাচ্ছেন।' পরদিন ফিরে এসে তিনি বললেন: 'মাসুদ, বঙ্গবন্ধু তোমাকে দেখতে চান। তিনি জানতে পেরেছেন যে তুমি এখানে আছ।' পরে শুনলাম তিনি কর্ণেল শফিউল্লাহ্কেও জিজ্ঞাসা করেছিলেন: 'মাসুদ কোথায়? আমরা একই সাথে মায়ানপুর জেলে ছিলাম। তাকে অবশ্যই বলবে আমার সাথে দেখা করতে।'

প্র: মায়ানপুরে আপনার সাথে বঙ্গবন্ধুর কোনও কথা হয়েছিল কি?

উ: না। আমার সাথে কোনও কথা হয়নি। কিন্ত, তাঁকে আমি কোর্টে দেখেছি। তিনিও আমাকে দেখেছেন। তাছাড়া, বঙ্গবন্ধু আমাকে চিনতেন

কোলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে। তিনি আমার সিনিয়ার ছিলেন। ১৯৪৪ সালে যখন আমি ইসলামিয়া কলেজে প্রথম বর্ষে ছিলাম, তখন তিনি ছিলেন চতুর্থ বর্ষে।

প্র: আপনি সেনাবাহিনীতে কবে যোগ দিয়েছিলেন?

উ: ১৯৪৯ সালে।

প্র: '৭২ সালে আপনাকে বাধ্যতামূলক অবসর দানের পরের ঘটনা বলুন।

উ: আগের কথাটি শেষ করি। জেনারেল ওসমানী আমাকে বললেন বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করার জন্য। উপদেশানুযায়ী তৎকালীন গণ ভবনে (বর্তমান উপরাষ্ট্রপতি ভবন) গিয়ে আমি বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করেছিলাম। আমি কাছে যাওয়া মাত্রই তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং প্রায় কেঁদেই ফেললেন। ঐ সময়ে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব তাজুদ্দিন, গাজী গোলাম মোস্তফা এবং জনাব শামসুল হক (প্রাক্তন মন্ত্রী) সহ অনেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁদের সবাইর সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারিখটি ছিল সম্ভবতঃ ১২ই কি ১৩ই জানুয়ারী, '৭২। নেতৃবৃন্দ ছাড়াও ঐ সময় বঙ্গবন্ধুর কক্ষে কয়েক-জন বিদেশী সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমার পিঠে হাত রেখে আমার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলেন। আমার অসুস্থ ছেলেটির কথা জানতে চাইলেন। বললাম: আমার ছেলে মরণাপন্ন।'* বঙ্গবন্ধু তখন আমাকে প্রবোধ দিয়ে বললেন: 'মাসুদ, তোমার বিরুদ্ধে আমার কোনও অভিযোগ নেই। আমি জানি কি পরিস্থিতিতে তোমাকে বিবৃতি দিতে হয়েছিল। তুমি যাও, আমাদের সেনা-বাহিনীকে পুনঃসংগঠন কর।'

কাজেই বঙ্গবন্ধুর ইচ্ছায় আমি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে সংগঠন করার জন্য দিনরাত কাজ করলাম।

প্র: তারপর বঙ্গবন্ধু আবার পরিবর্তন হয়ে গেলেন কেন?

উ: সেটাত ভেবে আমি আশ্চর্যান্বিত হই। ৯ মাস যাওয়ার পর সেপ্টেম্বর '৭২এ আমি অব্যাহতি পত্র পেয়েই প্রথমে কর্ণেল শফিউল্লাহ্র কাছে গেলাম। বললাম: সেনাবাহিনীকে সংগঠনের জন্য দীর্ঘ প্রায় ৯ মাসকাল দিন রাত আমি যে ভাবে পরিশ্রম করেছি, এত পরিশ্রম আমি জীবনে করিনি। শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধু আমাকে ডেকে বলেছিলেন বলেই, তাঁর নির্দেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যই আমি এত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করেছি। তখন চিঠিখানা পকেট থেকে বের করে

*১৯৭২এর মাঝামাঝি সময়ে কর্ণেল মাসুদুল হোসেনের এই সন্তান মারা গিয়েছে। (ইন্নালিল্লাহে ---)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল প্রায় আট বছর।

দেখিয়ে বললাম: 'শফিউল্লাহ্ আর এটাই কি তার পুরস্কার? তোমরা শেষ পর্যন্ত আমার সাথে এই করলে?'

উ: কর্ণেল শফিউল্লাহ্ তখন বললেন: আমি কি করব স্যার। আমরা রাজনৈতিক চাপের মুখে আছি। বললাম: এখন আমি কার কাছে কোথায় যাব? তিনি বললেন: তা' আপনি চেষ্টা করতে পারেন। বঙ্গবন্ধুর সাথেও দেখা করতে পারেন।

সেদিন বিকেলে আমি পুনরায় গণ ভবনে গেলাম এবং বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করলাম। বললাম: স্যার, আপনি বলেছিলেন আমার বিরুদ্ধে আপনার কোনও অভিযোগ নেই। কিন্তু এটা কি দেখুন। তিনি তখন আমাকে পাশের সোফায় বসালেন। চা খাওয়ালেন। বললেন: মাসুদ, তোমাকে আমি কোলকাতা থেকে চিনি। তুমি সেনাবাহিনীকে সংগঠনের জন্য যে কঠোর পরিশ্রম করেছ, সে খবরও আমি পেয়েছি। কিন্তু যারা সশস্ত্র বাহিনীর অফিসারগণকে ছাঁটাই করেছে, তারা সবাই তোমার অধস্তন ছিল। যেমন, শফিউল্লাহ্, জিয়াউর রহমান, খালেদ মোশাররফ এবং অন্যান্য। তারা তোমার পদচ্যুতির জন্যই সুপারিশ করেছিল; কিন্তু আমি বলেছিলাম: না, মাসুদকে পদচ্যুত করা হবে না। তাকে পূর্ণ সম্মান এবং সুযোগ-সুবিধা দিয়ে অব্যাহতি দেয়া হবে। কাজেই তোমাকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এই অবস্থায় তুমি যদি তাদের অধস্তন হয়ে কাজ করতে চাও আমার কোনও আপত্তি নেই। আমি নির্দেশ পরিবর্তন করে দেবো। তবে আমি জানি, তুমি ওদের অধস্তন হয়ে কাজ করতে পারবে না। তুমি নিশ্চিত থাক, আমি তোমাকে কোথাও না কোথাও পুনর্বহাল করব।

তিনি তাঁর কথা রেখেছিলেন। দু'মাসের মধ্যেই '৭২-এর নভেম্বরে তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন: সরকারের যানবাহনগুলি খুব খারাপ অবস্থায় আছে। এগুলি কেউ ঠিক ভাবে দেখাশুনা করছে না। আমার মন্ত্রীরা নিয়মিত যানবাহন পান না। তুমি এটা নিয়ন্ত্রণ কর। সংস্থাপন বিভাগের সেক্রেটারীকে ডেকে তিনি বলে দিলেন আমাকে ট্রানসপোর্ট কমিশনারের দায়িত্ব দেয়ার জন্য।

কাজেই অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই নির্দেশ অনুযায়ী আমি ট্রান্সপোর্ট কমিশনারের দায়িত্বভার নিলাম। আমার চাকুরী তখন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বদলী করে কেবিনেট এফেয়ার্স (সংস্থাপন বিভাগ) মন্ত্রণালয়ে দেয়া হ'ল। আমি তখনো এল, পি, আর (লিভ প্রিপেয়ারেটরী টু রিটায়ারমেন্ট) অর্থাৎ অবসর গ্রহণের প্রস্তুতিকালীন ছুটিতে ছিলাম। সশস্ত্র বাহিনীর চাকুরী থেকে আমার নাম কেটে দেয়া হয় নি। আমাকে ট্রান্সপোর্ট কমিশনার পদে বহাল করা হ'ল।

এই পদ যুগ্ম সচিবের সমতুল্য ছিল। বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে আগে থেকেই একটি ট্রান্সপোর্ট অফিস ছিল। ওখানে আমি ডিসেম্বর '৭২ থেকে জুন '৭৩ পর্যন্ত কাজ করলাম। কিন্তু সহসা আমি বঙ্গবন্ধুর ভগ্নিপতি সৈয়দ হোসেনের কুনজরে পড়লাম। তিনি ছিলেন তখন সংস্থাপন বিভাগের যুগ্মসচিব (পরে অতিরিক্ত সচিব হয়েছিলেন)। পরিত্যাক্ত গাড়ীগুলি আমার তত্ত্বাবধানে ছিল। এগুলির বরাদ্দ নিয়ে গণ্ডগোলের সূত্রপাত হ'ল। নিয়ম অনুযায়ী বরাদ্দ হওয়ার আগে আমি এগুলির মূল্য ঠিক করে দিতাম। আমার সাথে টেকনিক্যাল ষ্টাফ ছিলেন। তারাই এসব মূল্য নির্ধারণ করতেন। তারপর যুদ্ধের সময় যাঁরা যানবাহন হারিয়েছিলেন, তাঁদের এগুলি বরাদ্দ দেয়া হ'ত। এ স্থলে জনাব সৈয়দ হোসেন ভাল অবস্থার গাড়ীকেও কম দামে (যেমন তিন থেকে পাঁচ হাজার টাকায়) ধার্য করার পরামর্শ দিতেন। এতে অনেক সময় আমার সাথে তাঁর মতানৈক্য হ'ত। এই সুযোগে তিনি বঙ্গবন্ধুর কাছে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন শুরু করলেন। আমার বিরুদ্ধে অপবাদ দিলেন যে কর্ণেল মামুন এখনো পাকিস্তানী আইন কানুন নিয়ে চলতে চান। কাজেই তাঁকে দিয়ে যানবাহন নিয়ন্ত্রণের কাজ হবে না।

ফলে আমাকে পুনরায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে ফেরত পাঠানো হ'ল। আপনাকে আগেই বলেছি ওখান থেকে ইতিপূর্বে আমাকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছিল। কাজেই আমার আর কোথাও স্থান থাকল না। আমাকে অবসর নিতে হ'ল।

প্র: বাংলাদেশ সেনা কল্যাণ সংস্থায় কখন এলেন?

উ: ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬।

প্র: এতদিন কোথায় ছিলেন?

উ: ইতিপূর্বে দুইটি বিদেশী প্রাইভেট কোম্পানীর সাথে কাজ করেছি।

প্র: বর্তমানে আপনি কেমন আছেন?

উ: ইনশা-আল্লাহ্ ভাল আছি।

প্র: আপনার সাথে অনেক কথা হ'ল। অনেক কথা জানার সুযোগ পেলাম। আপনাকে ধন্যবাদ।

উ: আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ।

নবম পরিচ্ছেদ

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র নিবেদিত রচনাবলী

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র নিবেদিত রচনাবলী

একটি আবেদন
প্রথম সন্ধ্যার অনুষ্ঠান থেকে (২৬শে মার্চ '৭১)

_কবি আব্দুস সালাম_

"নাহ্‌মাদুহু ওয়ানুসাল্লী আলা রাসুলিহীল করিম"।

আস্‌সালামু আলায়কুম,

প্রিয় বাংলার বীর জননীর বিপ্লবী সন্তানেরা। স্বাধীনতাহীন জীবনকে ইসলাম ধিক্কার দিয়েছে। আমরা আজ শোষক প্রভুত্বলোভীদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছি। এ গৌরবোজ্জ্বল স্বাধিকার আদায়ের যুদ্ধে, স্বাধীনতার যুদ্ধে আমাদের ভবিষ্যত জাতির মুক্তিযুদ্ধে, মরণকে বরণ করে যে জানমাল কোরবাণী দিচ্ছি, কোরআনে করিমের ঘোষণা—তারা মৃত নহে অমর।

দেশবাসী ভাইবোনেরা,

আজ আমরা বাংলার স্বাধীনতার সংগ্রাম করছি। আল্লার ফজল করমে বাংলার আপামর নরনারী আমাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করে চলেছেন। আর সবখানে আমাদের কর্তৃত্ব চলছে। আমরা যারা সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছি—তাঁদের আপনারা সকল প্রকার সহযোগিতা দিন। এমনকি খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারেও সহায়তা দিন। স্মরণ রাখবেন দুশমনরা মরণ কামড় দিয়েছে। তারা এ সোনার বাংলাকে সহজে তাদের শোষণ থেকে মুক্তি দিতে চাইছে না। কোন অবাঙ্গালী সৈনিকের কাজেই সাহায্য করবেন না। মরণ ত' মানুষের একবার। বীর বাংলার বীর সন্তানেরা শৃগাল কুকুরের মতো মরতে জানে না। মরলে শহীদ, বাঁচলে গাজী।

কোন গুজবে কান দেবেন না। খালি হাতে কয়জন মিলে কোন পশ্চিমা মিলিটারীর মোকাবিলা করবেন না। ওরা আমাদের দেশে এসে আমাদের খেয়েই

শক্তি যুগিয়ে আমাদের নির্বিচারে হত্যা করবে—তা হতে পারে না। দশজনে হলেও একজনকে খতম করুন। সমস্ত প্রকার অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। যারা নিরস্ত্র তারা অন্ততঃ সোডার বোতল বাজী প্রস্তুত করে মরিচের গুঁড়ার ঠোঙ্গা বানিয়ে ওদের প্রতি নিক্ষেপ করলে টিয়ার গ্যাসের কাজ করবে। বিজলী বাতির বালবে এসিড ভরে তা'ও নিক্ষেপ করুন। একেবারে খালি হাতে থাকবেন না। মরবেন তো মেরেই ইতিহাস সৃষ্টি করুন।

"নাস্রুম মিনাল্লাহে ওয়া ফাতহুন করিব"। আল্লাহ্র সাহায্য ও জয় নিকটবর্তী॥

প্রথম কথিকা

২৮শে মার্চ '৭১ প্রচারিত

বেলাল মোহাম্মদ

কবির ভাষায়:

'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে
কে বাঁচিতে চায়
দাসত্ব শৃংখল বলো কে পরিবে পায় রে
কে পরিবে পায়।'

দাসত্বের শৃংখল ভেঙ্গেছে সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালী। স্বাধীনতা বঞ্চিত জীবন থেকে তারা স্বাধীন জীবনের জয়-যাত্রার পথে এগিয়ে চলেছে। এই এগিয়ে চলার পথ দুর্গম, দুর্বার। এই যাত্রা পথে কোনো শাসক দমন নীতি, কোনো অশুভ শক্তির বিধি-নিষেধ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। জীবন জয়ের অভিযাত্রীদের কে বাধা দেবে। কে এই অভিযাত্রীদের পথ রোধ করে দাঁড়াবে? সেই সাধ্য কারো নেই, সেই দুঃসাহস দেখাবার সকল 'পশ্চিম পাকিস্তানী দাপট' আজ ছিন্ন-ভিন্ন, পর্যুদস্ত।

ভাবতে অবাক লাগে, তেইশ-তেইশটি বছর কিভাবে সেই তথাকথিত পাকিস্তান সরকার বাংলার মা-বোন, বাংলার শিশু-বৃদ্ধ, বাংলার কৃষক-শ্রমিক, জেলে-তাঁতী, কামার-কুমার, মেহনতী মানুষের ওপর শাসনের নামে চালিয়ে গেছে শোষণ।

বাংলার মানুষকে ওরা লাঞ্ছনা গঞ্জনা আর অবহেলা দিয়ে দিয়ে নিজেদের জাতিগত দুশ্চরিত্রেরই পরিচয় দিয়েছে।

আজকের স্বাধীন বাংলার পথে-ঘাটে দেখতে পাওয়া যায় বীর জনতার গড়া স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা। পশ্চিম পাকিস্তানী গুপ্তচর, বর্বর সৈন্যদের প্রত্যেক প্রবেশপথ আজ রুদ্ধ। ওদেরকে যেখানেই দেখা যাচ্ছে, স্বাধীন বাংলা মুক্তিবাহিনীর রাইফেল গর্জে উঠেছে, এফোঁড় ওফোঁড় করে যাচ্ছে বুলেট—আর ধরাশায়ী হচ্ছে এক একটি হানাদার দুশমন। ওদের ক্ষমা নেই—ক্ষমা নেই।

স্বাধীন বাংলার প্রতিটি গৃহ এক একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ। আমাদের মা-বোনেরাও আর নিষ্ক্রিয় হয়ে নেই। প্রত্যেকেই সশস্ত্র। দুশমনকে উচিত সাজা দেবার জন্যে নারী-পুরুষ শিশু-বৃদ্ধ সবাই সদাপ্রস্তুত।

বাঙ্গালী আজ জেগেছে। দাসত্বের শৃংখল ভেঙ্গে বেরিয়ে এসেছে তারা—

'এবার বন্দী বুঝেছে,
মধুর প্রাণের চাইতে ত্রাণ
মুক্তকণ্ঠে স্বাধীন বিশ্বে
উঠিতেছে এক তান:
জয় নিপীড়িত জনগণ জয়
জয় নব অভিযান
জয় নব উত্থান॥
জয় স্বাধীন বাংলা

(২৩শে ডিসেম্বর ১৯৭২ তৎকালীন-গণভবনে বঙ্গবন্ধুর সহৃদয় উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের 'নমুনা অধিবেশনে' পঠিত ও বাংলাদেশ বেতারের জাতীয় অনুষ্ঠানে পুনঃপ্রচারিত।)

সাম্প্রদায়িকতা ঃ সামন্তবাদ প্রসঙ্গ

২১শে এপ্রিল '৭১ প্রচারিত

মোস্তফা আনোয়ার

সামন্তবাদ সভ্যতার ইতিহাসে একটি মৃত অধ্যায়। বাংলাদেশেও একদিন ছিলো সামন্ততন্ত্র। ছিলো জমিদারের শাসন ও শোষণ। এই জমিদারদের ছিলো দুর্দণ্ড প্রতাপ। পর-গাছার মত এই জমিদার-শ্রেণী বেঁচে ছিল লাঞ্ছিত নিপীড়িত মানুষের রক্ত শোষণ করে। এই জমিদাররা নিজেরাই এক জাতি—নিজেরাই একটা শ্রেণী। এরা হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়। এরা রক্তপায়ী এক জীব। এরা দরিদ্র মুসলমান কৃষককে শোষণ করেছে—নিরন্ন হিন্দু কৃষককেও ক্ষমা করেনি। এদের রক্তলোলুপ থাবা থেকে কেউ-ই রেহাই পায়নি। সম্পর্কটি ছিলো জমিদার ও কৃষকের মধ্যে শোষণ ও শোষিতের সম্পর্ক—হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক নয়। হিন্দু জমিদারের মধ্যে যেটা করেছে সেটা শ্রেণীস্বার্থ—জমিদার রূপে অত্যাচারিত কৃষকের রক্ত-পানের উদগ্র নেশা।

হিন্দু ও মুসলমান জমিদারদের অত্যাচারের এটাই বাস্তব চিত্র। শুধু বাংলাদেশে কেনো সমগ্র বিশ্বে সামন্ততন্ত্রের এটাই আসল চেহারা। রাশিয়ায় বা আমেরিকায় এই সামন্ত প্রভুদের অত্যাচারের কাহিনী রক্তলেখায় লেখা আছে ইতিহাসে ও সাহিত্যে।

বিশ্বের প্রতিটি দেশে সাধারণ মানুষ অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত হয়েছে এই জমিদার শাসকগোষ্ঠি দ্বারা। কিন্তু এই অমানিশারও শেষ আছে। মানুষের মুক্তির সূর্যোদয় অবশ্যম্ভাবী। অত্যাচারিত মানুষ জেগেছে। ঘুম ভেঙ্গেছে দৈত্যপুরীর রাজকন্যার। অবশেষে কবর রচিত হয়েছে সামন্ততন্ত্রের। অত্যাচার আর নিপীড়নের হয়েছে অবসান। শোষণহীন গণতান্ত্রিক সমাজ গঠন করেছে সংগ্রামী মানুষ।

আমরা আগেই বলেছি, সামন্তবাদ বা জমিদার-তন্ত্র সভ্যতার ইতিহাসের একটি মৃত অধ্যায়—যাদুঘরের সামগ্রী। যে জমিদার অত্যাচার করেছিলো, সে জমিদার শেষ হয়েছে। নিশ্চিহ্ন হয়েছে এই রক্তপায়ী জোঁক শ্রেণীর। ব্যাপারটি

হচ্ছে শ্রেণী-সংঘর্ষের—হিন্দু-মুসলমানের নয়। সর্বহারা কৃষকের জয় ঘোষিত হয়েছে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পত্তনের মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশের দরিদ্র কৃষকের দুঃখের অবসান হয়েছিলো। বাংলার কৃষকের চোখে নেমেছিলো নতুন ফসলের আশা। বাংলার কৃষক দুর্ভিক্ষ দেখেছে। দেখেছে জলোচ্ছ্বাসের ভীষণ তাণ্ডবলীলা, দেখেছে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণির বিধ্বংসকে। তবু সে বুক বেঁধে দাঁড়িয়েছে প্রতিবার। পদ্মা-পারের মানুষ ধ্বংসকে ভয় করে না। তার হাতে আছে দুর্জয় সৃষ্টির মন্ত্র।

কিন্তু এতবড় দুর্যোগ কি কেউ কোনোদিনও দেখেছে? নিজের দেশে, নিজের ঘাম-ঝরানো পয়সায় কেনা গুলি এসে বিঁধে নিজেরই বুকে। কারা চালালো গুলি? হিন্দু জমিদার—নাকি সেই দস্যু বর্বর পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার? কারা পুড়িয়ে দিলো কৃষকের সাজানো সবুজ ক্ষেতকে—কারা কামান ও গোলায় গুড়িয়ে দিলো কৃষকের কুটির—কারা কেড়ে নিলো নবান্নের উৎসব—কারা, কারা, তারা কারা?

ইতিহাসের কবর থেকে উঠিয়ে আনা হচ্ছে জমিদারকে। জমিদার তো অত্যাচার করেই ছিলো আর তার শাস্তিও পেয়েছে গণ-মানুষের হাতে। কিন্তু তোমাদের শাস্তির দিনও যে দ্রুত ঘনিয়ে আসছে—তা কি জানো?

তোমরা কি ভেবেছ জমিদার ও কৃষকের শ্রেণী-সংঘাতের ইতিহাসটি মুছে দিয়ে আজকের জাগ্রত শ্রেণী-সচেতন মানুষকে সাম্প্রদায়িকতার ভাওতায় ভুলাতে পারবে? ইতিহাসের ভুল ব্যাখ্যা করে দাঙ্গাবাজ রাজনীতি এ দেশের মাটিতে আজ অচল।

আজ প্রতিটি বাঙালী জানে, এ যুদ্ধ তার বাঁচার জন্য। এ যুদ্ধ তার চির-দাসত্বের নিগড় থেকে মুক্তির জন্য। বাঙালীর মুক্তি-যুদ্ধকে তাই ইতিহাসের-কবরে পচে যাওয়া সাম্প্রদায়িকতার বিষে ঘুলিয়ে দেওয়া যাবে না।

তথাকথিত পাকিস্তান আর নেই। পাকিস্তানের নিশান আমরা পুড়িয়ে ভস্মিভুত করেছি। আমরা উড়িয়েছি আমাদের বুকের রক্তে রাঙানো স্বাধীন বাংলা দেশের পতাকা। রক্তে আমাদের স্বাধীনতার আগুন গনগন করছে। চোখে আমাদের প্রতিশোধের দাবাগ্নি দাউ দাউ করে জ্বলছে। মুখে আমাদের স্বাধীনতার বাণী চৌচির হয়ে ফেটে পড়েছে শত-কোটি কণ্ঠে।

এই মহান বিপ্লবকে বিভ্রান্ত করার জন্য ওরা তাই উঠে পড়ে লেগেছে। কিন্তু ওদের রসদ কই? হাঁ, আছে বস্তাপচা রাজনীতি—হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা-বাধানোর অপচেষ্টা। বুকে বেপরোয়া গুলি চালিয়ে সমস্ত বাঙালী জাতিটাকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার হীন-ষড়যন্ত্রে মেতে, অখণ্ডতার প্রলেপ মাখানো আর ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীর ভুত দেখানোতে।

এক কথায়, দাঙ্গাবাজী লুঠ-তরাজ, নারী-হরণ প্রভৃতি অসামাজিক, পৈশাচিক-নারকীয় পশুত্বের রাজত্ব সৃষ্টি করতে চায় ওরা লক্ষ শহীদের রক্তভেজা বাংলার মাটিতে। যে জাতি সূর্যতেজে জেগে উঠেছে সে কি অন্য কোনো রাষ্ট্রের কাছে দাসত্বের জন্য হার মানে। অদ্ভুত ওদের রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশ। অদ্ভুত ওদের ইতিহাসের ব্যাখ্যা। অদ্ভুত ওদের বে-পরোয়া গণ-হত্যার নজির।

দাঙ্গাবাজী কলা-কৌশল আর চলবে না। লাঞ্ছিত, নিপীড়িত দরিদ্র বাঙালী গণ-মানুষ ওদের কলঙ্কিত রাজনীতির মুখোশ উন্মোচিত করেছে। ওদের নগ্ন-আসল রূপটি অতি দুর্ভাগ্যের রাত্রে আমরা দেখে ফেলেছি—পশুও বুঝি এত নগ্ন নয়—এত বিশ্রী, এত কুৎসিত, এত বিভৎস নয়।

ওরা মানুষ হত্যা করেছে—আসুন আমরা পশু হত্যা করি।

জয় বাংলা॥

বাংলা সংবাদ

২৬শে মে '৭১ প্রচারিত

(১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেছেন, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতির মধ্যেই রয়েছে বাংলাদেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার চাবিকাঠি।

(২) ওয়ার অন ওয়াণ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান ও বৃটিশ এম, পি, আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করেছেন।

(৩) বুদাপেষ্টের শান্তি সম্মেলন বাংলাদেশে পাকিস্তানী হামলার নিন্দা করেছে।

(৪) মুক্তিফৌজ* গানবোট দখল করেছে। কালভার্ট উড়িয়ে দিয়েছে, পাক ফাঁড়ি উড়িয়ে দিয়েছে।

*স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রাথমিক পর্যায়ে মাঝে মধ্যে স্বাধীনতা যোদ্ধাদের পরিচিতিতে 'মুক্তিফৌজ' নাম প্রচারিত হতো। কিন্তু গণপ্রজাতন্ত্র বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশক্রমে মাত্র কয়েকদিন পর থেকে তাঁদের সঠিক পরিচিতি 'মুক্তিবাহিনী' নাম প্রচারিত হয়েছে।

(৫) আজ বাংলাদেশের সর্বত্র বিদ্রোহী কবি নজরুলের জন্মজয়ন্তী পালিত হচ্ছে।

(৬) বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি বিচারপতি জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী নিউইয়র্ক পৌঁছেছেন।

(৭) পাকিস্তান বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের প্রধান উ থাণ্টের কাছে বাংলা-দেশের বৌদ্ধ হত্যার কাহিনী জানিয়েছেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেছেন যে, বাংলাদেশের স্বাধীন ও সার্বভৌম স্বত্বা স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যেই নিহিত রয়েছে বাংলাদেশে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরে আসার নিশ্চয়তা। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে, জাতিসংঘ বাংলাদেশ থেকে পাক সৈন্য সরিয়ে নিতে পাকিস্তান সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করবে।

ইউনাইটেড প্রেস ইণ্টারন্যাশনালের জনৈক বিশেষ প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে, আমাদের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান বাংলাদেশ সরকারের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন।

ভারতে আশ্রয়প্রার্থী বাংলাদেশ শরণার্থীদের সাহায্য দানের জন্য বিশ্ব সরকার সমূহের প্রতি জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল যে আবেদন জানিয়েছেন সে সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেন, বিরাট সংখ্যক নির্যাতিত ও নিগৃহীত মানুষ যে পাক দস্যুদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে গিয়েছে উ থাণ্টের আবেদনে তার স্বীকৃতি রয়েছে। সেক্রেটারী জেনা-রেলের বিবৃতি থেকে এও প্রতীয়মান হয়, কি নিদারুণ পরিস্থিতিতে মানুষ জন্ম-জন্মান্তরের বাড়ীঘর ছেড়ে বিদেশে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম আশা প্রকাশ করে বলেন যে, উথাণ্ট বাংলাদেশে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করার দায়িত্ব নেবেন যে পরিবেশে দেশত্যাগী শরণা-র্থীরা পূর্ণ মর্যাদায় ও নিরাপত্তায় আবার দেশে ফিরে আসতে পারবেন। উক্ত সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমার এই বক্তব্যের দ্বারা আমি এ কথাই বোঝাতে চাচ্ছি যে জাতি সংঘ পাকিস্তান সরকারের উপর এমন একটা চাপ সৃষ্টি করবে যে চাপের মুখে বাংলাদেশ থেকে পাক হানাদার বাহিনী প্রত্যাহার করা হবে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হবে। তিনি বলেন যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হওয়ার মধ্যেই বাংলাদেশে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরে আসার সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে।

তিনি বলেন, শুধু সে অবস্থাতেই দেশত্যাগী লক্ষ লক্ষ নারীপুরুষ শিশু স্বদেশে ফিরে আসতে পারবে।

বুদাপেষ্ট শান্তি সম্মেলনে যোগদানকারী ৫৫টি দেশের ১২৫ জন প্রতিনিধি একটি বিশেষ আবেদন প্রচার করেছেন। প্রতিনিধিদের মধ্যে মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, আইনজীবী, চিকিৎসক, সাংবাদিক, আফ্রো-এশীয় দেশসমূহের মুক্তি আন্দোলনের এবং গোষ্ঠী নিরপেক্ষ দেশসমূহের নেতৃবৃন্দ রয়েছেন।

আবেদনে বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্য দানের জন্য এবং তারা যাতে মাতৃভূমিতে ফিরে যেতে পারেন সেই অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য বিশ্বের সরকার সমূহের ও জনগণের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে। তারা বাংলাদেশে গণ-হত্যার জন্য পাকিস্তান সামরিক শাসক-চক্রের কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করেছেন। বাংলাদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক আশা আকাংখার প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য তারা পাক সামরিক শাসকচক্রের প্রতি আহ্বান জানান। তারা সিয়াটো-সেণ্টো জোটের মার্কিন এবং অন্যান্য সদস্যরা যাতে পাকিস্তানের সামরিক চক্রকে সাহায্য দেয়া বন্ধ করেন তার জন্যও দাবী জানিয়েছেন। বুদাপেষ্ট শান্তি সম্মেলনে জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব এম, এ, সামাদ বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি বর্তমানে লণ্ডনের পথে রয়েছেন বলে অনুমান করা হচ্ছে।

বিলেতের War on Want প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান মিঃ ডোনাল্ড চেজওয়ার্থ এবং শ্রমিক দলের পার্লামেণ্ট সদস্য মিঃ মাইকেল বার্নস, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধান মন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিন আহমদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলেত হন। এই বৈঠক প্রায় তিন ঘণ্টা কাল স্থায়ী হয়। এই বৈঠকে বাংলাদেশ সরকারের স্বীকৃতির প্রশ্নে বৃটিশ সরকারের মনোভাব সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা হয়েছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমাধান বলতে বৃটিশ পার্লামেণ্ট কি বুঝাতে চাইছেন সে সম্পর্কে আমাদের প্রধানমন্ত্রী বৃটিশ এম, পি-র কাছ থেকে বিশদ ব্যাখ্যা দাবী করেন বলে জানা গেছে। বৃটিশ নেতা আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছেন যে, বাংলাদেশের মানুষের আশা-আকাংখার বাস্তবায়নকেই তাঁরা সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান বলে মনে করেন। বাংলাদেশ থেকে বাঙালীদের তাড়িয়ে দিয়ে সেখানে একটা শাসন চাপিয়ে দেওয়ার নাম রাজনৈতিক সমাধান নয় বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

মুক্তি বাহিনীর দক্ষিণাঞ্চলীয় সদর দফতর থেকে পাওয়া এক খবরে জানা গেছে যে, মুক্তিফৌজ এক প্রচণ্ড সংঘর্ষের পর পাকিস্তানী সেনাদের একখানা

গানবোট দখল করে নিয়েছে। গানবোটযোগে খান সেনারা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিল। গানবোটের আরোহী সব ক'জন খান সেনাই পানিতে ডুবে মারা গেছে।

মুক্তি বাহিনীর জোয়ানেরা বরিশালে একটি থানা আক্রমণ করেন, এবং বাঙ্গালীর দুষমন খান সেনাদের কয়েকজন স্থানীয় দোসরকেও হত্যা করেন।

রংপুর সেক্টরে পাকিস্তানী সৈন্যদের একটি দল ধরলা নদী অতিক্রমের চেষ্টা করলে মুক্তি ফৌজ তাদেরকে বাধা দেয়। সংঘর্ষকালে বেশ কয়েকজন খান সেনা নদীতে ডুবে মারা যায়।

রাজশাহীর কাছে একটি কালভার্টে মুক্তি ফৌজের স্থাপিত মাইন বিস্ফোরিত হয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটা জীপ ধ্বংস হয়েছে। জীপের আরোহীরা গুরুতর আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

সিলেট সেক্টরে বাংলাদেশ মুক্তি বাহিনী পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের একটি কনভয়ের উপর চোরা গোপ্তা আক্রমণ চালায়। এতে শত্রু পক্ষের ৭ খানা যান-বাহন ধ্বংস হয়। বিয়ানী বাজার এবং বরলেখায় মুক্তি ফৌজ খান সেনাদের ১৭ জন স্থানীয় দালালকে হত্যা করেছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে।

সম্প্রতি কুমিল্লার কসবা অঞ্চলে বাংলাদেশ মুক্তি ফৌজ একটি পাক-হানাদার বাহিনীর উপর হামলা চালায় এবং তাদের হটিয়ে দেয়।

এই অঞ্চলে মন্দভাগ নামে এক জায়গায় পাক-হানাদারদের একটি ট্রলি বোঝাই অস্ত্র আর খাদ্য দ্রব্য যাচ্ছিল: মুক্তি ফৌজ সেটি আক্রমণ করে পুড়িয়ে দিয়েছেন। বল্লবপুরে পাক-ঘাঁটির উপর হঠাৎ আক্রমণ করে মুক্তি ফৌজ দু'জন প্রহরীকে হত্যা করেছেন। কাঁঠাল বাড়ীয়াতে মুক্তি ফৌজের হামলায় পাক-বাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন ও কয়েকজন পাক হানাদার খতম হয়েছে। ময়মন-সিংহ এলাকায় শ্রীবর্দীতে মুক্তি ফৌজ একটি পাকা সেতু উড়িয়ে দিয়েছেন।

সিলেট সেক্টরে দু'টি পাক-ঘাঁটি, মুক্তি ফৌজ জ্বালিয়ে দিয়েছেন। এই ঘাঁটি দুটির নাম জামকান্দি ও লালাপুঞ্জি। কুমিল্লায় বিবির বাজারে মুক্তি ফৌজ মাইন ফেলে পাক-হানাদারদের একটি ট্রাক বিধ্বস্ত করেন। হতাহতের সংখ্যা জানা যায়নি। হিলি আর পাঁচবিবির মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা আমাদের মুক্তি ফৌজ বিপর্যস্ত করে দিয়েছেন।

চট্টগ্রাম শহর ও বন্দর এলাকায় মুক্তি সংগ্রামরত বাঙ্গালী ছাত্ররা পাকিস্তানী বর্বর সৈন্যদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে দেয়ালে দেয়ালে পোষ্টার লাগিয়েছে। পোষ্টারে ভাষা হচ্ছে, ইয়াহিয়ার সেনাদের খতম কর—ওদের খতম কর। খতম কর

অবিলম্বে বাংলাদেশ ছেড়ে না গেলে হানাদার সৈনিকদের সবাইকে খতম করা হবে বলে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে।

আজ বাংলাদেশের সর্বত্র বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৭২তম জন্মজয়ন্তী পালিত হচ্ছে। এ উপলক্ষে বাংলাদেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান আয়োজন করেছে আলোচনা সভা আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। আজকের সান্ধ্য অধিবেশনে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকেও নজরুলের ওপর একটি বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করা হবে।

পাকিস্তান বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ এবং বিশ্ব বৌদ্ধ ফেলোশিপের পাকিস্তান আঞ্চলিক শাখার সভাপতি মিঃ জ্যোতিপাল মহাথেরো জাতি সংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থাণ্টের কাছে বাংলাদেশে পাক সৈন্য কর্তৃক বৌদ্ধ নিধন যজ্ঞের সংবাদ জানিয়ে একটা তারবার্তা পাঠিয়েছেন। তারবার্তায় তিনি জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেলকে জানিয়েছেন যে, বাংলাদেশে পাক সৈন্যরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জনগণকে নির্বিচারে হত্যা করছে। এই হত্যাকাণ্ড থেকে বৌদ্ধ ভিক্ষুকরাও বাদ যাচ্ছেন না। মহাথেরো জানিয়েছেন বৌদ্ধদের গ্রামগুলো একের পর এক জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে মন্দিরগুলো ধ্বংস করা হয়েছে। আর স্থানীয় দুষ্কৃতিকারীরা পাক ফৌজের সক্রিয় সহায়তায় বৌদ্ধদের সহায় সম্পত্তি লুটপাট করে নিয়েছে। মহাথেরো বাংলাদেশের বৌদ্ধদের রক্ষা করার জন্য উ থাণ্টকে অনুরোধ জানিয়েছেন।

বিশ্ব জনমত

৩০শে মে প্রচারিত

বিশ্বাসঘাতক ইয়াহিয়া সরকার ২৫শে মার্চের রাতের অন্ধকারে নিরস্ত্র জনতার উপর যে নৃশংস আক্রমণ চালিয়েছে—ইতিহাসে তার তুলনা নেই। আর সে রাতের পর থেকেই শুরু হয়েছে বিশ শতকের ইয়াজিদ ইয়াহিয়ার ঘাতক বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের উপর ঔপনিবেশিক শোষণ অব্যাহত রাখার যে চক্রান্ত সাবেক পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে শুরু হয়েছিলো একাত্তরের মার্চ মাসে ঘটলো তারই নগ্ন প্রকাশ। পশ্চিম পাকিস্তানী

শাসকেরা তাই আর কোন কিছু রেখে ঢেকে রাখতে চান না। এজন্য তারা কামান-বন্দুক-মেশিনগান-বোমারু-বিমান নিয়ে যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় বাঙ্গালীদের সামনে একটি মাত্র পথ—সে পথ স্বাধীনতা রক্ষার সশস্ত্র লড়াই। বাংলার বীর জনতা সে দায়িত্ব পালন করেছে। আজ তাই স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ একটি বাস্তব সত্য। এ সত্য বাংলার সাড়ে সাত কোটি জনতার প্রাণের মন্ত্র—বাংলাদেশের বাঁচার শপথ।

বিগত ২৩ বছর বাংলাদেশ শোষিত হয়েছে ধর্ম আর সংহতির নামে। পশ্চিম পাকিস্তানী শোষক গোষ্ঠি লুণ্ঠন করেছে বাংলার সম্পদ—ধ্বংস করেছে বাংলাদেশের আর্থিক মেরুদণ্ড। পাট প্রধান অর্থকরী ফসল। আর এ পাট রপ্তানী করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করেছে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকেরা। কিন্তু পাট চাষীরা তাতে কোনো উপকৃত হয়নি—বাংলার গরীব চাষী-শ্রমিকেরা আরো গরীব হয়েছে—তাদের উপর নেমে এসেছে নির্যাতনের চরম দণ্ড।

বাংলাদেশ এবং বাংলার জনগণকে বাঁচাবার জন্যই আজ তাই শুরু হয়েছে মরণপণ স্বাধীনতা সংগ্রাম। এ সংগ্রামে শরীক বাংলার বুদ্ধিজীবী বাংলার কৃষক-শ্রমিক ছাত্র-জনতা সবাই বাংলার এ সংগ্রামকে আজ নৈতিক সমর্থন জানাচ্ছে সারা দুনিয়ার মানুষের বিবেক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের অধিকাংশ সদস্য দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন বাংলার জনগণের প্রতি তাঁদের সমর্থন। সিনেটর কেনেডি এডওয়ার্ড, সিনেটর ফুলব্রাইট এবং আরো কয়েকজন প্রভাবশালী সিনেটর দৃঢ়কণ্ঠে জানিয়ে দিয়েছেন পাকিস্তানের জঙ্গী সরকার বাংলাদেশে যে গণহত্যা চালাচ্ছে তাকে সমর্থন করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সিনেটের বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কিত কমিটি পাকিস্তানকে আর্থিক সাহায্য দেবার প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করে দিয়েছেন। ইসলামাবাদের খুনী সরকারের বিশেষ দূত এম. এম. আহমদ হয়েছেন প্রত্যাখ্যাত। সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি তাঁর সাথে দেখা করার সকল আবেদন-নিবেদন নাকচ করে দিয়েছেন।

বাংলাদেশে যুদ্ধ চালাতে গিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানী ঘাতকেরা অধুনালুপ্ত পাকিস্তানের অর্থনৈতিক দেউলিয়াত্ব ত্বরান্বিত করেছে। যুদ্ধের খরচ দৈনিক দেড়-কোটি টাকা। অতএব চাই-চাই—সাহায্য চাই। সাহায্যের জন্য ভিক্ষাপাত্র নিয়ে দেশ পরিক্রমায় বেরিয়েছিলেন ইয়াহিয়ার দোসর এম. এম. আহমদ। কিন্তু সবখানেই ব্যর্থ হয়েছেন তিনি; শূন্য হাতেই ফিরেছেন।

অন্যদিকে যতই দিন যাচ্ছে আমাদের মুক্তি বাহিনীর আঘাত দুর্বার হয়ে উঠছে। হানাদার শত্রুরা গেরিলা আক্রমণে হয়ে উঠছে দিশাহারা। সারা বিশ্বের

শান্তিকামী মানুষ এগিয়ে আসছে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সাহায্যে। কয়েকদিন আগে বুদাপেষ্টে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের অধিবেশন। পৃথিবীর বহু দেশের প্রতিনিধিরা সেখানে সর্বসম্মতভাবে প্রস্তাব নিয়েছেন—বিশ্বশান্তি কংগ্রেস সর্বাত্মক সাহায্য করবে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে।

সুইডেনের সকল রাজনৈতিক দল যুক্তভাবে ঘোষণা করেছেন—বাংলাদেশে ইসলামাবাদের লেলিয়ে দেওয়া জল্লাদদের নির্বিচার হত্যালীলা বন্ধ করতেই হবে। বাংলার নির্যাতিত জনগণকে তাদের সকল গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনে তাঁরা জানিয়েছেন অকুণ্ঠ সমর্থন। সুইডেনের ইতিহাসে এই প্রথমবার দল-মত নির্বিশেষে সবাই এমন একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বাংলাদেশের জনগণ বিশ্বের শুভ বিবেকের এই কণ্ঠস্বরকে জানাচ্ছে অকুণ্ঠ অভিনন্দন। লক্ষ লক্ষ স্বাধীনতাকামী জনতা উদ্দীপিত হয়ে উঠছে—স্বাধীনতার চূড়ান্ত লক্ষ্যে। আমাদের লড়াই আজ তাই সুনিশ্চিত বিজয়ের পথে।

ইন্দোনেশিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও ইন্দোনেশিয়ার পার্লামেন্টের স্পীকার মিঃ আইচে বিশ্ব মুসলিম সমাজের কাছে বাংলাদেশের স্বপক্ষে আবেদন জানিয়েছেন। বাংলাদেশে ইয়াহিয়ার হানাদার সেনারা বর্বরতা ও নৃশংসতার যে বিভৎস ইতিহাস রচনা করছে—তা তিনি তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙ্গালীর উপর অকারণে ইয়াহিয়ার সেনারা যে নির্যাতন চালাচ্ছে, তার প্রতিবাদে বজ্র আওয়াজ তোলার জন্যে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন বিশ্বের সকল মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতি তিনি। বলেছেন বিশ্বের অন্যতম প্রধান মুসলিম রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ সে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসীদের বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধ শুরু করেছে—শাসকগোষ্ঠির এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের সমর্থন কোন বিবেকসম্পন্ন মানুষই করতে পারে না।

দেশে দেশে পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক গোষ্ঠির বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত হচ্ছে। বিবেকের কণ্ঠস্বর আজ বহু দেশে উচ্চকিত। বৃটেনের শ্রমিক দলের পার্লামেণ্ট সদস্য মাইকেল বার্নসও বিশ্ব বিবেকের সাথে ঘোষণা করেছেন একাত্মতা। বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের কাছে আবেদন জানিয়ে তিনি বলেছেন, 'বাংলাদেশের নিরস্ত্র অসহায় জনগণের উপর পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বর্বরতা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানকে যে কোন রকম সাহায্য দান বন্ধ রাখুন।'

বাংলাদেশের যে সমস্ত লোক পশ্চিম পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে তিনি স্বচক্ষে তাদের অবস্থা প্রত্যক্ষ

করেছেন। মিঃ মাইকেল বার্নস বলেছেন 'বৃটেনের জনগণ বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্পূর্ণ সমর্থন করে'।

বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি জনতার 'স্বাধীনতার সংগ্রাম' আজ তাই দুর্বার হয়ে উঠছে দিনের পর দিন। ন্যায় ও সত্যের এই সংগ্রাম সফল হবেই—চূড়ান্ত বিজয় আমাদের আসন্ন।

ইয়াহিয়া ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে বাঙ্গালীর অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে নস্যাৎ করার যে ষড়যন্ত্র করেছিলো—বাংলাদেশের জনগণ তা ব্যর্থ করে দিয়েছে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ আজ ইতিহাসের শাশ্বত রায়।

বাংলাদেশের শহর, নগর, গঞ্জে ও গ্রামে পাক হানাদার বাহিনী রক্তের যে প্লাবন বইয়ে দিয়েছে, বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ শান্তির নীড়ে যে আগুন তারা জ্বালিয়ে দিয়েছে, আজ তারই মাঝ থেকে উৎসারিত হয়েছে সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর স্বাধীনতা সূর্য। পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার পঙ্গপালরা সে সূর্যকে আড়াল করতে চাইছে। কিন্তু বাংলাদেশ জুড়ে মুক্তিযুদ্ধের যে অগ্নি ঝড় শুরু হয়েছে হানাদার পঙ্গপালেরা তাতে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। মুক্তি সেনাদের অব্যর্থ লক্ষ্য থেকে হানাদাররা কেউ রেহাই পাবে না।

আমাদের এ সংগ্রাম একটি বিজাতীয় বর্বর হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সুসভ্য সংস্কৃতিবান সমগ্র একটি জাতির সংগ্রাম। বিশ্ববিবেক ও বিশ্ব মানবতা আমাদের পক্ষে। এ যুদ্ধে জয় আমাদের সুনিশ্চিত। ভাড়াটিয়া সৈন্য আর ভিক্ষে করা সমরাস্ত্র নিয়ে কোন বর্বর বাহিনীই একটি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করতে পারে না, কোনদিন পারেনি। বাংলাদেশের মাটি থেকে হানাদারদের নিশ্চিহ্ন করার দুর্বার লড়াই চলছে। হানাদাররা নিশ্চিহ্ন হবেই।

জয় বাংলা ॥

NEWS IN ENGLISH

BROADCAST ON 2ND JUNE '71

This is Swadhin Bangla Betar Kendra.
Here is the news read by Perveen Hossain.

1. The foreign banks in Pakistan have declined to underwrite letters of credits from Pakistan.

2. The 3 member Bangladesh Parliamentary delegation has met the Indian President and the Prime Minister in New Delhi.

3. Khan Abdul Ghaffar Khan has blamed the power hungry rich classes of West Pakistan for the crisis in Bangladesh.

4. Four young freedom fighters killed three Pakistani agents at Jhikargacha on Monday last.

5. Moulana Bhashani said : Freedom is the only goal of the people of Bangladesh.

The foreign monetary institutions have raised an alarm with regard to Pakistan's credibility abroad and have declined to underwrite letters of credit from Pakistan. The foreign banks have also demanded 100% deposits for such purposes.

The Pakistani businessmen have been told by the bank officials that they have taken this step due to the grave economic crisis of Pakistan.

A leading export-import businessman told Pakistani newsmen yesterday, that an American bank had first demanded 100% deposit as a condition for opening letters of credits for imports from the U. S. A.

The Swiss and Japanese banks have also refused to issue letters of credit to Pakistani businessmen.

Another businessman is reported to have complained that the Japanese banks have gone to the extent of demanding a guarantee by banking establishments in England because the Ministry of Trade in Japan has stopped exporting insurance orders for Pakistan.

The refusal of foreign banks to issue letters of credit has created a scare among the West Pakistani business community.

The three member Bangladesh Parliamentary delegation, headed by Mr. Phani Majumdar has met the Indian President and the Prime Minister in New Delhi. The legislators from Bangladesh, including Mrs. Noorjahan Morshed and Shah Moazzem Hossain, also addressed the members of the Indian Parliament yesterday at the Parliament House. A spokesman of the Foreign Office of the Government of Bangladesh, told us : In the course of their 45 minutes talk with Mrs. Indira Ghandi, the Indian Prime Minister, the members of the Bangladesh delegation discussed the problems relating to the refugee problem created in India by the West Pakistani atrocities in Bangladesh.

They also discussed question of recognition of the Bangladesh Government.

The Indian President, Mr. V. V. Giri, gave them a hearing for about 20 minutes and discussed various matters relating to Bangladesh.

The three legislators from Bangladesh, while addressing the Indian Parliament, made an impassioned appeal for the recognition of Bangladesh by the Government of India. They put before the Indian Parliamentarians the background of the Bangladesh issue, its exploitation by the West Pakistani rulers, the discrimination meted out to the majority people and finally the reign of terror let loose by the West Pakistani army on the innocent people of Bangladesh.

Addressing the Indian M. P.'s, Mr. Phani Majumdar said : Bangladesh stands for democracy, secularism and socialism. He called upon the Indian Government to recognise the Government of the People's Republic of Bangladesh. Mr. Majumdar also urged the Indian M. P.'s to take up the question of the release of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, at evesy national and international forum.

Mrs. Noorjahan Morshed, while reffering to the talk of political settlement, said : If there is to be a political settlement, it will have to be on our terms. And that is complete withdrawal of the West Pakistani Army and the Liberation of Bangladesh.

Mr. Shah Moazzem Hossain, in his speech before the Indian M. P.'s described the discrimination the people of Bangladesh, who

constituted the majority, had suffered since the creation of Pakistan. He said : It is the rulers of Pakistan who have disintegreted Pakistan. They have killed Pakistan; we are only burying it. Mr. Moazzem Hossain said : Pakistan, with its two wings separated, and having nothing in common between the people of the two wings except religion, could not sustain without the will of the people. Such a will could develop only when all were treated as equals and not as slaves.

Mr. Moazzem Hossain gave a description of the killing unleashed by Yahya Khan's Army. He said : about five lakhs of people have been killed in Bangladesh. In his speech, Mr. Moazzem Hossain also appealed to the Indian Government to offer diplomatic recognition to the Government of Bangladesh.

This is Swadhin Bangla Betar Kendra giving you the news.

The Pakhtoon leader, Khan Abdul Ghaffar Khan, has blamed the aggressive, power-hungry, rich class of West Pakistan for the present crisis in Bangladesh.

Reporting this, the Kabul daily 'Caravan' says : Khan Abdul Ghaffar Khan, is prepared to leave for Bangladesh to mediate between the Awami League and the West Pakistani leaders.

The Pakhtoon leader has also said : He has been asked by the Pakistan Council in Jalalabad to visit Pakistan and have a meeting with President Yahya Khan. Khan Abdul Ghaffar Khan is reported to have rejected this Pakistani offer and has declined to meet a military dictator of Pakistan.

Mr. M. Mansoor Ali, Minister for Finance, Govt. of the People's Republic of Bangladesh, has today proceeded for a trip to the eastern part of Bangladesh. During his stay there, he is expected to meet the Awami League M. P. A.'s and M. N. A.'s, leaders and workers.

The freedom fighters of Bangladesh are reported to have intensified guerilla activities in Rangpur, Comilla and Dacca sectors. A number of bridges on the railway line between Lalmanirhat and Kaunia, have been blown up, dislocating railway communications for the Pakistani troops. In the Lalmonirhat-Kurigram area, freedom fighters have continued to harrass the Pakistani troops by frequent commando raids. It is reported, in a recent encounter, the

Liberation Forces killed 6 Pakistani soldiers and destroyed an enemy jeep at Lalmonirhat.

In the Dacca sector, the freedom fighters are reported to have exchanged fire recently with a Pakistani Army patrol, north east of Mymensingh. The Liberation Forces have also successfully prevented the Pakistani troops from crossing the River Dharla. The enemy troops retaliated by burning down villages and attacking the civilian population.

In the Comilla sector, the Liberation Forces damaged two Railway bridges near Akhaura to disrupt the movement of the Pakistani Army. In Comilla the Pakistani troops are reported to have molested and abducted women after killing a number of people. The Pakistani soldiers also shot dead about 300 people, south of Chandpur. In Jessore, the local population killed two Pakistani soldiers recently.

Road and rail communication between Dacca and Chittagong have not yet been restored. Our Mymensingh correspondent reports : The freedom fighters have dislodged Pakistani troops from Mymensingh's Tawakucha border outpost.

Four young freedom fighters killed three Pakistani agents at Ganganandapur in Jhikargacha Thana on Monday last. It is reported these Pakistani agents, with the help of the local goondas, were loading a jeep with articles looted from the civilians, when the four freedom fighters launched a surprise attack and killed three of them. The freedom fighters seized a few rifles and a light machine gun. The enemy jeep was captured and the dead body of a killed agent was also brought by the freedom fighters.

This news broadcast comes to you from Swadhin Bangla Betar Kendra.

The National Awami Party leader, Moulana Abdul Hamid Khan Bhashani, has ruled out the possibility of coming to a political settlement of the Bangladesh issue. In clear cut terms the Moulana declared : Our fight against Pakistan will continue to the last. Either we win or we die.

He said : Even if attempts are made for a political settlement either by someone in Bangladesh or abroad, the 75 million people of

Bangladesh will reject it outright. The reason is that the people have lost their faith in the Pakistani Government, more so after its recent atrocities perpetrated on the people of Bangladesh, which is something unheard of in human history.

The Moulana said : He would not mind a referendum being held under the U. N. auspices to ascertain the wishes of the people of Bangladesh. He said : He is sure that not even 1% of the people will vote against independence.

The Moulana has also called upon such countries like the U. S. A., U. S. S. R., Britain, and China, which are friendly to Pakistan, to send out their journalists to make an independent study of the Pakistan Army's atrocities in Bangladesh. Declaring his support to the Awami League leadership, Moulana Bhashani said : Nothing should be done to provide an opportunity to the Pakistan Government to divide and rule the people of Bangladesh.

This is Swadhin Bangla Betar Kendra giving you the news. The Bangladesh emissary, Mr. Abdus Samad, now on a visit to Moscow, has said that Yahya's appeal to the evacuees to return to Bangladesh from India has been made only to mislead the people of the world. He said : While the West Pakistani troops continue genocide and barbaric atrocities in Bangladesh, this appeal from Yahya Khan is nothing but a cruel gesture.

Mr. Samad has been touring different countries of Europe for the last three weeks to give a clear picture of the Bangladesh situation to European leaders.

And that is the end of the news

অভিযোগ

সিকান্দার আবু জাফর

বাঙালীর মনোবল ভাঙতে ত্রাস সৃষ্টির জন্যে ধ্বংস-যজ্ঞের প্রথম ক'দিন হাজার হাজার বাঙালীর লাশ ওরা পথে-ঘাটে ছড়িয়ে রাখলো। সংসার নিস্পৃহ ডক্টর গোবিন্দ দেব, আমার বন্ধু অধ্যাপক জ্যোতির্ময়, ডক্টর মনিরুজ্জামান, সপ্ততি বর্ষী আইনজীবী ধীরেন্দ্র দত্ত, নব্বই বৎসরের ভিষাগাচার্য যোগেশ ঘোষ, মিউনিসিপ্যালিটির মেথর, ষ্টেশনের কুলী, নৌকার মাঝি, ক্ষেতের চাষী, নদীর জেলে, গাঁয়ের তাঁতি, ঘাটের ধোপা, পথের নাপিত, হাটের পশারী, গঞ্জের মহাজন, মসজিদের ইমাম, গীর্জার পাদ্রী, মন্দিরের পুরোহিত—সাধারণ থেকে অসাধারণ সকল শ্রেণী-ধর্মের নিরীহ বাঙালীর শবদেহ অসনাক্ত ভাবে কুকুর শকুনের ভক্ষণ হল সকলের চোখের সামনে। মনুষ্যত্বের এতবড় অবমাননা ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তান ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোথাও সম্ভব হত বলে আমি বিশ্বাস করি না। আর সেই জন্যেই বোধ করি এই অমানুষিক বর্বরতা পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। তবু বলব, দুষ্কৃতি দমনের নামে যারা বাঙালীর কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি লুন্ঠন করল, জাহাজ ভর্তি নতুন নতুন গাড়ী, টেলিভিশন, রেডিও, রিফ্রিজারেটার, এয়ারকুলার ব্যক্তিগত মালিকানায় পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করল, কোটি কোটি টাকার অর্থ, অলংকার, প্রকাশ্য মনি অর্ডার, পার্শেল অথবা পি-আই-এ কার্গো মারফত নিজের নিজের এলাকায় পাঠিয়ে দিলো, হাজার হাজার অবাঙালীর হাতে মারণাস্ত্র তুলে দিয়ে বাঙালী নিধনে লেলিয়ে দিলো ; হাট-বাজার, গ্রাম-জনপদ পুড়িয়ে শ্মশান করে ফেললো, দশ লক্ষাধিক বাঙালীর মৃত দেহ খাইয়ে জলের হাঙ্গর-কুমীর এবং ডাঙার কুকুর শেয়াল-শকুনের সখ্যতা অর্জন করলো, দীর্ঘ দিন ধরে যারা সেই ঘাতক দস্যুদের এই সব ক্রিয়াকীর্তি সার্কাসের দর্শকের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন তাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, বাঙালীর শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসের পরিমণ্ডল থেকে চির নির্বাসনের সড়ক তারা নিজেরাই প্রশস্ত করে নিলেন।

পাকিস্তানী হানাদারদের তথাকথিত রাষ্ট্রীয় সংহতির পরিকল্পনা আমরা দেখতে পাচ্ছি। তারা শহীদ মিনারগুলো ধ্বংস করে নিজেদের পদলেহী কিছু সংবাদ

গরুচোর দিয়ে সেখানে নামাজ পড়াচ্ছে। অর্থাৎ ওই সব জায়গায় এক একটা মসজিদের দাবী খাড়া করানো হচ্ছে। মজার ব্যাপার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটগাছটিকেও তারা নির্মূল করে উপড়ে ফেলেছে। যেন ওই বটগাছের ডাল-গুলিতেই বাঙালী জাতীয়তাবাদীরা ট্রাপীজ খেলতো। বাংলাদেশে হিন্দুর অস্তিত্ব পাকিস্তানী সংহতির পরিপন্থী। কাজেই তাবৎ হিন্দুকে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। যারা পালিয়ে বেঁচেছে তারা এখানে ওখানে লুকিয়ে থাকছে, কিন্তু একজনেরও সম্পত্তি নিজেদের দখলে নেই, অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবাঙালী এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মুসলিম লীগের পোশাকের বাঙালী গুণ্ডারা সেগুলো দখল করে বসে আছে। তাই যখন ইয়াহিয়া খান বাঙালী হিন্দুদের নিজেদের বাড়ীতে ফিরে আসার জন্যে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে তখন অতি দুঃখেও হাসি পাচ্ছে এই ভেবে যে, হিন্দুরা ত আসবে কিন্তু উঠবে কোথায়? নিজের নিজের বাড়ী বলতে যা বোঝাতো সে তো জ্বলে পুড়ে খাক। যেটুকু অবশিষ্ট ছিলো তাও কি আর খালি আছে? সেখানে তাদের চাচারা নিশ্চিন্তে এখন চাচীদের সঙ্গে আল্লা বান্দা আমদানীর পরামর্শ করছে। হিন্দুর মন্দির ভেঙ্গে মাটি বরাবর করা হচ্ছে তা-ও দেখেছি চোখের সামনে। বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন এলাকার লক্ষ লক্ষ বাঙালী মুসলমানের সম্পত্তিও এখন অবাঙালীদের দখলে। ঢাকার মীরপুর-মোহাম্মদপুর থেকে বাঙালী খেদানো এবং নির্বিচার বাঙালী নিধন শুরু হয়েছে ২৫শে মার্চ থেকে। ওই দুটি অঞ্চলের তাবৎ বাঙালীর সম্পত্তি লুণ্ঠিত এবং অবাঙালীদের অধিকৃত। ভারতে শরণার্থী বাঙালী মুসলমানেরা ফিরে এলে যথাসময়ে ওইসব অবাঙালীদের অস্ত্রের শিকার হবে। আঠারো থেকে তিরিশ বছর বয়সের হাজার হাজার বাঙালী ছাত্র যুবককে পাকিস্তানী ঘাতকরা ধরে নিয়ে গিয়েছে এবং তাদের অধিকাংশকেই মেরে ফেলেছে। এখনও ধরে নিয়ে যাচ্ছে, হয়তো মেরেও ফেলেছে। উদ্দেশ্য, সক্ষম বাঙালী যুবকদের খতম করে বাঙালীর বাহুবল ভেঙ্গে দেওয়া। রবীন্দ্রনাথের দেখা ভারতীয় সংহতির চেহারা: "শক হুনদল পাঠান মোগল এক দেহে হলো লীন", আমরা দেখলাম, পাকিস্তানী সংহতি কসরতে হানাদার সেনাবাহিনীর পাঞ্জাবী, পাঠান, বিহারী, বালুচ অফিসার জওয়ান পাই-কারী হারে অপহৃতা বাঙালী নারীদেহে লীন হচ্ছে। দূরপ্রসারী অভিসন্ধি হয়তো একটি মিশ্র জেনারেশন সৃষ্টি করা। সেটা রোধ করতে গেলে, আমার আশঙ্কা, যে পরিমাণ গর্ভপাতের প্রয়োজন হবে তাতে প্রদেশের বিভিন্ন এলাকায় মেটার-নিটি ক্লিনিকের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং বিদেশ থেকে শত শত বিশেষজ্ঞ ধাত্রী আমদানী অপরিহার্য। আজ এ-দেশে পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশ আমদানী হচ্ছে। বাঙালী অফিসার বাদ দিয়ে তাদের জায়গায় পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসার নিয়োগ করা

হচ্ছে। বাঙালী অফিসারদের যারা অবাঞ্ছিত তাদের মেরে ফেলা এবং আধা-বাঞ্ছিতদের বিষদাঁত ভাঙ্গার জন্যে জেলে পোরার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সেই একই ব্যবস্থা হবে শিক্ষক, সংস্কৃতিবিদ এবং সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রেও। ফলে গড়ে উঠবে অবাঙালী তাবেদার গোষ্ঠি এবং সুবিধাভোগী বাঙালী মীরজাফর শ্রেণী। বাঙলা ভাষার মর্যাদা এবং গুরুত্ব হ্রাস করা হচ্ছে। শিক্ষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে তাবেদার গোষ্ঠির প্রতিপত্তি বাড়িয়ে, এই সংহতি অভিযানের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে কোন ফল লাভের সুযোগ আমাদের নেই। কারণ এসবই পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। কিন্তু জাতীয়তাবাদে উদ্দীপ্ত বাঙালী আজ হাতে অস্ত্র তুলে নিতে বাধ্য হয়েছে মুক্তি-সংগ্রামের দুর্জয় অঙ্গীকারে। বাঙালীর মুক্তি যুদ্ধে নেতৃত্ব দিচ্ছে বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিক বাঙলার বাছাই করা বীর সন্তানেরা। তাদের সঙ্গে নিজেদের বন্ধু আত্মজনের রক্তস্নাত তৎকালীন ই-পি-আর, পুলিশ আনসার বাহিনী আর মুক্তি-মাতাল বাঙালী তরুণ কিশোর ছাত্র এবং ছাত্রীরাও। রবীন্দ্রনাথ প্রার্থনা করেছিলেন, "বাংলার মাটি বাংলার জল বাঙলার বায়ু বাঙলার ফল পুণ্য হউক"—আর এতদিনে শ্রেণী বর্ণ-গোত্র-ধর্ম-নির্বিশেষে নিরীহ বাঙালী নরনারীর রক্ত-ধৌত বাঙলার মাটি পুণ্যস্নাত হয়েছে, মহাপুণ্য স্নাত হয়েছে। পাকিস্তানী হানাদার ঘাতকেরা ইতিহাসের একটি সহজ সত্য স্বীকার করতে পারেনি যে, সামরিক মৃত্যু দিয়ে একটি জাতিকে তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থেকে চিরকালের জন্যে বঞ্চিত রাখা যায় না।

জাতীয়তাবাদ কোন একটা নির্ভরযোগ্য নীতি নয়। আমার মানসিক প্রস্তুতি আন্তর্জাতিকতাবাদ গ্রহণ করারই স্বপক্ষে। কিন্তু পাকিস্তানের কালে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিভিন্ন প্রসঙ্গে আমার বিভিন্ন কবিতায় বাঙালী জাতীয়তাবাদকেই আমি বলিষ্ঠ আকৃতি দেবার চেষ্টা করেছি। এর কারণ প্রথম থেকেই বাঙালীর সমস্যা হয়েছে নবজাত পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ গ্রহণ করার জন্যে, অস্থি মজ্জায় একান্ত আত্মীয়তার পরিচয়ে স্বাক্ষরিত, বাঙালী জাতীয়তাবাদ বর্জনের তাগিদ। এই তাগিদ এসেছে প্রধানতঃ দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রবক্তা এবং তাদের অনুগামী গোষ্ঠির কাছ থেকে, পাকিস্তান যাদের মুষ্টিমেয় কয়েকজনের স্বার্থে এক উজ্জ্বল সুখ-সম্ভাবনায় পরিণত হয়েছে। এদের প্রায় অধিকাংশই পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পপতি এবং পাকিস্তানী জঙ্গী তন্ত্রের পরিচালক। দেশ-বিভাগের প্রথম দিন থেকেই এরা বাংলাদেশকে চিরস্থায়ী উপনিবেশে পরিণত করার চক্রান্তে বাঙালী জাতীয়তাবাদ সমূলে উৎখাত করার চেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে এবং সেই একই দিন থেকে দ্বিজাতি-তত্ত্বের ব্যর্থতা উপলব্ধি করে বাঙালী যতই লুণ্ঠিত, নিগৃহীত এবং অপমানিত হয়েছে ততই হাজার বছরের ঐতিহ্য সমৃদ্ধ জাতীয়তাবোধ তার কাছে উজ্জ্বল

হতে উজ্জ্বলতর দীপ্তি লাভ করেছে। বস্তুতঃ পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকচক্রের একমাত্র উল্লেখযোগ্য ঐতিহ্য—নরহত্যা, লুণ্ঠন এবং নারী ধর্ষণের অভিজ্ঞতা আর স্বাধীনতা লাভের আগে দীর্ঘ দুই শতাব্দী শৃংখলিত শিকারী কুকুরের মত ঔপনিবেশিক প্রভুর পদলেহনের কৃতিত্ব। বাঙালীর আত্মমর্যাদা এই চক্রের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে কোনদিনই তাকে আত্মহননে উদ্দীপ্ত করতে পারেনি। কাজেই পশ্চিম পাকিস্তানী ঘাতকেরা আজ বাঙলা দেশে যে নির্বিচার গণহত্যা এবং ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে তার পরিকল্পনা সূচিত হয়েছে স্বাধীনতা লাভের প্রথম দিনটি থেকে।

আর সার্বিক অবলুপ্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাঙালীর পক্ষে আত্মসংরক্ষণের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই। শিক্ষক হিসেবে যাঁদের প্রতিষ্ঠা এবং প্রশ্নাতীত মর্যাদা তাঁরা আজ শুধুমাত্র পেশাদার চাকুরে। ডাক্তার কিংবা ইঞ্জিনীয়ার, বিচারপতি কিংবা আইনজ্ঞ হিসেবে নিজের নিজের কৃতিত্বে যাঁরা গোটা দেশের জন্যে অপরিহার্য, তাঁরা আজ অনিশ্চয়তা এবং বিভ্রান্তির গোলক ধাঁধাঁয় আত্মবিস্মৃত চাষী, মজুর বাস্তহারা, দিশাহারা। সরকারী কর্মচারী আজ নিরক্ষর সিপাই, প্রভুর ভ্রুকুটি লাঞ্ছিত মর্যাদাহীন হুকুমের নফর। ব্যবসায়ী-শিল্পপতি আজ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দুর্ভাবনায় নিষ্পিষ্ট নিরুপায় সরীসৃপ। ছাত্র-ছাত্রীরা আজ উদ্দেশ্যহীন আকাংখাহীন। এমন সামগ্রিক মৃত্যুর আবর্তে কোন জাতি নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে না। তাই বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন আজ অগণিত আত্মীয় পরিজনের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন লাশের সামনে দাঁড়িয়ে এক বেদনায় একাত্ম হয়েছে, এক প্রতিজ্ঞায় বাহুবদ্ধ হয়েছে: মৃত্যুর বিনিময়-মূল্যেই তারা মৃত্যুকে রোধ করবে। বাঙলার মাটির পুণ্য-পীযুষ ধারায় সঞ্জীবিত প্রাণ একটি বাঙালী বেঁচে থাকতে বাঙলা দেশের এই মুক্তি-সংগ্রাম শেষ হবে না।*

*বাংলাদেশের বিপ্লবী কবি সিকান্দার আবু জাফর '৭১ এর ২৬শে জুলাই একটি অভিযোগ-ইশতাহার প্রকাশ করেন। ইশতাহারটি পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র (মুজিব নগর) থেকে ধারাবাহিকভাবে তিন পর্যায়ে প্রচারিত হয়। এটি সেই ইশতাহারেরই একটি অংশ।

—গ্রন্থকার।

পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ

জহির রায়হান

পাকিস্তানের গত তেইশ বছরের ইতিহাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো পাকিস্তান কখনো জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসিত হয়নি।

প্রথম প্রধানমন্ত্রী নবাবজাদা লিয়াকত আলী খান জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন না। তিনি চক্রান্তের রাজনীতিতে আস্থাবান ছিলেন এবং তাঁর আমল থেকেই পাকিস্তানের রাজনীতিতে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের তল্পি-বাহকদের প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও চক্রান্তের জাল বিস্তার পেতে থাকে। চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, গোলাম মোহাম্মদ, ইসকান্দার মির্জা, এরা সবাই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুগত ভৃত্য ছিলেন এবং চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতির গুপ্ত পথ বেয়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছিলেন।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সরাসরি নিয়োগ পত্র নিয়ে ক্ষমতায় আসেন বগুড়ার মোহাম্মদ আলী। ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পরিকল্পিত পন্থায় বিভিন্ন সামরিক চুক্তি সম্পাদন করে পাকিস্তানকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের লেজুড়ে পরিণত করেন তিনি।

পাঞ্জাবের মালিক ফিরোজ খান নুন আর করাচীর আই, আই, চুন্দ্রিগড়ও সেই একই চক্রান্তের সিঁড়ি বেয়ে ক্ষমতায় আরোহণ করেন। আইয়ুব খান ছিলেন বৃটিশ সামরিক বাহিনীর একজন পেশাদার সৈন্য। তিনি ক্ষমতায় এসেছিলেন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে একটি সামরিক 'জুন্টা'র সহায়তায়। আইয়ুব খানের অনুচর কালাতের খান, মোনায়েম খান, সবুর খান এঁরাও কেউ প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গদীনশীন হননি।

পাকিস্তানের সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানও ক্ষমতায় এসেছেন সামরিক বাহিনীর দৌলতে, ষড়যন্ত্রের রাজনীতির অন্ধকার পথ বেয়ে; আর তাই লিয়াকত আলী খান থেকে ইয়াহিয়া খান, পাকিস্তানের গত তেইশ বছরের ইতিহাস হচ্ছে গুটিকয়েক ক্ষমতালিপ্সু; স্বৈরী স্বার্থবাদী, আমলা মুৎসুদ্দি, সামন্ত-প্রভু, ধনপতি, সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী, সামরিক ও রাজনৈতিক স্বার্থশিকারীদের প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ইতিহাস।

যেহেতু, চক্রান্ত, দলাদলি ও ষড়যন্ত্রের পঙ্কিলতার মধ্যে এই শাসকগোষ্ঠির জন্ম, লালন-পালন ও মৃত্যু, সেইহেতু ওই তিনটি প্রক্রিয়ার প্রতিই তারা আস্থাবান ছিলেন। জনগণের কথা তারা ভাবতেন না, কিম্বা ভাববার অবসর পেতেন না। জনগণের কোনো তোয়াক্কা তারা করতেন না। জনগণের আশা-আকাংখা, তাদের চাওয়া-পাওয়া আর দাবীদাওয়ার প্রতি সব সময় এক নিদারুণ নিস্পৃহতার পরিচয় দিয়ে এসেছেন এই শাসকচক্র।

তাই এই গণবিমুখ শাসকচক্রের হাতে পড়ে পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ এক দুঃসহ সময় অতিবাহিত করেছে গত তেইশ বছর ধরে। ধনীরা আরো ধনী হয়েছে। গরীবের দল আরো গরীব হয়ে গেছে। যেহেতু এই শাসকচক্র, পাঞ্জাবী ভূস্বামী, পাঞ্জাবী ধনপতি, পাঞ্জাবী আমলা-মুৎসুদ্দি ও পাঞ্জাবী সামরিক 'জুন্টা'র দ্বারাই বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হতো, সেইহেতু পাকিস্তানের বাকী চারটি প্রদেশ, পূর্ববাঙলা, বেলুচিস্তান, সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশের সাধারণ মানুষ এই শাসকচক্রের হাতে আরো বেশি লাঞ্ছিত, নিগৃহীত ও শোষিত হয়েছে। সবচেয়ে বেশী শোষিত হয়েছে পূর্ববাঙলা ও পূর্ববাঙলার মানুষ। পাকিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা ছাপ্পান্ন ভাগ অধ্যুষিত পূর্ববাংলা এই শাসক চক্রের হাতে সবচেয়ে বেশী উপেক্ষিত হয়েছে। যদিও পাকিস্তানের আয়-করা বৈদেশিক মুদ্রার অধিকাংশ আসত পূর্ববাঙলা থেকে তবু পূর্ববাঙলাকে তার আয়ের সিকি ভাগও ভোগ করতে দেওয়া হতো না। সব তারা ব্যয় করতো পশ্চিম পাকিস্তানে, বিশেষ করে পাঞ্জাবে কলকারখানা তৈরীর কাজে। যদিও কেন্দ্রীয় পাক সরকারের আয়ের শতকরা সত্তর ভাগ আসত পূর্ববাংলা থেকে, তবুও শিক্ষা খাতে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যে ব্যয় করা হতো মাথাপিছু চার টাকা ছয় আনা তিন পাই, আর পূর্ববাংলার জন্যে মাথাপিছু মাত্র এক পাই।

শিল্পক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যে মাথাপিছু একাত্তর টাকা চার আনা পনেরো পাই, আর পূর্ব বাংলার জন্যে মাথাপিছু মাত্র পাঁচ টাকা বারো আনা পাঁচ পাই। সমাজ উন্নয়নের ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু পাঁচ টাকা দুই আনা সাত পাই, আর পূর্ব বাংলার জন্যে মাথাপিছু মাত্র নয় আনা ছয় পাই।

বৈষম্যের এখানেই শেষ নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে যে বছরে মাত্র সত্তর লক্ষ টাকা সাহায্য দেয়া হয়েছে, সেই একই বছরে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য দেয়া হয়েছে চার কোটি দশ লক্ষ টাকা। যে বছরে ঢাকা রেডিওর জন্যে ব্যয় করা হয়েছে মাত্র এক লক্ষ নিরানব্বই হাজার টাকা, সেই একই বছরে পশ্চিম পাকিস্তানের রেডিও ষ্টেশনগুলোর জন্যে ব্যয় করা হয়েছে নয় লক্ষ বারো হাজার

টাকা। কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বস্তরে নিযুক্ত পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের হার হচ্ছে শতকরা মাত্র চারজন। আর পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীদের হার শতকরা ছিয়ানব্বই জন।

বৈদেশিক বিভাগে রাষ্ট্রদূত পদসহ সমস্ত শ্রেণীর বঙ্গবাসী কর্মচারীর সংখ্যা শতকরা মাত্র পাঁচজন, আর পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীদের হার হচ্ছে শতকরা পঁচানব্বই জন।

আর দেশরক্ষা বিভাগ? শতকরা ৯১'৯ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসী, আর শতকরা ৮'১ ভাগ পূর্ব বাংলার বাঙালী। কী নিদারুণ বৈষম্য, কী ভয়াবহ শোষণ। পূর্ব বাংলার সদাজাগ্রত মানুষ তাই সংঘবদ্ধভাবে এই শোষণের অবসান দাবী করল। স্বায়ত্ত শাসনের আওয়াজ তুলল তারা। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা দাবীর মধ্যে স্বায়ত্ত শাসনের কথাই বলা হয়েছে, তার বেশী কিছু নয়।

পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের কোনো বিরোধ ছিল না, এখনও নেই। পাকিস্তানের যে কোনো অঞ্চলের মানুষের ওপরে যেকোনো রকমের অত্যাচারের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনগণ সবসময় সোচ্চার হয়েছে। পূর্ব বাংলার জনগণ শুধুমাত্র নিজেদের স্বাধিকার চেয়েই ক্ষান্ত থাকেনি, তারা পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষী অঞ্চলের মানুষের স্বাধিকারের দাবী তুলেছে। পশ্চিম পাকিস্তানের দুর্বল প্রদেশগুলোর ওপরে যখন শাসকচক্র জোর করে এক ইউনিটের জোয়াল চাপিয়ে দিয়েছে, তখন পূর্ব বাংলার জনগণ প্রতিবাদের ঝড় তুলেছে। পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষুদ্র প্রদেশগুলোর জনগণের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তারাও এক ইউনিটের বিলোপ সাধনের দাবী তুলেছে।

বেলুচিস্তানের নিরীহ নিরস্ত্র মানুষের ওপর যখন জঙ্গী আইয়ুব শাহী তার সৈন্যদের লেলিয়ে দিয়েছে, যখন অসংখ্য নরনারীকে লক্ষ্য করে মেশিনগানের গুলি চালিয়েছে, তখন পূর্ব বাংলার মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়েছে। এই গণহত্যার নায়ক আইয়ুব খানের বিচার দাবি করেছে।

পাকিস্তানের শাসকচক্র সবসময় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে এবং সেই বিরোধের ঘোলা জলে নির্বিচারে সাঁতার কেটে বেঁচে থাকতে চেয়েছে। কিন্তু ১৯৬৯ সালে তাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। সারা পাকিস্তান এক সঙ্গে আইয়ুব খানের ডিক্টেটরী শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে দিল। পূর্ব বাংলা, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান আর পাঞ্জাব এক সঙ্গে গর্জে উঠল।

খাইবার থেকে টেকনাফ প্রতিটি অঞ্চলের জনগণ, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী প্রতিটি স্তরের মানুষ গণতন্ত্রের পতাকা হাতে নিয়ে আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে অভূতপূর্ব আন্দোলনের জন্ম দিল।

পাকিস্তানের ইতিহাসে এই প্রথম সারা পাকিস্তানের মানুষ দল-মত-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হলো গণবিমুখ শাসকচক্রকে উৎখাতের লড়াইয়ে। ১৯৬৯-এর এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন পাকিস্তানের শাসকচক্রের ভিত নাড়িয়ে দেয় এবং তারা বুঝতে পারে যে জনতার এই একতায় ফাটল না ধরাতে পারলে তাদের একচেটিয়া শোষণ আর গণবিমুখ শাসন ব্যবস্থাকে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখা সম্ভবপর হবে না। জনতার মধ্যে ভাঙন ও বিরোধ সৃষ্টির সবচেয়ে সহজ পন্থা হচ্ছে সাম্প্রদায়িক কলহের জন্ম দেয়া,—হিন্দু-মুসলমান বিরোধ, বাঙালি অবাঙালি বিরোধ, পাঞ্জাবী-পাঠান বিরোধ, শিয়া-সুন্নি বিরোধ। অতীত ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে যখনই শাসকশ্রেণীর মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে, যখনই গদীচ্যুত হবার সম্ভাবনা প্রকট হয়ে উঠেছে, তখনই যে কোনো একটি সাম্প্রদায়িক পদ্ধতি অবলম্বন করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্তির পথে চালিয়ে, আত্মকলহে লাগিয়ে দিয়ে নিজেদের আসন পাকাপোক্ত করেছে তারা।

১৯৬৯ এর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে ফাটল ধরাবার চেষ্টা করেও যখন শাসকচক্র ব্যর্থ হলো, তখন একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আইয়ুব খান সরে গিয়ে ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা তুলে দিলেন। জেনারেল ইয়াহিয়া খান চক্রান্তের পরিকল্পিত পথে ধীরে ধীরে এগোতে থাকলেন। মুখে বলতে লাগলেন, প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। আসলে তাঁর পরিকল্পনা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ছোট-বড় সকল রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে তিনি পৃথক পৃথকভাবে মিলিত হতে লাগলেন; কখনো প্রকাশ্যে, কখনো গোপনে। উদ্দেশ্য ছিল পরস্পরের বিরুদ্ধে পরস্পরকে লাগিয়ে দেয়া। সকল দলের সঙ্গে সমানে তাল রেখে চলছিলেন তিনি। নিজেকে সাধুজন হিসেবে উপস্থিত করছিলেন সবার কাছে। নির্বাচনের দিন তারিখ ঘনিয়ে আসতে লাগল। এমন সময় ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসের শুরুতে ভয়াবহ এক প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হলো পূর্ব বাঙলার মানুষ। সর্বনাশা ঝড় আর সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে দশ লক্ষ মানুষ মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে প্রাণ হারান। পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ সহায়-সম্বলহীন হয়ে পড়ল। পৃথিবীতে এত বড়ো প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর কখনো হয়নি। এই দুর্যোগের সময়ে হাজার হাজার বিদেশী সৈন্য, বিদেশী সাংবাদিক, বিদেশী সাহায্যকারীতে ভরে গেল

পূর্ব বাংলার ঝড়-উপদ্রুত অঞ্চল। কিন্তু পাকিস্তানের শাসক চক্রের একটি লোকও এলেন না এই অসহায় মানুষগুলোকে একটু সান্ত্বনা জানাবার জন্যে। বাতাসে অনেক কথা শোনা যেতে লাগল। নানা প্রশ্ন উঠল নানা মহল থেকে। ত্রাণ কাজের নাম করে বিদেশী সৈন্য কেন এসে নামবে আমাদের মাটিতে? আমাদের সৈন্যরা বসে বসে করছে কি? এত বড়ো দুর্যোগ ঘটে গেল। কিন্তু দেশের প্রেসিডেন্ট আর তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা নীরবে ইসলামাবাদে বসে বসে করছেন কি? বিদেশ থেকে হেলিকপ্টার আনতে হলো। কিন্তু আমাদের হেলিকপ্টারগুলো গেল কোথায়? নানা গুজব ছড়াতে লাগল দ্রুত। জনৈক বিদেশী সাংবাদিক জানালেন, তোমাদের জন্য দুঃখ হয়। দশ লক্ষ লোক তোমরা ঝড়ে হারিয়েছ। কিন্তু আরো দুঃখ আছে, তোমাদের কপালে। আরো অনেক প্রাণ তোমাদের দিতে হবে খুব শীঘ্রই। বিদেশী সাংবাদিকের এই উক্তি তখন থেকেই নানা আলোচনা, সমালোচনা, সন্দেহ এবং জল্পনা-কল্পনার জন্ম দিয়েছিল পূর্ব বাংলায়। অনেকের মনেই সন্দেহ জেগেছিল, আমরা কি কোনো বিশ্বরাজনীতির দাবা-খেলার ছকের মধ্যে পড়ে যাচ্ছি?

নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে এলো। যথাসময়ে শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিতও হলো। পাকিস্তানের চব্বিশ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে সারা পাকিস্তানব্যাপী সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেল পাকিস্তানের নাগরিকেরা। নির্বাচনের ফলাফল বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, পাকিস্তানের পাঁচটি প্রদেশের মধ্যে তিনটি প্রদেশে গণতন্ত্র, স্বায়ত্বশাসন ও একচেটিয়া শোষণের অবসানকারী দুটি দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। দল দুটি হলো, আওয়ামী লীগ আর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি।

আর প্রদেশ তিনটি হলো, পূর্ব বাংলা, বেলুচিস্তান আর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। বাকী দুটি প্রদেশ সিন্ধু ও পাঞ্জাবে জয়ী হলো জুলফিকার আলী ভুট্টোর দল পিপলস্ পার্টি। পিপলস্ পার্টির নির্বাচনী ইস্তাহারেও একচেটিয়া শোষণের অবসান ও সমাজতান্ত্রিক প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল।

নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হতে দেখা গেল, যে সমস্ত দল ও গোত্র দীর্ঘদিন ধরে পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়িয়ে এসেছে, পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে অস্বীকার করে এসেছে এবং সাধারণ মানুষকে শোষণের জোয়ালে আবদ্ধ রাখতে চেয়েছে—সেই সমস্ত দক্ষিণপন্থী দলগুলোকে পাকিস্তানের জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে সরাসরিভাবে বর্জন করেছে।

পূর্ব বাংলায় নির্বাচনের ফলাফল গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। জাতীয় পরিষদের মোট ৩১৩টি আসনের মধ্যে পূর্ব বাংলার জন্য বরাদ্দ মোট ১৬৯টি আসনের স্থলে ১৬৭টি আসন দখল করলেন শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দল আওয়ামী লীগ। জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেন তাঁরা। আওয়ামী লীগের এই বিজয়ের পেছনে যে সকল সম্প্রদায়ের লোকের সমর্থন ছিল তার প্রমাণ হলো, ঢাকার মীরপুর, মোহাম্মদপুর, খুলনার খালিশপুর, রংপুরের সৈয়দপুর ও ঈশ্বরদী প্রভৃতি অবাংগালি অধ্যুষিত অঞ্চলেও আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা বিপুল ভোটাধিক্যে, মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম নামক সাম্প্রদায়িক দলের প্রার্থীদের পরাজিত করেছে।

নির্বাচনের এই ফলাফল পাকিস্তানের শাসক ও শোষকচক্রের নাভিশ্বাস তুলে দেয়। তারা ভেবেছিলেন নির্বাচনের কোন একটি দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। তাদের মধ্যে তখন ক্ষমতা নিয়ে কলহ দেখা দেবে এবং সেই কলহের সুযোগ নিয়ে পুরোন পাপীরা আবার নতুন করে ক্ষমতা দখল করে বসবে।

কিন্তু ফলাফল যখন উল্টো হয়ে গেল তখন আবার চক্রান্তে লিপ্ত হলো ষড়যন্ত্রের রাজনীতির ধারক-বাহক পাকিস্তানের শাসকচক্র। আবার সেই পুরানো বিভেদের রাজনীতির দাবা খেলা শুরু করল তারা এবং এই দাবা খেলায় সুযোগ্য সহযোগী হিসেবে ভুট্টো আর কাইউম খান দুজনেই ছিলেন এই ষড়যন্ত্রকারীদের গোত্রভুক্ত।

খান আবদুল কাইউম খান হলেন সেই হিংস্র বর্বর রাজনীতিবিদ যিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে গণহত্যা আর জেল-জুলুমের মাধ্যমে সংখ্যালঘু দলে পরিণত করে ক্ষমতায় এসেছিলেন।

আর জুলফিকার আলী ভুট্টো হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি আইয়ুব খানের পোষ্যপুত্র হিসেবে তাঁর মন্ত্রীসভায় থাকাকালে ছয় দফার প্রশ্নে শেখ মুজিবুর রহমানকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যা দিয়েছিলেন। পরে আইয়ুব খানের সভাসদের দল থেকে বিতাড়িত হয়ে সহসা সমাজতন্ত্রের বুলি কপচাতে থাকেন। আসলে তিনি একজন চরম প্রতিক্রিয়াশীল, ক্ষমতালোভী, বৃহৎ ভুস্বামী।

ভুট্টো এবং কাইয়ুম খানকে দলে টেনে নিজেদের শক্তিশালী করলেন শাসকচক্র। তাঁরা দেখলেন পূর্ব বাঙলার মানুষ স্বাধিকারের প্রশ্নে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার। তাদেরকে যদি চিরতরে দাবিয়ে দেয়া যায় তাহলে বেলুচিস্তান, সিন্ধু আর সীমান্ত প্রদেশের জনগণের স্বাধিকার আন্দোলনকেও বানচাল করে দেয়া যাবে; এক ঢিলে চার পাখী মারতে সক্ষম হবেন তাঁরা।

তাই নির্বাচনের ফলাফল বের হবার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের শাসকচক্র নানা ছলচাতুরীর আশ্রয় নিয়ে, ভুট্টো ও কাইউম খানের মাধ্যমে, পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ও তিক্ততা সৃষ্টির চেষ্টা চালাতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বাঙলার মাটিতে বাঙালী ও অবাঙালীদের মধ্যে একটা সামাজিক দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাঁধানোর চেষ্টাও করলেন তাঁরা, তাঁদের অনুচর মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলাম আর নেজামে ইসলামের দালালদের মাধ্যমে। কিন্তু পূর্ব বাঙলার সদা সচেতন মানুষ এই প্ররোচনায় সাড়া না দেওয়ায় শাসকচক্র আবার বিপদে পড়ে গেলেন।

তখন জুলফিকার আলী ভুট্টো তাঁর মুখোশের কিছুটা খুলতে বাধ্য হলেন। শাসকচক্রের কলের পুতুল ভুট্টো হঠাৎ আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন। তিনি জানালেন, জাতীয় পরিষদের নির্ধারিত বৈঠক পিছিয়ে দিতে হবে, নইলে, পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবেন তিনি। তিনি জানালেন জাতীয় পরিষদের সভা বসার আগে শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দলকে ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র ও ক্ষমতার বিলিবণ্টন সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে একটা সমঝোতায় উপনীত হতে হবে। তা না করা পর্যন্ত জাতীয় পরিষদের বৈঠক ডাকা যাবে না।

এই ধরণের একটি অযৌক্তিক দাবী ও অন্যায় আবদার গণতন্ত্রের ইতিহাসে বিরল হলেও এটাই ছিল শাসকচক্রের চক্রান্তের আসল চেহারা, গোপন বৈঠকও আলোচনায় স্থির করা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। আর ইয়াহিয়া খান যে এই সিদ্ধান্তের অন্যতম ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া গেল যখন ভুট্টোর হুমকীর সঙ্গে সঙ্গে তিনি জাতীয় পরিষদের ৩রা মার্চে আহূত সভা কোন কারণ না দেখিয়েই অনির্দিষ্ট কালের জন্যে মুলতবী ঘোষণা করে দিলেন, যদিও জাতীয় পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য তখন পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেবার জন্যে ঢাকায় এসে জমায়েত হয়েছিলেন। এর মধ্যে কাইয়ুম খান ও ভুট্টোর দল ছাড়া অন্য সব দলের সদস্যরা ছিলেন।

ইয়াহিয়া খানের এই হঠকারী ঘোষণা স্বাধিকারকামী পূর্ব বাঙলার জনগণের মনে অসন্তোষের আগুন জ্বালিয়ে দিল। শাসকচক্রের চক্রান্তের কথা বুঝতে তাদের বাকি রইল না।

আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান জনগণকে শান্তিপূর্ণ অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানাবার আহ্বান জানালেন। জনগণ অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু করল। ইয়াহিয়া খানের সেনাবাহিনী এই অহিংস জনতার ওপর বিনা প্ররোচনায় গুলি বর্ষণ করল। সহসা ঢাকা শহর

কারফিউ জারী করে এক রাতে তাঁর বর্বর সৈন্যেরা প্রায় দু-হাজার দেশপ্রেমিককে খুন করলো। কিন্তু এই প্ররোচনার মুখেও শেখ মুজিবুর রহমান জনগনকে শান্ত থাকার আহ্বান জানালেন। জনগণ শান্ত রইল। তখন শাসকচক্রের ভাড়াটে দালালরা পূর্ব বাঙলার বাঙালী ও অবাঙালীদের মধ্যে একটা দাঙ্গা বাঁধাবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। এ সময়ে শেখ মুজিবুর রহমান দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করলেন পূর্ব বাঙলায় বসবাসকারী প্রতিটি মানুষ, হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খৃষ্টান, বাঙালী-অবাঙালী সবাই সমান অধিকারের দাবিদার, সবাই পরস্পরের ভাই। শাসকচক্র দাঙ্গা বাঁধাতে ব্যর্থ হলো। কিন্তু অহিংস জনতার ওপরে তাঁরা গুলি বর্ষণের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব বাঙলার সামরিক প্রশাসনের প্রধান ও গবর্ণর হিসেবে নিয়োগ করে ঢাকায় পাঠানো হলো।

জেনারেল টিক্কা খান হচ্ছেন সেই জেনারেল যিনি বেলুচিস্তানের নিরীহ জনগণ যখন ঈদের নামাজে অংশ নেওয়ার জন্যে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন তাঁদের ওপরে বিমান থেকে গোলা বর্ষণ করে ও মেশিনগান চালিয়ে কয়েক শ' বালুচকে হত্যা করেন। সেই টিক্কা খানকে পূর্ব বাঙলায় পাঠানো তাই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

টিক্কা খান এলেন এবং তার কিছুদিন পরে ইয়াহিয়া খানও দলবল নিয়ে এলেন ঢাকায়। ১৬ই মার্চ তিনি শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। মুখে আলোচনার বাণী এবং আলোচনার মাধ্যমে সকল সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত আর অন্যদিকে লোকচক্ষুর অন্তরালে এক বিরাট সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি নিয়ে থাকলেন ইয়াহিয়া খান আর তার সামরিক 'জুণ্টা'র প্রধানরা।

জল এবং বিমান পথে হাজার হাজার সৈন্য আমদানি করলেন তাঁরা পূর্ব বাঙলার মাটিতে। সামরিক নিবাসগুলোকেও আরও সুদৃঢ় করলেন। ঢাকার সৈন্য শিবির ও বিমানপোতের চারপাশে অসংখ্য বিমানধ্বংসী কামান বসান হলো। মেশিনগান বসানো হলো বিমানপোতের আশেপাশের বাড়ির ছাদে। একদিকে আলোচনায় প্রহসন চললো আর অন্যদিকে চলল দ্রুত সামরিক প্রস্তুতি।

২৫শে মার্চ, ১৯৭১ সাল।

এল সেইদিন যে-দিনটির জন্যে পাকিস্তানের শাসকচক্র ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ থেকে অপেক্ষা করছিল। রাতের অন্ধকারকে আশ্রয় করে মিথ্যেবাদী তস্কর ইয়াহিয়া খান চুপিচুপি ঢাকা থেকে পালিয়ে গেলেন এবং যাবার আগে তার বর্বর সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দিয়ে গেলেন বাঙলার নিরীহ নিরপরাধ নিরস্ত্র মানুষ নিধনযজ্ঞে।

ইতিহাসের এক বিভীষিকাময় গণহত্যা শুরু হলো। ট্যাঙ্ক, মেশিনগান, মর্টার, বোমারু বিমান ব্যবহৃত হলো নিরস্ত্র মানুষকে মারার জন্যে।

লক্ষ লক্ষ মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করল তারা।

কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, নারী, পুরুষ, দুগ্ধপোষ্য শিশু, ছাত্র, কেরাণী, বুদ্ধিজীবী কেউ বাদ গেল না তাদের এই নৃশংস বর্বরতার হাত থেকে। ইয়াহিয়া খানের হিংস্র বন্য সেনারা অসউইজ আর বুখেনওয়াল্ডের হত্যাকাণ্ডকেও ম্লান করে দিল।

মৃত্যুর এই বিভীষিকার মধ্যে অসহায় বাঙলার মেহনতি মানুষ তার দুর্জয় মনোবল আর সাহস নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মরণপণ প্রতিরোধ যুদ্ধে। বাঙলার ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্ট, ই-পি-আর, আনসার আর পুলিশ বাহিনী তাদের মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষার জন্যে অস্ত্র তুলে নিল হাতে। আর অন্যদিকে, ইয়াহিয়া খানের বর্বর সেনারা গ্রামের পর গ্রাম জালিয়ে দিয়ে পুরো দেশটাকে শ্মশানে পরিণত করতে লাগল।

হিংসার এই উন্মত্ততার মধ্যে বাঙলাদেশের জনগণের নিজস্ব সরকার গঠন ছাড়া আর অন্য কোনো পথ রইল না। বাঙলাদেশের জন-প্রতিনিধিরা তাই মুজিবনগরে সমবেত হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করলেন।

পাকিস্তান এখন বাংলাদেশের মানুষের কাছে মৃত।

পাকিস্তানের এই অপমৃত্যুর জন্যে বাংলাদেশের মানুষ দায়ী নয়। দায়ী পাকিস্তানের শাসকচক্র, যারা পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষী অঞ্চলের মানুষের স্বাধিকারের প্রশ্নকে লক্ষ লক্ষ মৃতের লাশের নীচে দাবিয়ে রাখতে চেয়েছে। পাকিস্তানের এই মৃত্যুর জন্যে শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দলও দায়ী নয়। দায়ী, লিয়াকত আলী খান থেকে শুরু করে গোলাম মোহাম্মদ, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, ইস্কান্দার মীর্জা, খাজা শাহাবুদ্দিন, খান আবদুল কাইউম খান, আইয়ুব খান, মোনায়েম খান, সবুর খান, ইয়াহিয়া খান, টিক্কা খান আর জুলফিকার আলী ভুট্টো প্রভৃতি গুটিকয়েক ক্ষমতালিপ্সু কায়েমী স্বার্থবাদী আমলা মুৎসুদ্দি, সামন্ত-প্রভু, ধনপতি, সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী রাজনৈতিক স্বার্থশিকারীর দল,—যারা গত চব্বিশ বছর ধরে পাকিস্তানকে তাদের ব্যক্তিগত জমিদারী হিসেবে ব্যবহার করে এসেছে।

বাংলাদেশ এখন প্রতিটি বাঙালীর প্রাণ। বাংলাদেশে তারা পাকিস্তানের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হতে দেবে না। সেখানে তারা গড়ে তুলবে এক

শোষণহীন সমাজব্যবস্থা, সেখানে মানুষ প্রাণভরে হাসতে পারবে, সুখে-শান্তিতে থাকতে পারবে। বাঙলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ ঐক্যবদ্ধ ভাবে লড়ছে, লড়ছে সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এক পেশাদার বাহিনীর সঙ্গে। লড়ছে মৃত্যুকে তুচ্ছ করে জীবনকে অর্জন করার জন্যে। বাঙলার মানুষের এই মুক্তির লড়াই পশ্চিম-পাকিস্তানের নিপীড়িত অঞ্চলের মেহনতি মানুষকেও শোষণমুক্ত হবার প্রেরণা যোগাবে।

মেছিক কারবার। ঢাকায় অখন মেছিক কারবার চলতাছে। চাইরোমুড়ার লোক-থনে গাবুর বাড়ি আর কেচকা মাইর খাইয়া ভোমা ভোমা সাইজের মছুয়া সোল-জারগুলো তেজগাঁ-কুর্মিটোলায় আইস্যা—আ-আ-আ দম ফেলাইতেছে। আর সমানে হিসাবপত্র তৈরী হইতাছে। তোমরা কেডা? ও-অ-অ ভৈরব থাইক্যা আইছো বুঝি? কতজন ফেরত আইছো? অ্যা: ৭২ জন। কেতাবের মধ্যে তো দেখতাছি—লেখা রইছে ভৈরবে দেড় হাজার পোস্টিং আছিলো। ব্যাস ব্যাস আর কইতে হইবো না—বুইজ্যা ফালাইছি। বাকীগুলার বুঝি হেই কারবার হইয়া গেছে। এইডা কি? তোমরা মাত্র ১১ জন কীর লাইগ্যা? তোমরা কতজন আছিলা? খাড়াও খাড়াও—এই যে পাইছি কানিয়াকৈর—১২৫ জন। তা হইলে ১১৪ জনের ইন্না লিল্লাহে ডট ডট ডট রাজেউন হইয়া গেছে। হউক, কোন ক্ষতি নাই। কামানের খোরাকের লাইগ্যাই এইগুলোরে বাঙ্গাল মুলুকে আনা হইছিলো। আরে এইগুলি কারা? যণ্ডা কই মাছের মত চেহারা হইছে কীর লাইগ্যা। ও-অ-অ তোমরা বুঝি যশোর থাইক্যা ১৫৬ মাইল দৌড়াইয়া ডাংগোয়াট হওনের গতিকে এই রকম লেড়লেড়া হইয়া গেছো। অ্যা: তুমি একা খাড়াইয়া আছো কীর লাইগ্যা? কী কইলা—তুমি বুঝি নীরকাদিরের মানুষ না :—ও-অ-অ-অ বাকী হগ্গলগুলারে বুঝি বিচ্ছুরা বেবাক হান্দাইছে? পাং-এর পারে পাইয়া আরামসে পানির মাইদ্দে চুবানী মারছে। কেইসডা কী? আমাগো বকশী বাজারের ছক্কু মিয়া কান্দে কীর লাইগ্যা? ছক্কু-উ, ও ছক্কু! কান্দিস না ছক্কু কান্দিস না। কইছিলাম না, 'বাঙ্গাল মুলুকের কেদো আর প্যাঁকের মাইদ্দে মছুয়াগো মউত তেরা পুকারতা হ্যায়।' না: তখন কী দেট-পাট-হ্যাল করেগা, তান করেগা আর অখন। অখন তো মওলবী সাবরা কপিকলের মাইদ্দে পড়ছে। সামনে বিচ্ছু, পিছনে বিচ্ছু, ডাইনে বিচ্ছু, বাঁয়ে বিচ্ছু। অখন খালি মছুয়ারা জিগাই-তাছে, 'ইডা হ্যামি কী করছুনুরে! হামি ক্যা নানীর বাড়িত আছিলুনুরে। হামি ইডা কী করনুরে। আতকা আমাগো ছক্কু মিয়া কইলো, 'ভাইসাব, আমার বুকডা ফাইটা খালি কান্দন আইতাছে। ডাইনা মুড়া চাইয়া দেহেন ওইগুলা কী খাড়াইয়া রইছে। কী লজ্জা, কী লজ্জা। মাথা এ্যাহেন কইরা তেরছা নজর মারতে দেহি কী? শও কয়েক মছুয়া অক্করে চাউয়ার বাপ মানে দিনা দিগম্বর সাধু হইয়া খাড়াইয়া রইছে। ব্রিগেডিয়ার বশীর তাগো জিগাইলো 'তুম লোগকো কাপড়া কেধার গিয়া?' জবাব আইলো যশোরে শার্ট, মাগুরায় গেঞ্জী, গোয়ালন্দে ফুলপ্যান্ট আর আড়িচায় আণ্ডারওইয়ার থুইয়া বাকী রাস্তা খালি জিগাইতে জিগাইতে আইছি—'হায় ইয়াহিয়া ইয়ে তুমনে কেয়া কিয়া—হামলোগ তো অভি নাঙ্গা মছুয়া বন গিয়া?' আতকা ঠাস ঠাস কইরা আওয়াজ হইলো—ডরাইয়েন না, ডরাইয়েন না। মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী চুলে ডভি দিয়া চাব-ড়াইতে শুরু করছে, 'পদ্মা নদীর কূলে আমার নানা মরেছে, পদ্মা নদীর কূলে আমার দাদা মরেছে, গাবুর বাড়ির চোটে আমার কাম সেরেছে।' ব্যাস মওলবী রাও ফরমান আলী, ঠেটা ম্যালেরিয়া ডাংগোয়াট হওনের গতিকে জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্টের কাছে খবর পাডাইলো, 'হে প্রভু তোমার দিলে যদি আমাগো লাইগ্যা কোন রকম মহব্বৎ থাইক্যা থাকে, তা হইলে তুরন্ত আমাগো কইয়া দাও কিভাবে বিচ্ছু আর হিন্দুস্থানী ফৌজের পা ধরলে লেড়লেড়া আর ধ্বংসস্তম্ভ মার্কা বাকী সোলজারগো জানটা বাঁচানো সম্ভব হইব। এই খবর না পাইয়া জেনারেল নিয়াজী আর সেনাপতি ইয়াহিয়া কী রাগ? জনব ইয়াহিয়া লগে লগে উ থান্টের কাছে টেলিগ্রাম করলো, 'ভাই উ থান্ট, ফরমাইন্যার মাথা খারাপ হওনের গতিকেই এই রকম কারবার করছে। হের

চিডিভারে চাপিশ কইর‍্যা কালাও। এইদিকে আমি আর শাহনেওয়াজ ভুট্টোর ডাউটফুল পোলা পোংটা সরদার জুলফিকার আলী ভুট্টোরে মিছা কথার ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করনের লাইগ্যা জাতিসংঘে পাডাইতেছি। একটুক নজরে রাইকবো। বেডার আবার সাদা চামড়ার কসবীগো লগে এথি-ওথি কারবার করণের খুবই খায়েশ রইছে। সাবে কইছে কীসের ভাই, আহলাদের আর সীমা নাই। সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের হবু ফরিন মিনিষ্টার জুলফিকার আলী ভুট্টো ব্রাকেটে শপথ লণ্ডনের টাইম হয় নাইক্যা। ব্র্যাকেট শেষ জাতিসংঘে যাইয়া পয়লা রিপোর্টারগো লগে চ-উ-উ মারত মানে কিনা লুকোচুরি খেলা, খেলতাছিলো। তারপর জাতি-সংঘে আতকা কান ধইর‍্যা উঠ বস কইরা ভুট্টো সাবে চিল্লাইতে শুরু করলো, আর লাইফে এই রকম কাম করুম না। বাঙ্গাল মুলুকে আমরা গেনজাম কইরাই খুবই ভুল করছি। আমরা মাফ চাইতাছি, তওবা করতাছি, কান ডলা খাইতাছি—আমাগো এইবারের মতো ক্ষমা কইর‍্যা দেন। কিন্তু ভুট্টো সাহেব বহুত লেইট কইর‍্যা ফালাছেন। এইসব ভোগাচ কথাবার্তায় আর কাম চলবো না। ঠাস ঠাস কী হইলো? কী হইলো? সোভিয়েট রাশিয়া জাতিসংঘে ভেটো মাইরা হগ্‌গল মিচকী শয়তানরে চীৎ কইর‍্যা ফালাইছে। কইছে ফাইজলামীর আর জায়গা পাওনা? এইদিকে সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের পরানের পরান জানের জান চাচা নিক্সন কত্তা কিসিঞ্জেরে টিরিক্স করনের লাইগ্যা সপ্তম নৌবহররে সিঙ্গা-পুরে আনছে। লগে লগে সোভিয়েট রাশিয়া একটুক হিসাব কইর‍্যা কাম করনের লাইগ্যা হোয়াইট হাউসরে এ্যাডভাইসিং করছে। প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগর্নী ক্রেমলিন থাইক্যা কইছে পাক-ভারত উপমহাদেশে বাইরের কেউ নাক না গলালেই ভালো হয়। ব্যাস, আমেরিকার সপ্তম নৌবহর সিঙ্গাপুর আইস্যা নিল-ডাউন হইয়া রইলো। এ্যা: এ্যা: এই দিককার কারবার হুনছেন নি? হরিধনের একটা ছেলে কাঁদে ভেউ ভেউ, হেইটা গেলো গাধার মাইদ্দে রইলো না আর কেউ। জেনারেল পিঁয়াজী সরাবন তহুরা দিয়া গোসল কইর‍্যা ঢাকার হোটেল ইন্টার—কন্টিনেন্টালের মাইদ্দে হান্দাইয়া এখনও চ্যা চ্যা করতাছে, আমার ফৌর্স ছেরাবেরা হইলে কি হইবো, আমি ফাইট করুম, ফাইট করুম। আমাগো নেয়ামত মিয়া আতকা চিল্লাইয়া উঠলো এইডা কী? এইডা কী? জেনারেল পিঁয়াজীর ফুলপ্যান্টের দুই রকম রং দেখতাছি কীর লাইগ্যা? সামনের দিকে খাকী রং, পিছনের মুড়া বাসন্তী রং, কেইসডা কী? অনেক থিংক করলে বোঝান যায় এর মাজেজাডা। হেইর লাইগ্যা কইছিলাম---

মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের কবিতা

১১ই জুন প্রচারিত

মাহবুব তালুকদার

পঁচিশে মার্চের রাত্রের সুপ্তি থেকে সমগ্র বাংলাদেশ জেগে উঠেছে। মধ্য-রাতের দুঃস্বপ্নে অকস্মাৎ কেঁদে উঠেছিল ঢাকা নগরী। সে কান্না মায়ের জঠর থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে নবতর জন্মলাভের কান্না। বিশ্বাসঘাতকতার খোলস ছিঁড়ে নতুন সূর্যোদয়ের মতই স্বাধীন বাংলা পূর্বদিগন্তে উদ্ভাসিত হয়েছে। তার মুক্ত আলোকচ্ছটা সূর্যকরের মতই সত্য আর স্বচ্ছ।

সুজলা সুফলা বাংলা আজ বিশ্বের বিস্ময়ে পরিণত। কৃষাণের লাঙ্গল রূপান্তরিত হয়েছে সংগ্রামী হাতিয়ারে, শ্রমিক তার হাতুড়ি ছুঁড়ে দিয়েছে গ্রেনেডের মত, দেশের অগণিত জনগণ রক্ত দিয়ে স্বাধীনতার পোষ্টার লিখছে। এ কোন বাংলাদেশ? এই অচিন্তনীয় বাংলার রূপ কি পৃথিবীর মানুষ কখনও দেখে-ছিল? হয়ত দেখেনি, কিন্তু বাংলার কবিরা চিরকালীন আবহমান বাংলাকে অনুভব করেছেন এই বিস্ময় রূপের মধ্যে। তাই বাংলার রণক্ষেত্রে আজ তরুণ মুক্তি-যোদ্ধারা আবৃত্তি করেন রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ এবং তাঁদের দেশের একান্ত প্রিয় কবিদের কাব্য।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের একদিকে হিংস্র বন্য পশুদের নির্মম অত্যা-চারের যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর, অন্যদিকে স্বদেশের প্রতি গভীর আবেগময় ভালবাসা। এই ভালোবাসার প্রতিভাস ফুটে উঠেছে এ দেশের কবির সৃষ্টিতে। মসি এখানে অসির সহযোগী। বাংলার সাড়ে সাত কোটি জনগণ জীবনানন্দের অনুভবে একাত্ম হয়ে উচ্চারণ করেন: 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর।'

ভাষাই সম্ভবতঃ বাঙালীর চেতনার উৎসমুখ। নদীর স্রোতের মত অগণিত কাব্যের প্রবাহে হৃদয় ভাসিয়ে এ দেশের মানুষ আত্মশুদ্ধ হন। পৃথিবীতে একমাত্র বাংলাদেশেই সম্ভব ভাষা ও ভাবের আত্মীয়তার মধ্যে নিজেদের অস্তিত্বের মুক্তি আবিষ্কার। এ জন্যেই একুশে ফেব্রুয়ারী শুধু ভাষার আন্দোলন নয়, একুশে ফেব্রুয়ারী আজকের স্বাধীনতা-বাসনার প্রথম প্রজ্বলন।

দেশের প্রতি কবিদের আত্মনিবেদনে দেশের মানুষ সমান অংশীদার। তাই এদেশের মানুষের কাছে একজন সৈনিক ও একজন কবি পাশাপাশি পথ চলেন। 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' এ কেবল জাতীয় সঙ্গীত নয়, জাতির হৃদয়-সঙ্গীত। অন্তরের প্রতি প্রান্তে স্বদেশের মাটির প্রতি কবির যে সংবেদন, মুক্তিযোদ্ধারা তাঁদের প্রতিটি বুলেটে সেই চিরন্তন সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চান। আর তাই অকুতোভয় বাঙালী সৈনিকের কাছে মৃত্যুকেও মৃত মনে হয়, তুচ্ছ মনে হয়।

বাংলার জাতীয় জাগরণে জসীমউদ্দীন কেবল কবি নন, তিনি সংগ্রামের সৈনিকও বটে। মানুষের প্রতি অপরিসীম সহানুভূতি তাঁকে নিয়ে এসেছে সংগ্রামী জনতার পুরোভাগে। সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর মূর্ত প্রতীক শেখ মুজিবুর রহমানকে উৎসর্গ করে তাই তিনি বলেন:

'সেনাবাহিনীর অশ্বে চড়িয়া
দম্ভ-স্ফীত ত্রাস,
কামান গোলার বুলেটের জোরে
হানে বিষাক্ত শ্বাস।
তোমার হুকুমে তুচ্ছ করিয়া
শাসন ত্রাসন ভয়
আমরা বাঙালী মৃত্যুর পথে
চলেছি আনিতে জয়।'

আমাদের স্বাধীনতার মূল উদ্দীপনা আহৃত হয়েছে দেশের প্রতি উৎসারিত মমত্ববোধ থেকে। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেই শুধু নয়, মুক্তিযুদ্ধের রণক্ষেত্রেও এই স্বদেশ প্রীতিই হচ্ছে আসল হাতিয়ার। দেশকে ভালোবাসার অপরিমেয় আগ্রহ এক নতুন রণশক্তির সৃষ্টি করেছে যা মানবিক মূল্যবোধহীন বর্বর পশু শক্তির বিরুদ্ধে প্রত্যুত্তর দিতে সক্ষম। এখানেই বাংলাদেশের কবিরা হয়ে উঠেছেন মুক্তিসেনার পরম সহায়ক। যুদ্ধ এক ধরণের হিংস্রতা সন্দেহ নেই, কিন্তু জীবন দেয়া-নেয়ার গৌরবময় ইতিহাস সৃষ্টিতে মুক্তি-বাহিনীর প্রত্যেকটি সৈনিকের মুখে যে নির্ভীক সাহসিকতার ঔজ্জ্বল্য প্রকাশমান, তার প্রেরণা বাংলা-মায়ের মুখ। দেশ আর দেশের মানুষের প্রতি অগাধ ভালোবাসাই যেখানে অস্ত্র, সেখানে পশুশক্তির পরাজয় অনিবার্য। হাসান হাফিজুর রহমান

এমনিতর অস্ত্রই আবিষ্কার করেছেন যা জনগণের চোখের দৃষ্টি আর কণ্ঠের ভাষা থেকে উৎসারিত:

'অনাদি অটল দুর্গজয়ী অস্ত্র পাবে কোথায়?
মোহাচ্ছন্ন চোখে তোমার পড়ে না কিছুই।
দ্যাখো না লক্ষ কোটি তীব্র চোখ ভিন্ন আলো ফেলে,
কণ্ঠ তাঁদের আকাশ বাতাস ছেয়ে?
অস্ত্র আমার তাদের চোখ
অস্ত্র আমার কোটি কণ্ঠের ভাষা।'

বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের পরিণতি আজ অতি স্পষ্ট। ইতিহাসের অনিবার্য গতিতেই আসন্ন হয়েছে এদেশের স্বাধীনতা। মানুষ মারার জন্যে বুলেটের সাথে অমানবিক জিঘাংসার প্রবৃত্তি থাকা প্রয়োজন, কিন্তু পশু হত্যার জন্যে চাই মানবিক দৃঢ়বদ্ধ চেতনা। এ বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমগ্র জাতি এখন রক্তক্ষয়ী আপোষহীন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। হাজার মাইল দূর থেকে নিয়ে আসা ভাড়াটে হানাদল বিপর্যস্ত ও পর্যুদস্ত হয়ে উঠেছে। কোন নৈতিক মনোবলশূন্য সামরিক শক্তি যত বিশালই হোক না কেন, আত্মিক বলে বলীয়ান নিরস্ত্র মানুষের শক্তি ও তার চেয়ে কম নয়। এহেন মনোবলের বোধ পাকিস্তানের শূন্যগর্ভ বুলিতে কোনকালেই জাগ্রত করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে বাংলাদেশের কবিরা বাঙালীর আত্মিক প্রেরণার সুদৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে শত্রুর মোকাবেলা করছে। রক্তের ফিনকিতে লাল হয়ে যদিও বাংলাদেশ ধুয়ে যাচ্ছে; তবু মহান মুক্তি সেনারা আজ মৃত্যুভয়ে ভীত নয়। তাঁদের মনের নির্ভীক প্রতিরূপটিকে ব্যক্ত করে এ দেশের কবি বলেন:

'মৃত্যুকেও মৃত মনে হয় আজকাল, কারণ মৃত্যুতে
মোমবাতির শিখাটি নড়ে না,
শোকধ্বনির মধ্যে গভীর আনন্দে খোল করতাল বাজে
অন্ধকারে আলো ওঠে জ্বলে
স্বপ্নের রং গুঁড়ো হলে কারা তবু আঁকতে চায় ছবি
বারুদের পোড়া গন্ধ শুঁকে
স্বদেশের ঘ্রাণ পায়, প্রাণে নেয় আশ্বাসের বায়ু
দুঃখ ক্লান্তি ভীতি নেই, যেহেতু তাদের
প্রত্যেক দুঃখের সঙ্গে আনন্দ ঘুমায় অবিরত,
যেহেতু এখন
মায়ের জঠরে কাঁদে বাংলাদেশ নবতর জন্মের পুলকে।'

ইতিহাসের অমোঘ ধারাকে লঙ্ঘন করার সাধ্য পাশব শক্তির প্রতিভূ ইয়াহিয়া খানের নেই। বাংলাদেশ এখন সেই মহাজাগতিক সত্যের ধারায় স্নাত হয়ে মুক্ত সত্তার প্রতীক্ষায় দিন গুনছে। 'এ পৃথিবীর রণ-রক্ত সফলতা সত্য, কিন্তু শেষ সত্য নয়'—জীবনানন্দের এই চিরন্তন বাণী মিথ্যার মুখোশ উন্মোচন করে স্বাধীনতার পরম সত্যের মাঝখানে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করবে। সেই অলখ অরুণোদয়ের প্রতীক্ষায় আমরা নিদ্রাহীন, ক্লান্তিহীন। জীবনকে ভালবাসি বলেই আমরা বরণ করি মৃত্যুকে।

(জনাব মাহবুব তালুকদার 'কামাল মাহবুব' ছদ্ম নামে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন) —গ্রন্থকার

এক

ডক্টর মাযহারুল ইসলাম

৬ই জুন '৭১ প্রচারিত

বাঙলার প্রাণের নেতা শেরে বাংলা ফজলুল হককে পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থবাদীচক্রের মুখপাত্রেরা একদিন বিশ্বাসঘাতক বলে আখ্যা দিয়েছিল। বলেছিল Mr. Fazlul Haq is a self confessed traitor. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে কুচক্রী মুসলিম লীগ সরকারের অনুসারীগণ বাংলার মাটিতে সাংঘাতিক পরাজয় বরণ করে এবং আবার পর্দার অন্তরালে ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে। এই নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের একুশ দফার স্বপক্ষে সমগ্র বাঙালী অকুণ্ঠ

রায় দিয়েছিলেন। বাঙালীর এই একতা ও নবজাগ্রত চেতনা পশ্চিমাদের ভয়ের ও আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাকে যেমন নির্বিচারে শোষণ করা চলছিল এবার সে পথে এক বিরাট বিঘ্ন সৃষ্টি হয়ে পড়ে। এই জাগ্রত জনতার পুরোভাগে দাঁড়িয়ে যখন শেরে বাংলা ফজলুল হক বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করতে থাকেন যে বাংলাকে আর শোষণ করতে দেয়া হবে না, তখন পশ্চিমা আমলাগণ এবং স্বার্থ-বাদী রাজনীতিবিদরা বিপদ গুণতে শুরু করে। তাই ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার হতে থাকে—আর বাংলার অবিসম্বাদিত নেতা ফজলুল হককে বলা হয় বিশ্বাস-ঘাতক। এই ষড়যন্ত্রের নেতা সেদিন ছিল ইস্কান্দার মীর্জা, গোলাম মোহাম্মদ প্রভৃতি। এদের সাথে হাত মিলিয়েছিল চুয়ান্নর নির্বাচনে পরাজিত মুসলিম লীগের কতিপয় বাঙালী মীরজাফর। ১৯৫৫ সালের ২৯শে মে বাংলার দরদী নেতা শেরে বাংলা ফজলুল হক যখন করাচী থেকে ঢাকা বিমান বন্দরে ফিরে এলেন তখন বিপুল জনতা তাঁকে সম্বর্ধনা জানাতে সেখানে সমবেত হয়েছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের কি পরিহাস—নিজের দেশে ফিরে এসে, যে বাংলার মাটিকে ফজলুল হক প্রাণের মত ভালবাসতেন সেই মাটিতে দাঁড়িয়ে একটি কথা পর্যন্ত বলবার অধিকার তাঁর রইল না। সামরিক বাহিনীর কড়া পাহারায় তাঁকে বিমান বন্দর থেকে গৃহে নিয়ে যাওয়া হোল এবং নিজের ঘরে তাঁকে অন্তরীণাবদ্ধ করে রাখা হোল। ছয় মাস তাঁকে বাইরের কোন লোকের সাথে মিশতে দেয়া হোত না—এমন কি পবিত্র ঈদের দিনে ঈদের জামাতের সাথে একত্র বসে নামাজ পড়তে পর্যন্ত তাঁকে দেয়া হোল না। বাংলাকে ভালবাসার এই হোল শাস্তি—বাংলার দুঃস্থ, নিঃস্ব, নিপীড়িত এবং লাঞ্ছিত মানুষের জন্য কথা বলার এই হোল সতিকার পুরস্কার। ঋণসালিশী বোর্ড স্থাপন করে একদিন যে ফজলুল হক বাঙালীর অস্তিত্ব রক্ষা করেছিলেন, বাঙালীর সামান্য বিপদে যিনি বাঘের মত গর্জে উঠতেন, দুঃখী মানুষের জন্য যিনি সর্বস্ব ত্যাগ করতেন, বাংলার গ্রামে বন্দরে শহরে অসংখ্য স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষার পথ যিনি সুগম করেন এবং সর্বোপরি লাহোর বৈঠকে যিনি সারা বিশ্বের সামনে পাকিস্তান প্রস্তাব তুলে ধরেন, সেই ফজলুল হক, সেই শেরে বাংলা ফজলুল হক সেদিন প্রবীণ ও বৃদ্ধ বয়সে নিজের ঘরে বন্দী হয়ে রইলেন। যেদিন জীবনের সমস্ত বিশ্রাম ও আরাম আয়েশ পরিত্যাগ করে দেশের স্বাধীনতার জন্য ফজলুল হক ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সেদিন কোথায় ছিল ইস্কান্দার মীর্জা, গোলাম মোহাম্মদ—বৃটিশের তাঁবেদার ও গোলাম সেজে তারা তখন চাকুরী করতো ও নিজেদের সমস্ত বিপদ থেকে নিরাপদ দূরত্বে বাঁচিয়ে রেখে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ওপর রক্তচক্ষু নিক্ষেপ করতো এই দুই

পরাশ্রিত বশম্বদ জানোয়ার। আর পাকিস্তান প্রস্তাবের যিনি উদ্যোক্তা, যাঁর হাতে পাকিস্তান প্রস্তাবের জন্ম, সেই মনীষী ফজলুল হককে বিশ্বাসঘাতক বলতে এদের এতটুকু বাঁধলো না। বাঁধবে কেন—বাংলাদেশ যে পশ্চিম পাকিস্তানীদের একটি সস্তা উপনিবেশ—একটি বাজার,—যা খুশী তাই তারা এখানে করতে পারে—যাকে যা খুশী তাই তারা বলতে পারে। এ কারণেই যখনই নির্বাচন হয়েছে এবং নির্বাচনে বাঙালী তাঁদের প্রিয় নেতৃবৃন্দকে নির্বাচন করেছেন তখনই সেই নির্বাচনের রায়কে বানচাল করে নিষ্ঠুর শাসনের ষ্টীমরোল চালানো হয়েছে। উনিশ শ' চুয়ান্নোর নির্বাচনের পর এসেছে এই আঘাত—এসেছে ষড়যন্ত্রের পর ষড়যন্ত্রের প্রবাহ। বেছে বেছে যাঁরা বাংলাদেশকে, বাংলার মানুষকে, বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ভালবাসেন তাঁদের নানা উপায়ে নির্যাতন ও শায়েস্তা করা হয়েছে।

উনিশ শ' সত্তরের নির্বাচনের পর এসেছে অভিশপ্ত একাত্তর সন। এবারেও সেই একই খেলার ভয়াবহ পরিনাম আমাদের চোখের সামনে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। চুয়ান্নোর নির্বাচনের পর শিকার ছিলেন শেরে বাংলা ফজলুল হক, প্রবীণ জননেতা মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং অসংখ্য দেশপ্রেমিক। শিকার ছিলেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী এবং সেদিনের তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। আর আজকের নির্বাচনের পর শিকার হয়েছেন বাংলার অবিসম্বাদিত প্রাণের নেতা শেখ মুজিবর রহমান, তাঁর অনুসারীবৃন্দ এবং বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের আবাল বৃদ্ধবনিতা। যে ইয়াহিয়া টিক্কা এবং এম, এন, আহম্মদ একদিন ছিল বৃটিশের পদলেহী চাকর—যারা স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ছিল এক একটি অখ্যাত-কুখ্যাত সাধারণ গোলাম, আজ তারাই হয়েছে দেশের হর্তাকর্তা বিধাতা। আর ফজলুল হকের ভাগ্যে যেমন জুটেছিল বিশ্বাসঘাকতকার গ্লানি, তেমনি বাংলার প্রাণের নেতা, সমগ্র পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের একচ্ছত্র গণনেতা আজ হলেন দেশদ্রোহী। ভাগ্যের এ এক নির্মম পরিহাসই বটে—রবীন্দ্রনাথের উপেনের ভাষায়—"তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ আর আমি চোর বটে।"

কিন্তু দিন আর বেশী দূরে নয় যখন এই ষড়যন্ত্রের জাল আমরা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করবোই এবং বাংলাদেশকে এই দানবদের নির্যাতন থেকে উদ্ধার করবোই। আসুন আপনি কৃষক, মজুর, আসুন আপনি চাকুরীজীবী বুদ্ধিজীবী, সবার ওপরে এসো তোমরা ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-তরুণের দল, এবার আমরা দানব হত্যার ও দানব বিতাড়নের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ি। আল্লাহ্ আমাদের সহায় হবেন।

জয় বাংলা।

দৃষ্টিপাত
দুই
রনেশ দাশ গুপ্ত
৯ই জুলাই '৭১ প্রচারিত

মাঠে মারা গিয়াছে ইয়াহিয়া খানের ২৮শে জুনের লম্বাচওড়া রেডিওতে গলাবাজী। শাহী কায়দার ফরমান জারীর ভঙ্গীতে কাকাতুয়া ইংরেজীতে আওড়ানো প্রায় এক ঘণ্টার নরম-গরম-চরম বিলাপ আর প্রলাপ কি করে দাগ রাখবে দুনিয়ার মানুষের মনে? তবু, যাদের মাথায় দুর্বুদ্ধি ভর করেছে, যাদের মধ্যমণি হিসেবে ইয়াহিয়া খান ধরাকে সরা জ্ঞান করেছে, তারা এই রেডিও গলাবাজীর আগে একটা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে বাজনাতো কম বাজায়নি, কাঠখড় তো কম পোড়ায়নি, গৌরীসেনের টাকা তো কম খরচ করেনি, বেঈমানি ঢাকবার জন্যে দেশ দেশান্তরে মিষ্টি কথা তো কম পরিবেশন করেনি। পাকিস্তানী শাসকচক্রের ঝানু ঝানু উপদেষ্টারা ইতিমধ্যে তদির তদারকের বাকি কিছু রাখেনি। কিন্তু কোন ফল হলো না। ইয়াহিয়া খানের ২৮শে জুনের রেডিও ভাষণ একটা জঘন্য অপ-ভাষণ হিসেবেই বরং চিহ্নিত হয়ে গেল। উলঙ্গ হয়ে ধরা পড়ে গেল রাওয়ালপিণ্ডি সামরিকচক্রের সেই বর্বর রক্তলোলুপ মুনাফালোভী দুর্বুদ্ধিতা, যা এই চক্রকে বাংলাদেশ দমনে প্রবৃত্ত করেছে। ইয়াহিয়া খান তার প্রলাপে বলেছেন, রাওয়ালপিণ্ডির সামরিকচক্র নিজেরাই শাসনতন্ত্র রচনা করবে। তারা পশ্চিম পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরও শাসনতন্ত্র রচনার এখতিয়ার নাকচ করে দিয়েছে। বাংলাদেশকে তো তারা ধ্বংস করতেই চেয়েছে। এটা ইয়াহিয়ার বাচনে দুনিয়ার কাছে জাহির হয়ে গিয়েছে। ২৮শে জুনের আগে দুনিয়ার যেসব রাষ্ট্রের কর্মকর্তারা চিন্তা করছিলেন যে, দানবীয় অপকর্ম করে ফেলে হাতেনাতে ধরা পড়ার পরে ইয়াহিয়া খানেরা হয়তো তওবা করে পশ্চিম পাকিস্তানে বহাল থাকার জন্যেও দুনিয়ার কাছে একটা সম্মানজনক মীমাংসা সূত্র রাখতে পারবে, তারাও খুঁজে পেতে কিছু পায়নি ইয়াহিয়া খানের বাচনে।

বস্তুতঃপক্ষে ২৮শে জুনের পরে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মুখপাত্র এবং প্রতিনিধিবৃন্দ বাংলাদেশের ঘটনা সম্পর্কে যেসব বক্তব্য বলেছেন, তাদের প্রত্যেকটি থেকেই একথা বুঝতে পারা যায় যে, এইসব মুখপাত্র এবং প্রতিনিধি ইয়াহিয়া খানের বাচনকে আমলেই আনেননি। নিউজিল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী এবং পশ্চিম জার্মানীর

পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী বাংলাদেশ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বাংলাদেশের পক্ষে গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক মীমাংসা সূত্রের জন্যেই তাগিদ দিয়েছেন। এটা ধরে নেওয়া যায়, তাঁরা কূটনৈতিক সূত্রে ইয়াহিয়া খানের রাজনৈতিক সমাধান সূত্রগুলিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

কানাডা আর আয়ারল্যাণ্ডের আইন পরিষদের যেসব সদস্য বাংলাদেশ ও পশ্চিম বঙ্গ সফরে এসেছেন, তাঁদেরও একই কথা। তাঁরা স্বচক্ষে দেখে যাচ্ছেন, বাংলাদেশে ইয়াহিয়া খানের রাওয়ালপিণ্ডি চক্রের জল্লাদেরা একটা গোটা জাতিকে সাড়ে সাত কোটি নরনারী, শিশুকে ধ্বংস করে দেবার উদ্দেশ্যে কি ধরণের হত্যাকাণ্ড করেছে। বাংলাদেশের প্রশ্নে রাজনৈতিক সমাধানের যে তাগিদ তাঁরা দিয়েছেন তাতে বুঝতে পারা যায়, ইয়াহিয়ার ভাষণকে তাঁরা খাড়া অগ্রাহ্য করেছেন। গোটা বাঙ্গালী জাতিকে নিধন করার জন্যে পাকিস্তানী শাসকচক্র যে ষড়যন্ত্র চালিয়ে এসেছে এতদিন, ইয়াহিয়ার বক্তব্য তারই একটা বেতালা পদক্ষেপের মহড়া ছাড়া আর কিছু নয়, সেকথা আজ বিশ্বের বিভিন্ন মানুষ বুঝে নিয়েছে। পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন সমাজতন্ত্রী দেশ বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে তাঁদের সমর্থন জানিয়ে আসছেন। সর্বশেষ সংবাদে দেখা গেল, চেকোশ্লোভাকিয়ার কর্মকর্তারা সরকারীভাবে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে সমর্থন জানিয়েছেন। তাঁরা বাংলাদেশের ব্যাপারে রাজনৈতিক মীমাংসার জন্যে তাগিদ দিয়েছেন। এর সোজা অর্থ এই যে, ইয়াহিয়া খানের রেডিও ভাষণকে তাঁরা ধর্তব্যের মধ্যেই আনেননি।

বাংলাদেশ আজ স্বাধীন। এটাই সত্য, এটাই বাস্তব, এটাই বর্তমান, এটাই ভবিষ্যৎ। বাংলাদেশ নিজের শাসনতন্ত্র নিজেরাই তৈরী করবে। দুনিয়ার দেশ দেশান্তরের কাছে এই ঘটনা অনিবার্য অপ্রতিরোধ্য ঘটনা হিসেবে উন্মোচিত হয়ে চলেছে। ইয়াহিয়া খানেরা মিথ্যা। স্বাধীন বাংলাদেশ সত্য। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি নরনারী, শিশু বুকের রক্ত ঢেলে এই সত্যের ভিত্তিতেই বাংলাদেশের মুক্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে আসছেন।

দুনিয়ার সমস্ত স্বাধীনতাকামী বিবেকমান মানুষ বাংলাদেশের হাতে হাত রাখছেন, হাতে হাত রাখার জন্যে এগিয়ে আসছেন।

(মিঃ রনেশ দাশ গুপ্ত 'জামিল শারাফী' ছদ্ম নামে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন) —গ্রন্থকার

দৃষ্টিপাত

তিন

অধ্যাপক আবদুল হাফিজ

বাংলাদেশ! ও নাম কানের ভিতর দিয়া মরমে পশে। এ নামের লাবনি অবনী বহিয়া যায়। আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি। শেখ মুজিবের বড় প্রিয় গান। সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর প্রাণের গান। এ গানে বাংলাদেশের মর্ম কথাটি আছে। আমার কাছে এ গানের কিন্তু একটা ভিন্ন অর্থ আছে। মনে পড়ছে, গাঁ থেকে ফিরছি। অদূরে রাজশাহী শহর দেখতে পাচ্ছি। তেসরা এপ্রিল। সকাল দশটা। মাথার ওপরে উড়ে এলো ইয়াহিয়া খানের জল্লাদ বিমান স্যাবার জেট। তারপর শুরু হলো নির্মম বোমা বর্ষণ। আমি তাড়াতাড়ি একটা খালে শুয়ে পড়লাম। খালটার দশ হাত দূরেই একটি ছেলে হাল চাষ করেছে। তাকেও শুয়ে পড়তে বললাম। কিন্তু সে নির্বিকার হাল চাষ করতে লাগলো। যেন কিছুই হয়নি। বিমানগুলি চলে গেলে আমি উঠে দাঁড়িয়ে কাপড় চোপড় ঝাড়তে লাগলাম। ছেলেটি তখন গাইছে, 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।' আমাকে দেখে ও বলদ দুটি থামালো—বললো, আপনি বুঝি খুব ভয় পেয়েছিলেন? তার কথায় একটু বিদ্রূপের সুরও ছিল। বললাম, হাঁ ভয় একটু পেয়েছিলাম বৈ কি! বললাম, তোমার বুঝি ভয় করেনি। বললো, না। বললো মরতে তো হবেই স্যার। জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমার নামটি কি ভাই? উত্তর এলো, অমল। ঘটনাটা ছোট। কিন্তু অসামান্য। অমল, বিমল, রহিম, করিম হাল চাষ করছে আর গান গাইছে, 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।'

হাঁটতে হাঁটতে আবার গাঁয়ের দিকে যাচ্ছি। আমবাগানের নীচে নীচে ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলসের বীর সেনানী ভাইরা রাইফেল নিয়ে শত্রুর মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসে আছে। রাজশাহী শহরের চারদিকে অতন্দ্র প্রহরী এই ই-পি-আর বাহিনীর জোয়ানেরা। ওদের কাছে বসলাম। পাশেই বাজছে রেডিও। আবার সেই গান: আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি। ই-পি-আর-এর কয়েকজন জোয়ান গানের সঙ্গে পায়ের তাল ঠুকছে। ওরই মধ্যে একজন, নাম রশিদ। ঢাকায় বাড়ি। বললো, কি জানেন সাহেব। এ গানটা শুইনলে পরানডা একেবারে ফাইটা যাবার চায়। বললো—ঐ যে ছেলেটাকে দেখছেন, ঐ যে হাল চাষ

করছে, ওর নাম অমল। সারা রাত কাল ট্রেঞ্চ কেটেছে আমাদের জন্য। আর এই যে দেখছেন বুড়ো মিয়াকে, ইনি মসজিদের ইমাম। সারাদিন আমাদের জন্য খাবার দিয়ে যাচ্ছেন। পানি আনছেন। বিড়ি-সিগারেট যোগাড় করছেন। বুকটা আমার গর্বে ফুলে উঠলো। বাংলাদেশের মানুষ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে শেখ মুজিবের আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের এমন প্রমাণ আর কখনও দেখিনি।

এরই তিনদিন আগেকার ঘটনা। জনতার রুদ্ররোষে ভেঙ্গে খান খান হয়েছে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের দুয়ার। হাজার হাজার কয়েদী মুক্ত। রাজবন্দীরা জনতার রায়ে মুক্তি লাভ করেছেন। পুলিশ ই-পি-আর এবং আনসার বাহিনী তৈরী হচ্ছে মুক্তি যুদ্ধের জন্য। বলা হোল খাবার চাই, প্রতিটি পাড়া থেকে হিন্দু-মুসলিম সবাই চারখানি করে রুটি এবং গুড় দিয়েছে। দেখতে দেখতে আমার চোখের সামনে তৈরী হলো রুটির পাহাড়। জনতার এমন মিলিত পদক্ষেপ ইতিহাসেও খুব বেশী নেই। এক বৃদ্ধের কথা মনে আছে। ৭০/৭২ বয়স। পাড়ার সবাই তাঁকে কাকাবাবু বলে ডাকতেন। তিনি নিজের হাতে মুসলিম যুবকদের সাথে ব্যারিকেড রচনা করছিলেন। তাকে বলেছিলাম, এ বয়সে কি এতটা সইবে আপনার? বলেছিলেন, আমি আর ক'দিন বাঁচবো বাবা? শেখ সাহেবের ডাকে সবাই তো সাড়া দিয়েছে। আমি দেবো না? সত্যি তো। শেখ সাহেবের ডাকে সবাই তো সাড়া দিয়েছেন। তাঁকেই বা মানা করে কে? ভাবলে অবাক লাগে, এই বৃদ্ধ এবং তাঁর সমগ্র পরিবার তাঁদের সবকিছু হারিয়েছে। আর সেই যে ইমামের কথা বলছিলাম। তিনি তাঁর প্রাণ হারালেন একটি ঘটনার প্রতিবাদ করতে গিয়ে। ইয়াহিয়া খানের একজন সৈনিক পাড়ায় ঢুকে দুটি মেয়েকে টেনে হেঁচড়ে বাইরে নিয়ে আসে এবং প্রকাশ্য দিবালোকে তাদের ওপর পাশবিক অত্যাচার করে। ইমাম সাহেব মেজরের কাছে গিয়ে এ-ঘটনার প্রতিবাদ করেছিলেন। মেজর উত্তরে বলেছিল, আওয়ামী লীগকে যারা ভোট দেয়, তাদের আবার সতীত্ব কিসের? এর ক'দিন পরেই তাকে ডেকে পাঠিয়ে নির্মম ভাবে হত্যা করা হল। ইয়াহিয়ার সেনারা ঘটনার কোনও স্বাক্ষর কিংবা সাক্ষী কিছুই রাখতে চায় না। আমি মাঝে মাঝে ভাবি, ইতিহাসে গণ-ঐক্যের উদাহরণ আছে হয়তো, কিন্তু এমন উদাহরণ বোধকরি আর নেই। শেখ মুজিব মানুষের সমস্ত সংকীর্ণতাকে কাটিয়ে ডাক দিয়েছিলেন মানবতায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্যে। ফলে জাতি-ধর্ম ভুলে বাঙলার মানুষ এক হলো। রেসকোর্সের বিশালতম জনসভায় শেখ সাহেব সবাইকে সাবধান করে দিয়েছিলেন এই বলে যে শত্রুরা জনগণের ঐক্যে ফাটল ধরাতে পারে। কাজেই সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে, দুটি দিক থেকে ইয়াহিয়া এবং তার পোষা দালালেরা জনগণের ঐক্যে ফাটল ধরাতে পারতো। একটি হলো বাঙালী-অবাঙালী বিরোধ ও অন্যটি হলো, হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্যের সৃষ্টি করা। এবং সত্যিই এই দুটি দিক থেকেই কাজ করছে ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনী। বাঙালীদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে অবাঙালীদের এবং অন্য দিকে হিন্দু জনগণকে বাঙালী মুসলিমদের থেকে বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে। উদ্দেশ্যটা সবাই বুঝবেন। বাংলাদেশের মানুষ যেমন একই লক্ষ্য থেকে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছেন, তেমনি একই ভাবে তারা ঐক্যবদ্ধ থাকবেন। শত্রুর প্ররোচনা আজ বেড়েছে সত্য, কিন্তু তাকে পরাস্ত করতে হবে। ইয়াহিয়ার আজ একটিমাত্র লক্ষ্য; দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিয়ে লুট করা। আর আমাদের লক্ষ্য হল দাঙ্গাহাঙ্গামাকে প্রতিরোধ করে জনগণের ঐক্য বজায় রাখা, লুটপাট করতে না দেওয়া এবং শেষবারের সংগ্রামে জয়লাভ করা। কেননা আমরা জানি:

লুটপাট করো দাঙ্গাহাঙ্গামাতে
তোমার প্রতাপ কোটালের চালে বটে
লুটেপুটে খাও যতো পারো দুই হাতে
সে পচা মড়াইয়ে সে কার মরণ ঘটে?

লুটেপুটে খাচ্ছে ইয়াহিয়ার সেনারা,—কিন্তু তাতে করে ওদেরই মরণ ঘটছে। তৈরী হচ্ছে হাজার হাজার মুক্তি ফৌজ। আমাদের ক্ষণিক দুর্বলতার সুযোগে বেরিয়ে এসেছে গর্তের কীটেরা। বিশ্বাসঘাতক দালালেরা, মুসলিম লীগ আর জামাতে ইসলামীর বিষাক্ত সাপেরা। বাংলাদেশের সমস্ত ভাইবোনেরা শোনো:

আজ আর বিমূঢ় আস্ফালন নয়,
দিগন্তে প্রত্যাসন্ন সর্বনাশের ঝড়;
আজকের নৈঃশব্দ হোক যুদ্ধারম্ভের স্বীকৃতি।
দুহাতে বাজাও প্রতিশোধের উন্মত্ত দামামা,
প্রার্থনা করো—
হে জীবন, হে যুগসন্ধিকালের চেতনা—
আজকে শক্তি দাও, যুগ যুগ বাঞ্ছিত দুর্দমনীয় শক্তি,
প্রাণে আর মনে দাও শীতের শেষের
তুষার-গলানো উত্তাপ।
টুকরো টুকরো করে ছেঁড়ো তোমার
অন্যায় আর ভীরুতার কলঙ্কিত কাহিনী।
শোষক আর শাসকের নিষ্ঠুর একতার বিরুদ্ধে
একত্রিত হোক আমাদের সংহতি।

কাজী নজরুল ইসলামের কথা স্মরণ রাখবেন। তিনি বলেছিলেন, হিন্দু না ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন? আর আজ যারা একথা জিজ্ঞেস করছে, তারাই জনগণের সংহতিকে বিনষ্ট করতে চাইছে। তাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হোন, নিজেদের ঐক্য বজায় রাখুন। আমরা একসঙ্গে কাজ করছি এবং একসঙ্গে জিতব।

কী আনন্দ আনন্দ অসীম
রাহুর দল ভাবে মেরেছে শেষ
প্রথম ভোরে অবাক করে দেশ
মেতেছে মিলে হিন্দু মুসলিম
জলে স্থলে অসীম তার রেশ।

রণ দামামা

দিলীপ কুমার দর

৬ই জুলাই প্রচারিত

"এসো শ্যামল সুন্দর
আনো তব তৃষ্ণাহারা তাপহারা সঙ্গসুধা
বিরহিণী চাহিয়া আছে আকাশে।"

গ্রীষ্মের খরদাহ তাপক্লিষ্ট রুদ্র রূপের পর বর্ষা তুমি এসেছ। তোমার রুম-ঝুমাঝুম নৃত্য আমার হৃদয়ে কেনিল তরঙ্গোচ্ছ্বাস তোলে না। রুদ্র দাহনের পর তোমার শ্যাম-সুন্দর সরস আগমন। আজ জনমন সঞ্জীবিত তোমার রস সিঞ্চনে। হারান সম্পদ বিয়োগ ব্যথায় বিধুরা প্রকৃতি আজ শীতল হল।

'গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি গরজে গগনে গগনে'। সেইসাথে গরজে আমার উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ মন। আজ হৃদয় দুর্জয়, অশান্ত, টানমাটান। ঘন বর্ষায় বাংলার ঘুমন্ত রাণীর তন্দ্রালু স্বপ্নাচ্ছন্ন বেশ। ঝম ঝম করে একটানা ঝরছে। ঝরে পড়া জলের সমুদ্দুরে আরও নূতন ধারা পড়ে বাঙময় হয়ে উঠছে। আমার হৃদয় সমুদ্রেও তেমনি বিক্ষুব্ধ কল্লোলধারা অশান্ত উর্মিমালা, উত্থিত-পতিত হচ্ছে ভীমবেগে। আজ 'জনতা সাগরে জেগেছে ঊর্মি টান-মাটান।' স্বাধীন বাংলায় বর্ষা এসেছে নতুন জাগরণের বাণী নিয়ে, নব উত্থানের মন্ত্র নিয়ে; ঘুম-পাড়ানীর

গান গেয়ে নয়, শিকল-ছেঁড়া বাঁধন হারার গান গেয়ে; তরুণ অরুণের বহ্নিশিখার মত প্রতিজ্ঞার ভাস্বরতা নিয়ে।

হৃদয়-বারিধি তীরে সে আহ্বানের অনুরণন। নতুন নতুন শপথের দীপ্ত প্রতিভাস, নবীন প্রত্যয়ের সুরে ঝংকৃত অসংখ্য প্রতিজ্ঞার মালা হৃদয়কে আরও কঠিন, আরো ভৈরব-রুদ্র করে তুলছে। বরষার মল্লার মঞ্জুরী উত্তরীয় আর হৃদয় পদ্মের কোমল পাঁপড়িকে আন্দোলিত করে না, বরং নব উচ্ছ্বাসে হৃদয়ের ঘুমন্ত বিদ্রোহী সত্ত্বাকে জাগিয়ে তোলে। আজ প্রাণের রুদ্রবীণায় একটি সুরের লয় মিলে—মুক্তির সুর, স্বাধীনতার সুর। রিমঝিম সুরের ঐকতান হৃদয়ের নিকুঞ্জ বনকে স্বর্ণ-মদিরায় অলস-উতল ঘুম-আর্দ্র করে তোলে না বরং বিসুভিয়াসের সুপ্ত গলিত লাভা উদগীরণ করে। বর্ষার কল-কল্লোল বারিধারা, ক্ষীণকায় স্রোতস্বিনীর উদ্দাম কলহাস্য, তালতমালের শিহরণ এখন আর হৃদয়ের পেলব তন্ত্রীতে সুন্দরের ঝংকার তোলে না বরং দুরন্ত দুর্মদ কালবোশেখীর প্রলয় বিষাণ বাজায় হৃদয়-মধ্যে। কদম্ব কেতকী-কামিনী আর কুমুদ কহলার অনুপম অনাবিল সৌন্দর্যের মধ্যে দেখি ভয়ঙ্কর সুন্দরের প্রতিভাস। স্ফীতকায়া নির্ঝরিণীর সলিল-উল্লম্ফনে রক্তের ঝিলিক চমক দিয়ে যায়। বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা আষাঢ়ের মালায় একটি রক্ত-কবরী গেঁথে যাই। যেন এক শপথের গুচ্ছ শহীদী রক্তে সিক্ত হয়ে নতুন সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করছে। বিজলী-চমকের ঝিলিকে সে প্রত্যয় আরও প্রোজ্জ্বল, আরও দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে। মেঘমল্লার রাগে নতুন করে বাজুক রণ দামামা।

"জয় নিপীড়িত প্রাণ, জয় নব উত্থান।"

"যাত্রা তব শুরু হোক হে নবীন রুদ্ধ হানি দ্বারে
নবযুগ ডাকিছে তোমারে
তোমার উত্থান মাগি ভবিষ্যৎ রহে প্রতীক্ষায়"*

*শেষের তিন পঙক্তি প্রচারিত হয় নি। উল্লেখ্য যে ১৯৭১ সালে দিলীপ কুমার ধর ছিল তের কি চৌদ্দ বছরের কিশোর বালক। রচনাকাল ১২ই আষাঢ় ১৩৭৮ বাংলা (২৭শে জুন, ১৯৭১ ইং)।

১১ই জুলাই '৭১ প্রচারিত

নকীব। (চিৎকার করে হাঁকছে) জনাব সদরে-ই-মুলুক, খান-এ-তালুক, প্যায়ারে মোহাম্মদ কেল্লা ফতে খান বাহাদুর—

ফতে। সিপাহসালার টিটিয়া খান, যুদ্ধের খবর কি?

সিপাহ। যুদ্ধ শেষ। আমাদের সেনারা এখন ক্যাম্পে বসে তুন্দুরী রুটি খাচ্ছে। আর ঘুমুচ্ছে।

দুর্মুখ খান। জনাব সদরে মুলুক, গোস্তাকি মাপ। আমি দুর্মুখ খান। মাঝে মাঝে অতীব সত্য কথা না বললে কেমন যেন অম্বলের মতো বুক জলে যায়।

ফতে। তোমার কি বক্তব্য বলে ফেল দুর্মুখ খান।

দুর্মুখ। আমাদের সিপাহসালার বুড়ো হলেও মনটা জোয়ানই আছে। উনি এইমাত্র বললেন আমাদের সেনারা নাকি যুদ্ধ শেষ করে এখন ক্যান্টনমেন্টে বসে তুন্দুরী রুটি খাচ্ছে আর ঘুমুচ্ছে।

ফতে। তুমি কি বলতে চাও?

দুর্মুখ। হুজুরে আলা আপনি তো তিন মাস হ'ল হার্ট আর মাথা ঘুরানী ব্যামোতে আপনার "মগরকী বাঙ্গালে" পা রাখতে পারেন নি। যদি মেহেরবাণী করে একবার "বাংলাদেশে" যান তাহলে দেখতে পাবেন,

ওইসব দুষ্টু বিচ্ছিন্নতাবাদী মানে মুক্তিবাহিনী প্রতিদিন আপনার প্যায়ারের সেনাদলকে এ্যায়সান ধোপা পাটকান পাটকাচ্ছে যে, সেইসব আমাদের সেনারা তুন্দুরী রুটি খাবার বদলে হাসপাতালের বেডে বাবি খাচ্ছে। ওরা ঘুমুচ্ছে ঠিকই—তবে সে ঘুম সহজে ভাংবার নয়। উঃ কি মার হুজুর—একেবারে বদন বিগড়ে দিয়েছে।

ফতেহ। খামোশ না লায়েক। মুক্তিবাহিনী, মুক্তিবাহিনী, মুক্তিবাহিনী—আমাকে পাগল না বানিয়ে ছাড়বে না দেখছি।

দুর্মুখ। গোস্তাকি মাফ জনাব। ভুলে গিয়েছিলাম, ওদের মুক্তিবাহিনী বলা চলবে না। মানে ঐসব দুষ্টু বিচ্ছিন্নতাবাদীরা।

ফতে। দুর্মুখ খানের এ কথা কি সত্য টিটিয়া খান।

সিপাহ। জনাব, মারতে গেলে মার খেতে হয়—এইটাই আমাদের যুদ্ধ কৌশল।

ফতে। তাহলে ওইসব দেশদ্রোহীদের হাতে আমার সাধের সেনাদল এখনও মার খাচ্ছে?

দুর্মুখ। খাচ্ছে মানে? এ মার—এমন মার যে হজম করা মুস্কিল। মেরে একেবারে তক্তা করে দিচ্ছে। আহা। দুর্মুখ খান, তোমার এই কথা শুনে আমার মাথাটা আবার ঘুরে উঠল। পানি।

সিপাহ। জনাব, আপনি বিচলিত হবেন না। আমাদের বীর সেনা বাহিনী জান দিয়েও দেশ রক্ষা করবে।

দুর্মুখ। দেশ রক্ষা নয়—বলুন তারা এখন পেট রক্ষায় ব্যস্ত।

ফতে। তার মানে? বেশ খোলসা করে বলো দুর্মুখ খান।

দুর্মুখ। তার মানে বুঝলেন না জনাব? আপনার সেনা দল বাংলাদেশের বুকে অভিযান চালাবার নামে, নিরীহ মানুষগুলোকে হত্যা করেছে—তাদের যথাসর্বস্ব লুটতরাজ করেছে, ব্যাঙ্ক লুটেছে। এইসব লুটের টাকায় আপনার এক একজন গরীব সেনা রাতারাতি ক্রোড়পতি বন গিয়া।

ফতে। এতো আনন্দের বিষয়। খোশ খবর।

দুর্মুখ। কিন্তু নিরানন্দে আপনি তাদের ভাসালেন জনাব। আচমকা একশো আর পাঁচশো টাকার নোটগুলোকে কাগজ করে দিয়ে আপনার ওইসব ক্রোড়পতি সেনাদের আপনি একেবারে পথে বসালেন। তারা বলছে, কেল্লা ফতে খান, আমাদের পথে বসালেন।

ফতে। সিপাহসালার এ কথা কি সত্য? এই দেখো মাথাটা আবার—

সিপাহ। আংশিক সত্য জনাব। লুটের টাকা নিয়ে সৈন্যদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে কিনা জানি না। তবে তারা পুরো মাইনে না পাওয়াতে মানে ডিফেন্স সারটিফিকেটে মাইনে দেওয়াতে দিলে বড়ই দুঃখ পেয়েছে।

ফতে। কি আর করা যাবে সিপাহসালার। যুদ্ধের ব্যয়, খয়রাতি সাহায্য বন্ধ, ব্যবসা অচল এই সবে মিলে কোষাগার প্রায় শূন্য। উঃ, মাথাটা কেমন যেন—

সিপাহ। ভাববেন না জনাব। আমাদের সেনারা মাইনে না পেলেও বীর বিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।

দুর্মুখ। হাঁ-হাঁ কুছ পরওয়া নাহি হ্যায়। পঁয়ষট্টি সালের যুদ্ধের সময় আমাদের স্বনামধন্য লারকানার নবাব নন্দন বলেছিলেন, যদি আমাদের ঘাস খেয়ে বাঁচতে হয় তবু হাজার বছর যুদ্ধ চালিয়ে যাবো। ভাগ্যিস সতেরো দিনে যুদ্ধ থেমেছিল।

সিপাহ। তুমি পরিহাস করছো দুর্মুখে খান।

দুর্মুখ। এ পরিহাস নয় সিপাহসালার। বাস্তব আর মুখের বজ্র-ঠাণ্ডা বুলি এক নয়। এর মধ্যেই শোনা যাচ্ছে, আমাদের কিছু সেনা নাকি আর বাংলাদেশের নিরীহ মানুষ খুন করতে রাজী নয়।

ফতে। ওফ্! মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল।

সিপাহ। বিচলিত হবেন না জনাব। এ নিতান্ত কিছু সেনার মুখের কথা— মনের কথা নয়।

দুর্মুখ। আমাদের বৃদ্ধ সিপাহসালার আজকাল কি তাঁর প্রতিটি সেনার অন্তরের গভীরতম তলদেশ অন্বেষণ করে এ কথা বলছেন? আপনার বীর বেলুচ সেনারা যে ধীরে ধীরে বিদ্রোহী হয়ে উঠছে। তারা নাকি এখন বলছে কাফের হত্যার নির্দেশ আমাদের দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন দেখছি আমরা যাদের খুন করছি তারা নিরীহ মানুষ, তারা মুসলমান, তারা আমার ভাই।

ফতে। ওফ্ মাথাটা আবার

সিপাহ। জনাব, আপনার মাথাটাকে অতো ঘোরাবেন না। আপনার প্রেশার আবার বেড়ে যাবে। আমার ওপর বিশ্বাস আর আস্থা রাখুন। সব ঠিক করে দেবো।

ফতে। কি করে আর আস্থা রাখি টিটিয়া খান। ইতিপূর্বে আপনি আমাকে বলেছিলেন সব স্বাভাবিক হয়ে গেছে। আমিও বিশ্বকে বুক ঠুকে

বলেছিলাম, দেখে যান বিশ্ববাসী, আমরা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে সব স্বাভাবিক করে ফেলেছি। কিন্তু কতোকগুলো বিদেশী মানুষ এদেশে এসে আপনার জারি-জুরী সব ফাঁস করে দিল। আমার মুখ হাসালেন।

দুর্মুখ। শুধু মুখ হাসালেন না, চোখের জলে নোনশ বুক ভাসালেন। আচ্ছা জনাব, যুদ্ধটা বন্ধ করে দিলে হয় না?

ফতেহ। কি বললে?

দুর্মুখ। একটু ভেবে দেখুন, আপনার জন্মদাতাও অবশেষে যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়ে নিরালায় বসে আত্মজীবনী লিখছেন আর দিলখুশবাগে পায়চারী করছেন। আপনিও না হয় সব কিছুতে ইস্তফা দিয়ে সাকী আর সুর নিয়ে খোশমহলায় বাকি জীবনটা আরাম আয়েশে কাটিয়ে দেবেন। কি দরকার এসব ঝুট ঝামেলা।

ফতেহ। দুর্মুখ খান, তোমার এই ঔদ্ধত্য স্পর্দ্ধা দেখে আমি বিস্মিত হচ্ছি। রসনা সংযত করো। এই মুহূর্তে আমি তোমাকে বহিষ্কার করতে পারি।

দুর্মুখ। পারেন না জনাব। কারণ আমি আপনার হৃদয়ের গভীরে বাস করি। সেখান থেকে আমাকে বিতাড়িত করবেন কি করে।

সিপাহ। জনাব আমি তাহলে এখন চলি।

ফতেহ। আসুন। তবে হাঁ, স্মরণ রাখবেন সাড়ে সাত কোটি মানুষকে চরম ভাবে শায়েস্তা না করা পর্যন্ত বিশ্রাম আমাদের হারাম।

সিপাহ। আমি আবার বলছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আর ক'দিন পর ওদের আমরা ফুঁরে উড়িয়ে দেবো জনাব।

দুর্মুখ। (হেসে) দেখবেন, সাড় সাত কোটি মানুষের মিলিত নিশ্বাসে আপনারা শেষে উড়ে না যান। নিজেদের গোড়া শক্ত করে রাখবেন।

সিপাহ। এ ব্যাপারে তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে। আমি চললাম জনাব। খোদা হাফেজ।

ফতেহ। খোদা হাফেজ।

দুর্মুখ। জনাব, আমাদের সিপাহসালারের ভীমরতি ধরেছে। ওকে অবসর দিন।

ফতেহ। আমিও তাই ভাবছি।

নকীব। জনাবে আলা, নারকানার নবাবজাদা আপনার দর্শন প্রার্থী।

ফতেহ। উঃ, লোকটা আবার ঝামেলা করতে আসছে।

দুর্মুখ। সেকি জনাব, বাদশাজাদা আপনার প্যায়ারের দোস্ত। সেই দোস্তকে এখন বরদাস্ত না করার কারণ?

ফতেহ। যখন প্রয়োজন ছিল দোস্তি করেছি।

দুর্মুখ। আর এখন প্রয়োজন শেষে ছোবরার মতো রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন এইতো।

ফতেহ। এইটাই আমাদের নীতি। যাও, নবাবজাদাকে পাঠিয়ে দাও।

নকীব। জো হুকুম জনাব।

দুর্মুখ। আমি কি চলে যাবো জনাব?

ফতেহ। না-না থাক। বুঝলে দুর্মুখ খাঁ, এক এক সময় তোমাকে সহ্য করতে পারি না সত্য, আবার তোমার অস্তিত্বকে অস্বীকারও করতে পারি না। আসুন, নবাবজাদা, আসন গ্রহণ করুন। তারপর কি সংবাদ।

নবাব। আমার পক্ষে আর প্রকাশ্যে চলাফেরা দুঃসাধ্য খাঁ সাহেব। কোন রকমে ছাতি দিয়ে মাথা বাঁচিয়ে চলছি।

ফতেহ। কেন?

নবাব। আমার দলের সদস্যরা আজকাল কাবনে তাগাদা শুরু করেছে। তারা বলছে, আমরা এতো তকলীফ করে সদস্য হলাম, আর এখন পর্যন্ত ক্ষুদে উজির হওয়া তো দূরের কথা, মাইনেটা পর্যন্ত পেলাম না।

ফতেহ। (হেসে) নবাবজাদা বর্তমানে পরিস্থিতি বড়ই ঘোলাটে।

দুর্মুখ। নবাবজাদা সেটা জানেন হুজুর, কারণ ওঁর হাত দিয়েই তো ঘোল চালিয়েছেন।

ফতেহ। দুর্মুখ খান!

দুর্মুখ। গোস্তাকি মাপ করবেন।

নবাব। খাঁ সাহেব আপনি আমার কাছে ওয়াদা করেছিলেন, বিচ্ছিন্নতাবাদী দের ঠাণ্ডা করেই ক্ষমতা আমার হাতে অর্পণ করবেন।

দুর্মুখ। লাগ ভেল্কি লাগ, চোখে মুখে লাগ।

NEWS COMMENTARY

by ***Ahmed Chowdhury***
(Noted film producer Alamgir Kabir)

Broadcast on 20th July '71

A frightened Yahya has threatened war. The desperate man has now brought out his last card in the game of international deception and black mail that he has been playing ever since he let loose his primitive hordes to massacre innocent human beings in Bangladesh. In an interview with a correspondent of the Financial Times of London he has threatened India with war, if, as he liked to put it, India captured any part of East Pakistan. He even hinted that if he declares War against India he will not be alone meaning he will be backed by some other states in his aggression. This, is, indeed, yet another of the series of political blunders that he and his accomplices have been committing ever since March 1, the day he dealt a lethal blow to the reemergence of democracy in Pakistan and paved the way toward total desintegration 25 days later. Yahya's threat is an expression of extreme frustration that usually makes appearance prior to a nervous breakdown. This is, in reality, a public admission of the precarious war position in Bangladesh. He has now admitted that Pak army has lost positional control over vast areas of Bangladesh. According to reports from various fronts, Pakistan Army has been retreating in all sectors following massive inspired attacks by the Liberation Forces. In the western sector, Pak Army suffered particularly heavy casualties and almost whole of Kushtia district has been recaptured by Mukti Bahini. Observers believe that these significant set-backs suffered by the Pakistan Army in this sector has been mainly responsible for Yahya's threat of war on India. Naturally he is accusing India for territories that his occupation army lost to Mukti Bahini. How could be admit that his 'invincible' army has been putting up a pathetic show against the ill-equipped but superbly inspired youths of Bangladesh Liberation Forces? The pretention that his men were

losing to mighty India is a desperate attempt at an artificial resuscitation of, at least, his own moral. But the world knows better. Scores of foreign journalists have toured the liberated areas of Bangladesh. They have also visited the camps of Mukti Bahini miles inside Bangladesh territory and talked with the commanders and commandos.

Foreign Television networks shot films of Mukti Bahini operation from war fronts. Their reports would easily testify that Indians have nothing to do with the liberation war. As a matter of principle the war is being fought only by the dedicated citizens of Bangladesh. The cause of their spectacular success has been, not a grand-scale fire-power, but a supreme sense of dedication. They were fighting for the liberation of their motherland. Pakistani invaders, even though they bristle with armoury, will never match their spirit and moral armament. But Yahya and his accomplices are too drunk with their narcotic madness to be able to recognise this. After all the war does not threaten the clique or their families. As thousands of dumb soldiers die thousands of miles away in the muddy, rain-soaked jungle of Bangladesh, these officers enjoy the cool comforts of officers mess and company of international call-girls. Swiss banks are looking after the safety of their private fortunes---fortunes that they accumulated robbing Bangladesh and Pakistan for the rainy day. When the army rank and file discover their vicious motives and make things too hot---they will have chartered Boeings to fly them with their families to the safety of Swiss Villas.

The darkly hint that Yahya will not be alone when he commits aggression against India shows that he has still remained the school boy bully he always was. Obviously he has forgotten that China never ventured outside her borders since Korea. Even the US-backed invasion of Laos could not stir her up. Whether she will come in direct military confrontation with India just to please Yahya's fascist junta is a question that is not too difficult to answer. On the other hand, India is no ginny to be frightened by muscle-flexing of a militarily sterile---and deeply frightened gang leader such as Yahya. Moreover, Yahya's self deceiving presumption that India is frienoless once again points out his total lack of political understanding.

অভিজ্ঞতার আলোকে

২৬শে জুলাই '৭১ প্রচারিত

অধ্যাপক এম, এ, সুফিয়ান

গত ২৫শে মার্চের রাত থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত নরপিশাচ এহিয়া সরকারের রক্তপিপাসু জঙ্গী বাহিনী অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। আর একদিকে একদল দালালকে ঢাকা বেতারের পার্শ্বে দণ্ডায়মান করে রাখা হয়েছে, যারা রাত দিন*...... খাঁ খাঁ শব্দে চিৎকার করে শরণার্থীদের দেশে ফেরার আহ্বান জানাচ্ছেন। আহ্, কি দরদভরা ডাক—সত্যি যেন বাংলাদেশে আর কোন অত্যাচার হচ্ছে না। কিন্তু ধাপ্পাবাজী নিমকহারামী, মোনাফেকি ও বিশ্বাস-ঘাতকতা আর কতদিন বা চলবে। আজ আর বিশ্বের রাষ্ট্রগুলির কাছে অজানা নেই যে বাংলাদেশের উপরে এহিয়া এক নারকীয় হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়েও আজ সেই সমস্ত বর্বর কুকুরেরা বাংলার বীর সন্তানদের অর্থাৎ মুক্তিবাহিনীর কাছে দিনের পর দিন পটল তুলছে। যার জলন্ত দৃষ্টান্ত বিদেশী সাংবাদিকরা ঢাকা হাসপাতাল পরিদর্শন করার পর বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছে। তখনই টিক্কা খানের টাউটগিরি বি-বি-সি নিউজে ধরা পড়ে। আর একদিকে ধাপ্পাবাজীদের ধামাচাপা বুলি দিয়ে বাংলার মানুষকে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।

কারণ গত এপ্রিল খুলনা শহর হতে আরম্ভ করে যশোরের নওয়াঁ পর্যন্ত যশোর রোডের ও রেল লাইনের পার্শ্ববর্তী লক্ষ লক্ষ মানুষের কত আশার নীড়-গুলোকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়ার পর (যেখানে শুধু ছাই দেখা যাচ্ছিল) দালালদের সহযোগিতায় লাঙ্গল দিয়ে চাষ করে ছাইগুলোকে ঢাকবার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু জাতিসংঘের হাইকমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দীন আগা খাঁ ও বিদেশী পর্যটক বাহিনীর কাছে ধরা পড়ে যায়। তারপরেও মে মাসের ৬ তারিখ হতে আরম্ভ করে দৌলতপুর থানার পার্শ্ববর্তী ও নদীর ধারের গ্রামগুলো দাদান প্রতাপ আবান গাতি, আড়ুয়া, লক্ষীখাটি ও রাধামাধবপুরের ঘরবাড়ীকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে লুটতরাজ

*শব্দটি বর্তমান পরিস্থিতিতে অভিপ্রেত নয় মনে করে ছাপলাম না।

করা হয়, যার কোন নিদর্শনই আর সেই সমস্ত এলাকায় নেই। তারপর আরম্ভ হলো কালিয়া থানার নদীর ধারের গ্রামগুলোর উপর অত্যাচার। ১২।১৩ তারিখে মে মাসে বড়দিয়া ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলো, ১৯শে মে তে মাঝিগাতি, মাধবপুর, কোলা, পায়রাবাদ, ২২শে মেতে কুলসি, মাধবপাশা ও বুড়ীরালি দিয়ে গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর ও নড়াইল মহকুমার প্রায় গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। যে সমস্ত গ্রামের লক্ষ লক্ষ মানুষের চিরজীবনের অর্জিত বাপদাদা চৌদ্দ পুরুষের ঘরবাড়ী ছিল, তার কিছুই আজ আর পৃথিবীর আলো বাতাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ মিলে না। প্রত্যেক বছরের বন্যার পানি—চিরদিনের অভ্যাসের মত এবারের পানি আর সেই সমস্ত ঘরবাড়ী খুঁজে পাবে না। গ্রাম বাংলার মাঝিরাও 'নবগঙ্গায়' মহা আনন্দে জাল নিয়ে নামে না। এত সমস্ত করেও এহিয়ার কুত্তারা ক্ষান্ত হয়নি। ১৯শে জুন হতে গাজিরহাট, জিলিনপুর, পীড়ল, নিষ্টপুর ও বুড়ীরালি গ্রামে অত্যাচার খুব বেশী আরম্ভ হয়। ১৯শে জুন বুড়ীরালি গ্রামে লুটতরাজ করার পরও ৭ জন যুবতী মেয়েকে ধরে নিয়ে যেতে দ্বিধাবোধ করেনি। ২৮শে জুন সন্ধ্যায় চন্দ্রপুর হতে * -এর স্ত্রী, বোন সুলতানা ও তার আরও তিনজন ভগ্নিকে ধরে নিয়ে যায়। নরঘাতক এহিয়ার কুকুরেরা এখন গ্রাম বাংলার মা-বোনদের উপর অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। এই সমস্ত জানোয়ারদের মা-বাবার ঠিক নেই। অবশ্য আমরা জানতাম যাদের মা বাবার ঠিক নেই তাদেরকে জারজ সন্তান বলা হয়। কিন্তু এখন দেখছি যারা মা বোন চিনে না তাদের কি বলে আখ্যায়িত করা যায়। এমনিভাবে প্রাত্যহিক গ্রাম বাংলার নদীতে গানবোটে আসার সঙ্গে সঙ্গে মা বোন-দের ইজ্জতের ভয়ে কচি কচি ছেলেমেয়েদের বুকে নিয়ে পালাতে হয়, লুকোতে হয় খাল বিলের মধ্যের কচুরীপানা, ধানগাছ ও পাট গাছের মধ্যে। তবুও রক্ষা পাওয়া যায় না। অথচ এরাই আবার ইসলামের দোহাই দিয়ে জাহির করে পাকিস্তান একটি ইসলামিক দেশ বলে। কিন্তু যে দেশে মা বোনদের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয় সে দেশ কি করে ইসলামিক দেশ হতে পারে? এত অন্যায় অবিচার ও অত্যাচার চালিয়ে এহিয়া সরকার আজও সাড়ে সাত কোটি মানুষকে আনুগত্যে আনতে পারেনি। বাংলার নয়নমণি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক বাণীগুলি গ্রাম বাংলার আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে, যার ফলে প্রত্যেক নরনারীই স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে মুক্তির আশায় দিন গুনে যায়। আর একদিকে মুক্তিবাহিনীর হাতে প্রচণ্ড মারখেয়ে পশ্চিমী পাঞ্জাবী

*গোপনীয়তা রক্ষার কারণে নাম ছাপলাম না।

কুত্তারা সীমান্ত এলাকা ছেড়ে পালাতে আরম্ভ করেছে। ওরা জানে না এটা মুক্তির লড়াই, স্বদেশ ভূমিকে মুক্ত না করা পর্যন্ত আমাদের মুক্তিবাহিনী কোন মতেই ক্ষান্ত হবে না। অথচ আবার এদিকে বাংলা দেশের প্রাইমারী শিক্ষকদের ১০ জন করে ছেলে ধরে নিয়ে ক্লাশ শুরু করার হুকুম দিয়েছে, তা নাহলে কোন শিক্ষকের চাকুরী থাকবে না। কি মজার কথা! সবই নাকি স্বাভাবিক হয়ে গেছে? কতরূপ না দেখাবে এ রঙ্গলাল। জেনারেল এহিয়া আজ আর ভাবতে পারে না, পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোন নজিরও নেই যে ভয় দেখিয়ে জোর করে বুলেট মেরে মানুষকে হত্যা করে কোনদিন কোন দেশ শাসন করা যায় না। অবশ্য ক্ষণস্থায়ী ভাবে দমন করা যেতে পারে, কিন্তু স্থায়ীত্ব লাভ করতে পারে না। যার পথ তার বড় দুই দাদা দেখিয়ে গিয়েছেন, সেই পথ লক্ষ্য করে অনুসরণ করলে হয়ত জীবনটা রক্ষা পেত, কিন্তু এবার আর রক্ষা নেই। অথচ দেড় হাজার মাইল দূর থেকে বাংলাদেশকে শাসন করার স্বপ্ন তিনি আজও দেখছেন। এযে স্বপ্নে মিষ্টি খাওয়ার মতো। কিন্তু স্বপ্নের রস গোল্লাহ্ যে মুখের মধ্যে যায় না, এটা তার জানা ছিল না। এখন শুধু কাফনই তৈরীর হচ্ছে, গোর খুঁড়ে রাখতে বাকি।

জনাব এম, এ, সুফিয়ান খুলনার স্থানীয় একটি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। স্বাধীনতার এই অগ্র সৈনিক দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার অল্পদিন পরই আততায়ীর গুলীতে নিহত হয়েছেন। (ইন্নালিল্লাহে)

—গ্রন্থকার।

চৌদ্দই আগষ্টের স্মৃতি

১৪ই আগষ্ট '৭১ প্রচারিত

জেবুন্নাহার আইভি

২৪ বছর পরে আজ ১৪ই আগষ্টে মনে পড়ছে আজ থেকে ২৪ বছর আগে-কার দিনটির কথা। সেদিন কি উজ্জ্বল ছিল বাংলাদেশ, আর প্রাণদৃপ্ত ছিল বাংলার মানুষ। সারাদেশে কাগজের রঙিন পতাকা আর মালার ছড়াছড়ি। আলোর আলোয় সারাদেশ ঝলমল। আমরা স্বাধীন হয়েছি, এবার আমাদের দুঃখ ঘুচবে। বিদেশী শাসন, জমিদারের অত্যাচার, মহাজনের শোষণ আর সামাজিক অন্যায়ের হাত থেকে রেহাই পাবে বাংলার মানুষ। সারাদেশের মানুষ অন্তরের সবটুকু দিয়ে বরণ করে নিলো ১৪ই আগষ্টের ভোরের লগ্নটি।

তারপর প্রতি বছর ১৪ই আগষ্ট ঘুরে এসেছে। বাংলার মানুষ তাদের ন্যায়-সংগত প্রত্যাশা নিয়ে প্রতি বছর ১৪ই আগষ্টের ভোরে ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। ভেবেছে যে দিনগুলো চলে গেলো সে এক ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন। এবার নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুত নতুন জীবনের বাণী বহন করে আসছে ১৪ই আগষ্ট। কিন্তু প্রতি-বারই ভুল ভেঙ্গে গেছে বাংলার মানুষের। তার অতি কাঙ্খিত জীবনের প্রতি-শ্রুতি বহন করে এলো না কোন ১৪ই আগষ্ট। বিদেশী শাসনের পরিবর্তে তার ঘাড়ে চেপে বসলো পশ্চিম পাকিস্তানী শাসন। ১৪ই আগষ্ট বাঙ্গালীর জন্যে মুক্তি নিয়ে এলো না কোনবার। শুধু তীব্রতর হলো শোষণ। জমিদারের অত্যা-চার আর মহাজনের শোষণের চাইতে পশ্চিম পাকিস্তানের আমলাতন্ত্র এবং পুঁজি-পতিদের বর্বরতম অত্যাচার ও তীব্রতর শোষণে তারা জর্জরিত হয়ে উঠলো। সামাজিক স্বীকৃতি আর অনাচারে তাদের জীবন হয়ে উঠলো দুঃসহ।

এই শৃঙ্খলিত শাসন এবং সামাজিক অবিচারের হাত থেকে প্রতিবার মুক্তি চেয়েছে বাংলাদেশের নিপীড়িত জনসাধারণ। স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে বেঁচে থাকবার প্রতিটি উপকরণের জন্যে তাদের লড়তে হয়েছে। পশ্চিম পাকি-স্তানী শাসকচক্র বাংলাদেশের প্রতিটি দাবীকে অস্বীকার করেছে, আর প্রতিটি দাবী আদায়ের জন্যে বাংলার মানুষকে লড়তে হয়েছে। ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগষ্টের পর বাংলাদেশের ইতিহাস পশ্চিম পাকিস্তানী শোষক শ্রেণীর শোষণের বিরুদ্ধে বাংলার মানুষের সংগ্রামের ইতিহাস। এই ইতিহাস গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের মানুষের রক্তাক্ত সংগ্রামের ইতিহাস।

১৯৫০ সালে রাজশাহী জেলে বাংলার বীর সন্তানেরা মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রাণ দিয়েছে, ১৯৫২ সালে ভাষার দাবীতে বাংলার মানুষ বুকের রক্ত দিয়ে তাজা তাজা প্রাণগুলো উৎসর্গ করেছে, ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন সাত কোটি বাঙ্গালীর প্রাণের দাবী ছয় দফাকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে ভাই মনু মিয়া, ১৯৬৯ সালে বাংলার স্বাধিকারের দাবীতে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবীতে বাঙ্গালীর প্রাণাপেক্ষা প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তির দাবীতে বুকের তাজা রক্তে বাংলার শ্যামল মাটি লালে-লাল করে দিয়েছে।

পশ্চিম পাকিস্তানী শোষক শ্রেণী, আমলাতন্ত্র, সামরিকচক্র এই তিন শক্তি বাংলাদেশের মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে বারবার হামলা করেছে। প্রতিবারই বাংলার সংগ্রামী জনতার প্রতিরোধের সম্মুখে পিছু হটে গিয়েছে এবং চূড়ান্ত আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়েছে। তারপর তারা তাদের চূড়ান্ত আক্রমণ পরিচালনা করলো ২৫শে মার্চের গভীর রাত্রিতে। বুলেট, সংগীন, মেশিনগান মর্টার আর বোমার আঘাতে স্তব্ধ করে দিতে চাইলো বাংলার মুক্তিকামী জনতার কণ্ঠকে। কিন্তু বাংলার মুক্তিকামী জনতার দুর্জয় প্রতিরোধের সম্মুখে আবার পিছু হটে চলেছে পশ্চিম পাকিস্তানী বর্বর শোষক শ্রেণী এবং তাদের স্বার্থবাহী সামরিকচক্র। তাদের এই অভিজ্ঞান হয়েছে যে, পরাজয় তাদের সুনিশ্চিত, মৃত্যুর ঘণ্টা বেজেছে।

বাংলায় আজ রক্তের স্রোত বইছে। ঘরে-ঘরে মাঠে-মাঠে, রাজপথে জমাট বাঁধা রক্ত। ধর্ষিতা মা-বোনদের মরণ আর্তনাদ অভিশপ্ত ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগষ্ট আর তার নায়কদের প্রতি মুহূর্তে ঘৃণার সাথে ধিক্কারে ধিক্কৃত করছে। '৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট বাংলার জন্যে এনেছে প্রতিশ্রুতির আড়ালে বঞ্চনা, শোষণ আর রক্তস্নান ; কান্না আর দীর্ঘশ্বাস।

তাই আজ ১৪ই আগষ্ট স্বাধীন বাংলার পবিত্র মাটিতে দাঁড়িয়ে শিকল ছেঁড়া বাংলার মানুষ অতীতের অপমান আর গ্লানিভরা দিনগুলোকে স্মরণ করছে প্রচণ্ড ঘৃণার সাথে। আর সে জন্যেই সেদিন ছোট ছেলেটি বললো : 'মা, কি পুণ্যই যে ছিল তোমার, যার জন্যে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্টের কলঙ্কিত দিনটির মুখ দেখতে পাইনি, আর তোমাদের মতো আমার দু' হাত দিয়ে ঐ ঘৃণ্যতম দিনটির জন্যে মালা গাঁথতে হয়নি।

(জেবুন্নাহার আইভি 'আইভি রহমান' নামেই পরিচিত। ইনি একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং রাজনৈতিক কর্মী। ব্যক্তিগত জীবনে ইনি আওয়ামী লীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক জনাব জিল্লুর রহমানের স্ত্রী। —গ্রন্থকার।

একটি উর্দু কথিকা

উর্দু'তে মূল রচনাঃ জাহিদ সিদ্দিকী

অনুবাদঃ আশরাফুল আলম

১৪ই আগষ্ট '৭১ প্রচারিত

আজ ১৪ই আগষ্ট—মৃত পাকিস্তানের জন্মদিন। এই মৃত শব্দটি শুনে চমকে উঠবার কোন কারণ নেই। গত ২৬শে মার্চের ভয়াল রাতে ইয়াহিয়া, টিক্কা এবং নিয়াজী সমবেত ভাবে পাকিস্তানকে হত্যা করেছে। ২৫ বছরের ভরা যৌবনে পাকিস্তানের মৃত্যু ঘটল। জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই দেশকে কেন্দ্র করে এই দেশেরই বিশেষ এক অঞ্চলে কি ধরণের শোষণ, অত্যাচার, চক্রান্ত চালান হয়েছিল তার বিস্তারিত বর্ণনা সম্ভব নয়। সংক্ষেপে বলছি।

গত ২৪ বছরের ইতিহাস অত্যাচার এবং বর্ব্বরতার ইতিহাস। ফ্যাসিজমের একটা জীবন্ত চিত্র। এই চব্বিশ বছরে এদেশের শাসক এবং শোষকগোষ্ঠি গণতন্ত্রের সমস্ত সর্ত ও দাবীকে পায়ের তলায় নিষ্পিষ্ট করেছে। মনুষ্যত্ববোধ এবং মানবিকতাকে বিকৃত করবার চেষ্টা করেছে। বাঙালীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ—শোষকরা এই ভয়ে ভীত হয়ে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত হতে দেয়নি। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করলে এর সমস্ত সুফল বাঙালীদের জীবনে বিরাট কল্যাণ ডেকে আনবে। তাই গণতন্ত্র যাতে প্রতিষ্ঠিত না হয় তার চক্রান্ত চালিয়ে যেতে লাগল। এবং ধর্ম ও সংহতির নামে গণতন্ত্রের পথকে রুদ্ধ করা হল। শোষকগোষ্ঠির ধারণা ছিল বাঙালীরা ধর্মভীরু। ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে তারা তাদের স্বার্থসিদ্ধি করে নেবে। ইসলামের নামে অর্থনৈতিক শোষণ, এমনকি ভাষা ও সংস্কৃতির উপর হস্তক্ষেপ শুরু করল। এই শোষণ থেকে বেলুচিস্তান এমনকি সিন্ধুকেও মুক্তি দেয়া হল না। সিন্ধুর জনগণের কবি শেখ আয়াজকে তারা কারারুদ্ধ করল।

সীমান্ত প্রদেশের জনগণের কবি ফারেগ বোখারীকে জেলে পুরে নির্যাতন চালান। উপমহাদেশের প্রবীণ রাজনৈতিক নেতা খান আবদুল গফ্ফার খানকে মানবতামুখী কার্যকলাপের দোষে তাঁর মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করল। এমনকি নির্যাতিত বেলুচীদের মৌলিক দাবীগুলোকে নস্যাৎ করে দেবার জন্য ঈদের জামাতে অমানুষিক ভাবে বোমা বর্ষণ করা হয়েছিল।

সাম্প্রতিক একটা ভয়ঙ্কর চক্রান্তের কথা উল্লেখ করছি। প্রতিরক্ষা খাতে মোট ব্যয়ের ৬০ ভাগ দিত বাংলাদেশ এবং মাত্র ৪০ ভাগ দিত পশ্চিম পাকিস্তান। বর্তমান শাসকচক্র সুস্পষ্টভাবে জানত বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। আর তাই বাংলাদেশে যুদ্ধের আগুন আরো প্রচণ্ড ভাবে জ্বালিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের সৈন্যদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইছে। যাতে ভবিষ্যতে বেঁচে থাকা এইসব সৈন্যের ব্যয়ভার আর তাদের বহন করতে না হয়। একবার ভেবে দেখুন যে দেশের ভৌগলিক পরিবেশ তাদের অপরিচিত, যে দেশের জলবায়ুতে তাদের দৈনন্দিন জীবন অভ্যস্ত নয়, সে দেশে ১৫শ মাইল দূর থেকে এসে এই নদীমাতৃক সমতল ভূমিতে তারা কি পেতে পারে একমাত্র অসহায় মৃত্যু ছাড়া ?

নাট্যকার খুনী ইয়াহিয়া এই রক্তাক্ত নাটকের পরিকল্পনা অনেক পূর্বেই করেছিল। এই নাটকের সবচেয়ে ঘৃণিত ও ভয়ঙ্কর চরিত্র টিক্কা খাঁকে সে একবার প্রশ্ন করেছিল, "বল, তুমি ৭২ ঘণ্টার মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে আয়ত্বে আনতে পারবে কি না ?"

টিক্কা বিনা দ্বিধায় চট করে উত্তর দিয়েছিল, "হুজুর ৭২ ঘণ্টা নয়, বলুন ২৪ ঘণ্টার ভেতরে আমি বাংলাদেশকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারব। শুধু দশ বিশলাখ বাঙালীর রক্তের প্রয়োজন।"

এই উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে নাট্যকার ঘাতক ইয়াহিয়া 'আহাম্মকের স্বর্গ' ইসলামাবাদে চলে যায়। পেছনে পড়ে থাকে সেই রক্তাক্ত নাটকের মঞ্চ বাংলাদেশ।

২৫শে মার্চের সেই ভয়াল রাতে নরঘাতক টিক্কা তার সশস্ত্র বর্ব্বর বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল নিরস্ত্র, নিরীহ বাংলাদেশের মানুষের উপর। কামানের কুটিল গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে 'জয়বাংলা' ধ্বনি আরও প্রচণ্ড রূপ নিয়ে ছড়িয়ে পড়ল বাংলার আকাশে-বাতাসে। টিক্কা খান এতে হতভম্ব হয়ে ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী এদেরকে নির্বিচারে হত্যা করার আদেশ দিল। পশ্চিম পাকিস্তানী বর্ব্বর পশুরা দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, সমস্ত বাংলা জুড়ে চালাল, হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ। গ্রামের পর গ্রাম তারা পুড়িয়ে দিল। বাংলার মাটিতে শুধু রক্ত আর রক্ত। একদিকে এইসব অত্যাচার অন্যদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শক্তি ও মনোবল দিন দিন বেড়েই চলল। বাংলার জনতা এক হয়ে একটা ইস্পাতের দেয়াল হয়ে গেল। রক্তলোলুপ হায়নারা জানত না এরা বাংলার সন্তান, এরা সুন্দর বনের ভয়ঙ্কর বাঘের সাথে খেলে, প্রচণ্ড ঝড়ের সাথে পাঞ্জা লড়ে এবং মৃত্যুর চোখের উপর চোখ রেখে হাসে।

গত ২৫শে মার্চের পরে টিক্কা খাঁর ২৪ ঘন্টা, ঘন্টা থেকে দিনে, দিন থেকে, মাসে অতিক্রম করল। এখন স্বাধীনতা সংগ্রামের ৫ মাস। শত্রু কবলিত বেতার থেকে প্রত্যহ তারা প্রচারণা চালাচ্ছে অবস্থা স্বাভাবিক বলে। অথচ প্রায় সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন, বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত, অফিসের দরজায় দরজায় তালা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ, কারখানার চাকা নিস্তব্ধ, মুক্তিবাহিনীর প্রবল আক্রমণের মুখে বর্ব্বর সৈন্যরা পালাবার পথ খুঁজছে, সত্তর জন সামরিক পদস্থ অফিসার প্রাণ ভয়ে আকাশ পথে পাড়ি জমিয়েছে। এইসব অফিসাররা তো আকাশ পথে পাড়ি জমাবেই, বিপদ আসবে শুধু সাধারণ সৈনাদের উপর। কেনই বা আসবে না? তাদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়াই তো শাসকগোষ্ঠির উদ্দেশ্য। সামরিক পদস্থ কোন অফিসার যুদ্ধে মারা গেলে তাদের মৃতদেহ কাঠের তৈরী কফিনে ভরে পাঠিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু সাধারণ সৈন্য মারা গেলে তাদেরকে বাংলাদেশের মাটিতে মাটি চাপা দিয়ে দায়সারা কাজ সারে। এটাই তো ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ।

মিথ্যের সম্রাট ইয়াহিয়া খান ইরাণে বলেছে হিন্দুদের ভোটে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জয়ী হয়েছে। চমৎকার! মিথ্যের সম্রাট চমৎকার! তোমার ওষ্ঠদ্বয়ই শুধু নয়, মিথ্যে বলার তোমার জিভের দৌরাত্মও অসীম। নিজের ঘৃণিত কার্য-কলাপকে ঢেকে ফেলার জন্য আর কত মিথ্যা তুমি বলবে? শোন এহিয়া খাঁ, কান খুলে শোন, বাংলাদেশ স্বাধীন এবং এটা ধ্রুবতারার মত জীবন্ত সত্য। তোমাদের তথাকথিত পাকিস্তান মৃত, তার গলিত শবদেহকে সত্বর কবরস্থ কর, নৈলে পচন ধরা দেহের দুর্গন্ধ বাতাস বিষাক্ত করে তুলবে, মারাত্মক বীজাণু ছড়াবে বাতাসে বাতাসে। ইরাণের সেই নোংরা বিবৃতিতে তুমি আরও বলেছ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তুমি শাস্তি দেবে। সাড়ে সাত কোটি মানুষের হৃদয় যার স্পন্দনে স্পন্দিত, তাকে তুমি শাস্তি দেবে কি করে? শেখ মুজিব শুধু একজন ব্যক্তির নাম নয়, তাঁর ব্যক্তিত্ব সমস্ত বাঙালীর জন্য একটা আলোকস্তম্ভ—যে আলো পথ নির্দেশ করবে একটা শোষণহীন জাতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য। জেনে রেখো আমরা যারা বাঙালী তারা তোমাদের মত শোষকদেরকে এ দেশের মাটি থেকে নিশ্চিহ্ন করব। বাংলাদেশে নব-ইতিহাস সূচিত হবে, বাংলার আকাশ-বাতাসকে রবীন্দ্র, নজরুলের সঙ্গীত মুখরিত করে তুলবে। বিশ্বের ইতিহাসে ফেরাউন, নমরুদ, ইয়াজিদ চেঙ্গিস, হালাকুর নামের সাথে আর একটা নাম কলঙ্কিত হয়ে থাকবে। সে নাম তোর, নরঘাতক হায়েনা ইয়াহিয়া. সে নাম তোর।

জয় বাংলা

দর্পণ

আশরাফুল আলম

১৬ই আগষ্ট '৭১ প্রচারিত

ক্যাম্পে বসে বসে সে তার পুরানো দিনগুলোর কথা ভাবছিল। সেই নদী, শীতের সকাল, গ্রামকে বিলুপ্ত করে দেয়া কুয়াশা, সোনাগাছির চরের উপর প্রসন্ন বুনো হাঁস, পানিতে ভেসে বেড়ান পানকৌড়ি; বন্দুকের শব্দ, পরাণ মাঝির চোখ এক এক করে সব কথাই মনে পড়ছে। প্রথম যেদিন বন্দুক থেকে গুলি ছুড়েছিল সে দিনের কথাও।

সোনাগাছির চর পাখী শিকারের জন্য বিখ্যাত। শীতকালে নদী ক্রমশঃ শুকিয়ে এলে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে চর পড়ে। এই চর থেকে প্রায় মাইল তিনেক দূরে তোরণের বাড়ী। বাড়ী বলতে অবশ্য ছোট দুটি কুঁড়ে ঘর, একটা আম গাছ, গোটা কয়েক সুপারী গাছ। চালের উপর সারা বছর কুমড়ো গাছের লতা ছেয়ে থাকে। শীতের খুব ভোরে উঠে তোরণ সোজা চলে আসত নদীর পারে। বর্ষা পরিত্যক্ত নদীর পরিসর তখন অনেক ছোট হয়ে গেছে। ঘাটে বাঁধা নৌকায় নদী পার হয়ে, চরের শিশিরে ভিজে ওঠা বালুর উপর দিয়ে আরও মাইল খানেক হাঁটার পর এলোমেলো চরের মাঝ দিয়ে বয়ে যাওয়া একটা খালের পারে এসে দাঁড়াত। খালের পাশেই বালুর উপর দুটো ছই পাতা। তার একটাতে খড়ের উপর কাঁথা মুড়ি দিয়ে বৃদ্ধ পরাণ মাঝি তখনও ঘুমাচ্ছে। তোরণ তাকে ডেকে তুলতো। খালে বেড় দিয়ে মাছ ধরার যন্ত্র সারারাত পেতে রাখা হত। তোরণ আর পরাণ দু'জনে মিলে গামছা পড়ে সব মাছ খাচিতে ঝেড়ে তুলতো। তারপর তোরণ নিজ হাতে ছোট ছোট কাঠের টুকরো দিয়ে মালসা জ্বালিয়ে তাতে দু-জনেই হাত পা সেঁকে নিত। পরাণ নিজ হাতে হুকো ধরিয়ে হাত পা সেঁকতে সেঁকতে আয়েশ করে খোঁচা খোঁচা মুখে ধোঁয়া ছাড়ত। এরপর একটা বাঁশের টুকরোও দু'পাশে দুটো খাচি বেঁধে নিয়ে নদীর ঘাট পার হয়ে কুয়াশা ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে যেত গঞ্জের দিকে।

মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পের বাইরে রাতের অন্ধকারে বসে থাকা তোরণের এক এক করে অনেক কথাই মনে পড়ল। তখন ওর বয়স প্রায় ২৩ বছর। বছর

ন'বছর পূর্বে ওর বাবা মারা গেছে। সংসারে একমাত্র বৃদ্ধা মা ছাড়া আর কেউ নেই। পনের বছর বয়স থেকে সে পরাণ মাঝির সাথে কাজ করে। বৃদ্ধ পরাণ তাকে ছেলের চেয়েও বেশী স্নেহ করত।

সে শীতের সেই সকালগুলোর কথা ভাবছিল। পরাণ গঞ্জের দিকে বেরিয়ে গেলে, তোরণ মালসার পাশে বসে নতুন করে হুকো ধরিয়ে পরাণের মত ভঙ্গিতে টানতো। ক্রমে ক্রমে কোন কোন দিন কুয়াশা আরও পাতলা হয়ে আসত, কোন কোন দিন আরও ঘন হয়ে ছড়িয়ে পড়ে চরের বালু পর্যন্ত বিলুপ্ত করে দিত। সূর্য উঠবে উঠবে ভোর বেলার ভাবটা যখন এই রকম ঠিক তেমনি সময় থেকে সোনাগাজির চরে অসংখ্য সৌখিন শিকারীর পায়ের ছাপ পড়তে শুরু করত। এবং তাদের সবাইকে যেতে হ'ত পরাণ মাঝির মাছ ধরার জায়গার উপর দিয়ে। তারপরই বিস্তীর্ণ চর—যেদিকে খুশী চলে যাওয়া যায়। এইসব শিকারীদের একজনের কাছ থেকে সে প্রথম বন্দুক চালান শিখে।

সেদিনও তোরণ যথারীতি বসে বসে হুকো টানছিল। বন্দুক হাতে জনা-তিনেক লোক তার কাছে এসে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল, চরের কোন অঞ্চলটায় ভাল পাখী পাওয়া যায় এবং এর জন্য তোরণকে তারা সঙ্গে নিতে চায়। উপযুক্ত পারিশ্রমিকের কথাও তারা উল্লেখ করল। তোরণ বন্দুক কোন দিন নিয়ে পর্যন্ত দেখেনি। চট করে তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। বলল, "যাবার পারুম এক শর্তেত হামাক বন্দুক মারা শিখাবার নাগিবে।" যে ভদ্রলোক কালো একটা ওভারকোট গায়ে দিয়েছিলেন তিনি হেসে উঠলেন। মাছ মেরে শখ মেটে না পাখী মারার ভীষণ শখ, তাই না?

তোরণ কোন উত্তর দেয়নি, ভদ্রলোকরা রাজি হয়ে গেল। সেদিনই সে প্রথম বন্দুক ছুঁড়লে। লাল একটা কার্তুজ ভরে যখন তার হাতে বন্দুকটা দিল তখন সে নতুন একটা অভিজ্ঞতা অর্জনের আনন্দে কেঁপে উঠেছিল, কিছুটা ভয়ও কর-ছিল। নির্দেশ মত বাটটা বুকের কাছে শক্ত করে ধরে ট্রিগারটা ডান হাতের আঙ্গুল দিয়ে চেপে দিয়েছিল। এখনও সেই দিনের কথা ভাবলে তোরণের নাকে বারুদের গন্ধ এসে লাগে।

সেই দিনের থেকেই প্রায় প্রত্যেক দিন বন্দুক ছোঁড়ার শর্তে চরের যেসব অঞ্চলে প্রচুর পাখী সেইসব এলাকায় শিকারীদের নিয়ে যেত। তারপর দুপুর বেলা মাছ ধরার ডেরায় ফিরে আসত। ভোরে গঞ্জে যাওয়া বৃদ্ধ পরাণ দুপুর গড়িয়ে গেলে ফিরে আসত। আসার সময় বাড়ী থেকে খেয়ে আসত। পরাণ

ফিরে এলেই তোরণ বাড়ীতে ফিরে যেত। আবার সন্ধ্যে বেলার দিকে কিছুক্ষণের জন্য আসত। তারপর আবার সেই ভোরের দিকে।

মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পের বাইরে বসে এক এক করে তোরণের সব কথা মনে পড়ল। কবে তার বাবা মরে গিয়েছিল, কবে একবার নদীর পাঁকে পড়ে ডুবতে ডুবতে আশ্চর্য ভাবে বেঁচে এসেছিল, একবার মাছের ডেরা ফেলে যাত্রা শোনার জন্য বুড়ো পরাণ মাঝি তাকে ভীষণ মেরেছিল। সব কথা এক এক করে মনে পড়ছে। কিন্তু এক দিনের কথা তোরণ কিছুতেই ভুলতে পারে না। একদিন দেখল অসংখ্য নৌকায় চড়ে দলে দলে সব লোক যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করে জানতে পারল কুড়িগ্রামে নাকি বিরাট মিটিং—শেখ মুজিব বক্তৃতা করবেন। অতি পরিচিত নামটা শুনে তোরণ যেন সম্মোহিত হয়ে গেল। বলে কয়ে কুড়ি-গ্রামমুখী একটা নৌকায় উঠে বসল।

এখনও মনে পড়ছে কি সে মিটিং। লক্ষ লক্ষ লোক যেন ফেটে পড়তে চাইছে। অসংখ্য স্পীকার লাগান হয়েছে। ভীড়ে দম বন্ধ হয়ে আসার যোগাড়। শেখ মুজিব বক্তৃতা দিলেন, বাঙলার কথা বললেন, বাঙলার মানুষের কথা বললেন। তোরণ নিষ্পলক দৃষ্টিতে সমস্ত বক্তৃতা শুনলো।

মিটিং ভাঙ্গলে মুষলধারে বৃষ্টি নামল। বৃষ্টির মধ্যে ভিজে ফিরতি কোন এক নৌকায় ফিরে এসেছিল। ভোর রাতের দিকে তাকে ঘাটে নামিয়ে দিল। তোরণ ভয়ে ভয়ে মাছের ডেরায় ফিরে এসে দেখলো ছইএর নীচে পরাণ চাচা নেই। সে অবাক হয়ে গেল। এরকম একটা ব্যতিক্রম পরাণ মাঝির জীবনে নেই বললে চলে। ভোরের দিকে মাঝি ফিরে এলো। জিজ্ঞেস করে জানতে পেলো পরাণ মাঝিও মিটিংএ গিয়েছিল। মাছের ডেরা ফেলে মিটিংএ যাওয়া পরাণ মাঝির জীবনে এই প্রথম।

তোরণের জীবন থেকে একটা একটা দিন প্রতিদিনের মত খসে যেতে লাগল। এক সময় সারা দেশ জুড়ে ভোট হল, শেখ মুজিব নির্বাচিত হলেন। তারপর বাংলার বুকে খুব দ্রুত কতগুলো দৃশ্যান্তর ঘটে গেল। ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তর না করার চক্রান্ত ফাঁদলেন। আবার নতুন করে শুরু হল শ্লোগান, মিটিং, পোষ্টার, ব্যানার। ঢাকায় শেখ মুজিবের সাথে ইয়াহিয়া ভুট্টোর বৈঠক বসল।

গঞ্জ থেকে ফিরে আসা লোকজনের কাছ থেকে সব খবরই সে পেত। কিন্তু পরাণ মাঝি বিশ্বাস করত না। তোরণও বিশ্বাস করত না। 'ভোট দিনু যাক', ক্ষমতাও যাবার নয় এটা হবার পারে না।"

পরাণ মাঝি তখন নিশ্চিন্তে মাছের ডেরা নিয়ে ব্যস্ত।

একদিন দেখল গঞ্জ থেকে ফিরে আসা লোকগুলো খুব উত্তেজিত। প্রায় প্রত্যেকের হাতে একটা করে পত্রিকা। গ্রামের ছাত্ররা দল বেঁধে যেন দিন রাত কি সব শলা-পরামর্শ করে। থানার পুলিশদের মধ্যেও একি উত্তেজনা।

তারপর একদিন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল—বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। ভোরে গঞ্জের দিকে বেরিয়ে যাওয়া পরাণ মাঝি ফিরে এলো না। অন্যান্য দিন গঞ্জ থেকে সারি সারি নৌকো ফিরতো। সে সবও দেখা গেল না। রাত্রি বেলার দিকে সে মাঝির বাড়ীতে গিয়ে দেখা করল। না তখনও মাঝি ফেরেনি। তারপর রাত আরও বাড়লে গঞ্জ থেকে পালিয়ে আসা এক জনের কাছ থেকে জানতে পারল বন্দরের উপর পশ্চিমা সৈন্যবাহিনী প্রচণ্ড গুলি চালিয়েছে। তোরণ মুহূর্তেই ভেঙ্গে পড়ল। কোন দুর্ঘটনা না ঘটলে পরাণ মাঝি নিশ্চয়ই ফিরে আসত।

পরের দিন তোরণ গঞ্জের দিকে রওয়ানা দিল। স্কুলবাড়ীর থেকে একটু দূরে পাটের গুদামের পাশ দিয়ে গঞ্জের ভেতর ঢুকতে যাবে এমন সময় সমস্ত গা ছমছম করে উঠল। একটা লোকজন নেই। সমস্ত দোকান পাঠ বন্ধ। আর একটু অগ্রসর হতেই দেখতে পেল বাজারের পোড়া ধ্বংসাবশেষ। তোরণের আর ভেতরে ঢোকার সাহস হয়নি। জোরে পা চালিয়ে বেড়িয়ে সোজা গ্রামে চলে এসেছিল।

তোরণের এখন অন্য জীবন শুরু হয়েছে। বসে বসে পরাণ মাঝির চোখ দুটোর কথা মনে করল। সেই চোখ দুটো থেকে তোরণের জন্য সবসময় স্নেহ ঝরে পড়ত। না, পরাণ মাঝি আর গঞ্জ থেকে ফিরে আসেনি। সব বুঝতে পেরে তোরণ মাছের ভেরার পাশে বসে একলা একলা কেঁদেছিল। বাড়ীতে পরাণের বউও কেঁদেছিল।

তারপর পশ্চিমা সৈন্যরা ক্রমে ক্রমে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। একদিন তোরণ মাছের ভেরায় কাজ করছিল। এমন সময় তাদের গ্রামের দিক থেকে গুলির শব্দ শুনতে পেল। তোরণের ছেঁড়া জাল মেরামত করা বন্ধ হয়ে গেল। সে খুব ভয় পেয়েছে। ঘণ্টা খানেক পর গুলির শব্দ থেমে গেলো। বাড়ীতে ফেরার সময় বার বার কেন যেন পরাণ চাচার কথা মনে পড়ল। গঞ্জে গুলি হয়েছিল। পরাণ চাচা আর ফিরে আসেনি। মা, পরাণ চাচার বউ এখনও কি বেঁচে আছে? ঘাটে নৌকো পেল না। পশ্চিমা দস্যুরা নৌকো ডুবিয়ে দিয়েছে। সাঁতরে তোরণ নদী পার হ'ল।

তোরণ এখন মুক্তিযোদ্ধা। গতকাল একটা অপারেশনে গিয়েছিল। আবার আগামীকাল রাতের অন্ধকারে পশ্চিমা দস্যুদের খোঁজে গ্রেনেড, এল, এম, জি নিয়ে কয়েকজন মিলে বেরিয়ে যেতে হবে। আজ রাতটায় শুধু একটুখানি বিশ্রাম।

ক্যাম্পের বাইরের একটা অন্ধকার গাছের নীচে বসে বসে তোরণ এইসব ভাবছিল। সাঁতরে নদী পার হয়ে কাছাকাছি আসতেই সে মাথায় হাত দিয়ে ধপ করে মাটিতে বসে পড়েছিল। গ্রামের ঘরগুলো পুড়ে ছাই হয়ে মাটির সাথে মিশে গেছে। ঠিক শশ্মানের পরিত্যক্ত চিতার মত। গ্রামের ভেতর ঢুকে দেখতে পেল গুলি চালনার সময় যারা পালিয়ে বেঁচেছিল এরা ফিরে এসে ছাইয়ের ভেতর থেকে তাদের আপন জনের মৃত লাশ খুঁজছে। তোরণ পাগলের মত দৌড়ে তার বাড়ীর দিকে ছুটে গেল। ভিটের উপর তার মায়ের কোন চিহ্ন খুঁজে পেল না। তারপর বাড়ীর আশে পাশের ফিরে আসা দু'চারজন লোককে জিজ্ঞেস করল। তারা কেউ কিছু বলতে পারল না। তোরণ পাগলের মত বাড়ীর পেছনের বাঁশ ঝাড়ের ভেতর ঢুকে পড়ল। এমনওতো হতে পারে গুলি খেয়ে বাঁশ ঝাড়ে ঢুকে সেখানেই মারা গেছে। তন্নতন্ন করে সেখানে খুঁজতে লাগল। সেখানেও পেল না। তারপর বাড়ীর ভিটে থেকে আরও দূরে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল।

ক্যাম্পের বাইরে বসে থাকা তোরণের চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা উত্তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। তাদের গ্রাম থেকে আধ মাইল খানেক দূরে একটা আম বাগান আছে। তারি ভেতর তার মায়ের লাশের পাশে হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বসে পড়েছিল তোরণ। এখনও মায়ের কথা মনে পড়লে মায়ের কণ্ঠস্বর যেন কানে এসে বাজে। শীতের খুব ভোরে মাছ ধরার ভেরার দিকে যাবার সময় মা তাকে বলতো 'জার নাগিবে রে তোরণ, জার নাগিবে। মোর একখান শাড়ী জড়ায়া নে ক্যানে?"

এই মা আর কোনদিন ফিরে আসবে না। তোরণ শুধু ভাবছে। সে প্রাইমারী পর্যন্ত পড়েছিল। তারি বন্ধু কাজল। সে এখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে। তার সাথে একদিন দেখা হয়ে গেল। সেই তাকে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে আসে।

শেষবারের মত তার মায়ের কাঁচা কবরের পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তার পোড়ো ভিটেটাকে পেছনে ফেলে রেখে কখনও নৌকায়, কখনও হেঁটে কাজলের সাথে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে চলে এসেছিল।

প্রায় মাস দুয়েক হয়ে গেল। রাতের পর রাত জেগেছে। আক্রমণের পর আক্রমণ চালিয়েছে। কিন্তু তোরণের মধ্যে আজ পর্যন্ত বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নামেনি। সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে দিনের পর দিন লড়াই করে চলেছে। সে জানে মাকে আর কোনদিন সে ফিরে পাবে না। পরাণ মাঝি আর কোন দিন ফিরে আসবে না। প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হয়ে সে লড়ছে। তোরণ আবার সেই ফেলে আসা শীতের সকাল, গ্রামকে বিলুপ্ত করে দেয়া কুয়াশা, পানিতে ভেসে বেড়ান পানকৌড়ি, সোনাপাত্রির চরের উপর প্রসন্ন বুনো হাঁস এইসব হারিয়ে যাওয়া টুকরো টুকরো সুখ আগের মত ফিরে পেতে চায়।

১২ই সেপ্টেম্বর '৭১ প্রচারিত

যেখানে অন্যায় সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়, যেখানে মানুষ মানুষের রক্ত চোষে, যে দেশে রক্তের স্রোত বয়, পংকিলতা আর কুটিলতার শত আচ্ছাদন ভেদ করে, সেখানেই ফুটে ওঠে নতুন সূর্য। রক্ত নদীর ঢেউ চুরমার করে দেয় শোষণ-নির্যাতনের যাঁতাকল। এটাই চিরন্তন সত্য আর এই মহাসত্যের ভিত্তিতেই এই নরম রোদের দেশ বাংলার আজ আমরা হয়েছি সৈনিক। পক্ষান্তরে পাক জঙ্গীশাহী বাংলাদেশে শোষণ, নির্যাতন ও নির্বিচার গণহত্যা চালিয়েও যখন আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব বিপন্ন করতে পারেনি বরং বাংলাদেশের অর্থের ওপর নির্ভরশীল গোটা পশ্চিম পাকিস্তানই টুকরো টুকরো হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে, তখন গোয়েবলসীয় মিথ্যা প্রচারণায় বিশ্বজনমতকে ধোঁকা দেবার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে ইয়াহিয়া চক্র।

বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকায় খুনী টিক্কার পরিবর্তে ডাক্তার মালিককে গভর্নর নিয়োগ এমন একটি চক্রান্ত। এর পেছনে জঙ্গীশাহীর চারটি উদ্দেশ্য রয়েছে। প্রথমতঃ বাঙ্গালী গভর্নর নিয়োগ করে বাঙ্গালীদের বিভ্রান্ত করে যুদ্ধকে দুর্বল করে দেয়া। দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় বেসামরিক প্রশাসন চালু হচ্ছে বলে বিশ্ব-বিবেককে ধোঁকা দেয়া।

ডাক্তার মালিককে গভর্নর নিয়োগের তৃতীয় কারণটি হচ্ছে : ইয়াহিয়া খান একটা ব্যাপারে অত্যন্ত সুনিশ্চিত যে বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকার গভর্নর আজ হোক কাল হোক মুক্তিযোদ্ধা গেরিলাদের হাতে নিহত হবেই। সুতরাং

জঙ্গীশাহীর কথা হচ্ছে, মরবেই যখন পশ্চিম পাকিস্তানী কেন, একজন বাঙ্গালীই মরুক। চতুর্থ এবং প্রধান কারণটি হচ্ছে বেসামরিক প্রশাসনের মুখোশ পরে ভেঙ্গে পড়া অর্থনৈতিক অবস্থাকে চাঙ্গা করবার জন্য বৈদেশিক সাহায্য বাগানো। কারণ বাংলাদেশ পরিস্থিতির জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা জঙ্গীশাহীকে সাহায্যদান বন্ধ করে দিয়েছে।

ডাক্তার মালিককে গভর্নর নিয়োগের দুরভিসন্ধি ধরা পড়ে গেছে বিশ্ব বিবেকের কাছে। তাই বিশ্বের নামকরা পত্রপত্রিকা ও বেতারে এ ব্যাপারে ইয়াহিয়া চক্রের কঠোর সমালোচনা করা হচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ান ব্রডকাস্টিং কমিশনের রিপোর্টার মিঃ শোয়ান ও কনার ঢাকা সফর শেষে বলেছেন, "টিক্কা খানকে সরিয়ে ডাঃ মালিককে দখলীকৃত এলাকার গভর্নর নিয়োগের আসল উদ্দেশ্য বিদেশী সাহায্য বাগানো এবং বিশ্বজনমতকে বিভ্রান্ত করা।"

এ প্রসঙ্গে গার্ডিয়ান পত্রিকার মিঃ মার্টিন এডিনি বি, বি, সি থেকে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় অসামরিক গবর্ণর নিয়োগ করা হলেও সামরিক তৎপরতার কোন পরিবর্তন ঘটবে না। অর্থাৎ বাংলার নিরীহ জনগণের ওপর পাক বর্বরতা ঠিকই চলবে এবং বেসামরিক গভর্ণর ডাঃ মালিক সামরিক বাহিনীর হাতের পুতুল মাত্র।"

জন্মভূমি থেকে হানাদারদের নিশ্চিহ্ন করে দেশকে মনের মতো করে গড়ে তুলতে আজ আমরা বদ্ধপরিকর। আমাদের দুর্বার প্রতিরোধের সম্মুখে টিকতে না পেরে দখলীকৃত এলাকায় জাতিসংঘের রিলিফ কর্মী নিয়োগের আরেকটি চক্রান্ত এঁটেছে জঙ্গীশাহী। কিন্তু আমরা জানি এই রিলিফ কর্মী নিয়োগের আসল উদ্দেশ্য কি। জঙ্গীশাহী চাচ্ছে : রিলিফ কর্মীর কথা বলে বাংলার বুভুক্ষু জনতাকে যেমন যুদ্ধ সম্পর্কে বিভ্রান্ত করা যাবে ; তেমনি বিশ্বজনমতকে বাঙ্গালীর দরদী সেজে ধোঁকা দেয়া যাবে।

আমরা এও জানি জাতিসংঘের এই তথাকথিত রিলিফ কর্মীদের বাংলাদেশে নিয়োগের উদ্দেশ্য হচ্ছে জঙ্গীশাহীর বর্বরতা ও পৈশাচিকতায় সহায়তা করা। অর্থাৎ এদের ভূমিকা হবে দস্যুবাহিনীর দালালদের মতো। অতএব দালালদের প্রতি আমাদের যে ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে এদের প্রতিও তাই করা হবে।

এই প্রসঙ্গে বি, বি, সি থেকে বলা হয়েছে "বাংলাদেশে গেরিলা বাহিনীর একজন মুখপাত্র জাতিসংঘকে এই বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন যে তাদের রিলিফ কর্মীদের জঙ্গীশাহীর দালাল বলেই গণ্য করা হবে এবং তারা দালালদের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থারই আওতায় পড়বে।" বি, বি, সি থেকে আরও বলা হয়, "এ

ব্যাপারে জাতিসংঘ থেকে কোন মন্তব্য করা হয়নি। তবে অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, বাংলাদেশ গেরিলা বাহিনীর মুখপাত্রের এই হুঁশিয়ারি জাতিসংঘকে বেশ খানিকটা ভাবিয়ে তুলেছে।"

ভয়েস অব আমেরিকা থেকে বলা হয়, "ডেমোক্রেট দলের নেতা এডওয়ার্ড কেনেডির মতো রিপাবলিকান দলীয় সিনেটর, পার্সী ও পাকিস্তান সরকারকে আমেরিকান সাহায্য দান বন্ধের দাবী জানান।"

বি, বি, সি'র রিপোর্টার মিঃ মার্টিন বেল সম্প্রতি শরণার্থী শিবিরগুলো পরিদর্শনের জন্য ভারত সফরে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি শরণার্থীদের অসীম দুঃখ-দুর্দশাই প্রত্যক্ষ করেননি—শুনেছেন পাক জঙ্গীশাহীর চরম বর্বরতা ও পৈশাচিকতার অনেক করুণ কাহিনী। কিন্তু তিনি লাখ লাখ লাঞ্ছিত মানুষের শুধু একটা প্রাণই দেখেছেন। শুনেছেন একই কথা। চাপ যন্ত্রণায় সে কথা চাপা পড়ে যায়নি এবং আরো বলিষ্ঠ হয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে গোটা বিশ্বে। আর সে কথাটি হচ্ছে বাঙ্গালীর অন্তর মথিত হৃদয়-সঙ্গীত "জয় বাংলা"।

অমর ১৭ই সেপ্টেম্বর স্মরণে

ডঃ আনিসুজ্জামান

১৭ই সেপ্টেম্বর '৭১ প্রচারিত

পাকিস্তান সরকারের স্বৈরাচারী শাসনের প্রতিবাদে বাংলাদেশের দীর্ঘকাল-ব্যাপী সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯৬২ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর একটি স্মরণীয় দিন। এইদিন বাংলাদেশের ছাত্রেরা বুকের রক্ত দিয়ে সরকারী শিক্ষানীতির প্রতিবাদ করেছিল। সেই থেকে এই দিন বাংলাদেশের সর্বত্র শিক্ষা দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। আজ সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে, স্বতন্ত্র পরিস্থিতিতে, দেশব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রামের মাঝে ১৯৬২ সালের শিক্ষা-আন্দোলনের শহীদদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি।

পাকিস্তান সরকারের শিক্ষানীতি চিরকালই ছিল জনসাধারণের স্বার্থ থেকে বিযুক্ত। নানারকম প্রতিশ্রুতি সত্বেও সার্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা দেশে প্রবর্তিত হয়নি, বয়স্কদের শিক্ষার ব্যাপারেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। শিক্ষালাভের সুযোগের ক্ষেত্রেও দেশের দুই অংশে ইচ্ছাকৃত

ভাবে বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল ১৬ হাজার। পশ্চিম পাকিস্তানে এর সংখ্যা ছিল অনেক কম। গত বছরে বাংলাদেশে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৪ হাজারে আর পশ্চিম পাকিস্তানে সে সংখ্যা স্ফীত হয়ে দাঁড়ায় ৪০ হাজারের চেয়ে বেশী।

শুধু স্কুল-কলেজের সংখ্যা নিয়েই কথা নয়। সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্কুল-কলেজের যে পাঠ্যতালিকা তৈরী করা হয়, তা প্রকৃত শিক্ষার অগ্রগতির সহায়ক ছিল না; বরঞ্চ ভাষার চাপ, সাম্প্রদায়িক বিষয়-বস্তুর অবতারণা এবং অগণতান্ত্রিক ধ্যানধারণার প্রবর্তনে এই পাঠ্য তালিকা ছিল গঠনশীল চিত্তের পক্ষে ক্ষতিকর। উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে চিন্তার ও বক্তব্যের স্বাধীনতা হরণ ছিল সরকারী শিক্ষানীতির অঙ্গ। শিক্ষার প্রশাসনের ক্ষেত্রেও সরকার যে অগণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন, তাও স্বাধীন ও ফলপ্রসু শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের পথ রুদ্ধ করেছিল। মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষাদানের বিষয়েও সরকারী উদাসীনতা ছিল এই নীতির অংশ স্বরূপ।

আইয়ুব সরকারের আমলে যে নতুন শিক্ষানীতির অবতারণা হয়, তাতেই এই অগণতান্ত্রিক শিক্ষা পদ্ধতির সম্পূর্ণ চেহারাটা ধরা পড়ে। বাংলাদেশের শিক্ষক ও ছাত্রেরা স্বভাবতঃই এই শিক্ষানীতির বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু এই প্রতি-বাদকে আন্দোলনের রূপ দেওয়ার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব ছাত্র সমাজের প্রাপ্য। ১৯৬২ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর সেই আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ দিন হিসেবে ইতিহাসে স্থান পেয়েছে।

সরকারী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে এই আন্দোলনের সূচনা হলেও, তা শুধু শিক্ষানীতির প্রতিবাদ স্বরূপ ছিল না। ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে আইয়ুব খান যে একনায়কত্ববাদী শাসনের প্রবর্তন করেন, ১৭ই সেপ্টেম্বরের বিক্ষোভ সেই অগণ-তান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধেই পরিচালিত হয়েছিল। যখন সারা দেশ প্রকৃতপক্ষে এক সামরিক শাসনের নিষ্পেষণে পীড়িত হচ্ছিল, তখন ছাত্ররাই বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়েছিল এবং প্রাণের বিনিময়ে সেই আন্দোলনে তারা সাফল্য অর্জন করেছিল। এক নায়ক আইয়ুবের সেই ছিল প্রথম পশ্চাদপসারণ। আর এর চূড়ান্ত বিকাশ ঘটে ১৯৬৯ সালে—যখন আইয়ুবকে ক্ষমতা ছেড়ে চলে যেতে হয়।

এরপরে ১৯৬৯ সালে ইয়াহিয়া-সরকারের প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে দেখা গেল শিক্ষাসংক্রান্ত আন্দোলনের আরো স্বীকৃতি ঘটেছে। প্রস্তাবিত নীতিতে শিক্ষা-প্রশাসনের গণতন্ত্রীকরণের ধারণা কিছুটা গৃহীত হয়। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা পদ্ধতির জন্য যে দাবী শিক্ষক ও ছাত্রেরা করেছিলেন, তা স্বীকার করা হয়নি।

মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষাদানের প্রস্তাবও সেখানে ছিল না। কিন্তু এর চেয়ে বড় কথা, এই শিক্ষা সংস্কারের প্রস্তাবও শেষ পর্যন্ত ধামাচাপা দেওয়া হয় এবং শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্যকেই মেনে নেয়া হয় নীতি হিসাবে। আশা করা গিয়েছিল যে, দেশে গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষানীতিতেও ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করা সম্ভবপর হবে।

কিন্তু সে আশা পুরণ করা হয়নি। তার আগেই সামরিক শাসনের বর্বরতম আঘাত নেমে এসেছে দেশের মানুষের উপর।

আজ বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত। দেশকে শত্রুমুক্ত করার পরে সার্বিক পুনর্গঠনের সময়ে শিক্ষাব্যবস্থার নব রূপায়ণ ঘটবে। যে শিক্ষাব্যবস্থায় দেশের শতকরা আশি ভাগ লোক নিরক্ষরতার অভিশাপগ্রস্ত, সেই শিক্ষাব্যবস্থা দেশের কলঙ্কস্বরূপ। শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে সকলকে। শিক্ষার ভিত্তি প্রসারিত করে গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে আমাদের। শিক্ষার সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক ঘনিষ্টতর করতে হবে। শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হতে হবে কাজের সুযোগ। সত্যিকার স্বাধীনতা অর্জন না করা পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থার এই অভিপ্রেত পুনর্গঠন সম্ভবপর হবে না।

আজ আমরা সেই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধে ব্যাপৃত। ইতিহাসে অতুলনীয় ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নতুন উষার স্বর্ণদ্বার যেদিন উদ্‌ঘাটিত হবে, সেদিনই ১৭ই সেপ্টেম্বরের আন্দোলন সার্থকতায় উপনীত হবে।

পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে

(ছদ্মবেশী ময়ূরপুচ্ছ খসে পড়েছে)

ফয়েজ আহমদ

২১শে সেপ্টেম্বর '৭১ প্রচারিত

সামরিক ডিক্টেটর আইয়ুব খানকে তাড়িয়ে নাঙ্গা তলোয়ার হাতে তারই প্রধান সেনাপতি ইয়াহিয়া ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চের রাত্রে যখন পিণ্ডির সিংহাসনে বসলেন, সে সময় এই মিথ্যাশ্রয়ী জেনারেল বিক্ষুব্ধ জনসাধারণকে শান্ত করার জন্যে সভ্য জগতের শাসকদের অনুকরণে কোমল ভাষায় দর্শন সম্মত বাণী উচ্চারণ করতে শুরু করেন। গণতান্ত্রিক নির্বাচন, জনগণের আশা আকাঙ্খা প্রতিফলিত শাসনতন্ত্র ও ন্যায়নীতির শাসন প্রতিষ্ঠার কথা তিনি অহরহ প্রচার

করতেন। এমনকি 'আমি জনগণের প্রতিনিধি নই—সৈনিক; জনগণের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে ব্যারাকে ফিরে যাবো এবং সামরিক সরকার হচ্ছে অন্তর্বর্তীকালীন'—এ সমস্ত বক্তব্য ফলাও প্রচার করে জনগণের চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রাখতেন।

দেশী-বিদেশী নেতৃবর্গ, অফিসার ও সাংবাদিকদের কাছে সবচাইতে প্রিয় আলোচ্য বিষয় ছিল নির্বাচন ও শাসনতন্ত্র অর্থাৎ বন্দুকধারী মানুষটির মধ্যে গণতন্ত্রের এক সুকুমার মূর্তী বিরাজ করছে—এটাই ছিল সমগ্র কিছুর প্রতিপাদ্য বিষয়। এক কথায় তিনি দানবের কাছ থেকে মানবীয় গুণাগুণ লাভের আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু তবুও ঈশপের গল্পের সত্য তার মধ্যে প্রকাশ পেতে থাকে। বিশেষ বিশেষ পশু বা পক্ষী ছদ্মবেশ ধারণ করে দীর্ঘ সময় যেমন নিজেকে লুকিয়ে রাখতে সক্ষম হয় না—কণ্ঠস্বরই তার জন্যে অভিশাপ হয়ে উঠে, তার পরিচয়কে ঘোষণা করে, ইয়াহিয়ার ব্যাপারেও তাই ঘটল। তার ক্রমবিকাশমান পাশবিক রূপটি সকলের কাছে স্পষ্ট হতে থাকে। তবে তিনি সুচতুরের ন্যায় বাক্য ব্যয়ে শিক্ষিত।

তখন ঢাকাতে ট্যাংকগুলো ক্যান্টনমেন্টে ফিরে গিয়েছিল, রাস্তার মোড়ের কামানগুলোর নল মাথা নত করে স্তব্ধ। অসামরিক ও সামরিক টাইধারী আমলাদের রাজনৈতিক শাসনগত কাঠামো তখন অনেকটা সুপ্রতিষ্ঠিত। সে সময় ইয়াহিয়া সিভিলিয়ান পোষাকে ঢাকা শহরে আসলেন। হাতের ব্যাটন আর মুখ নিসৃত সৌরভ বাদ দিলে তাকে সেদিন অন্ততঃ একজন মোনাফেক রাজনীতিকের মতো মনে হয়েছিল। সাংবাদিকরা বিমান বন্দরে তাকে প্রশ্ন করেছিলেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট দ্য গলের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে—দেশব্যাপী এক রেফারেণ্ডামে দ্য গল পরাজিত হয়ে সেদিনকার পত্রিকাতেই পদত্যাগের কথা ঘোষণা করেছিলেন।

প্রশ্ন ছিল: দ্য গলের এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?

জেনারেল ইয়াহিয়া খান হাতের ব্যাটন বাঁ হাতের তালুতে দু'বার ঠুকে বিজ্ঞের ন্যায় মন্তব্য করেন: যে কোন সম্মানীয় নেতার পক্ষে এটাই হচ্ছে গৌরবজনক পথ।

আবার প্রশ্ন: পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও কি একথা প্রযোজ্য?

এ প্রশ্ন যে তির্যকভাবে তাকেই আঘাত করছে, তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। ক্রোধ সম্বরণ করে প্রশ্নকারী রিপোর্টারের কাঁধে হাত রেখে দ্রুত উত্তর দেন—ইয়েস্—মানে 'হ্যাঁ'।

এটা যে তার দিক থেকে প্রতিশ্রুতি ছিল, সে কথা এই সিপাহীর মস্তিকে আসেনি। কিন্তু রিপোর্টারগণ বুঝতে পেরেছিলেন কোথায় তার আঘাত লাগে।

ক্রমান্বয়ে ক্ষণিকের এই ছদ্মবেশীর ময়ুরপুচ্ছ খসে পড়তে থাকে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রবঞ্চনাপূর্ণ বাক্য সম্ভারের ছিদ্রপথে তিনি জনগণের বিরুদ্ধে অস্ত্র শানানোর তথ্য প্রকাশ করতে থাকেন—রিপোর্টারের কাঁধে হাত রেখে। "গৌরব-জনক পথ অবলম্বনের" প্রতিশ্রুতি তখন থেকেই তার কানে ব্যাঙের মতো শোনাতো।

পিণ্ডির এক সম্বর্ধনা সভার ঘনিষ্ঠ মহলের আলোচনায় ইয়াহিয়া অস্ত্রে শান দেয়ার তথ্য সগৌরবে ফাঁস করেন। তিনি বাঁ হাতের অনুতাধির ঊর্ধ্বে তুলে ডান হাতের অঙ্গুলি নির্দ্দেশে বলেন: আইয়ুব খান ক্ষমতায় এসেছিলেন মুষ্টিবদ্ধ হাতে, বিদায়ের সময় মুষ্টি খুলে তাকে চলে যেতে হয়েছে। আর আমি এসেছি মুষ্টি খুলে, কালক্রমে আমার হাত মুষ্টিবদ্ধ হবে। কথাটা শুনে জী-হুজুর পরিষদ নিষ্প্রয়োজনে হেসে উঠেছিলেন, সুযোগ সন্ধানী রাজনৈতিক নেতারা বিচলিত হয়ে পড়েন—কিন্তু জনসাধারণ তার এই বক্তব্যে মোটেই বিস্মিত হননি। তারা জানতেন, ডিক্টেটর সেনাপতি কোন্ পথ নেবেন, তার শাসনের পথ কোনটি, ক্ষমতায় স্থির থাকার জন্যে তার হাতের অস্ত্রের নাম কি। আর এক দস্যু জেনারেলের "অস্ত্রের ভাষা" সম্পর্কে তারা সচেতন।

নির্বাচনের আয়োজন ও বিলম্বিত ব্যবস্থার পরও জনগণ ও দেশপ্রেমিক রাজনীতিকগণ ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নে ইয়াহিয়াকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতেন না। তবুও সামরিক আইনের মধ্যেই জনগণ ইয়াহিয়ার স্বপ্নকে চুরমার করে এক ঐতিহাসিক রায় ঘোষণা করেন। সামরিক শাসকগোষ্ঠির গুপ্ত বাহিনীর রিপোর্ট ছিল আওয়ামী লীগ শতকরা ৬০ বা ৬৫টির অধিক আসন লাভ করতে পারবে না। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফল শত্রুর শাণিত অস্ত্রের ন্যায় ইয়াহিয়া বক্ষে প্রোথিত হল। এই পরিস্থিতিটা ছিল সামরিক শাসকদের বিদায়ের ইঙ্গিতবাহী। কিন্তু সামরিক শাসক কোনদিন সম্মানের সাথে বিদায় নেন না—বিতাড়িত পশুর ন্যায় পরাজিত হয়ে পলায়নই তার চরিত্র। ডিক্টেটর চরিত্রের নির্দেশে ইয়াহিয়া চণ্ড রূপ নিয়ে হত্যার অভিযানে বের হলেন বাংলাদেশের নগরে-বন্দরে-গঞ্জে-গ্রামে। বিদ্রোহের অগ্নিতে প্রজ্জলিত হয়ে উঠলো সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুখমণ্ডল। বিপ্লবী প্রত্যেকটি মানুষের লৌহ-পেশী বাহু দৃঢ়তর হয়ে উঠলো ঘৃণ্য আক্রমণকারী ভাড়াটিয়া সৈন্যবাহিনীর ধ্বংসের তাড়নায়। এতো হত্যা, এতো ধ্বংস আর

নির্যাতনের বিভীষিকার মধ্যে তারা আজ ক্রন্দনরত নয়, নয় স্থবির—তারা আজ স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ, নব চেতনায় উজ্জীবিত মুক্তির দিশারী।

তাই আজ পরিস্থিতিটা হত্যাকারীর বিরুদ্ধে চলছে। বিশ্বের সচেতন রাষ্ট্র ও নাগরিকগণ সোচ্চার কণ্ঠে বর্বর শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর। কিন্তু এর পরও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরাজিত করার উদ্দেশ্যে ইয়াহিয়া নানান অপকৌশল অবলম্বনের পথ বেছে নিয়েছেন। চক্ষু চিকিৎসককে করেছেন ক্রীড়নক গভর্ণর, আর মন্ত্রী করেছেন দশজন বিকৃত ও জনগণের আঘাত থেকে পলাতক পশুকে। তদুপরি নির্বাচিত ১৮৪ জন সদস্যের পদ খারিজ করে উপনির্বাচনের নির্দেশ দিয়েছেন। ২৫শে নভেম্বর থেকে ৯ই ডিসেম্বর পর্যন্ত এই উপনির্বাচন হবে। আর এরই মধ্যে তিনি সামরিক নির্দেশে রচিত শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রকাশ করবেন। তার মতের বাইরে উক্ত খসড়ার কোন ধারাই প্রস্তাবিত তথাকথিত পার্লামেন্টের বাতিল বা সংশোধন করার ক্ষমতা থাকবে না। সম্ভবতঃ ১৯৭২ সালের জানুয়ারীর পূর্বে তিনি পার্লামেন্ট আহ্বান করতে সাহসী হবেন বলে মনে হয় না। কিন্তু তার এই স্বেচ্ছাচারমূলক শাসনতন্ত্র রচনা ও অধিবেশন সব কিছুই একটা বিরাট "যদি"র উপর ঝুলছে।

কার স্বার্থে তিনি শাসন নির্যাতন-হত্যা অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে এইসব বিভ্রান্তিকর আয়োজন করার ঘোষণা করেছেন, সে কথা পিণ্ডির "ব্রাসহ্যাট" গোষ্ঠি হয়তো জানেন। কিন্তু তার চাইতেও সুস্পষ্টভাবে এই শ্রেণীর চক্রান্তের ফলাফল সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন বাংলাদেশের সংগ্রামরত নাগরিকগণ। ইয়াহিয়ার প্রতিশ্রুতি আর দেশদ্রোহীদের সমাবেশ দ্বারা অস্ত্রধারী সংগ্রামীদের স্তব্ধ করা যাবে না—সমগ্র নব চক্রান্ত আজ সূর্যের মতো প্রখর।

যাঁর জীবনেতিহাস প্রবঞ্চনার বিষ ধারায় আচ্ছন্ন, মুক্তিকামী মানুষের ক্রুদ্ধ অস্ত্রের ধর্ষণেই কেবল তার চক্রান্তের যথাযথ উত্তর।

৫ই নভেম্বর '৭১ প্রচারিত

বাংলাদেশের উত্তাল মুক্তিসংগ্রামের মুখে ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনী বর্তমানে দু'ধরণের দালাল জুটিয়েছে। এদের একটি বঙ্গজ, অন্যটি বাস্তুউজ। বঙ্গজ দলে আছে জনগণের পরিত্যক্ত মীরজাফরের মন্ত্রশীষ্যরা। আর বাস্তুউজ—যাদের জন্ম বাংলায় কিন্তু মাদেরী জবান উর্দু। বাসস্থান ও কর্মক্ষেত্র এদের অধিকাংশের বাংলাদেশ থেকে এগার শ' মাইল দূরে বাংলার পয়সায় গড়ে তোলা মহানগরী করাচীতে। এখনও যদি পরিষ্কার না হয়ে থাকে তবে দুটো নাম বলছি। দেখুন পানির মত পরিষ্কার হয়ে যাবে। অবশ্য এদের দুজনেরই বিচরণ ক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন। একজন জঙ্গীচক্রের পঙ্কিল রাজনীতির সিঙ'এ ফুঁকে চলেছেন। দেশবাসীর মস্তিষ্ক ধোলাইয়ের কাজ নিয়েছেন অন্য জন।

প্রথম ব্যক্তি মিঃ শিরওয়ানী ওরফে জামাইবাবু ওরফে ডিগবাজী আলী তথা মাহমুদ আলী রূপে পরিচিত। দ্বিতীয় ব্যক্তি করাচীর শেয়ার মার্কেটে সবচেয়ে সুলভ মূল্যে বিক্রিত পণ্য সাংবাদিক জগতের কলঙ্ক মহসিন আলী শিরওয়ান সাহেব ওরফে মাহমুদ আলী তখন পাকিস্তানের জঙ্গীচক্রের সবচেয়ে বড় দালাল অর্থাৎ দালাল দি গ্রেট। জাতিসংঘে নাপাক দলের নেতা, ইয়াহিয়ার অন্যতম পরামর্শদাতা এবং উপনির্বাচনী তামাশার উৎসাহী গায়েন। তবে মজার ব্যাপার এই যে, শিরওয়ানীওয়ালাকে তাঁর এই রাজনৈতিক নসিহতের জন্য ঢাকা থেকে দৌড়ে যেতে হয় লাহোর পিণ্ডি ও করাচীতে। কারণ ঢাকায় বসে মুখ খোলার

বিপদ আছে। মুক্তিযোদ্ধারা কখন কি করে ফেলে বলা তো যায় না। তার উপর তো আবার 'ম' পাল্লায় পড়েছেন—মোনেম-মালেক-মাহমুদআলী। হারাধনের এই তিন দুলালের একজন তো এরই মধ্যে ইহলোক ত্যাগ করেছেন।

দেশে বৃটিশ শাসন অবসানের অনেক আগেই এই লোকটি মুসলিম লীগের ঝাণ্ডার নীচে জমায়েত হয়েছিলেন দেশ উদ্ধারের ব্রত নিয়ে। এই সময়ে খাজা নাজিমুদ্দিন থেকে শুরু করে মুসলিম লীগের অনেক দিগ্‌গজের পদধুলি তাঁর ললাটে জুটেছিল। কিন্তু অচিরেই ললাটের সেই জয়টিকা শূণ্যে মিলিয়ে গেল। বাংলাদেশের মাঠে, বন্দরে নগরে তখন অন্য হাওয়া বইতে শুরু করেছে। মুসলিম লীগের সোনালী চাঁদ অস্তাচলগামী। মাহমুদ আলী বাংলার যুব সমাজের সংগঠনে ভিড়ে গিয়ে বরাত ফেরাতে চাইলেন। গণতন্ত্রের সেনানী বাংলার কয়েকজন বীর সন্তানেরা সে সময়ে লীগ শাহীর ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছেন। তাঁরা চেয়েছিলেন এ উদ্দেশ্যে একটি দল গড়তে। তিনিও সেখানে জুটে গেলেন। দলও একটি হলো। কিন্তু গণতন্ত্রের সেনানীরা বুঝতে পারলেন গণভিত্তির অভাবে মাহমুদ আলীর ন্যায় জামাই বাবুদের নেতৃত্বের জন্য এ দলের অকাল মৃত্যু অবধারিত। অতঃপর অল্প কিছুকালের মন্ত্রীত্বগিরি এবং মরহুম জননেতা মওলানা ভাসানীর সাথে ধোয়াধুয়ির পর বাম পন্থীদের হতচ্ছায়ায় তাঁর ভাগ্য বদলের রাজনৈতিক জুয়াখেলার পরিসমাপ্তি ঘটলো। এরপর থেকে ভদ্রলোক নিরবচ্ছিন্ন ভাবে একটানা দালালী করে গেছেন। প্রতিটি মুহূর্ত চেষ্টা করেছেন অন্য দালালদের চেয়ে বেশী দালালী করা যায় কিনা।

বাংলাদেশের মানুষ এজন্য তাঁকে ক্ষমাও করেনি। ঐতিহাসিক এগারো দফা আন্দোলনকালে পল্টন ময়দানে জনতার কাছে হয়েছেন নাস্তানাবুদ। পিণ্ডির গোলটেবিল বৈঠক থেকে ফিরে হয়েছেন ঘেরাও। বিগত সাধারণ নির্বাচনে জন জোয়ারে ভদ্রলোকের হাতটিও গেল উল্টে। তাই এবার খোলাখুলি ভাবে ইয়াহিয়ার কসাই বাহিনীর হাতের রক্ত মুছে বিশ্বদরবারে তুলে ধরার কাজে লেগেছেন। কিন্তু দশ লাখ বাঙালী হত্যার কসাইদের হাতের রক্ত এত সহজে মোছা যায় না। তাই এখন প্রভুর প্রভু মহাপ্রভুর স্মরণ নিয়েছেন। স্বস্তি পরিষদের দুয়ারে ছুটেছেন—বাঁচাও বাঁচাও!

এবার ধোলাইয়ের মশালবরদারদের কথায় আসা যাক। করাচীর শেয়ার-মার্কেটের সবচেয়ে সুলভ মূল্যের এই বাস্তুউজ সাংবাদিক প্রবরটি আত্ম-বিক্রয় করেনি এমন কোন মহল পশ্চিম পাকিস্তানে গড়ে উঠেনি। মার্কিণ তথ্যকেন্দ্র ইউসিস থেকে শুরু করে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের ন্যাশনাল ট্রাষ্ট পর্যন্ত সর্বত্র। পশ্চিম

পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক স্বার্থ বাংলাদেশে যখনই বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, ডাক পড়েছে এই ভদ্রলোকের কলম ধরো। অবশ্য এই ভদ্রলোক মহসিন আলী একা নয়। আরো একজন আছেন জেড. এ. সুলেরী। কিন্তু তিনি একাই একজন। তাই তার সম্পর্কে অন্যদিন আলাপ করা বাঞ্ছনীয়। এক সময়ে গণ আন্দোলনের জোয়ারের আলোয় মার্কিনীরা তাদের স্বার্থ বিপন্ন হওয়ার ছবি দেখেছিল। সেরা দাস মহসিন আলী তখন ইউসিসের একজন কর্মচারী। মহা-প্রভুর স্বার্থতো দেখতে হবে। সংগ্রামী ছাত্র-জনতার দুর্বার আন্দোলনে আইয়ুব শাহীর মসনদ কেঁপে উঠেছে—জনমতকে বিভ্রান্ত করার জন্য তিনি মর্নিং নিউজ-এর সম্পাদকের হাল ধরে আছেন। তবুও শেষ রক্ষা হলো না। ব্যবসায়িক স্বার্থ নিয়ে টুপাইস লেনদেন নিয়ে লাগলো গোলমাল প্রেস ট্রাষ্ট প্রধানের সাথে—চাকুরী খতম। কিন্তু শেয়ারমার্কেটের পণ্য তাদের সবচেয়ে কম। তাই আবার ডাক পড়লো ২৫শে মার্চের পর রেডিও পাকিস্তানে আওয়াজে—টেলিভিশনে। বলে যাও 'প্লেন লাই' দিনের পর দিন। জাতিসংঘের মানবাধিকার দিবসে কাশ্মীরীদের জন্য অশ্রু বিসর্জন কর। হাজার বার আওড়ে যাওয়া লেড়ু আবার বলে যাও। কিন্তু খবরদার। দশ লাখ বাঙালীকে কেন হত্যা করা হলো, কেন ঘর ছাড়তে বাধ্য হলো ৯৫ লক্ষ বাংলাদেশের মানুষ—এ কথা একবারও উচ্চারণ করবে না। গর্দান যাবে। তথাস্তু। পিন্ডি জিন্দাবাদ।

রণাঙ্গনে বাংলার নারী

বেগম উম্মে কুলসুম মুশতারী শফী

৮ই নভেম্বর '৭১ প্রচারিত

পবিত্র রমজানের কঠোর উপবাস পালন করছেন এখন দেশ রণাঙ্গন বাংলার প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম নারী-পুরুষেরা। অশেষ পুণ্যের মাস এই রমজান। সাধারণ ভাবে একটা নির্দিষ্ট সময় পানাহার বিরত থাকাই রমজানের বাহ্যিক উপবাস অনুষ্ঠান। এছাড়া কায়মনোবাক্যে সংযম পালন করা রমজান মাসের অবশ্য করণীয় ইবাদত।

এবারের রমজান এসেছে আমাদের জাতীয় জীবনের এক ইতিহাস সৃষ্টিকারী যুগসন্ধিক্ষণে। এখন আমাদের সন্তানরা দেশকে শত্রুমুক্ত করার সার্বিক যুদ্ধে নিয়োজিত, আমাদের সর্বস্তরের জনসাধারণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ যুদ্ধে

অংশগ্রহণ তথা নিজ নিজ কর্তব্য পালন করছেন। পবিত্র রমজানের কঠোর সিয়াম সাধনার সঙ্গে সঙ্গে এ যুদ্ধ হয়েছে আমাদের মা-বোনেরত্যাগ ও তিতিক্ষার কৃচ্ছ্র সাধনা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে তাঁর বেতার বাণীতে বলেছেন, গত বছরের রমজান মাসে বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষ এক প্রলয়ঙ্করী প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলা করেছে, প্রকৃতির নির্মম তাণ্ডবে সেবারে এখানে সংঘটিত হয়েছে এক ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ, বিপুল সংখ্যক মানুষের আকস্মিক মৃত্যু। আর এবারের রমজানে আমরা সাত মাস আগে সূচিত এক আকস্মিক আক্রমণের বিরুদ্ধে বিরতিহীন পাল্টা আক্রমণ পরি-চালনা করছি, যে আক্রমণ আমাদের উপরে এসেছে এক পশু প্রকৃতির সামরিক জান্তার কাছ থেকে একান্তই অতর্কিতে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, জীবনের তাগিদে আমরা সেবারের প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠেছিলাম, স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে এনেছিলাম বানের জলে ভেসে যাওয়া ক্ষেতে খামারে, আত্মীয় স্বজনহারা ঘর সংসারে। আর এবারে জাতীয় জীবনের তথা বাংলাদেশ ও বাঙালীর অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে আমরা আমাদের দেশকে শত্রুমুক্ত করতে বদ্ধপরিকর। একটি স্বাধীন দেশ ও স্বাধীন জাতি হিসেবে আত্ম-প্রতিষ্ঠার জীবন-যুদ্ধই দেশ রণাঙ্গন বাংলার ধর্মপ্রাণ মুসলিম নারী-পুরুষের জন্যে এবারের রমজান মাসের পুণ্যময় শপথ রূপে অভিষিক্ত হয়েছে।

বরকতের মাস রমজান। এ মাসে আমাদের মুসলিম পরিবারে সাধারণতঃ বাড়তি খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন করা হয়ে থাকে। ইফতারী সেহ্রী ইত্যাদির সরঞ্জাম হয়ে থাকে ব্যয়বহুল। সারাদিন উপবাস পালনের পর প্রচুর খাদ্য, ঘ্রাণ-যুক্ত ও সুস্বাদু খাবার স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যেই প্রয়োজনীয়। কিন্তু এবারে অন্য রকম। বাংলার গৃহিনীরা এবারে সর্বময় সংযম ও কঠিন কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনার পক্ষপাতি। অল্পে তুষ্টির সুশিক্ষাই তাঁরা আজ গ্রহণ করেছেন—গ্রহণ করেছেন জাতীয় স্বার্থের কারণেই।

আজকের যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহেসসাল্লামের সেই সুমহান হাদিসের শিক্ষাই আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—বলা হয়েছে, এক বেলার খাবার, উপস্থিত পরিধানের জন্য এক প্রস্থ কাপড় এবং এক রাতের মতো মাথা গুঁজবার আশ্রয় বা ঘুমোবার বিছানা যার আছে, সে কাঙাল নয়। তার জীবনে থাকা উচিত পূর্ণ পরিতৃপ্তি। আমরা পরিতৃপ্ত। রম-জানের সত্যিকার সংযম সাধনার শুভ মুহূর্তে আমাদের বর্তমান যুদ্ধকালীন

পরিস্থিতি। আমাদের পরিতৃপ্তি শুধু একটা নির্দিষ্ট সময় পানাহার বিরত থাকাতেই নয়, বরং এই বরকতের মাসে ব্যয় বাহুল্য বর্জন করে। আমাদের পরিতৃপ্তি উপবাসের চেয়ে কঠোর ত্যাগ বুকের সন্তানকে যুদ্ধে পাঠিয়ে। আমাদের পরিতৃপ্তি দেশকে সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত করার কাজে আমাদের রক্তবীজ সোনামানিকদের উৎসাহ ও সহযোগিতা দিয়ে।

ত্রিশ দিনের আনুষ্ঠানিক উপবাস পালনের শেষে যে ঈদ—সে ঈদকে আমরা কিসের মূল্যে আনন্দমুখর করে তুলবো, সে ভাবনা থেকেও আজ বাংলার মা-বোনেরা নির্লিপ্ত নন। আমরা জানি, আমরা বিশ্বাস করি, পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার, পশুশক্তি যেদিন আমাদের দেশ থেকে সম্পূর্ণ নির্মূল হবে, সেদিনই জমে উঠবে আমাদের ঈদের উৎসব। এ জন্যে যতো ত্রিশ দিনই আমাদের কেটে যাক, আমরা করে যাবো সংযম-সাধনা। একটি স্বাধীন জাতির ভবিষ্যৎ হিসেবে যেদিন আমাদের বংশধররা আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করবে, সেদিনই তো শুভ সমাপ্তি হবে আমাদের উপবাস পালনের।

এবারে আমরা দেখেছি, পুজোপার্বণে আমাদের দেশ ঢাক-ঢোল, সানাই-কাসা, শঙ্খ-ঘন্টায় মুখরিত হয়নি। কেবল কানে শুনেছি মুহুর্মুহুঃ গোলাগুলির শব্দ। পুজামণ্ডপে রক্ত চন্দনের লেপ দেখিনি, দেখেছি রক্ত। দুর্বৃত্ত হানাদার সৈন্যদের রক্ত। আমাদের দুঃসাহসী গেরিলা সন্তানদের হাতের অস্ত্র অব্যর্থ লক্ষ্য-ভেদ করে চলেছে এক একটি হানাদারের বক্ষদেশ। পুজোর আনন্দ আমরা উপভোগ করেছি মহিষাসুর বধের মাধ্যমে। বাংলা-মাকে প্রত্যক্ষ করেছি জাগ্রত রণচণ্ডীরূপে।

আমাদের সন্তানরা দেশের সর্বত্র বিস্তৃত রণাঙ্গনে যুদ্ধ করছে। আমাদের মা-বোনেরা কেউবা তাঁদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধার ভূমিকা পালন করছেন, কেউবা গৃহবাসে যুদ্ধকালীন কর্তব্য পালন করছেন। এ কর্তব্য বড় কঠোর ত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিত। ধর্মীয় ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের মতোই বাংলার মা-বোনেরা আজ মেনে নিয়েছে জাতির এই মুক্তিযোদ্ধাকে। যুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় ,তাই হয়ে উঠেছে সুনিশ্চিত।

১৪ই নভেম্বর '৭১ প্রচারিত

পৃথিবীর ইতিহাসে নৃশংস হত্যাকারীর তালিকায় সংযোজিত হয়েছে দুটি নাম। একটি ইয়াহিয়া খান, অপরটি টিক্কা খান। জঘন্য জালেম হিসেবে সারা বিশ্ব তাদের ধিক্কার দিচ্ছে। টিক্কা খান শুনেছ সেসব কথা? তোমার বক্তব্য আছে কিছু? বিচারের কাঠগড়ায় হলফ করে বলো, কেন এই গণহত্যা অনুষ্ঠিত করলে? বাংলার মাটি মানুষের রক্তে কেন লালে লাল হয়ে গেলো? এ গণ-হত্যার অন্যতম আসামী টিক্কা খান জবাব দাও।

অদ্ভুত মস্তিষ্ক বিকৃত, নাদির শাহের যোগ্য প্রতিনিধি, হত্যার নেশায় ভুলে গেছিলে, মরিয়া মানুষের কি প্রচণ্ড শক্তি। বিশাল অতল সমুদ্রও সে শক্তির কাছে হার মানে, তুমিতো আজাজিলের পাণ্ডা, তুমিতো কোন্ ছার! ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, কুমিল্লায় তথা সারা বাংলাদেশে তোমারই নির্দেশে নিতান্ত বর্বরের মতো গুলি করে মারা হয়েছে অগণিত মানুষ। বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম করতে চেয়েছ সারা বাংলাদেশে। বলো কুখ্যাত, গণহত্যাকারী, কি অধিকার তোমার ছিল এ গণহত্যার?

জল্লাদ প্রভুর আর জনগণের দুশমন দালালদের মনোরঞ্জনের জন্য, অমিত-শালী তুমি, ৭২ ঘন্টায় স্তিমিত করে দিতে চেয়েছিলে সারা বাংলার সংগ্রামের আগুন। কত শক্তি ধরে তোমার এই শুকর ছানার দল? সাম্রাজ্যবাদী, গণতন্ত্রের শত্রু, এ যুগের কলংক টিক্কা খান, তোমার সেই বীর পুংগবের দল নেড়ী কুত্তার মতো আজ লেজ গুটিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে গর্তে। দেখেছ? প্রত্যক্ষ করেছ বাংলার মানুষের শক্তি? তোমার শক্তির দম্ভ এক নিমিষেই মাটির হাঁড়ির মতো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। অবশ্যই এ কথা তোমার জানা। তবু, তবু হত্যা-কারী, তোমার হত্যার নেশা মেটেনি। গ্রামে জনপদে শহরে নগরে জাতিধর্ম

নির্বিশেষে অত্যাচারের বান ডাকিয়েছ। বাংলার মাটি নিরীহ মানুষের রক্তে হয়ে গেছে লালে লাল। রক্তের সমুদ্রে আজ কার সর্বনাশ দেখছো শয়তান, তোমার, না তোমার মহা প্রভুর? বলো কুৎসিত হত্যাকারী, এ বীভৎস হত্যার জবাব কি? জবাব দাও।

গ্রামে গ্রামান্তরে শহরে নগরে কুকুরের মতো লেলিয়ে দিয়েছ তোমার সেনাবাহিনী। ধর্ষণে লুণ্ঠনে হত্যায় তারা সারা বাংলাকে করে তুলেছিল মৃত্যুর পুরী। এ অত্যাচারে কতটুকু পেলে শয়তান। এক একটি রক্তবিন্দুতে জন্ম নিয়েছে লাখো লাখো মুক্তিযোদ্ধা। তোমার সেই কুকুরের দল মুক্তিবাহিনীর হাতে মার খেয়ে দিকভ্রান্ত, বিপর্যস্ত, ভীত এবং সন্ত্রস্ত। তবু আজো সাধ মেটেনি, হত্যার নেশায় এখনো খুঁজে অস্ত্রহীন সাধারণ মানুষ। কিন্তু তারই বদলে কুকুরগুলো নিঃশেষ হচ্ছে একের পর এক। বলো নরকের কীট গ্রাম বাংলাকে তুমি পুড়িয়েছ, লুট করেছ, শ্রীহীন করেছ, কেন? জবাব দাও।

বাংলাদেশে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে যে সন্নাতে উন্মুখ হয়েছিলে, যে সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ পাকাপোক্ত করতে চেয়েছিলে, চেয়ে দেখো আজ সেই সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মতো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। মৃত মানুষের লাশের তলায় চাপা পড়ে গেছে তোমার সাধের পাকিস্তান। হাত-পা কামড়াচ্ছো কেন? সংগীদের মতোই আগুন নিয়ে গাঁয়ের মাছি তাড়াও। বিভ্রান্তির অতল গহ্বরে নিহিত আমাকে খুঁজে পাচ্ছো না? নির্লজ্জ বিবেকহীন, জবাব দাও, কোন্ বিভীষিকা তোমার চোখে ভাসছে?

কতো মজার শাসনব্যবস্থা তোমার দেশের? বেহায়ার পৃষ্ঠপোষক বেহায়াই হয়। তার প্রমাণ তুমি আর তোমার বন্ধু বিশ্বের ইতিহাসে কলংকিত নায়ক ইয়াহিয়া খান। এত অত্যাচার, এত লুণ্ঠন এতো হত্যা করার পরেও তোমার পদোন্নতি হলো পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্তে 'কোর-কমাণ্ডার'। কিন্তু অর্বাচীন টিক্কা খান যে আগুন তুমি জ্বালিয়েছ, তার জের চলছে, চলবে। বাংলাদেশের মানুষ কোনদিন তোমাদের ক্ষমা করবে না। তোমাদের শয়তানের মতো কালো মুখে নিক্ষেপ করবে রাশি রাশি কলংকের কালি। তুমি যেখানেই যাও, যতো পদোন্নতিই তোমার হোকনা কেন, শান্তিহীন, স্বস্তিহীন হবে তোমার দিবারাত্রি। বলো হত্যাকারী, শয়তান তোমার জবাব কি?

কালো কলংকের বোঝা মাথায় দিয়ে, নৃশংস জানোয়ার প্রস্তুত হও। বলো তোমার জবাব কি? জবাব দাও শয়তান ইয়াহিয়ার চেলা টিক্কা খান।

সংগ্রামী দিনের গান ও কবিতা

একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত গান এবং কবিতার আবেদন ছিল অবিস্মরণীয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম এবং সুকান্তের রচনা ছাড়াও বহু খ্যাত অখ্যাত কবির গান এবং কবিতা সাড়ে সাত কোটি বাঙালীকে দিয়েছিল এক মহা প্রেরণা, মুক্তিবাহিনী পেয়েছিল এক অভূতপূর্ব রণ-উন্মাদনা। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত একাত্তরের এমনি কয়েকটি অগ্নিঝরা গান ও কবিতা পাঠককুলের উদ্দেশ্যে তুলে দিলাম :

গান

॥ এক ॥

জয় বাংলা বাংলার জয় ॥
হবে হবে হবে, হবে নিশ্চয়
কোটি প্রাণ একসাথে জেগেছে অন্ধরাতে
নতুন সূর্য উঠার এই তো সময় ॥
বাংলার প্রতিঘর ভরে দিতে
চাই মোরা অন্নে ॥
আমাদের রক্ত টকবক দুলছে
মুক্তির রিক্ত তারুণ্যে ॥

নেই—ভয়
হও হউক রক্তের প্রখ্যাত ক্ষয়।
আমি করি না করি না করি না ভয়।
অশোকের ছায় যেন রাখালের বাঁশরী
হয়ে গেছে একেবারে স্তব্ধ ॥

চারিদিকে শুনি আজ নিদারুণ হাহাকার
আর ঐ কান্নার শব্দ ॥
শাসনের নামে চলে শোষণের
সুকঠিন বজ্র ॥
শব্দের ঝংকারে শৃংখল ভাংতে
সংগ্রামী জনতা অতন্দ্র।

আর——নয়।
তিলেতিলে মানুষের এই পরাজয় ॥
আমি করি না করি না করি না ভয়।
জয় বাংলা বাংলার জয় ॥ *

কথা—গাজী মযহারুল আনোয়ার

॥ দুই ॥

সালাম সালাম হাজার সালাম
সকল শহীদ স্মরণে,
আমার হৃদয় রেখে যেতে চাই
তাদের স্মৃতির চরণে ॥

মায়ের ভাষায় কথা বলাতে
স্বাধীন আশায় পথ চলাতে
হাসিমুখে যারা দিয়ে গেল প্রাণ
সেই স্মৃতি নিয়ে গেয়ে যাই গান
তাদের বিজয় মরণে
আমার হৃদয় রেখে যেতে চাই
তাদের স্মৃতির চরণে।

* এ গানটি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সূচনা পর্যায়ে সকল অধিবেশনের প্রারম্ভ ও সমাপ্তিতে সূচক ধ্বনি হিসেবে প্রচারিত হয়েছে।

ভাইয়ের বুকের রক্তে আজি
রক্ত মশাল জ্বলে দিকে দিকে
সংগ্রামী আজ মহাজনতা
কণ্ঠে তাদের নব বারতা
শহীদ ভাইয়ের স্মরণে।
আমার হৃদয় রেখে যেতে চাই
তাদের স্মৃতির চরণে ॥

বাংলাদেশের লাখো বাঙালী
জয়ের নেশায় আনে ফুলের ডালি
আলোর দেয়ালী ঘরে ঘরে জ্বালি
ঘুচিয়ে মনের আঁধার কালী।
শহীদ স্মৃতি বরণে।
আমার হৃদয় রেখে যেতে চাই
তাদের স্মৃতির চরণে।

কথা—ফজল-এ খোদা
শিল্পী—আবদুল জব্বার

॥ তিন ॥

বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা
আজ জেগেছে এই জনতা, এই জনতা ॥
তোমার গুলির, তোমার ফাঁসির,
তোমার কারাগারের পেষণ শোধবে তারা
ও জনতা এই জনতা এই জনতা ॥
তোমার সভায় আমীর যারা,
ফাঁসির কাঠে ঝুলবে তারা ॥
তোমার রাজা মহারাজা,
করজোরে মাগবে বিচার ॥
ঠিক যেন তা এই জনতা।

তারা নতুন প্রাতে প্রাণ পেয়েছে, প্রাণ পেয়েছে।
তারা ক্ষুদিরামের রক্তে ভিজে প্রাণ পেয়েছে॥
তারা জালিয়ানের রক্তস্নানে প্রাণ পেয়েছে।
তারা ফাঁসির কাঠে জীবন দিয়ে
প্রাণ পেয়েছে, প্রাণ পেয়েছে॥
তারা গুলির ঘায়ে কলজে ছিঁড়ে প্রাণ পেয়েছে,
প্রাণ পেয়েছে এই জনতা।
নিঃস্ব যারা সর্বহারা তোমার বিচারে।
সেই নিপীড়িত জনগণের পায়ের ধারে॥
ক্ষমা তোমায় চাইতে হবে
নামিয়ে মাথা হে বিধাতা॥
রক্ত দিয়ে শোধতে হবে
নামিয়ে মাথা হে বিধাতা॥
ঠিক যেন তা এই জনতা।
বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা
আজ জেগেছে এই জনতা, এই জনতা॥

কথা—সলিল চৌধুরী

॥ চার ॥

শোন, একটি মুজিবরের থেকে
লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি, প্রতিধ্বনি
আকাশে বাতাসে উঠে রণি।
বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ॥
সেই সবুজের বুক চেরা মেঠো পথে,
আবার এসে ফিরে যাবো আমার
হারানো বাংলাকে আবার তো ফিরে পাবো।
শিল্পে কাব্যে কোথায় আছে হায়রে
এমন সোনার দেশ।

বিশ্ব কবির সোনার বাংলা, নজরুলের বাংলাদেশ,
জীবনানন্দের রূপসী বাংলা
রূপের যে তার নেইকো শেষ, বাংলাদেশ।
'জয়বাংলা' বলতে মনরে আমার এখনো কেন ভাবো,
আমার হারানো বাংলাকে আবার তো ফিরে পাবো,
অন্ধকারে পুবাকাশে উঠবে আবার দিন মণি।

কথা—গৌরী প্রসন্ন মজুমদার
শিল্পী—অংশুমান রায়

॥ পাঁচ ॥

নোঙর তোল তোল সময় যে হোল হোল
হাওয়ার বুকে নৌকা এবার
জোয়ারে ভাসিয়ে দাও
শক্ত মুঠির বাঁধনে বজরা বাঁধিয়া নাও
সমুখে এবার দৃষ্টি তোমার পেছনের কথা ভোল
দূর দিগন্তে সূর্য রথে
দৃষ্টি রেখেছ স্থির
সবুজ আশার স্বপ্নেরা আজ
নয়নে করেছে ভিড়
হৃদয়ে তোমার মুক্তি আলো
আলোর দুয়ার খোল।

কথা : নঈম গওহর

॥ ছয় ॥

মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি
মোরা একটি সুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি ॥

যে মাটির চির মমতা আমার অঙ্গে মাখা
যার নদী জলে ফুলে ফলে মোর স্বপ্ন আঁকা।
যে নদীর নীল অম্বরে মোর মেলছে পাখা
সারাটি জীবন সে মাটির গানে অস্ত্র ধরি ॥

নতুন একটি কবিতা লিখতে যুদ্ধ করি—
মোরা নতুন একটি গানের জন্য যুদ্ধ করি
মোরা একখানা ভালো ছবির জন্য যুদ্ধ করি
মোরা সারা বিশ্বের শান্তি বাঁচাতে আজকে লড়ি ॥
যে নারীর মধু প্রেমেতে আমার রক্তদোলে
যে শিশুর কান্না হাসিতে আমার বিশ্ব ভুলে
যে গৃহ কপোত সুখ স্বর্গের দুয়ার খুঁজে
সেই শান্তির শিবির বাঁচাতে শপথ করি ॥

মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি
মোরা একটি সুখের হাসির জন্য আজি অস্ত্র ধরি ॥

কথা : গোবিন্দ হালদার
শিল্পী : আপেল মাহমুদ

॥ সাত ॥

জনতার সংগ্রাম চলবেই,
আমাদের সংগ্রাম চলবেই
জনতার সংগ্রাম চলবেই ॥

হতমানে অপমানে নয়, সুখ সম্মানে
বাঁচবার অধিকার কাড়তে
দাস্যের নির্মোক ছাড়তে
অগণিত মানুষের প্রাণপণ যুদ্ধ

চলবেই চলবেই,
জনতার সংগ্রাম চলবেই
আমাদের সংগ্রাম চলবেই ॥

প্রতারণা প্রলোভন প্রলেপে
হোক না আঁধার নিশ্ছিদ্র
আমরা ত সময়ের সারথী
নিশিদিন কাটাবো বিনিদ্র।

দিয়েছি ত' শান্তি আরও দেবো স্বস্তি
দিয়েছি ত' সম্ভ্রম আরো দেবো অস্থি
প্রয়োজন হলে দেবো এক নদী রক্ত।

হোক না পথের বাধা প্রস্তর শক্ত
অবিরাম যাত্রার চির সংঘর্ষে
একদিন সে পাহাড় টলবেই
চলবেই চলবেই
জনতার সংগ্রাম চলবেই
আমাদের সংগ্রাম চলবেই ॥

হতে পারি পথশ্রম আরও বিধ্বস্ত
ধিকৃত নয় তবু চিত্ত
আশায় ত মুক্তির লক্ষ্যের যাত্রী
চলবার আবেগেই তৃপ্ত।

আমাদের পথরেখা দুস্তর দুর্গম
সাথে তবু অগণিত সঙ্গী
বেদনার কোটি কোটি অংশী
আমাদের চোখে চোখে লেলিহান অগ্নি
সকল বিরোধ বিধ্বংসী।

এই কালো রাত্রির সুকঠিন অর্গল
কোনদিন আমরা যে ভাঙবোই
মুক্ত প্রাণের সাড়া জানবোই।

আমাদের শপথের প্রদীপ্ত স্বাক্ষরে
নূতন অগ্নিশিখা জ্বলবেই
চলবেই চলবেই
জনতার সংগ্রাম চলবেই
আমাদের সংগ্রাম চলবেই।

কথা : সিকান্দার আবু জাফর

॥ আট ॥

মুক্তির একই পথ সংগ্রাম
অনাচার অবিচার শোষণের বিরুদ্ধে
বিদ্রোহ-বিক্ষোভ-ঝংকার-হুংকার
আমরণ সংঘাত, প্রচণ্ড উদ্দাম
সংগ্রাম—সংগ্রাম—সংগ্রাম ॥

ক্ষমতা দম্ভ লোভ লালসায় যারা
জনতার অধিকার করে খর্ব
ঘরে ঘরে গড়েছি দুর্জয় প্রতিরোধ দুর্গ
তাদের আজ প্রতিহত করবোই করবো।

যারা মানুষের রক্ত চোষে,
মানুষের মাঝে আনে ব্যবধান
যারা পৃথিবীর কলঙ্ক কালিমা,
কেড়ে নেয় মা-বোনের সম্মান
এসো রক্ত শপথে আজ আঘাতে আঘাতে
তাদের করি খান্ খান্—

বাঁচার জন্য ভয় সংশয় রেখে
প্রতিজ্ঞা করেছি আজ মোরা লড়বো
কাটিয়ে জীবনের দুঃখ ঝরা রাত্রি
নতুন এক পৃথিবী গড়বোই গড়বো।

কথা : শহীদুল ইসলাম

॥ নয় ॥

তীরহারা এই ঢেউয়ের সাগর,
পাড়ি দিবরে
আমরা ক'জন নবীন মাঝি
হাল ধরেছি শক্ত করে রে ॥
জীবন কাটি যুদ্ধ করি
প্রাণের মায়া সাঙ্গ করি
জীবনের সাধ নাহি পাই ॥
ঘর-বাড়ীর ঠিকানা নাই
দিন-রাত্রি জানা নাই
চলার ঠিকানা সঠিক নাই ॥
জানি শুধু চলতে হবে
এ তরী বাইতে হবে
আমি যে সাগর মাঝি রে।
জীবনের রঙে মনকে টানে না
ফুলের ঐ গন্ধ কেমন জানি না
জ্যোৎস্নার দৃশ্য চোখে পড়ে না
তারাও তো ভুলে কভু ডাকে না ॥

বৈশাখেরই রৌদ্র ঝড়ে
আকাশ যখন ভেঙে পড়ে
ছেঁড়া পাল আরও ছেঁড়ে যায় ॥
হাতছানি দেয় বিদ্যুৎ আমায়
হঠাৎ কে যে শান্ত সোনার
দেখি ঐ ভোরের পাখী গায় ॥

তবু তরী বাইতে হবে
খেয়া পারে নিতে হবে
যতই ঝড় উঠুক সাগরে।
তীরহারা এই ঢেউয়ের
সাগর পাড়ি দিব রে ॥

শিল্পী : আপেল মাহমুদ ও সঙ্গীরা

॥ দশ ॥

রক্তেই যদি ফোটে
জীবনের ফুল
ফুটুক না, ফুটুক না, ফুটুক না ॥

আঘাতেই যদি বাজে
প্রভাতের সুর
বাজুক না, বাজুক না, বাজুক না ॥

গান গান গান বেজেছে অগ্নি গান
দূর সব ব্যবধান
সাত কোটি প্রাণ বিসর্জনে
বাংলার গ্লানি ঘুচুক না, ঘুচুক না
এক এক এক
হয়েছি সবাই এক
আসুক দুর্বিপাক
ক্ষুব্ধ মিছিল চলবেই চলবে
প্রলয়-ঝঞ্ঝা উঠুক না, উঠুক না ॥

কথা : সৈয়দ শামসুল হক

॥ এগার ॥

তারা এ দেশের সবুজ ধানের শীষে
চিরদিন আছে মিশে ॥
উদাসী মাঝির গানে
বাউলের ভীরু প্রাণে
দোয়েল শ্যামার শিসে
চিরদিন আছে মিশে
গুরু গুরু মেঘে কাদের কণ্ঠ শুনি
রক্তে তখন নেচে উঠে কত ফাল্গুনী
সকল পথের বাঁকে
তারা আমাদের ডাকে

দিগন্তে দিশে দিশে
চিরদিন আছে মিশে ॥
উদাসী মাঝির গানে
তারা আমাদের টানে
দোয়েল শ্যামার শিসে
চিরদিন আছে মিশে ॥

কথা : ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

॥ বার ॥

সোনা সোনা সোনা
লোকে বলে সোনা
সোনা নয় ততো খাঁটি
বলো যতো খাঁটি
তার চেয়ে খাঁটি বাংলাদেশের মাটিরে
আমার জন্মভূমির মাটি ॥
ধন জন মন যত ধন দুনিয়াতে
হয় কি তুলনা বাংলার কারো সাথে
কত মার ধন মানিক রতন
কত জ্ঞানী গুণী কত মহাজন
এনেছি আলোর সূর্য এখানে
আঁধারের পথ পাতি রে
আমার বাংলাদেশের মাটি
আমার জন্মভূমির মাটি ॥

এই মাটির তলে ঘুমায়েছে অবিরাম
রফিক, শফিক, বরকত কত নাম
কত তিতুমীর, কত ঈশা খাঁন
দিয়েছে জীবন, দেয়নি তো মান।
রক্তশয্যা পাতিয়া এখানে
ঘুমায়েছে পরিপাটি রে

আমার বাংলাদেশের মাটি
আমার জন্মভূমির মাটি।

কথা : আবদুল লতিফ
শিল্পী : শাহনাজ রহমতুল্লাহ্

॥ তের ॥

ছোটদের বড়দের সকলের
গরীবের নিঃস্বের ফকীরের
আমার এ দেশ সব মানুষের, সব মানুষের ॥
নেই ভেদাভেদ হেথা চাষা আর চামারে,
নেই ভেদাভেদ হেথা কুলি আর কামারে।
হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, দেশ মাতা এক সকলের।
লাঙলের সাথে আজ চাকা ঘুরে এক তালে
এক হয়ে মিশে গেছি আমরা সে যে কোন প্রাণে।
মসজিদ, মন্দির, গীর্জার আবাহনে।
বাণী শুনি একই সুরের।
চাষাদের মজুরের ফকীরের
ফকীরের নিঃস্বের গরীবের
আমার এ দেশ, সব মানুষের, সব মানুষের।
বড়দের ছোটদের সকলের
আমার এ দেশ সব মানুষের।

শিল্পী : রথীন্দ্রনাথ রায়

॥ চৌদ্দ ॥

এক সাগর রক্তের বিনিময়ে
বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা
আমরা তোমাদের ভুলব না।
দুঃসহ এ বেদনার কণ্টক পথ বেয়ে
শোষণের নাগপাশ ছিঁড়লে যারা
আমরা তোমাদের ভুলব না।
যুগের নিষ্ঠুর বন্ধন হ'তে
মুক্তির এ বারতা আনলে যারা

আমরা তোমাদের ভুলব না।
কৃষাণ-কৃষাণীর গানে গানে
পদ্মা-মেঘনার কলতানে
বাউলের একতারাতে
আনন্দ ঝংকারে
তোমাদের নাম ঝংকৃত হবে।
নতুন স্বদেশ গড়ার পথে
তোমরা চিরদিন দিশারী রবে।
আমরা তোমাদের ভুলব না॥

কথা : গোবিন্দ হালদার
শিল্পী : স্বপ্না রায়

॥ পনের ॥

আমি এক বাংলার মুক্তি সেনা
মৃত্যুর পথ চলিতে
কভু করি না ভয় করি না।
মৃত্যুরে পায়ে দলে চলি হাসিতে।
দুঃসহ জীবনের রাহু মুক্তি
প্রাণে মেখে সূর্যের নবশক্তি
বজ্র শপথে নেমেছি যুদ্ধে
বাঙ্গালীর জয় হবে নিশ্চয়
চলেছে এ দুর্জয় মুক্তির পথে।
বাংলার তরে আমি সঁপেছি এ মন
নেই জ্বালা হাহাকার নেই হুতাশন।
রক্তে রাঙ্গা আজ বিপ্লবী মন
ক্ষমা নেই বাংলার গণদুশমন
বজ্রের তূর্যের মন্দ্রে
মারবো এবার মরবো না আর
চলেছি যে শত্রুকে পায়ে দলিতে।

কথা : নেওয়াজিস হোসেন*

---

*১৯৭১ সালে নেওয়াজিস হোসেনের বয়স পনের বছরের উর্দ্ধে ছিল না।

॥ ষোল ॥

সাত কোটি আজ প্রহরী প্রদীপ
বাংলার ঘরে জ্বলছে,
বন্ধুগো এসো হয়েছে সময়,
পথ যে তোমায় ডাকছে ॥
বন্ধুগো আজ যেয়ো না পিছে,
আজকে শঙ্কা করো না মিছে,
বাংলার মাটি, বাংলার তৃণ,
তোমাদেরই কথা বলছে ॥

বন্ধু অনেক বেদনা সয়েছি,
অনেক হয়েছি কাতর,
বন্ধু ভুলেছি বেদনা এবার
হৃদয় করেছি পাথর ॥
রক্তের দাম চাইনাক আর
আজকে দেখুক বিশ্ব আবার,
বাংলার প্রাণে, বাংলার গানে
আগুনের শিখা জ্বলছে ॥

কথা—সারওয়ার জাহান

॥ সতের ॥

ও বগিলারে,
কেন বা আনু বাংলাদেশে মাছের আশা নিয়া ॥
ও বগিলারে, -------------।
শিয়াল কান্দে, কুত্তা কান্দে, কান্দে ইয়াহিয়া হায়রে ॥
দুপুর রাইতে ভুপরি কান্দে, ভুট্টো বড় মিয়া, কান্দে ॥
ও বগিলারে, -------------।

আপন ফান্দে আপনি বন্দী টিক্কার চৌখত পানি, ঐ দেখ ॥
আন্ধার দেখে মাইরের চোটে মিছাই বন্দুক তানি ॥
বগিলারে, ----------।
বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে বাংলার মাটি ঠুকরি ভাংনু কার।
আষাঢ় মাসোত কাদোর পরি
হনু নাজেহাল, ও তুই হনু নাজেহাল।
শাওন মাসোত ফাল্গুন ছাড়ি
নেংটি করলো ছাড়
বৈঠার গুঁতায় বাপরে মরে
জান বাঁচে না আর
ও তোর জান বাঁচে না আর।
মরদ মরদ কাওয়ার শানি
কেমন তোর মরদানি ঐ ॥
বন্দুক ছাড়ি ঘর উদাসী, ও তুই ॥
বউয়ের আগে কেরদানি
গাইলের চোটে কোমড় ভাংগী ভাত বাড়িনু গিয়া
হাত বাড়াইয়া কান্দে এখন ভুট্টো-ইয়াহিয়া, টিক্কা-ইয়াহিয়া
ও বগিলারে,
কেন বা আনু বাংলাদেশে মাছের আশা নিয়া।

কথা : হরলাল রায়
শিল্পী : রথীন্দ্র নাথ রায়

॥ আঠার ॥

অত্যাচারের পাষাণ কারা
জ্বালিয়ে দাও
সভ্যতার ঐ বধ্যভূমি
জ্বালিয়ে দাও ॥
শত্রু হনন চলছে দিকে দিকে
সকল যুগের নিপীড়িতের পক্ষ থেকে

আপোষহীন সংগ্রামের
শেষ কথাটি জানিয়ে দাও ॥
অসুরের হাড় কাঠে
তোর পায়ের ধুলিঝড়
ওরে নাগুক নাগুক ভয়ংকর।
খুনের বদলা খুন নেবো
খুন নেবো আজ—
রক্ত লোভীর খুনী পাঁজর ভেঙ্গে
হানাদারের কলজে ছিঁড়ে
খুনের আগুন জ্বালিয়ে দাও ॥

কথা : আল মুজাহেদী

॥ উনিশ ॥

সোনার মোড়ানো বাংলা মোদের
শ্মশান করেছে কে?
পৃথিবী তোমায় আগামীর মত
জবাব দিতে হবে ॥
শ্যামল বরণী সোনালী ফসলে
ছিল যে সেদিন ভরা
নদী নির্ঝর সদা ব'য়ে যেত
পূত অমৃত ধারা
অগ্নিদাহনে সে সুখ স্বপ্ন
দগ্ধ করেছে কে?
আমরা চেয়েছি ক্ষুধার অন্ন
একটি স্নেহের নীড়
নগদ পাওনা হিসেবে কষিতে
ছিলনা লোভের ভীড় ॥
দেশের মাটিতে আমরা ফলাবো
ফসলের কাঁচা সোনা
চিরদিন তুমি নিয়ে যাবে কেড়ে
হায়রে উন্মাদনা

এই বাঙালীর বুকের রক্তে
বন্যা বহালো কে
পৃথিবী তোমার আগামীর মত
জবাব দিতে হবে।

কথা, সুর ও শিল্পী—মকসুদ আলী খান (সাঁই)*

*একাত্তরের এই শব্দ সৈনিক মাত্র অল্পদিন আগে পরলোক গমন করেছেন (ইন্নালিল্লাহে -------------রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল আনুমানিক পঁয়তাল্লিশ বছর মাত্র।

॥ কুড়ি ॥

সাড়ে সাত কোটি মানুষের আর একটি নাম---মুজিবর
সাড়ে সাত কোটি প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেলাম
জয় বাংলা, জয় মুজিবর, জয় বাংলা, জয় মুজিবর।
এ যে শপথের রক্তের স্বাক্ষর, এ আগুনের মন্ত্রের অক্ষর
অগ্রগামী মুক্তিকামীর মনস্কাম---মুজিবর
এ যে লাঞ্ছিত নিপীড়িত গণসত্তার জাগরণ
এ যে নির্ভয় দুর্জয় গণসংগ্রাম আমরণ—মুজিবর
এ সূর্যের দীপ্তিতে ভাস্বর, এ যে আত্মার মত অবিনশ্বর
চলে হুংকার জয় বাংলার নগর গ্রাম—মুজিবর
জয় বাংলা, জয় মুজিবর, জয় বাংলা, জয় মুজিবর।

কথা—শ্যামল গুপ্ত

॥ একুশ ॥

অনেক রক্ত দিয়েছি আমরা
দেবো যে আরো, এ জীবন পণ
আকাশে বাতাসে জেগেছে কাঁপন
আয়রে বাঙালী ডাকিছে রণ ॥

ঘরে ঘরে ঐ জ্বলছে অগ্নিশিখা
শহীদের খুনে লিখতে রক্ত লেখা
আঘাতে আঘাতে ভেঙ্গেছে পাহাড়
ভেঙ্গেছে ওরে বন্ধুগণ ॥

দিকে দিকে তোরা আয়রে সর্বহারা,
মুক্তি শপথ ভেঙ্গেছে বন্দী কারা ॥

ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে পথের বাঁধন
ওরে ও বাঙ্গালী শোন্‌রে শোন্‌ ॥

অনেক রক্ত দিয়েছি আমরা
দেবো যে আরো এ জীবন পণ।

কথা : টি. এইচ. শিকদার

॥ বাইশ ॥

পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে
রক্ত লাল, রক্ত লাল, রক্ত লাল
জোয়ার এসেছে পরশ মনে
রক্ত লাল, রক্ত লাল, রক্ত লাল ॥
বাঁধন ছেঁড়ার হয়েছে কাল,
হয়েছে কাল, হয়েছে কাল ॥

শোষণের দিন শেষ হয়ে আসে
অত্যাচারীরা কাঁপে আজ ত্রাসে
রক্তে আগুন প্রতিরোধ গড়ে
নয়া বাংলার নয়া শ্মশান, নয়া শ্মশান।

আর দেরী নয় উড়াও নিশান
রক্তে বাজুক প্রলয় বিষাণ
বিদ্যুৎ গতি হউক অভিযান ॥
ছিঁড়ে ফেলো সব শত্রু জাল, শত্রুজাল।

কথা : গোবিন্দ হালদার
সুর : সমর দাস

॥ তেইশ ॥

আমার নেতা শেখ মুজিব,
তোমার নেতা শেখ মুজিব,
দেশের নেতা শেখ মুজিব,
দশের নেতা শেখ মুজিব,
আহা বাংলা মা'র কোল কইরাছে উজ্জল।
ওরে মনের আশা আল্লার তাঁরে কইরা দিক সফল রে
আশার আলো করতাছে ঝলমল,
ও দ্যাখো আশার আলো করতাছে ঝলমল ॥

আমার নেতা শেখ মুজিব,
দিশার নেতা শেখ মুজিব,
যুগের নেতা শেখ মুজিব,
সবার নেতা শেখ মুজিব,
আজি নেতার নেতা হইছে শেখের ব্যাটা,
ওরে সাবাস ব্যাটার বুকের পাটা, যেমন বিজলী ঠাটা রে
চুকবে যত সমস্যার ল্যাটা,
এবার চুকবে যত সমস্যার ল্যাটা ॥

হাইলার বন্ধু শেখ মুজিব,
জাইলার বন্ধু শেখ মুজিব,
কুলির বন্ধু শেখ মুজিব,
চুলির বন্ধু শেখ মুজিব,
আহা এমন বন্ধুর তুলনা আর নাই।
ওরে নিজের প্রাণ বিলাইয়া করে দ্যাশেরি ভালাই রে,
আইসো ভাই তাঁর কাতারে দাঁড়াই
ও এবার আইসো ভাই তাঁর কাতারে দাঁড়াই ॥

কথা ও সুর : হাফিজুর রহমান।

॥ চব্বিশ ॥

ব্যারিকেড বেয়নেট বেড়াজাল
পাকে পাকে তড়পায় সমকাল
মারীভয় সংশয় ত্রাসে
অতিকায় অজগর গ্রাসে
মানুষের কলিজা
ছেঁড়ে খোঁড়ে খাবলায়
খাবলায় নরপাল।

ঘুম নয় এই খাঁটি ক্রান্তি
ভাঙো ভাই খোঁয়ারির ক্লান্তি
হালখাতা বৈশাখে
শিষ দেয় সৈনিক হরিয়াল॥

দুর্বার বন্যার তোড়জোড়
মুখরিত করে এই রাঙা ভোর
নায়ে ঠেলা মারো হেঁই এইবার
তোলো পাল তোলো পাল ধরো হাল॥

কড়া হাতে ধরে আছি কবিতার
হাতিয়ার কলমের তলোয়ার
সংগ্রামী ব্যালাডে
ডাক দেয় কমরেড কবিয়াল॥

আবুবকর সিদ্দিক*

* ইনি বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে নিয়োজিত আছেন।

গান : ব্যারিকেড বেয়নেট বেড়াজাল

সুর ও স্বরলিপি : সাধন সরকার কথা : আবুবকর সিদ্দিক

গা মা পা ।	গা মা পা ।।	গা মা পা ।	-া -া -া -া
ব্যা রি কে ড	বে য় নে ট	বে ড়া জা ০	০ ০ ০ ল
গা মা পা মা	গা মা পা মা	গা মা ধা ।	-া -া -া -া
পা কে পা কে	ত ড়্ পা য়	স ম কা ০	০ ০ ০ ল
পা পা ধা -া	পা -া ধ -া	পা -া র্সা -া	-া -া -া -া
মা রী ভ য়্	স ং শ য়	ত্রা ০ সে ০	০ ০ ০ ০
পা র্সা ধা -া	পা পা ধা -া	পা -া র্রা -র্া	-া -া -া -া
অ তি কা য়	অ জ গ র	গ্রা ০ সে ০	০ ০ ০ ০।
র্সা র্সা র্সা -া	র্রা র্রা র্সা	না না র্রা র্রা	না -া পা -া
মা নু ষে র	ক লি জা ০	ছেঁ ড়ে খোঁ ড়ে	খা ব লা য়
গা -া পা -া	গা রা সা ।।		
খা ব লা য়	ন র পা ল		
র্সা -া র্সা -া	র্সা -া র্সা র্সা	র্সা র্সা র্রা -া	-া -া -া ।।
ঘু ম্ ন য়	এ ই খাঁ টি	ক্রা ন্ তি ০	০ ০ ০ ০
না না র্রা র্রা	র্সা র্সা র্সা ।	মা -া গা -া	-া -া -া ।।
ভা ঙো ভা ই	খোঁ য়া রি র	ক্লা ন্ তি ০	০ ০ ০ ০
পা -া র্সা র্সা	রা -া র্সা র্সা	না -া ধা ণা	পা -া ধা -া
হা ল খা তা	বৈ ০ শা খে	শি ষ দে য়	সৈ ০ নি ক

পা পা মা -া -া -া ।- -া
হ রি য়া ০ ০ ০ ০ ন্

গা -া গা -া গা -া গা গা। মা গা রা । -া -া -া -া।
দু র বা র ব নৃ ন্যা র, তো ড় জো ০ ০ ০ ০ ড়

সা সা রা রা গা গা পা ।। মা মা গা । । । । ।
মু খ রি ত ক রে এ ই রা ঙা তো ০ ০ ০ ০ র্

গা গা পা পা গা গা মা ।। র্সা -া ধা -া । । । ।
না রে ঠে লা মা রো হে ই এ ই বা ০ ০ ০ ০ র

র্সা র্সা ধা -া পা পা গা -া গা পা র্সা -া -া -া -া -া
তো লো পা ল্ তো লো পা ল। ধ রো হা ০ ০ ০ ০ ০ ল্

"কড়া হাতে ধরে আছি কবিতার -------কমরেড কবিয়াল"-এর সুর প্রথম অন্তরার অনুরূপ।

কবিতা

উন্মেষ

আবুল কাশেম সন্দ্বীপ

৮ই জুন '৭১ প্রচারিত

বিকেল বিষণ্ণ তখন। ছাব্বিশে মার্চের বিকেল
বন্দর ধোঁয়াটে তখন চারদিকে ব্যারিকেড। অসংখ্য
সারি সারি ট্রাক। আগ্রাবাদে রাজপথে স্তূপীকৃত
পাথর আর ইট, কাঠ—রাবিশের স্তূপ। বন্দরে
আটক তখন ষ্টিমার বাবর—খল্লাদে-ভরতি।
তখনো অবরুদ্ধ সব দস্যুর দল—তিনদিকে
মুক্তিযোদ্ধা—মাঝখানে হাটহাজারী ক্যাণ্টনমেণ্ট।
প্রবর্তক সংঘ আর সি, আর, বি, মুক্তিযোদ্ধার
দুর্জয় ঘাঁটি। রাত্রির অন্ধকার নেমে আসে ক্রমে।
শব্দের হুঙ্কারে আতঙ্কিত সমস্ত হৃদয়। সব
মনে আন্দোলিত ভীতির সঞ্চার—সমস্ত দেশে
বন্ধ সব যোগাযোগ। দাউ দাউ আগুন জ্বলে
সব বস্তীতে। জনপদে স্তূপীকৃত নারী, শিশু, বৃদ্ধ
আর ছাত্রের লাশ।

তখন রক্তাপ্লুত বাংলাদেশে
সূর্য প্রস্তুত হলো রাত্রির গভীরে নতুন উদয়ের।
জ্যোতিক নির্মিত হলো নতুন আলোর। নবতর
উন্মেষে ইচ্ছা আর আকাংখার সাত কোটি স্বাধীন
সূর্য-মন। বাংলাদেশে জীবনের এলো জাগরণ।
সমস্ত জীবন। স্বাধীনতা বাঙালীর জীবনের পণ।

দুঃসহ আমাদের কাছে অসংখ্য মৃত্যুর খবর।
দুঃসহ আমাদের কাছে মৃত্যুর খবর।
আমাদের দুঃখ ও বেদনার বিক্ষোভ প্রকাশ—
শান্তির পথ নয় মুক্তির পথ: জনতার মুখে
বলিষ্ঠ শপথ—বিজয়ের উল্লাসে মৃত্যুকে ভুলবো।
যুদ্ধই বাঙালীর মুক্তির সনদ। হাতে হাতে অস্ত্রের
কঠিন প্রতিজ্ঞাগুলো মুক্তির উল্লাসে বিস্ময়কর।
দিগন্তে সূর্য লালে আকাংখিত আলোকের ঝড়।

শব্দের তারতম্যে

শিকদার ইবনে নূর

৮ই জুন '৭১ প্রচারিত

শব্দকে আমার বড় ভয় ছিল
পৃথিবীর নানা রকম শব্দকে,
বিশেষ বয়সে এসে অতর্কিত
বাবার পায়ের শব্দ, সেকেলে
খড়ম পড়া মায়ের চলার শব্দ,
প্রিয়তমার কাকণ নিক্কন; ট্রেনের
চাকার শব্দ, মোটরের বিস্ফোরণ,
প্রাচীন ইটের স্তূপে টায়ারের
আর্তনাদ—অকারণ ট্রাফিক হুইসিল,
এবং বিদ দিনে রাজ পথে
রৌদ্রের বিলাপ—ইত্যাদি অনেক শব্দে
শব্দময় পৃথিবীকে আমার ভীষণ ভয় ছিল।
অথচ অবাক হই, ইদানিং
আমি এক অত্যাশ্চর্য শব্দের মিছিল।

আমার আত্মায় শব্দ, শব্দ নাচে
প্রতি লোমকূপে, ধমনীতে, ফেনায়িত
রক্তের কণায়, জাগরণে, বিলম্বিত
ঘুমের সত্তায়।
শব্দ বাজে—সোনামুখী ধানের
শীষের মত, চতুর্দশী বৃষাণী
মেয়ের চুলে রক্ত লাল
শাপলার খোঁপার মত;
আমার সমস্ত দেহে, হৃৎপিণ্ডের
রক্তের ধারায়—শব্দ বাজে।
বাংলার শ্যামল মাঠে, আঙ্গিনায়
পৈশাচিক পদ শব্দ, নিসর্গের
বুক চিরে কামান গোলার শব্দ
বিধ্বস্ত মায়ের চোখে দুগ্ধপোষ্য
শিশুদের কচিকণ্ঠে শব্দের আগুন,
আমার পৃথিবী জুড়ে শব্দ শব্দ শব্দ শুধু;
কাজেই, এখন আর শব্দকে, ভয় নেই,
আমিও নিজেই এক অত্যাশ্চর্য
শব্দের মিছিল।

কমাণ্ডার

নাসিম চৌধুরী

৩০শে সেপ্টেম্বর '৭১ প্রচারিত

কমাণ্ডার
আমরা প্রস্তুত
কামান, মর্টার, গানে, রকেটে, গোলায়,
যুদ্ধের কড়া সাজে, বেল্টে-বুটে

আমরা সেজেছি যথারীতি।
এবার তোমার অর্ডার দেবার পালা
দাও অর্ডার
কমাণ্ডার।
দেখ, চারিদিকে প্রস্তুতির আয়োজন শেষ;
কী ভয়ান সুন্দর অন্ধকার ঘনিয়েছে চারিদিকে
এতক্ষণ যে মুমূর্ষু আলো ছড়াচ্ছিল
কৃষ্ণপক্ষের অসুস্থ চাঁদ,
সেটাও টুপ করে খসে গ্যাছে কোন রহস্য-লোকে
এখন শুধু অন্ধকার
কি বিশ্বাসী বন্ধুর মত ঘিরে আছে চারিদিক

আর দেখ কী লোমহর্ষক নীরবতা।
কুলায় ফিরে গ্যাছে সর্বশেষ পাখী
শুধু একটানা ঝিল্লীর ঝংকার।
এটাইতো শত্রু নিশ্চিহ্নের মাহেন্দ্রক্ষণ
কমাণ্ডার
আর দেরী নয়, শুধু অর্ডার।

কমাণ্ডার
শুধু তোমার একটি অর্ডার
দেখবে কী দুর্জয় করে তোলে আমাদের।
কী প্রচণ্ড সাড়া জেগে ওঠে রক্তের ধারায়
কী প্রখর জ্বলে ওঠে চোখের তারা।
কী অট্টশব্দে গর্জন করে ওঠে প্রতিটি অস্ত্র।
আর তার সাথে কী সুন্দর সুর মেলাবে
শত্রুর আর্তরব।

কমাণ্ডার, এবার শুধু অর্ডার করো, অর্ডার
তোমার অর্ডারের সঙ্গে সঙ্গে
ছুটে যাব আমরা
ঐ দূরে যেখানে শত্রুরা ফেলেছে ক্যাম্প

যেখানে প্রতিটি বাংকারে শুয়ে আছে
হিংস্র ঘাতকের দল
আর পেন্টাগণের জেনারেলদের মত
কুটিল বক্র ট্রেঞ্চগুলি লুকিয়ে রেখেছে যে
হিংস্র হায়নাদের
সেখানে ছুটে যাব কী তুমুল প্রাণের আবেগে
গর্জে উঠবে আমাদের মুষ্টিচ্যুত গ্রেনেড
সেই ধ্বংস উৎসবের আশায় বসে আছি
কমাণ্ডার
শুধু আদেশ দাও এবার।

কমাণ্ডার
আমরা প্রস্তুত
কামান মর্টার গানে, রকেটে গোলায়,
যুদ্ধের কড়া সাজে, বেল্টে-বুটে
আমরা সেজেছি যথারীতি
এবার তোমার অর্ডার দেবার পালা
দাও অর্ডার
কমাণ্ডার

কমাণ্ডার
এখন কী সময় হয়নি তোমার?
এখন কী দৃষ্টি রাখবে ঘড়ির কাঁটায়?
উৎকর্ণ হবে ঘাসের প্রতিটি শিহরে?
দায়িত্ব কী পালন করবে তুমি
সংসারী কৃষাণীর মত?
ভেবে-দেখে, কম্পনে-ত্রাসে।

দায়িত্ব গ্রহণ কী তবে বৃদ্ধত্ব গ্রহণেরই
নামান্তর শুধু!
নইলে হিসাবের প্রয়োজন কী
ঘড়ি আর আঁধারের গাঢ়তা নিয়ে?

তবু জানি তোমার প্রাবীণ্য
আমাদের মাঙ্গলিকে ভাস্বর
জানি তা আনবে আরো সুচারু সফলতা

কিন্তু আমাদের কাম্য তা নয়
শৃংখলিত, হিসাবী, সুচারু সফলতা
সেখানে কোথায় সেই শক্তির প্রকাশ
সর্বনাশীকে যা হাসিতে ভাসায়।

আমরা চাই বিশৃংখল বেঠিকের মাঝে
ভরান বিজয়।
আমাদের যাত্রা হবে হঠাৎ আচম্বিতে মনের তাড়ায়।
নিমেষে উপড়াবো যতগুলি জ্বালা আছে মনে
চকিতে ছুঁড়ে দেবো যতগুলি গোলা পাবো চোখে
হিসাবের জের আর টানবো না ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে
আনবো না বিজ্ঞান অংকের মাপ
শুধু যাবার আবেগে চলে যাব।

কমাণ্ডার
যদি ঐ বিদেশী পদবীটার সাথে জড়তা ওতপ্রোত থাকে
তবে তা ছুঁড়ে ফেলো বিষাক্ত ঘৃণায়
ভুলে যাও সময়ের নির্দিষ্টতা
চলো এক সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ি
শত্রুগুলোর ওপর
তাদের নিশ্চিহ্ন করে দি
আমাদের বেহিসাবী উচ্ছৃংখলতায়।
তারপর ক্ষতি হয়ে পড়ে থাকি
বে-নিয়ম পৃথিবীর পরে।

*১৯৭১ সালে কবিতাটির রচয়িতা নাসিম চৌধুরীর বয়স পনের বছরের উর্দ্ধে ছিল না।

রিপোর্ট ১৯৭১

আসাদ চৌধুরী

৫ই অক্টোবর '৭১ প্রচারিত

প্রাচ্যের গাভের মত শোকাহত, কম্পিত চঞ্চল
বেগবতী তটিনীর মত শান্ত স্নিগ্ধ, মনোরম
আমাদের নারীদের কথা বলি, শোন।
এ-সব রহস্যময়ী রমণীরা পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনে
বৃক্ষের আড়ালে সরে যায়—
বেড়ার ফোঁকর দিয়ে নিজের রন্ধনে তৃপ্ত
অতিথির প্রসন্ন ভোজন দেখে মুখ টিপে হাসে।
প্রথম পোয়াতী লজ্জায় আনত হয়ে
কৌটিয়ে ভরেন অনুজের সংগৃহীত কাঁচা আম, পেয়ারা, চালিতা—
সূর্যকে ও পর্দা করে এ-সব রমণী।
অথচ যোদ্ধারা ছিল ধর্ষণের নির্মম শিকার
সকৃতজ্ঞ প্রেমিকেরা
সঙ্গীনের সুতীব্র চুম্বন গেঁথে গেছে—
আমি তার সুরকার—তার রক্তে লেখি স্বরলিপি।
মরিয়ম, যিশুর জননী নয়—অবুঝ কিশোরী
গরীবের চৌমুহনী বেথেলহেম নয়
মগরেবের নামাজের শেষে মায়ে ঝিয়ে
খোদার কালামে শান্তি খুঁজেছিল
অস্ফুট গোলাপ কলি লহতে রঞ্জিত হলে
কার কী বা আসে যায়।
বিপন্ন বিস্ময়ে কোরাণে বাঁকা বাঁকা পবিত্র হরফ
বোবা হয়ে চেয়ে দেখে কামুকের ক্ষুধা
মায়ের স্নেহার্ত দেহ ঢেকে রাখে পশুদের পাপ।
পোষা বিড়ালের বাচ্চা নিবিড় আদর চেয়ে
কেঁদেছিল তাহাদের লাশের উপর।

এ দেশে যে ঈশ্বর আছেন তিনি নাকি
অন্ধ আর বোবা।
এই বলে তিন কোটি মহিলারা বেচারাকে গালাগালি করে।
জনাব ফ্রয়েড, যুবকের চোখে নাকে

শুধু এক রক্তাক্ত পতাকা,
এমনকি খোয়াবে ও আসে না সহজ পায়ে প্রেমিকেরা চপল চরণে।
জনাব ফ্রয়েড, মহিলারা,
কামুকের প্রেমিকের ধর্ষণের শৃঙ্গারের সংজ্ঞা ভুলে গেছে।
রকেটের প্রেমে পড়ে ঝরে গেছে
ভিক্টোরিয়া পার্কের গীর্জার ঘড়ি
মুসল্লীর সিজদার আনত মাথা
নিরপেক্ষ বুলেটের অন্তিম আজানে স্থবির হয়ে গেছে।
বুদ্ধের ক্ষমার মূর্তি জোকারের মত
ভ্যাবাচেকা খেয়ে পড়ে আছে, তাঁর
মাথার উপরে
এক ডজন শকুন মৈত্রী করে
হয়তো উঠেছিল কেঁদে।
র‍্যাবো পাউণ্ড চোরের মতন

পা টিপে পা টিপে জ্যোতির্ময়
স্যারের কেনাস থেকে চলে গেল
কাঁচের গেলাসের মত ভেঙে গেছে ছাত্রাবাস
পৃথিবীর সব চিন্তা কাগজের চেয়ে দ্রুত পুড়ে গেছে
বারুদের গন্ধে ধন্য গ্রন্থাগার ধ্বংস্তূপে সুন্দর।
জনাব উথান্ট।
জাতিসংঘ ভবনের মেরামত অনিবার্য আজ
আমাকে দেবেন শুধু দয়া করে তার ঠিকেদারী।
বিশ্বাস করুণ রক্তমাখা ইটের যোগান
পৃথিবীর সর্বনিম্নহারে একমাত্র আমি দিতে পারি
যদি চান শিশুর গলিত খুলি দিয়ে দেয়ালে আল্পনা,
প্লিজ, আমাকে কণ্ট্রাক্ট দিন।

দশ লক্ষ মৃত দেহ থেকে
দুর্গন্ধের দুর্বোধ জবাব শিখে রিপোর্ট লিখেছি—পড়, পাঠ কর।
কুড়ি লক্ষ আহতের আর্তনাদ থেকে
ঘৃণাকে জেনেছি—পড়, পাঠ কর।
চল্লিশ হাজার ধর্ষিতা নারীর কাছে
সাহসের সবক নিয়েছি—পড়, পাঠ কর।

দুঃখের স্মৃতিতে ডুবা আশি লক্ষ শরণার্থী
শিখিয়েছে দীর্ঘশ্বাসে কতটুকু ক্রোধ লেখা থাকে।
কোলকাতার কবির মত কে পার শোনাতে
আমি তোর জন্য সহোদর ?
অনাহুত'র বিবেকের ভ্রাম্যমাণ স্থায়ী প্রতিনিধি হয়ে
ক্লান্তিহীন বিশ্রামবিহীন আমি ছুটে যাই
শান্তির সভায়
কখনো দিল্লীতে, মস্কো, লণ্ডন প্যারী,
জনাকীর্ণ সমাবেশে খুঁজি একজন রাসেলের মুখ,
ফিলাডেলফিয়ার সমুদ্র বন্দরে পাওয়া
প্রেমের লিপিকা পড়ি জেনেভার জুরীদের কাছে—
পৃথিবীর ইতিহাস থেকে কলঙ্কিত পৃষ্ঠাগুলো
রেখে চলে আসি ক্যানাডার
বিশাল মিছিলে শ্লোগান শোনাতে—
মানুষের জয় হোক,
অসত্যের পরাজয়ে খুশী হোক বিশ্বের বিবেক,
পলাতক শান্তি যেন ফিরে আসে
আহত বাংলার প্রতি ঘরে ,ঘরে।

নামফলক

অন্নু ইসলাম

'মহান শহীদানের স্মরণে লেখা
প্রস্তর ফলকে বন্ধু তোমাদের নাম।

আমি হাঁটছি ২৫শে মার্চ থেকে
আমি হাঁটছি কালো-লাল এবং
সবুজ থেকে ঝলসানো স্বাধীনতা
পর্যন্ত।

এখন বন্ধুরা
স্থির হয়ে তাকিয়ে দ্যাখো
কেমন করে ঢেকে রেখেছি
তোমাদের স্মৃতি গাঁথা আমার বুকের মর্মরে।

জানো এখন আমার চোখ থেকে
সব আলো ফুরিয়ে গ্যাছে।
দ্যাখো আমার চোখ দু'টি কেমন করে
ঢেকে রেখেছি
রাশ রাশ জানা অজানা নামে।

আমি তবুও পড়তে পারি
(শিশু শিক্ষায় যেমন পড়তাম)
মানুষের হৃদয়ের পটে পটে
লক্ষ লক্ষ মানুষের নাম।
(ওরা মানুষ নয় বীর)

সালাম
বরকত,
মুক্তিযোদ্ধা
এবং শেখ
যেন একটি মানচিত্র।

আমার বুকের নীচে
রক্তের ঝরণা—
ঝরণার গানে গানে
শুধু শুনি লক্ষ নাম—
সালাম
মুক্তিযোদ্ধা।

হে দেশ
হে আমার বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিক

৫ই নবেম্বর '৭১ প্রচারিত

তোমার দেহের মতো খর-কৃপানের মতো
দীর্ঘ ও উদ্ধত ঋজু
সারিসারি
শালতরুশ্রেণী
দাঁড়িয়ে রয়েছে দুই পাশে,
দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর চুমু খেলে
ভয়ে ও বিহ্বলতায়
যেমন কম্পন জাগে
তোমার দু'পাশে ঠোঁটে, আজকে রাত্রেও তেমনি
উদগ্রীব অপেক্ষার
রুদ্ধ শিহরণ সাড়া
সাথে-সাথে, শকুনের ডানার ঝাপটে যেন
ঢেউ ওঠে ভয়াল সাগরে;

তোমার ত্বকের রং যেন
তপ্ত কাঞ্চনের মতো
লেগে আছে সড়কের প্রতি ধূলিকণা সাথে,
চোখের মণির মতো সজল নিবিড় কালো
জমছে খণ্ড খণ্ড মেঘ
সারাটা আকাশময়
হয়তো নামবে বৃষ্টি একটু পরে,
যেমন শোণিত চুঁয়ে চুঁয়ে
পড়ছে তোমার পথে পথে

তাল ও তমাল শাখে,
শত্রুর সৈন্যের বেয়নেটে
তোমার প্রাণের মতো
উষ্ণ লাল রক্ত
যেমন ঝরছে
মাঠে মাঠে গঞ্জে হাটে;

ক'জন চলেছি আমরা
সড়কের 'পর দিয়ে এই
একটি ট্রাকে ঠাসাঠাসি
উঁচিয়ে সঙ্গীন দৃপ্ত
আমরা চলেছি এই
নীরন্ধ্র রাতের মাঝামাঝি
তোমার প্রেমের ঋণ
রক্ত ঋণ
রক্ত দিয়ে শোধ করে দিতে;
শুধু আলো হাওয়া চাঁদ
বা সূর্য কিরণ নয়
তোমার শরীরে মাগো
বিকট দুর্গন্ধ আছে,
ক্লান্ত-শ্রান্ত অবসন্ন সব
কচি কচি যোদ্ধাদের
ঘামে ভেজা ছেঁড়া গেঞ্জি,
ময়লা বিছানা হ'তে
বিবমিষা ছুটে আসে;

তোমার দেহের সাথে
এ-দুর্গন্ধে মাগো
আমাদের ভবিষ্যৎ যেন
নবজাতকের মতো,
হাত পা বাতাসে ছুঁড়ে খেলা করছে;

শুধু খালে বিলে মাঠে
নদীতে নালায় জলে
বা সীতাকুণ্ডর
পর্বতমালায় নয়,
এইসব বৃষ্টি ভেজা
কাদামাখা তাবুতে তাবুতে যেন

তোমার মানচিত্রখানি
কতগুলি
ছোট ছোট আগুন চারার মতো
উষ্ণ-তাজা
হৃদয়ের সাথে লেপ্টে আছে।
বিভিন্ন টিলায় ট্রেঞ্চে
রাইফেলের ট্রিগারে হাত চেপে
দেখছি প্রতিদিন

হাজার হাজার জীর্ণ অবসন্ন ধর্ষিতা নারীও
পুরুষের সাথে
শত্রুর সন্ত্রাসগুলি বেয়নেট বেড়াজাল
কি করে এড়িয়ে মা আমার
হেঁটে চলছে দল থেকে দলে
দৃপ্ত পায়ে

কুয়াশার আস্তরন ছিঁড়ে
ভেঙে পড়া
প্রথম সূর্যের ক্ষীণ
আলোর রেখার মতো

কম্পমান সম্ভাবনার দিকে।
বহুপরে
অনেক রাতের শেষে
আঁধারের আস্তরন ভেঙে

নির্দয় নিশ্চিত সূর্য
জরাজীর্ণ
দেয়াল ফাটিলে বট
বৃক্ষের চারার মতো
যখন বেরিয়ে আসবে
ফেটে পড়বে
বহু প্রতিক্ষীত
সেই আনন্দিত ক্ষণে
হয়তো দেখবে
তোমার ঘরের পাশে
উজ্জ্বল পৈঠার 'পর
দু' একটি ফোঁটা
পুরনো মলিন রক্ত
লেগে আছে,

তখন কি
মনে পড়বে
মাগো
আমরা ক'জন মিলে
অবিচল প্রত্যাশায়
তোমার স্নেহের ঋণ
রক্ত-ঋণ
সহস্র সহস্র কোটি
হায়নার চীৎকারের মতো
সেই এক
পৈশাচিক অন্ধকার রাতে
চলে গেছি
রক্ত দিয়ে
শোধ করে।*

*কবিতাটির রচয়িতা জনাব মোহাম্মদ রফিক বর্তমানে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের একজন অধ্যাপক হিসেবে নিয়োজিত আছেন।

বাংলাদেশ

মিজানুর রহমান চৌধুরী

১৫ই নভেম্বর '৭১ প্রচারিত

গুরুদেব,
তোমার সোনার বাংলা আজ
শ্মশান হয়ে গেছে।
ফাগুনের আমের বনে
মুকুলের গন্ধ আজ আর নেই
বারুদের গন্ধে ভরেছে ফাগুনের বাতাস,
অবারিত মাঠ গগন ললাট
আজ উত্তপ্ত।
দস্যুদের সেলের আঘাতে
বাংলার শ্যামল রূপ বিপর্যস্ত।
মেসিনগান, মর্টার আর বোমার আঘাতে
বাংলার আকাশ বাতাস ভরে গেছে।
হে রবীন্দ্রনাথ
তোমার সোনার বাংলা আজ
শ্মশান হয়ে গেছে।

হে বিদ্রোহী
ওরা সাত কোটির সুখের প্রাণ
কেড়ে নিতে চায়।
ওরা বুলেটের আঘাতে বাঙ্গালীকে
নিশ্চিহ্ন করতে চায়।
ওই শোনো আকাশে বাতাসে
নিপীড়িত মানুষের ক্রন্দন রোল

ওই দেখ অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ
রক্তের হলি খেলায় মেতে গেছে ॥
এস বন্ধু সেই শমসের নিয়ে
আর একবার পদ্মার জলে মোরা
লালে লাল হয়ে মরি।
বাংলার পথ-প্রান্তর রক্তলেখায় পূর্ণ
এস বন্ধু আজ মোদের রক্তলেখায়
ওদেক নিশ্চিহ্ন করে দিই।

জীবনানন্দ
তুমি দেখেছিলে রূপসী বাংলার
রূপ মনোহর।
পাখীর নীড়ের মত চোখ দেখেছিলে—
নাটোরের বনলতা সেনের।
বাংলার ভাঁটফুল কদম্বের ডালে
রূপসিঁড়ি নদীটির পারে
ফিরে আসতে চেয়েছিলে
এই বাংলায়।

কিন্তু বন্ধু
রূপসী বাংলার রূপ আজ বিবর্ণ
পশ্চিমা হানাদারের নির্মমতায়
বাংলার মাঠে-ঘাটে হাহাকার ধ্বনি
প্রিয়া আজ দানবের হাতে বন্দিনী
ধর্ষিতা তরুণীর দিগন্ত বিদারী কান্না
আজ বাতাসে কেঁদে মরছে।
আশীর্ব্বাদ করো বন্ধু
প্রিয়ার দৃষ্টির অগ্নি শিখায় যেন
শত্রুর মুখ জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

সুকান্ত
নবজাতকের কাছে অঙ্গীকার করে বলেছিলে
এ বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাবে

কিন্তু নরদানবের পৈশাচিকতায়
অসংখ্য শিশু আজ অধিকার হারা।
বুভুক্ষু জনতার আহার ক্রন্দন
লাঞ্ছিত বঞ্চিত মানুষের ম্লান মুখ
গভীর জিজ্ঞাসা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।
এস আজ সিগারেটের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড হয়ে,
দিয়াশলাইয়ের কাঠির মত মুখে বারুদ নিয়ে।
এস এই সংগ্রাম মাঝে
নতুন আলোর মন্ত্র নিয়ে,
ঠিকানা তোমার পেয়েছি বন্ধু
ইন্দোনেশিয়া, যুগোশ্লাভ, কম্বোডিয়া, নয়
আলজিরিয়া, কোরিয়া, ভিয়েতনাম নয়
স্নেহ মায়া মাখা, মমতা ঘেরা
এই বাংলায়।

এগিয়ে চলো মাঝি

সবুজ চক্রবর্তী

১০ই ডিসেম্বর '৭১ প্রচারিত

এখন ঝড় উঠেছে।
চেতনার সমুদ্রে উথাল-পাথাল ঢেউ
রক্তের সমুদ্রে উথাল-পাথাল ঢেউ
তোমার
আমার
সকলের।

যে নৌকো আমরা বাইছি, সেগুলো দুলছে---
দুলছে----দুলছে----দুলছে----
হাল কষে ধরেছি
পাল ছিঁড়ে গেছে
ছেঁড়া পালে মাতাল হাওয়ার মাতলামো---
তবুও এগুতে হবে
তবুও কষে ধরতে হবে হাল---
পেছন দিকে তাকাবার সময় আর নেই
কূল অনেক দূরে ফেলে রেখে এসেছি
যাত্রাপথ দুস্তর
গন্তব্য সুদূর
তবুও অকুতোভয়ে তোমাকে এগুতে হবে
তবেই, মাঝি, তোমার নৌকো তীরে ভেড়াতে পারবে
তবেই তোমার যাত্রা হবে সার্থক--
বাঁ-হাতে মুছে ফেলবে ঘাম
চোখে মুখে ফুটে উঠবে হাসি—
বিজয়ীর হাসি
মাতাল সমুদ্রকে জয় করবার হাসি
পাগলা হাওয়াকে পরাজিত করবার হাসি

মৃত্যু তোমার থমকে দাঁড়াবে পথের বাঁকে।
মরণজয়ী জীবন তোমার, সে তো অক্ষয়
কে তাকে রুখবে বলো?
তাই, মাঝি, এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো
ক'ষে ধরো হাল
ছেঁড়া পালে মাতাল হাওয়ার মাতলামোকে
শঙ্কা করো না।

বাংলাদেশ
একটি জাগ্রত অগ্নিগিরি

অগ্নিগিরির ক্রুদ্ধ বিস্ফোরণে পম্পাই ডুবে গেল লাভা স্রোতে
বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় না নিজের চোখে না দেখলেও
চাঁদে নামলো মানুষ, কেমন অবিশ্বাস্য মনে হয়,
তবুও সত্যি।

কত স্বৈরাচারী তলিয়ে গেল
গণ-অভ্যুত্থানের বৈপ্লবিক লাভার তলায়,
সত্য ঘটনা।
ভিয়েতনাম: একটি অগ্নিগিরির অন্য নাম
বাংলাদেশ: একটি জাগ্রত অগ্নিগিরি

এ যুগের এক স্বৈরাচারী
যার ঘাড়ে অধুনা দশটা মাথা গজিয়েছে
উত্তপ্ত লাভা স্রোতে
ধ্বংস হবে তারো আলো-ঝলমল বিলাস নগরী।

এও এক অনন্ত সত্য।*

*এটিরও রচয়িতা সবুজ চক্রবর্তী। দুটি কবিতাই একই দিন প্রচারিত হয়েছে।

অবৈধ ন্যুরেমবার্গ ট্রায়াল

মুসা সদেক

২৪শে নভেম্বর '৭১ প্রচারিত

মহামান্য বিচারকমণ্ডলী :

এখন থেকে দুই দশক পূর্বে
পবিত্র ধর্ম এবং আইনের দোহাই পাড়িয়ে
বিশ্ববিবেক, বিশ্ব মানবতার ধ্বজা উঁচিয়ে
আপনাদের আদালতে যাঁদের বিচার করেছিলেন
আদালতে শেষতম শাস্তির বিধান দিয়েছিলেন
ঈশ্বর-দত্ত-প্রাণ রক্ষার অধিকার কেড়েছিলেন
তাঁরা প্রত্যেকেই নিরপরাধী এবং প্রত্যেকেই পুণ্যবান
এবং পবিত্র আইনের শ্লীলতাহানির অভিযোগে
মাত্র দুই দশকের ব্যবধানে আপনারা অভিযুক্ত।
ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না—দুই দশকি বিলম্বে
আসামীর কাঠগড়ায় আপনারা দাঁড়িয়ে
তার খাস্য একখানা প্রমাণ নির্মাণ করলেন অন্তত

বিশ্ববিবেকের যেসব মহানতম ব্যক্তিত্বকে
আপনারা সেদিন মানব সত্তা এবং সভ্যতা হন্তা হিসেবে
চিহ্নিত করেছেন, তার জন্য আমাদের দারুণ বিলাপ
এবং বিশ্বব্যাপী শোক সভার ঘটা অচিরেই শুরু হবে।

মহামান্য আদালত :

আমি অবশ্য কোটি কোটি মানুষের দুর্দশা এবং দুর্ভাগ্যের জনক
ফুয়েরারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করছি
আমি অবশ্যই ফুয়েরার দোসর বেনিটো মুসোলিনীর কথাভবছি !

ষাট লক্ষ ইহুদী নিধনের পুরোহিত মহাত্মা আইখম্যানের নামও উল্লেখ করছি।
আমি অবশ্যই কূটনৈতিক হের হস, প্রচার-বিদ গোয়েবলস সমরবিদ তোজো
প্রভৃতি পুণ্যাত্মাদের নামও উপস্থাপন করছি :
যাঁদেরকে আপনারা অবৈধ আইনের সত্তা অনুসরণ করে
ধর্মের দোহাই পেড়ে পাপাত্মা বলে চরম দণ্ড দিয়েছেন॥
এইসব মহাপ্রাণদের 'ন্যুরেমবার্গ-ট্রায়াল-প্রহসনের মাধ্যমে দণ্ড দিয়ে
সমগ্র বিশ্ব সভ্যতার যে অপূরণীয় ক্ষতি আপনারা করেছেন
আজ তার হিসাব হবে, আজ তার বিচার হবে
না হলে মানব সভ্যতার বুকে মহা অভিশাপ ধার্য হবে।

হে ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালের বিচারকমণ্ডলী :
ঈশ্বরের অসীম করুণা যে সত্য, ন্যায়, ধর্ম এবং বিচার
অবশেষে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে—তোমরা কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছো
অবৈধ ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালের তোমরা আসামী।
ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালের আসামীদের উত্তরসূরীরা আজ বিচারপতির আসনে।
ভিয়েৎনামের লক্ষ লক্ষ হত্যা যজ্ঞের পুরোহিত মহাত্মা রিচার্ড নিক্সন
বাংলাদেশের প াশ লক্ষাধিক মানুষ হত্যার যোগ্য জনক পুণ্যাত্মা এহিয়া
এবং অসংখ্য মাইলাই—ঐতিহ্যধারী পুণ্যাত্মারা
আজকের মহামান্য আদালতের মহিমান্বিত বিচারকমণ্ডলী।
আজকে বিচার হবে অবৈধ ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালের বিচারকদের
আজকে বিচার হবে ভিয়েৎনাম যুদ্ধ অপরাধে হোচিমিনের
আজকে বিচার হবে বাংলাদেশ অপরাধে শেখ মুজিবের॥*

---

*উল্লেখ্য যে কবিতাটির রচয়িতা মুসা সাদেকের বয়স ছিল ১৯৭১ সালে অনূর্ধ্ব ষোল বছর।

ভরাডুবির কবিতা

অধ্যাপক অসিত রায় চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী অবলম্বনে

কামান গরজে যেন ঘন বরষা
ভয়ে কাঁপে খান সেনা নাহি ভরসা
রাশি রাশি ভারা ভারা খান কাটা হল সারা
বাঙালীরা ক্ষুরধারা খরপরশা
জমিদারী বাঁচাবার নাহি ভরসা

এক ঘরে ইয়াহিয়া কাঁদে একেলা
দুনিয়ার রাজনীতি একি এ খেলা
চোখ বুজে দেখে আঁকা সব কিছু লাগে ফাঁকা
রাজধানী ঘুমে ঢাকা প্রভাত বেলা
সামলানো দায় হবে এবারে ঠ্যালা।

বোমবিং বিমানেতে কে আসে পারে
মনে ভাবে ইয়াহিয়া চেনে তাহারে
চাচা মামু উড়ে যায় কোনদিকে নাহি চায়
ইয়াহিয়া নিরুপায় পড়ি ফাঁপরে
ভাবে খান যা'ব পায়ে ধরি কাহারে।

চ্যাং চুং কোথা যাও কোন সে দেশে
বারেক ভিড়াও প্লেন পিণ্ডি এসে
যেও যেথা যেতে চাও যত খুশী গালি দাও
শুধু তুমি কথা দাও ক্ষণিক এসে
ভরা ডুবিবার কালে ঠ্যাকাবে এসে।

কান মল, থুথু দাও মুখের পরে
কিল চড় লাথি দাও পরান ভরে
এতকাল ঠ্যাং তুলে যাহা লয়ে ছিনু ভুলে
সব আশা ছাই হল থরে বিথরে
পিণ্ডিতে ইয়াহিয়া কাঁদে অঝোরে।

তলা ফেঁসে গেছে তাই ডুবিছে তরী
জলে ডুবে এইবার যাবে যে মরি
কাঁদিতেছে ইয়াহিয়া নিয়াজী ও ভুট্টো মিয়া
পদতলে টিক্কা সে রয়েছে পড়ি
ভরা ডুবি পাকা তাই ডুবিছে তরী।

বেহায়া খানের স্বগতোক্তি

জীবনানন্দ দাশের বনলতা সেন অবলম্বনে

অনেক বছর ধরে চরিয়াছি বাংলার মাঠে
ঢাকার প্রাসাদ থেকে চট্টগ্রাম রূপসী বন্দরে
অনেক ঘুরেছি আমি। রমনার সুরম্য হোটেলে
সেখানে গিয়েছি আমি। আরো দূরে অরণ্যের মর্কটআলয়ে।
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক ভবিষ্যৎ নিতান্ত পিচ্ছিল
আমি সে বেহায়া খান ভাঙা এক দিল।

সামনে আমার আজ ঘোরতর অন্ধকার নিশা
পড়িয়াছি বিষম ফাঁপরে। অতি দূর বাঙাল মুলুকে

মার খেয়ে পাক সেনা হারায়েছে দিশা
পালাবার পথ খুঁজে হয়রান বাঁধার ভেতর।
চিল্লায় গলা ছেড়ে—বাঁচান বাঁচান
আমি সে বেকুব বসে ইয়াহিয়া খান।

সকাল সন্ধ্যা ধরে একে একে সাঙ্গোপাঙ্গো আগে
হামিদ ভুট্টো আর নিয়াজীর দল
সবে মিলি পুনরায় করি আয়োজন
পেয়ালা উজাড় করে বুনে চলি চক্রান্তের জাল
সবশেষে ব্যর্থ হল—সব আশা—কবরেতে যায় পাকিস্তান
পিণ্ডির প্রাসাদে কাঁদি ইয়াহিয়া খান।*

*এই কবিতাও অসিত রায় চৌধুরী রচিত। দুটি কবিতাই ৯ই ডিসেম্বর '৭১ রেকর্ড করা হয়েছিল। তবে প্রচার তারিখ উল্লেখ নেই।

ধানসিঁড়ি নদীটির তীরে

সুব্রত বড়ুয়া

২৭শে ডিসেম্বর '৭১ প্রচারিত*

মনের নিভৃতে ছিল স্বপ্ন এক
যাযাবর জীবনের সোনার কৌটোয়
ক্যাঙ্গারুর সন্তানের মত
প্রাণের গভীর উষ্ণতায়,
শুধু শব্দ নয়, কথা নয়,
আরো এক অনুভূতির উজ্জ্বলতা
আমরাও পেয়ে গেছি ধানসিঁড়ি নদীটির তীরে।

একটি নদীর নামে আমরাও হৃদয়ের কাছে
কুয়াশার ফুলঝুরি খুঁজে পেতে পারি

*উল্লেখ্য যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান ২রা জানুয়ারী '৭২ পর্যন্ত প্রচারিত হয়েছিল।

একটি তারার দিকে চোখ রেখে
আমাদের সনাতন মাঠে একা
অন্ধকারে মাটির সৌরভে
নিজেকে হারাতে পারি শুভ্রস্নাত দীপ্ত নগ্নতায়।

মাঠে মাঠে ধান-কাটা শেষ হলো
হেমন্তের গভীর হাওয়ার রাত
ফিরে আসলেও ফসলের শূন্য মাঠে
আজ আর নিশীথেও সোনের বাঁচির স্বাদ
পাবে নাকো কোনো চাষী নাড়ার আগুনে।

আমাদের দিনগুলো হরিণের
বাঁকা শিং হয়ে গেলে
দিনের সবুজ রোদ
ক্রমে মধ্যাহ্নে নিষ্প্রভ হয়
বাংলার নিজের তিমিরে
একটি নদীর নাম রক্তমতী
একটি ফুলের নাম সংগ্রাম
একটি শপথ হলো একগুচ্ছ রক্তের দলিল।

ধানসিঁড়ি নদীটির তীরে
একদিন শকুনীরা সভা করেছিলো
চীন ও মার্কিণ তাতে যোগ দেবে
বলে লাউড-স্পীকার যদিও চেঁচায়—
তবু দশ লক্ষ মানুষের প্রাণের অগ্রিম মূল্যে
আমরা কিনেছি স্বাধীনতা॥
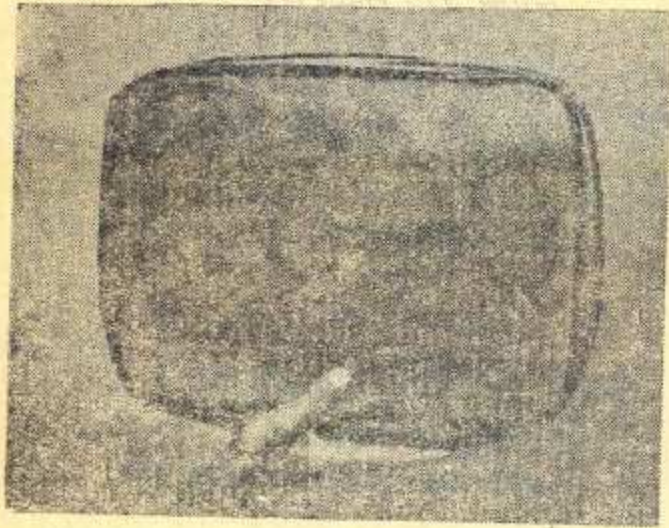
এই সেই ব্যাগ, যাতে লুকিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রতিটি অধিবেশনের রেকর্ডকৃত অনুষ্ঠান-মালা প্রচারের উদ্দেশ্যে বয়ে নিয়ে যাওয়া হ'ত ট্রান্সমিটারে। পথের অসংখ্য জনতার অসংখ্য ব্যাগের ভীড়ে মিশে যেতো এই ব্যাগ। কেউ জানতো না এতেই থাকত তাদের প্রাণ প্রিয় বেতারের জঙ্গী অনুষ্ঠান; সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনের খোরাক।

শব্দ সৈনিক
(এলবাম)

চূড়ান্ত বিজয়ের পরদিন অর্থাৎ ১৭ই ডিসেম্বর '৭১ গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিন আহমদ সমভিব্যাহারে এসেছিলেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে কর্মী-কুশলীকে ধন্যবাদ জানাতে। সম্মানিত অতিথিদ্বয়ের শুভাগমন উপলক্ষে ভাষণ দিচ্ছেন প্রেস, তথ্য, বেতার ও ফিল্ম-এর ভারপ্রাপ্ত এম, এন. এ জনাব আবদুল মান্নান। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি (পাশে উপবিষ্ট) তখন কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমদকে ছবিতে দেখা যাচ্ছেনা। তিনিও এ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রেখেছিলেন এবং বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অঝোর কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন। উল্লেখ্য যে বঙ্গবন্ধু ছিলেন তখন পাকিস্তানে এহিয়া খানের কারাগারে বন্দী। তিনি আদৌ জীবিত ছিলেন কিনা এবং তাঁরই সংগ্রাম ও ত্যাগ মহিমা স্নাত সদ্য মুক্ত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে তাঁকে কখনো ফিরিয়ে আনা যেতো কিনা সে প্রসঙ্গও ছিল তখন এক অসম্ভব কল্পনা মাত্র।

মাঝে জনাব আবদুল মান্নানের ভাষণ রেকর্ড করে নিচ্ছেন অনুষ্ঠান প্রযোজক (তৎকালীন) জনাব আশরাফুল আলম।

প্রথম দশজন ঃ

যাঁরা বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সংগঠনের দুঃসাহস করেছিলেন।

বেলাল মোহাম্মদ, দলনেতা (পরবর্তীকালে অনুষ্ঠান সংগঠক)

আবুল কাশেম সন্দ্বীপ প্রথম কন্ঠ (পরবর্তীকালে সাব এডিটর, বার্তা)

সৈয়দ আবদুস শাকের (প্রকৌশলের দায়িত্বে ছিলেন)

আবদুল্লাহ্ আল ফারুক (অনুষ্ঠান প্রযোজক)

আমিনুর রহমান (প্রকৌশল সহযোগী

রাশেদুল হোসেন (প্রকৌশল সহযোগী)

মোস্তফা আনোয়ার অনুষ্ঠান প্রযোজক (নাটক)

সারফুজ্জামান (প্রকৌশল সহযোগী)

রেজাউল করিম চৌধুরী (প্রকৌশল সহযোগী)

কাজী হাবিবুদ্দিন অনুষ্ঠান সচিব

(বাম থেকে)

সামনে উপবিষ্ট : এ. কে. শামসুদ্দিন (উপস্থাপনা তত্ত্বাবধায়ক), টি. এইচ. শিকদার (অনুষ্ঠান প্রযোজক), আবুল কাশেম সন্দ্বীপ (সাব এডিটর বার্তা), মেসবাহ্উদ্দিন আহমদ (অনুষ্ঠান সংগঠক), সুমিতা দেবী (নাট্য শিল্পী), শামসুল হুদা চৌধুরী (প্রধান অনুষ্ঠান সংগঠক), তাহের সুলতান (অনুষ্ঠান প্রযোজক), বেলাল মোহাম্মদ (অনুষ্ঠান সংগঠক), সুব্রত বড়ুয়া (সাব এডিটর, বার্তা), ম. মামুন (সাব এডিটর, বার্তা), কাজী হাবিবুদ্দিন (অনুষ্ঠান সচিব), রাশেদুল হোসেন (প্রকৌশল সহযোগী), আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী (বিশিষ্ট লেখক), মাহমুদ ফারুক (অনুষ্ঠান প্রযোজক)।

মধ্যে দাঁড়ানো : অরুন কুমার গোস্বামী (তবলা বাদক), দিলীপ কুমার ধর (লেখক), অনিল কুমার মিত্র (হিসাব রক্ষক), হাবিবুল্লাহ্ চৌধুরী (প্রকৌশল সহযোগী), সফিউর রহমান দুলু, আমিনুর রহমান (প্রকৌশল সহযোগী), আপেল মাহমুদ (সঙ্গীত শিল্পী ও সঙ্গীত প্রযোজক), মোমিনুল হক চৌধুরী (প্রকৌশল সহযোগী), কালিপদ রায় (টাইপিষ্ট), আবু ইউনুস (ঘোষক), ...(নাম উল্লেখ করা সম্ভব হল না), শামসুল হক (সহকারী), বিমল কুমার নিয়োগী (সহকারী), নাসিম চৌধুরী (লেখক), মান্না হক (সঙ্গীত শিল্পী ও সঙ্গীত প্রযোজক), আলী রেজা চৌধুরী (সংবাদ পাঠক)।

পেছনের সারি : নেওয়াজিস হোসেন (লেখক এবং কবি), সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন (ষ্টুডিও নির্বাহী), ---- (নাম উল্লেখ সম্ভব হ'ল না), বাবুল আখতার (বাংলা সংবাদ পাঠক), ---- (নাম উল্লেখ সম্ভব হ'ল না), রেজাউল করিম চৌধুরী (প্রকৌশল সহযোগী) এবং শাহ আলী সরকার (সঙ্গীত শিল্পী)।

এম, আর, আখতার
(বিখ্যাত চরম
পত্রের লেখক
এবং পাঠক)

আমিনুল হক বাদশা
(স্বাধীন বাংলা বেতার
কেন্দ্রের অন্যতম
সংগঠক)

কামাল লোহানী
(সম্পাদক, বার্তা
বিভাগ)

আশফাকুর রহমান খান
(অনুষ্ঠান সংগঠক
সঙ্গীত ও উপস্থাপনা)

আলমগীর কবীর
অনুষ্ঠান সংগঠক,
(ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ
প্রোগ্রাম)

টি, এইচ, শিকদার
অনুষ্ঠান প্রযোজক
(অগ্নিশিখা)

তাহের সুলতান
অনুষ্ঠান প্রযোজক
(সঙ্গীত)

আলী যাকের
অনুষ্ঠান প্রযোজক
ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ
প্রোগ্রাম)

আশরাফুল আলম
অনুষ্ঠান প্রযোজক
(ওবি এবং সাক্ষাৎকার)

জাহিদ সিদ্দিকী
অনুষ্ঠান প্রযোজক
(উর্দু)

শহীদুল ইসলাম
(প্রযোজক, সোনার বাংলা
ও বাংলা সংবাদ পাঠক)

বাবুল আখতার
(বাংলা সংবাদ
পাঠক)

সৈয়দ আলী আহসান
(ইসলামের দৃষ্টিতে)

ডক্টর মাযহারুল ইসলাম
(দৃষ্টিপাত)

কামরুল হাসান
(সাংগঠনিক সভায়
অংশ নিতেন)

ফয়েজ আহমদ
(পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে)

কল্যাণ মিত্র
(জল্লাদের দরবার)

আবু তোয়াব খান
(পিন্ডির প্রলাপ)

মুস্তাফিজুর রহমান
(কাঠগড়ার আসামী)

অসিত রায় চৌধুরী
(লেখক ও কবি)

মোহাম্মদ সলিমুল্লাহ্
(শেখ মুজিবের
বিচার প্রসঙ্গ)

অনু ইসলাম
অনুষ্ঠান প্রযোজক।
জয় বাংলা পত্রিকার অন্যতম
সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন।

মুসা সাদেক
(অবৈধ নুরেমবার্গ
ট্রায়াল)

নাসিম চৌধুরী
(কমাণ্ডার, আমরা
প্রস্তুত)

সমর দাস
সুরকার ও সঙ্গীত
প্রযোজক (পরবর্তী-
কালে সঙ্গীত পরিচালক)

আবদুল জব্বার
(সংগীত শিল্পী ও
প্রযোজক)

অজিত রায়
(সঙ্গীত শিল্পী ও
প্রযোজক)

আপেল মাহমুদ
(সঙ্গীত শিল্পী
ও প্রযোজক)

রথীন্দ্রনাথ রায়
(সঙ্গীত শিল্পী ও
প্রযোজক)

মান্না হক
(সঙ্গীত শিল্পী ও
প্রযোজক)

রফিকুল আলম
(আধুনিক ও
রবীন্দ্র সঙ্গীত)

হরলাল রায়
(ভাওয়াইয়া)

মোহাম্মদ শাহ বাঙ্গালী
(পুঁথী পাঠ)

এস,এম, আবদুল গনি
বোখারী
(পল্লীগীতি)

সর্দার আলাউদ্দিন
(পল্লীগীতি)

মোশাদ আলী
(পল্লীগীতি)

অনুপকুমার ভট্টাচার্য
(রবীন্দ্র সংগীত)

এম, এ, মান্নান
(আধুনিক গান)

অরুপ রতন চৌধুরী
(আধুনিক গান)

ইন্দ্র মোহন রাজবংশী
(পল্লীগীতি)

কল্যানী ঘোষ
(আধুনিক গান)

মনজুর আহমদ
(আধুনিক গান)

প্রবাল চৌধুরী
(আধুনিক গান)

মালা খান
(আধুনিক গান)

মনোরঞ্জন ঘোষাল
(আধুনিক গান)

মফিজ আঙ্গুর
(পল্লী গীতি)

খান্না সুজন
(গীতিকার)

তড়িৎ হোসেন খান
(যন্ত্র শিল্পী)

আবদুল জব্বার খান
(নাট্য প্রযোজক)

রণেন কুশারী
(নাট্য প্রযোজক)

রাজু আহমদ (নাট্য শিল্পী,
জল্লাদের দরবার এর
প্রধান চরিত্র ও প্রযোজক)

হাসান ইমাম
(নাট্য শিল্পী ও
প্রযোজক)

সিরাজুল ইসলাম
(নাট্য শিল্পী
ও প্রযোজক)

তোফাজ্জল হোসেন
(নাট্য শিল্পী
ও প্রযোজক)

সুভাস দত্ত
(নাট্য শিল্পী)

মাধুরী চট্টোপাধ্যায়
(নাট্য শিল্পী)

সৈয়দ মোহাম্মদ চান্দ
(নাট্য শিল্পী)

নন্দিতা চট্টোপাধ্যায়
(নাট্য শিল্পী)

মাযহারুল ইসলাম
(নাট্য শিল্পী)

সৈয়দ দীপেন্দু
(নাট্য শিল্পী)

আবু ইউনুস (ঘোষক)

মোহসীন রেজা
(ঘোষক)

রঙ্গলাল দেব চৌধুরী
(অনুষ্ঠানের টেপ সংরক্ষক)

সাজ্জাদ হোসেন
ষ্টুডিও নির্বাহী

নওয়াব জামান চৌধুরী
(কপিইষ্ট)

আশরাফ উদ্দিন খান
(ষ্টেনোগ্রাফার)

মোতাহার হোসেন
(ঘোষক)

রাশেদুর রহমান প্রধান
(নাট্য শিল্পী)

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত চারটি বিখ্যাত গানের গীতিকার (যাঁরা মুজিব নগরে যান নি)।

গাজী মাযহারুল আনোয়ার
(জয় বাংলা, বাংলার জয়)

ফজল-এ-খোদা
(সালাম সালাম হাজার সালাম)

আব্দুল লতিফ
(সোনা সোনা সোনা লোকে বলে সোনা)

হাফিজুর রহমান
(আমার নেতা তোমার নেতা শেখ মুজিব)

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কয়েকটি বাদ্য যন্ত্র। এ সব বাদ্য যন্ত্রের সাহায্যে শিল্পীগণ সৃষ্টি করতেন সুরের মূর্ছনা, যা সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীকে যোগাত অপরিসীম তেজ এবং মনোবল।

কয়েকটি প্রামাণ্য দলিল ও প্রাসঙ্গিক কথা

পঞ্চাশ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন মধ্যম তরঙ্গ ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে ২৫শে মে, ১৯৭১-এর সকালের অধিবেশনের শুভ উদ্বোধনের সাথেই শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় পর্যায়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দ সৈনিকগণের দৃপ্ত পথযাত্রা। সেদিনের প্রথম অধিবেশনের ঘোষণা সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর (বাংলাদেশীর) প্রাণে সঞ্চার করেছিল নতুন আশার আলো।

সেই প্রথম অধিবেশনের ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানের প্রামাণ্য ঘোষণা পত্র।

(Signature Tune)

7-00 A.M. ... [illegible]

7-10 ... [illegible]

[illegible] (handwritten Bengali lines)

8-15 : [News in Bengali.]

7-25. [News in English]

7-30: [illegible] (handwritten Bengali lines)

7-40 [Slogans & sayings of Sk. Mujib.]

হানাদার বাহিনীর দৃষ্টি এড়িয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রতি দিনের অনুষ্ঠান শোনার জন্য অতি সন্তর্পণে ভিড় জমাতেন স্বাধীনতাকামী বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি আবালবৃদ্ধবণিতা। সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রচারিত হতো এসব অনুষ্ঠান।

পঞ্চাশ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের উদ্বোধনের দ্বিতীয় দিনের প্রথম অনুষ্ঠান পত্র এমনি একটি ঐতিহাসিক প্রামাণ্য দলিল।

SWADHIN BANGLA BETAR KENDRA.

CUE-SHEET

Date: 26-5-71 Trans. I

6-57 P.M.: Signature Tune

6-58 P.M.: opening of the station & programme summary

7-00 P.M.: AGNISHIKHA: A composite programme for the freedom fighters.
(a) Message from
(b) "[illegible]" — Nazrul Islam's Song.
(c) Agiye chalo: talk on inspiration.
(d) Special News Bulletin.
(e) patriotic song

7-20 P.M.: CHARAM PATRA: Counter programme

7-30 P.M. : News in Bengali

7-40 P.M. : News in English

7-45 P.M. : AGNIBINA: A special programme on the observance of the birth anniversary of poet Nazrul Islam.. : Recitation & songs.

8-15 P.M. : Slogans & sayings of National leaders.

8-20 P.M. : Sammukhe Ashe Diganta: A talk in Bengali.

8-25 P.M : Flashes & music

8-30 P.M : close down

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র পরিবেশিত সংবাদ সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীকে দিত এক মহা প্রেরণা। তাঁরা উৎকর্ণ হয়ে থাকতেন শত্রুর ওপর নতুন নতুন আক্রমণের সংবাদ জানার জন্য। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র পরিবেশিত এসব সংবাদের উৎস ছিল টেলিগ্রাম ও অন্যান্য বিশেষ মাধ্যম। ২০শে নভেম্বর '৭১ প্রাপ্ত এমনি একটি টেলিগ্রামের প্রতিলিপি।

SADHINBANGLA RADIO
57/8 BALIGANJ CIRCULAR ROAD CALCUTTA

1500 1 MOTAHAR HOSSAIN TALUKDER MNA MANKACHAR 10 P 1/1 CTF NDS W 15L:

BIG OPERATION LEADED BY RENOWNED ABDUL LATIF MIRZA OF SIRAJGONJ ON THE ELEVENTH AT TARASH THANA WHICH ENCOUNTERED BY PAK ARMY AND RAJAKARS AT 5 A M THEY OPENED FIRE AFTER LONG FOUR HOURS FIERCE BATTLE MUKTI BAHINI KILLED FORTY PAK ARMY THIRTY RAJAKARS WOUNDED MANY/(C) ARRESTED TENPAK ARMY (50) WITH A CAPTAIN NAMED SALIM SHAH (O) CAPTURED DUE HEAVY MACHINEGUN FOUR SUBMACHINGUN

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর অন্তরে সঞ্চার করতো দৃপ্ত আশা, বাংলার দামাল মুক্তিযোদ্ধাদের দিতো মাতৃভূমি শত্রুমুক্ত করার অমিত তেজ, আর হানাদার বাহিনীর মনোবলকে করতো নিষ্ক্রিয়। যুদ্ধকালীন এই বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচার জোরদার এবং ব্যাপকতর করার উদ্দেশ্যে রোজ সকালের অনুষ্ঠান সভা ছাড়াও সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন বিশেষ অনুষ্ঠান সভার আয়োজন করা হতো।

এমনি একটি বিশেষ সভার কার্যবিবরণী।

Minutes of meeting on Co-ordination of Propaganda and Publicity efforts in support of War activity held on 10.10.71.

Members Present :-

1. A. Samad, Secretary, Ministry of Defence.
2. Dr. B. Hossain, Adviser.
3. Mr. Alamgir Kabir.
4. Mr. Shamsul Huda Chowdhury.
5. Mr. Kamal Ahmed. Lohani
6. Mr. A. Rahman.
7. Mr. B. Mahmood.

Progress of action on decisions taken in last meeting was discussed. Members from Radio Bangladesh assured that they are working on lines already decided upon and significant improvement will be noticeable from 15.10.71. onwards.

There was further discussion on measures which will contribute to improve the Radio Programme.

D E C I S I O N S :

1. An office will be immediately set-up in the Radio Building and all Staff work done there.
2. The method of news composition will be changed and text will be the same for English, Bengali and Urdu Bulletins. In view of pressure of work Mr. A. Kabir will compose the night bulletin and Mr. K. Lohani will compose the morning and after-noon bulletins.
3. The Radio will be immediately provided with a type-writing machine, two portable tape-recorders and one Casette tape-recorder.
4. The Staff of the outside broadcast section will go out frequently to the field. They will be given T.A. as no conveyance can be arranged at present.
5. Dependence on patriotic songs should be reduced and in its place martial songs and music should be introduced.
6. Arrangement for bringing the microphone from Agartala should be immediately made.
7. Security checking will be made rigid from 15.10.71. In the meantime I.D. Cards should be issued where necessary.
8. Payments for script-writers and talkers should be regular.
9. The panel of Talents should be finalized immediately in consultation with Mr. A. Mannan, MNA-in-Charge.
10. Programme shall be drawn up for 7 days at a time sufficiently in advance (atleast 4 days). The responsibility of filling in the Programme shall lie with the respective programme Organizer/Section heads.
11. Arrangement shall be made by Secretary, Information for getting Pak News Papers for the counter-propaganda section.

Sd/- A. Samad
Secretary,
Ministry of Defence.

Memo. No. D-003/76(5) Dated. 18.10.71

1) Copy forwarded to Mr. M. A. Mannan, MNA-in-Charge, Information & Broadcasting for information.

2) Mr. Shamsul Huda Chowdhury .... for information.

Secretary. 18/10/71

চূড়ান্ত বিজয়ের পর ১৭ই ডিসেম্বর '৭১ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রথম সকালের অধিবেশনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল অনেক। সে দিনের প্রথম সূর্যোদয়ে ন'মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধশেষে বাংলার জনগণ প্রথমবারের মত মুক্তাকাশে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনতে পেয়েছেন স্বাধীন সার্বভৌম জাতি হিসেবে মহা উৎসাহে। সেদিন তাঁরা ছিলেন বিজয়ী, মুক্ত। আর শত্রু ছিল শৃংখলাবদ্ধ।

সেই প্রথম সূর্যোদয়ের প্রথম অনুষ্ঠান পত্রের প্রামাণ্য প্রতিলিপি।

[illegible]

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত বিখ্যাত শ্লোগান

১। হানাদার পশুরা বাংলাদেশে মানুষ হত্যা করছে—আসুন আমরা পশু হত্যা করি।

২। বাংলাদেশের প্রত্যেকটি মুক্তিযোদ্ধা এক একটি গ্রেনেড। শুধু পার্থক্য এই—গ্রেনেড একবার ছুঁড়ে দিলে নিঃশেষ হয়ে যায়, আর মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের বার বার ছুঁড়ে দিয়ে বার বার গ্রেনেড হয়ে ফিরে আসে।

৩। গ্রেনেড গ্রেনেড গ্রেনেড---শত্রুর ঘাটিতে প্রচণ্ড গ্রেনেড হয়ে ফেটে পড়েছে মুক্তিযোদ্ধারা।

৪। বাংলার প্রতিটি ঘর আজ রণাঙ্গন---প্রতিটি মানুষ সংগ্রামী মুক্তিযোদ্ধা---প্রতিটি মানুষ স্বাধীনতার জ্বলন্ত ইতিহাস।

৫। শত্রুপক্ষের গতিবিধির সমস্ত খবরাখবর অবিলম্বে মুক্তিবাহিনীর কেন্দ্রে জানিয়ে দিন।

৬। কোন প্রকার মিথ্যা গুজবে কান দেবেন না, বা চূড়ান্ত সাফল্য সম্পর্কে নিরাশ হবেন না। মনে রাখবেন যুদ্ধে অগ্রাভিযান ও পশ্চাদাপসারণ দু'টোই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

৭। প্রতিটি আক্রমণের হিংসাত্মক বদলা নিন। সংগ্রামকে ঢেউয়ের মত ছড়িয়ে দিন।

৮। শত্রু কবলিত ঢাকা বেতার কেন্দ্রের মিথ্যা প্রচারণায় বিভ্রান্ত হবেন না। এদের প্রচার অভিযানের একমাত্র উদ্দেশ্যই হলো আমাদের সাফল্য সম্পর্কে দেশবাসীর মনে সংশয়, সন্দেহ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা।

৯। পদ্মা, মেঘনা, যমুনার মাঝি, কৃষক, কামার, কুমার, তাঁতী, বীর ক্ষেত মজুর হাতে তুলে নিয়েছে মারণাস্ত্র। এদের বুকে জ্বলে উঠেছে অনির্বাণ আগুন। এরা মরণপণ করে রুখে দাঁড়িয়েছে নরঘাতক দস্যু সৈন্যের মোকাবিলা করতে।

১০। সাবাস বাংলাদেশ, এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়, জ্বলে পুড়ে মরে ছারখার তবু মাথা নোয়াবার নয়।

১১। বর্বরতার জবাব আমরা রণাঙ্গনেই দিচ্ছি, রক্তের বদলে রক্ত নেবো। চূড়ান্ত বিজয় আমাদের হবেই হবে।

১২। বাংলাদেশে আজ শত্রু হননের মহোৎসব, প্রতিটি হানাদার দস্যু ও বিশ্বাসঘাতককে খতম করুন। ওদের বিষদাঁত ভেঙ্গে দিন, বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে অটুট থাকুন।

১৩। পশ্চিম পাকিস্তানী পণ্যসামগ্রী ব্যবহার বর্জন করুন। শত্রুর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ গড়ে তুলুন।

১৪। ইয়াহিয়ার লেলিয়ে দেয়া কুকুরগুলোকে খতম করে আসুন আমরা নতুন বাংলাদেশ গড়ি।

১৫। আপনার ভোটে নির্বাচিত গণ প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত সরকারই বাংলাদেশের বৈধ সরকার। স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ছাড়া আর কোন হানাদার সরকারের আনুগত্য রাষ্ট্রদ্রোহিতারই শামিল।

১৬। মুক্তিবাহিনী লড়ছেন আমার জন্য, আপনার জন্য। বাংলাদেশের ইজ্জতের জন্য।

১৭। স্বাধীনতার প্রশ্নে সাড়ে সাত কোটি বাঙালী আজ ঐক্যবদ্ধ। মুক্তিযোদ্ধাদের সবল হাতের হাতিয়ার শত্রুর কলিজায় ঘা মারছে। জয় আমাদের সুনিশ্চিত।

১৮। স্বাধীনতা কারো যৌতুক হিসাবে পাওয়া যায় না। তা কিনে নিতে হয় এবং একমাত্র রক্তের মূল্যেই স্বাধীনতা কেনা সম্ভব। বাঙালী সে মূল্য দিয়েছে, দিচ্ছে এবং আরো দেবে।

১৯। আমাদের মুক্তিবাহিনী যুদ্ধ করছে শত্রুর থেকে ছিনিয়ে নেয়া অস্ত্র দিয়ে, এমনিভাবে মুক্তিবাহিনীর অপ্রতিহত অগ্রগতি চলছে দুর্বার গতিতে। তারা আর থামবে না—কোনদিন থামবে না। দেশকে শত্রুমুক্ত করার পূর্বে, চূড়ান্ত বিজয়ের পূর্বে এই যুদ্ধ থামবে না।

২০। জল্লাদবাহিনীর গতিবিধি লক্ষ্য করুন। নিকটবর্তী মুক্তিবাহিনীর ঘাটিতে খবর দিন।

২১। বিদেশী শাসক এবং হানাদারদের সৃষ্ট কলংকের ইতিহাস বাঙালীরা এবার মুছে ফেলবে।

২২। বাংলাদেশের সর্বত্র শত্রু হননের প্রতিযোগীতা চলছে। রক্ত চাই। শুধু রক্ত।

২৩। প্রতিটি বাঙালীর হৃদয়ে আজ প্রতিহিংসার প্রচণ্ড উত্তাপ। হানাদার হত্যা করাই আজ আমাদের একমাত্র কর্তব্য।

২৪। চূড়ান্ত বিজয় আমাদের সন্নিকটে। সর্বশক্তি দিয়ে দস্যু সেনাদের আক্রমণ করুন।

২৫। বাংলার শ্যামল মাটি আজ পুঞ্জীভূত বারুদের গোলা---প্রতিটি ঘর এক

একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ ; বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ অপরাজেয় মুক্তি-যোদ্ধা। যেখানেই থাকুন না কেন শত্রুকে প্রচণ্ড আঘাত করুন।

২৬। বাংলার মুক্তিযুদ্ধে শহীদানের প্রতিটি রক্তবিন্দু—আজ উদ্দীপ্ত করেছে স্বাধীনতা সূর্যকে।

২৭। মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে জঙ্গীশাহীর বর্বর খান সেনারা আজ দিশেহারা।

প্রতিটি রণাঙ্গনেই হানাদাররা হচ্ছে পর্যুদস্ত, আরো জোরে আঘাত হানুন। শত্রুকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করুন।

২৮। সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুক্তি সংগ্রাম এখন চূড়ান্ত বিজয়ের পথে। বাংলার নবদিগন্তে আজ প্রত্যুষের নতুন আশ্বাস।

২৯। বাংলার নারী-পুরুষ—আবালবৃদ্ধবনিতা প্রত্যেকেই আজ দুর্দ্ধর্ষ মুক্তি-যোদ্ধা। সাড়ে সাত কোটি মানুষের এই সম্মিলিত শক্তির মোকাবেলায় হানাদার পশুরা চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

৩০। বঙ্গবন্ধুর অগ্নিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ সাড়ে সাত কোটি মানুষের সম্মিলিত বজ্র কণ্ঠ স্তব্ধ করে দিয়েছে জঙ্গীশাহীর উদ্ধত কামানকেও।

৩১। মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড আঘাতে শত্রু ছাউনী এখন ছিন্নভিন্ন। সংগ্রামের প্রতিটি মুহূর্ত বয়ে আনছে বিজয়ের জয়োল্লাস।

৩২। সাবাস মুক্তিযোদ্ধা ভায়েরা। বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানী পশুদের নির্মম গণহত্যার প্রতিশোধ নাও। আরো জোরে আঘাত কর।

৩৩। সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর পতাকা আজ পত্ পত্ করে উড়ছে বাংলাদেশের প্রতিটি প্রান্তে। নব দিকদিশারী এই পতাকাকে জানান আপনার সশ্রদ্ধ সালাম।

পঞ্চ শপথ

* হানাদারদের হাতে মারার সঙ্গে সঙ্গে ভাতেও মারুন।
* পাকিস্তানী পণ্য বর্জন করুন।
* মুক্তিবাহিনী লড়ছেন আমার জন্য, আপনার জন্য। বাংলাদেশের ইজ্জতের জন্য।
* মুক্তিবাহিনীকে সব রকম সাহায্য করুন। পাক বেতারের মিথ্যা কথার জঞ্জাল কানে নেবেন না।
* স্বাধীনতার প্রশ্নে সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালী আজ ঐক্যবদ্ধ। মুক্তিযোদ্ধাদের সবল হাতের হাতিয়ার শত্রুর কলিজায় ঘা মারছে। জয় আমাদের সুনিশ্চিত।

দশম পরিচ্ছেদ

হানাদার কবলিত বাংলা ঃ কবিতা ও গান

মূলত: বাঙ্গালীর স্বাধিকার এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে এ দেশের কবি, গীতিকার, সাহিত্যিক এবং সাংবাদিকের অবদান ছিল অবিস্মরণীয়। এতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে : অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ্, জহুর হোসেন চৌধুরী, বদরুদ্দিন ওমর, সেকান্দর আবু জাফর, আবু জাফর শামসুদ্দিন, ডক্টর মাযহারুল ইসলাম, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, ডক্টর আলাউদ্দিন আল আজাদ, ডক্টর নীলিমা ইব্রাহীম, ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী, ডক্টর আনিসুজ্জামান, ডক্টর রফিকুল ইসলাম, ডক্টর মো: মনিরুজ্জামান, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, রণেশ দাশ গুপ্ত, আনোয়ার পাশা, কবি শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহ, ফয়েজ আহমদ, আবদুল হাফিজ, কামাল লোহানী, নির্মলেন্দু গুন, আসাদ চৌধুরী, মহাদেব সাহা, গাজী মযহারুল আনোয়ার, আবদুল লতিফ, কবি আল মাহমুদ, আল মোজাহেদী, কবি আজিজুর রহমান, কবি আবুল হাসান, ফজল-এ খোদা, শহিদুল ইসলাম, টি, এইচ, শিকদার, আশরাফুল আলম, সুরকার আলতাফ মাহমুদ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহ, অধ্যাপক আনোয়ার পাশা, আলতাফ মাহমুদ প্রমুখকে হানাদার বাহিনীর হাতে হারাতে হয়েছে তাঁদের মুল্যবান জীবন। কবি শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান প্রমুখকে হানা-দারের দৃষ্টি এড়িয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কাটাতে হয়েছিল একাত্তরের দুঃসহ দিনগুলি। কিন্তু ঐ পরিস্থিতিতেও তাঁদের কলম ছিল সক্রিয়। এমনি কয়েকজন প্রবীণ এবং তরুণ কবির কবিতা ও গান এসাথে তুলে দিলাম পাঠককুলের উদ্দেশ্যে :

শামসুর রাহমান

তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা

তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা,
তোমাকে পাওয়ার জন্যে
আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায় ?
আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন ?

তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা
সকিনা বিবির কপাল ভাঙলো
সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর।
তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা।
শহরের বুকে জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক এলো
দানবের মতো চিৎকার করতে করতে
তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
ছাত্রাবাস, বস্তি উজাড় হলো। রিকয়েললেস রাইফেল
আর মেশিন গান খই ফোটালো যত্রতত্র।
তুমি আসবে বলে ছাই হলো গ্রামের পর গ্রাম।
তুমি আসবে বলে বিধ্বস্ত পাড়ায় প্রভুর বাস্তুভিটার
ভগ্নস্তূপে দাঁড়িয়ে একটানা আর্তনাদ করলো কুকুর।
তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা।
অবুঝ শিশু হামাগুড়ি দিলো পিতামাতার লাশের ওপর।
তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা তোমাকে
পাওয়ার জন্যে
আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়?
আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন?
স্বাধীনতা, তোমার জন্যে থুথুথুরে বুড়ো
উদাস দাওয়ায় বসে আছেন—তাঁর চোখের নীচে
অপরাহ্ণের
দুর্বল আলোর ঝিলিক, বাতাসে নড়ছে চুল।
স্বাধীনতা, তোমার জন্যে
মোল্লাবাড়ির এক বিধবা দাঁড়িয়ে আছে
নড়বড়ে খুঁটি ধরে দগ্ধ ঘরের।
স্বাধীনতা তোমার জন্যে,
হাড্ডিসার এক অনাথ কিশোরী শূন্য থালা হাতে
ব'সে আছে পথের ধারে।
তোমার জন্যে,
সগীর আলী, শাহবাজপুরের সেই জোয়ান কৃষক,
কেষ্ট দাস, জেলেপাড়ার সবচেয়ে সাহসী লোকটা,
মতলব মিয়া, মেঘনা নদীর দক্ষ মাঝি,

গাজী গাজী বলে যে নৌকো চালায় উদ্দাম ঝড়ে
রুস্তম শেখ, ঢাকার রিক্সাওয়ালা, যার ফুসফুস
এখন পোকার দখলে
আর রাইফেল কাঁধে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো
সেই তেজী তরুণ, যার পদভারে
একটি নতুন পৃথিবীর জন্ম হতে চলেছে—
সবাই অধীর প্রতীক্ষা করছে তোমার জন্যে, হে স্বাধীনতা
পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে জ্বলন্ত
ঘোষণার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে,
নতুন নিশান উড়িয়ে, দামামা বাজিয়ে দিগ্বিদিক
এই বাংলায়
তোমাকে আসতেই হবে, হে স্বাধীনতা।

হাসান হাফিজুর রহমান

আর নয় আর

গণহত্যা কার স্বার্থকে রাখে
        গণরক্ষক ওরা সৈনিক?
শহীদের খুনে একী উদ্ভট ঋণ
        শোধবার পালা প্রায় দৈনিক?

ব্যারিকেডে ঘিরে আমুন বাংলা ভূমি
        শান্তির নামে তোলে সঙ্গীন।
রক্তে রাঙিয়ে পলি কালো মাটি, তাকে
        তারা বলে, সংহতি রঙ্গীন।

বন্দীশালার নিপুন টহলদার,
        কেবলি বাড়ায় সাঁজোয়ার ভিড়।
টুঁটিতে আঁটেন সাঁড়াশির স্বাধীনতা,
        সোনায় সোহাগা তার কারফিউ।

লুটেরাতো নন, মাত্র দখলদার,
বুটের আঁচড়ে দেগে অধিকার।
মিত্র বেশের খোলে জামিয়ার বটে,
কণ্ঠে লুকানো খুনী হুংকার।

মিছিলের মুখে লাশ নিয়ে তবু ফিরি,
জাগ্রত করি করুণা কিসের ?
করুণার মূলে ক্রোধের আগুন, আজ
সর্ব শরীর জ্বলছে বিষের।

নিহত ভায়ের লাশ কাঁধে বয়ে ঢের,
গড়েছি মিনার, হেঁটে গেছি পথ।
আর নয়, চাই শত্রুর লাশ চাই,
---এইবার এই বজ্র শপথ।

আজিজুর রহমান

সেই সংগ্রাম এই স্বাধীনতা

অতল আঁধারে পাড়ি ধরে আর নিরাশা সাগরে ভেসে,
কত ঝড় আর প্রলয় ঝঞ্ঝা
দুঃখের রাত্রি শেষে---
কতো কারাগার, ফাঁসীর রশ্মি-
ছিঁড়ে এলো এই দিন---
কতো জীবনের কতো রক্তের বিনিময়ে এলো ফিরে ;
এই স্বাধীনতা সূর্য সুরঙ্গীন---
আনলো জোয়ার ভাঁটার নদীর তীরে,
সে কথা থাকবে যুগ যুগ লেখা তপ্ত অশ্রু নীরে।

আজ অতীতের সেই কথা মনে পড়ে---
বাঁধন ছিঁড়তে কত না প্রাণের পুষ্প পড়েছে ঝরে
সেই দুর্গম রাতে দুরন্ত যারা হলো আগুয়ান,

পাহাড় ভাঙলো
পাথর কাটলো
দিল পথ-সন্ধান।
এ দেশের মন এ দেশের মাটি ভুলবে না কোনদিন
তাদের সে ত্যাগ, তাদের সাধনা
তাদের রক্ত ঋণ।

তারা গেয়ে গেছে মরণ বিজয়ী গান,
রক্ত বীজের সৃষ্টি করেছে প্রাণ---
তারা এনে দেছে জীবন-বন্যা যৌবন অম্লান।
শোণিতের সুরে শুনছি তাদের ভাষা।
মুক্ত এদিনে আছে অতৃপ্ত
তাদের মৌন আশা,
জনতার মনে কথা ফোটাতেই হবে---
সকলের মুখে হাসি ফোটাতেই হবে---
আনতেই হবে
আরো উজ্জ্বল সূর্য বহ্নিমান

খান মোহাম্মদ ফারাবী

ব্যারিকেডের রাজপথ

লাফিয়ে উঠে ঝাপিয়ে পড়ে চিৎকার
গর্জে ওঠে ব্যারিকেডের রাজপথ---
নগরবাসী বেলা দ্বি-প্রহরে
মেতেছে আজ বসন্ত উৎসবে ?
দুয়ার প্রান্তে বসন্ত আজ কেমন
বিদ্রোহ লাল উত্তরীয় গায়ে---
চমকে দেখে বেয়োনেটের ফলা
স্বদেশ আজ মুক্তি অবাধ্যতা।

এবার ফাল্গুন আগুন হয়ে জ্বলে,
পথে পথে হোলি খেলার পালা---
সবুজ প্রিয়ার হৃদয়ে বিক্ষোভ
মায়ের মুখে লোহিত নীরবতা।

প্রভু তোমার সাঙ্গ হলো খেলা
মেঘে মেঘে অনেক হলো বেলা---
দেয়ার দিন শেষ হলো এইবার
এখন ঋণ পরিশোধের পালা।

লাশের পর লাশ জমেছে বেশ
স্বদেশ বুঝি কান্না হতে গিয়ে
রৌদ্রেরেখা অবাধ্য চিৎকারে
চমকে গিয়ে মিছিল হোলো ফের।

এই বসন্তে নগরবাসী চলো
আবীর রঙে চিন্তা মেখে নিয়ে
লুণ্ঠিত সব ইচ্ছাগুলো ফের
ফিরিয়ে আনার অস্ত্র তুলি হাতে।*

---

*কবিতাটির রচনাকালে খান মোহাম্মদ ফারাবীর বয়স ছিল মাত্র ষোল বছর। এই তরুণ কবি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে মাত্র একুশ বছর বয়সে দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯৭৬ সালে এন্তেকাল করেন। শুধু কবিই ন'ন, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতি ছাত্র ফারাবী মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক উভয় পরীক্ষায় মানবিক শাখায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন।

ফজল-এ খোদা

গান

১

আমি শুনেছি শুনেছি আমার মায়ের কান্না
গলিতে গলিতে শহরে নগরে
গাঁয়ে গাঁয়ে ঘরে ঘরে
আমি দেখেছি তারি রক্ত অশ্রু বন্যা॥

কান পেতে শোন আকাশে বাতাসে
দুঃখিনী মায়ের হাহাকার---
ছেলে হারানো দীর্ঘশ্বাসে
আনে অভিশাপ মৃত্যু অনিবার,
আজ মায়ের মুখে হাসি ফোটাতে
জাগে দিকে দিকে ভায়ের সাথে
বাংলার বধূ কন্যা॥
মা যে আমার অনাহারী আজো
ছিন্ন বস্ত্রে রোগে শোকে মৃত প্রায়;
মাকে আমার দিতে হবে আশা
পূর্ণ মুক্তি আলো হাসি যাহা চায়।
দিকহারা নদী সাগরে পাথারে
ওঠলি উঠিছে দিগ্বিদিক,---
কূল ছাপানো জলোচ্ছ্বাসে
ধুয়ে মুছে দিক জঞ্জাল, চারিদিক;
আজ মায়ের চোখের অশ্রু মুছিয়ে
কালো আঁধারের দুঃখ ঘুচিয়ে
বাংলা হবে ধন্য॥

আমরা এক ঝাঁক উজ্জ্বল রোদ্দুর—
আঁধারের বাঁধ ভেঙে
এনেছি আলোর সুর

আমাদের মুখে মুখে মুক্তির গান
আমাদের ঘরে ঘরে শক্তির বাণ
জনতার মিছিল সব দ্বিধা সঙ্কোচ
হয়ে গেছে দূর ॥

আমাদের পথে পথে রক্তের চিন
জীবনের আলো আনে উজ্জ্বল দিন
চলি তাই সম্মুখে পথ বক্র প্রান্তর
দুর্গম বন্ধ ॥

একাদশ পরিচ্ছেদ

বুদ্ধিজীবী যখন মুক্তিযোদ্ধা

সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত

মিঃ সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত।এ দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনের এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। একজন খ্যাতনামা আইনজীবী ছাড়াও বিগত দীর্ঘ এক দশক ঊর্দ্ধকাল থেকে তিনি প্রথমে তৎকালীন প্রাদেশিক পরিষদ এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশ জাতীয় পরিষদের একজন সম্মানিত সদস্য হিসেবে সিলেট জেলার সুনামগঞ্জাধীন দিরায়শাল্লাই এলাকার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। একজন পার্লিয়ামেণ্টারিয়ান হিসেবে ইতিপূর্বেই তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন।

একাত্তরের রণাঙ্গনে যে ক'জন বুদ্ধিজীবী পরিষদ সদস্য অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে দেশ মাতৃকার স্বাধীনতা যুদ্ধে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, মিঃ সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত তাঁদেরই একজন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টে আইন ব্যাবসায়ে নিযুক্ত আছেন।

১৮ই ফেব্রুয়ারী '৮২ সন্ধ্যার পর মিঃ সুরঞ্জিত সেন গুপ্তের এলিফ্যাণ্ট রোডস্থ বাসভবনে একান্ত অন্তরঙ্গ পরিবেশে আলাপ করলাম একাত্তরের রণাঙ্গনে তাঁর যুদ্ধ পরিচালনার অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে। সাথে ছিলেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম শব্দ সৈনিক সঙ্গীত শিল্পী মিঃ মনোরঞ্জন ঘোষাল।

প্র: মি: সেন গুপ্ত, একাত্তরে আপনার রাজনৈতিক পরিচিতি কি ছিল?

উ: আপনি বুঝতেই পারছেন, আমার বয়সের পরিধি থেকে যে সাধারণত: রাজনৈতিক পরিচিতি বলতে তদানীন্তন পাকিস্তানে বিভিন্ন ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে যারা বেরিয়ে আসেন, তাদের মধ্যে, আমি ছোট হলেও, একজন। এই যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ঢেউ যেটা ১৯৫২ থেকে শুরু হয়েছিল, তারই শেষ প্রান্তে এসে '৬২ থেকে '৬৯ আমি কিছুটা যুক্ত হয়েছিলাম। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম ছাত্রাবাস জগন্নাথ হলে এসে ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পরই রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে আমার কর্ম তৎপরতা বেড়ে যায় বলতে পারেন। তখনকার দিনে ছাত্র ইউনিয়ন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপওয়ালী)রাজনৈতিক দলকে অনুসরণ করত। কাজেই অধ্যয়নের শেষ প্রান্তে এসে আইনের ছাত্র থাকা কালেই আমি ন্যাপ-এ যোগ দিয়েছিলাম এবং আইন পাশ করার পর পরই তৎকালীন প্রাদেশিক ন্যাপ-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হয়েছিলাম। ঐ সময়ে প্রাদেশিক ন্যাপ প্রধান ছিলেন অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ। অল্পদিন পরই অনুষ্ঠিত হ'ল '৭০-এর সাধারণ নির্বাচন। আমি প্রাদেশিক পরিষদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য নির্বাচিত হয়েছিলাম। সিলেটের সুনামগঞ্জাধীন দিরাসল্লাই আমার নির্বাচনী এলাকা ছিল। আপনারা জানেন, তখন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ঢেউ চরমে পৌঁছেছিল। আওয়ামী লীগ নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে এলেন। রাজনৈতিক দল হিসেবে ন্যাপ থেকে একমাত্র আমিই নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলাম। আর প্রাদেশিক পরিষদে মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে জনাব নুরুল আমিন তাঁর দুই প্রাদেশিক পরিষদ সহ জয়ী হয়ে এসেছিলেন। পরবর্তীকালে স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁরা চলে যান পাকিস্তানের পক্ষে। আমরা কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যাই।

প্র: এবার বলুন ২৬শে মার্চ '৭১ আপনি কোথায় ছিলেন এবং কি ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিলেন?

মুক্তিযুদ্ধের সূচনাকালে আমি সিলেটে আমার নির্বাচনী এলাকায় ছিলাম। ২৬শে মার্চ '৭১ আমি একখানা টেলিগ্রাম পেলাম। টেলিগ্রামের প্রেরকের ঠিকানায় শেখ মুজিবুর রহমানের নাম ছিল। টেলিগ্রাম পাওয়া মাত্রই আমি জনসভা করলাম। তখন আমার এলাকার এয়ারফোর্স-এর দুজন অবাঙ্গালী ছিল। আমি খবর পেয়েছিলাম তারা একটা ওয়ারলেস সেট নিয়ে কিছু একটা করছিল। এটা নিয়ে মানুষের মধ্যে খুব উত্তেজনা হয়েছিল। কাজেই এই ওয়ারলেস সেটটি আমরা তাদের থেকে নিয়ে নিলাম। তাদের কাছে আমরা দু'টি রাইফেলও পেলাম।

এগুলি আমরা পাঠিয়েছিলাম সিলেট। এ দু'টি রাইফেলই ছিল মুক্তিযুদ্ধে আমাদের প্রারম্ভিক হাতিয়ার।

পরবর্তীকালে সুনামগঞ্জেই আমরা স্থাপন করেছিলাম আমাদের এলাকার প্রধান কার্যালয়।

প্র: ইতিপূর্বে ২৬শে মার্চ '৭১ শেখ মুজিবের নাম দিয়ে যে টেলিগ্রাম পেয়েছিলেন, তার বিষয়বস্তু কি ছিল, অনুগ্রহ করে বলুন।

উ: টেলিগ্রামখানা ছিল ইংরেজীতে। এর হুবহু ভাষা আর স্মৃতি থেকে বলা সম্ভব নয়। তবে এতে যা ছিল তার অর্থ এই দাঁড়ায়: 'আমরা আক্রান্ত। আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলাম। তোমরা শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত কর।'

এখানে একটি কথা যোগ করা দরকার যে: আমি কিন্তু তৎকালীন প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্য হিসেবেই ঐ নির্দেশ পেয়েছিলাম। আমি ছিলাম ন্যাপ দলীয় সদস্য। তবে আমার মধ্যে কখনো দলীয় মনোভাব ছিল না। সব সময় আমি জাতীয় মনোভাব নিয়েই কাজ করেছি। কাজেই আমিও বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে ঠিক অনুরূপ নির্দেশই আশা করেছিলাম। টেলিগ্রামখানাকে আমি জাতীয় নির্দেশ হিসেবেই ধরে নিয়েছিলাম। ঐদিনই আহূত আমার সভায় আমি জনতাকে এই টেলিগ্রাম পড়ে শুনিয়েছিলাম।

প্র: বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনের প্রতি আপনি কতটুকু একাত্ম ছিলেন, অনুগ্রহ করে বুঝিয়ে বলুন।

উ: আমাদের রাজনৈতিক দর্শন এবং অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী আওয়ামী লীগ থেকে কিছুটা ভিন্ন ছিল। কিন্তু এতদ্‌সত্বেও তখনো এবং আজো আমি মনে করি, যেহেতু আমি একটি নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব করেছিলাম, সে জন্যই ঐ টেলিগ্রাম আমার কাছে পাঠানো হয়েছিল, এবং এটাই হওয়া যুক্তিযুক্ত ছিল। রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আমি ছিলাম একজন পরিষদ সদস্য। কাজেই আমিও টেলিগ্রাম খানাকে সেভাবে গ্রহণ করেছিলাম।

প্র: ঐ টেলিগ্রাম পাওয়া মাত্রই আপনি সভা ডাকলেন, তারপর আর কি করলেন?

উ: আমরা ছিলাম একটা অনুন্নত এলাকায়। আমরা এক রকম বিচ্ছিন্ন ছিলাম। কিন্তু শুধু আমি নই, ঐ এলাকার পুরা মানুষ একটা কমাণ্ড-এর পেছনে চলে গেল। আমার মনে হ'ল সেদিন আমি যেন এটাই খুঁজছিলাম। জনসাধারণের কাছে আমি বলামাত্রই আশাতিরিক্ত সাড়া পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে হাজার

হাজার লোক একত্রিত হয়ে গেলেন। তাঁদের মধ্যে অভূতপূর্ব উৎসাহ পরিলক্ষিত হ'ল। কাজেই ঐ টেলিগ্রামের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ছিল অত্যন্ত বেশী।

আমি সঙ্গে সঙ্গে জনসভা করে জনগণকে বলে দিলাম যে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। সভার উপস্থিত জনতাকে হাত উঁচিয়ে টেলিগ্রামখানা দেখিয়ে বললাম: এটাই মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ, এটাই আদেশনামা। এটা এসেছে বিধিমতে গঠিত সংগঠন থেকে। কাজেই এই নির্দেশকে আমাদের অবশ্যই মানতে হবে।

আমরা সঙ্গে সঙ্গে একটা কমিটি করে ফেললাম। তখন অবশ্য শুধু আমি নই, আওয়ামী লীগ এবং স্বাধীনতার সমর্থক অন্যান্য সব দলের প্রতিনিধি নিয়ে আমরা একটা সম্মিলিত কমাণ্ড গঠন করলাম। এই কমাণ্ড-এর মাধ্যমেই আমরা ঐ এলাকাকে পরিচালিত করতে থাকি এবং পরবর্তী নির্দেশ আমরা কিছু পাই কিনা সেজন্য অপেক্ষা করতে থাকি।

দিন চারেক পরের কথা। হঠাৎ শুনলাম হবিগঞ্জ থেকে মেজর দত্ত পরিচয়ে একজন সামরিক অফিসার (পরবর্তীকালে মেজর জেনারেল) স্থানীয় কিছু লোককে নিয়ে এগিয়ে আসছিলেন। তাঁর বাড়ীও হবিগঞ্জ। তিনি তখন ছিলেন ছুটিতে। তাঁর সাথে স্থানীয় আনসার এবং তৎকালীন ই-পি-আর এর লোকজন ছিলেন। হবিগঞ্জ থেকে তিনি সিলেট আসার পথে আমি একখানা লঞ্চে কিছু খাবার এবং রশদপত্র নিয়ে আমার এলাকার কয়েকজন উৎসাহী লোকজন সহ শেরপুরে তাঁর সাথে একত্রিত হ'লাম। তিনি তখন দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। যতই তিনি এগিয়ে যাচ্ছিলেন, ক্রমে তাঁর বাহিনীর আকারও বাড়তে থাকে। ছেলেরা অস্ত্র বা অন্য যা পেলো তাই নিয়ে তাঁর সাথে যোগ দিল। এটা ছিল আমাদের এলাকা অর্থাৎ সিলেট জেলা থেকে সশস্ত্র যুদ্ধের প্রথম অভিযান।

মেজর দত্তের বাহিনী এক কি দেড় দিন সিলেট শহর তাঁদের অধীনে রেখে-ছিলেন। তারপর তাঁরা ওখান থেকে পিছু হটে যান। তাঁরা চলে যাওয়ায় আমিও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম। আমি তখন আমার এলাকা অর্থাৎ সুনামগঞ্জে ফিরে গেলাম। সেখানে আমরা স্থানীয় লোকজন এবং থানার পুলিশ অফিসার ও কর্ম-চারীদের সংগঠন করলাম। সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিলেন। পুলিশ বাদেও সশস্ত্র বাহিনীর অর্থাৎ স্থানীয় ই-পি-আর এবং আনসার বাহিনীর লোকজন এগিয়ে এলেন আমাদের সাথে। আশ্চর্যজনক ভাবে তাঁরাও আমাদের কমাণ্ডে সাড়া দিলেন। ইতিপূর্বে আমরা যে সম্মিলিত কমিটি গঠন করেছিলাম, তাঁরা আমাদের এই কমিটির নির্দেশ মানলেন। আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলাম যে,

আমার এলাকায় ঐ সময়ে কোনও চুরি-ডাকাতি ছিল না। দেখলাম, দেশাত্মবোধ সমাজের সর্বস্তরের লোককে একটিমাত্র লক্ষ্যে ধাবিত করেছে, আর সেটা হ'ল দেশকে শত্রুমুক্ত করা। অপরদিকে ঐ সময়ে সরকারের অস্তিত্ব পর্যন্ত ছিল না। অথচ লোকজন আমাদের কথাকেই সরকারী নির্দেশ হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন। একটা অভূতপূর্ব শৃংখলা পুরা এলাকায় বিরাজ করছিল। হাট-বাজার, পথে-ঘাটে সর্বত্র কোথাও কোনও বিশৃংখল অবস্থা পরিলক্ষিত হয়নি। আমার একটা ভয় ছিল, কেরোসিন এবং লবণের দাম বেড়ে যেতে পারে। কিন্তু লক্ষ্য করলাম, এমনকি ব্যবসায়ীদের মধ্যেও অদ্ভুত সংযম এবং দেশাত্মবোধ। তাঁরা এসব জিনিষের দাম বাড়াননি। লক্ষ্য করেছি, তাঁরাও এক অভূতপূর্ব জাতীয়তাবাদী এবং দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।

প্র: এত গেল '৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম কয়েকদিনের কথা। পর-বর্তী কি কর্মসূচী আপনি নিয়েছিলেন অনুগ্রহ করে বলুন।

উ: আমরা প্রায় মাস দেড়েক এভাবে আমাদের এলাকাকে মুক্ত রাখলাম। আমরা ইতিপূর্বে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়ার বক্তৃতাও শুনে-ছিলাম। আমি বস্তুনিষ্ঠ ভাবে বলছি, যথার্থই তাঁর বক্তৃতা জনগণকে প্রাথমিক ভাবে সংঘবদ্ধ করতে যথেষ্ট উৎসাহিত করেছিল। বিশেষ করে বেঙ্গল রেজিমেণ্ট এবং আনসার বাহিনীর সশস্ত্র জোয়ানগণ এতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তখন আমাদের একটা ধারণা হয়েছিল এই বুঝি ঢাকা দখল হয়ে গেল; ধারণা করেছিলাম স্বল্প কালের মধ্যেই আমরা স্বদেশকে হানাদার বাহিনী থেকে মুক্ত করে নিতে পারবো। কিন্তু আস্তে আস্তে বিভিন্ন রাজনৈতিক বিশ্লেষণে বুঝলাম যে এই যুদ্ধ মোটেই ক্ষণস্থায়ী হবে না; অনির্দিষ্ট কালের জন্য চলতে থাকবে। কাজেই আমরাও মনে করলাম, এই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে আমাদেরও ভূমিকা আছে, আমাদেরও করণীয় আছে। কাজেই সে ভাবে এই যুদ্ধের সাথে জড়িত হওয়ার জন্য চিন্তা করলাম।

আমি গেলাম হবিগঞ্জে। সেখানে গিয়ে জানলাম, যে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আগরতলায় একত্রিত হয়েছেন। তখন হবিগঞ্জের এস-ডি-ও ছিলেন জনাব আকবর আলী (সম্ভবতঃ বর্তমানে সংস্থাপন বিভাগের উপ-সচিব)। জনাব আকবর আলী আমাকে সাহায্য করলেন। তাঁর সাহায্যে আমি আগরতলা গেলাম। সেখানে আমি ন্যাপ এবং আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তাঁরা আমাকে সিলেটের করিমগঞ্জ যাওয়ার জন্য ভার দিলেন। আমাকে দায়িত্ব দিলেন পীর হাবিবুর রহমান, বরুণ রায় প্রমুখকে খুঁজে আনার জন্য। পীর হাবিবুর রহমান তখন ন্যাপ-এর নেতা ছিলেন (বর্তমানে মোজাফ্ফর ন্যাপ-এর সেক্রেটারী

জেনারেল)। কাজেই আমার কাজ ছিল তাঁদেরকে বের করে আগরতলা পাঠানো। তাঁরা তখন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ছিলেন। আমি তাঁদেরকে আগরতলা পাঠালাম। সেখানে আমার দেখা হয়ে যায় জেনারেল দত্তের সঙ্গে। তিনি তখন মোটামুটি তাঁর বাহিনীকে সংগঠন করে নিয়েছেন। তিনি আমাকে জানালেন যে খাসিয়া জয়ন্তিয়া পার্বত্য এলাকার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা তাঁর পক্ষে অসুবিধা হচ্ছিল। ঐ এলাকার সাথে যোগসূত্র বাঁধার দায়িত্ব আমি নিতে পারি কিনা তিনি জানতে চাইলেন। তখন আমি শিলং থেকে সীমান্ত এলাকা ধরে খাসিয়া জয়ন্তিয়া এলাকায় গেলাম। ফিরে এসে ঐ এলাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি জেনারেল দত্তকে জানালাম।

আমরা আওয়ামী লীগ দলীয় নেতৃবৃন্দ সহ এক সাথে বসে সিদ্ধান্ত নিলাম। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আমাকে একখানা জীপ দেয়া হ'ল। সাথে এক ট্যাঙ্ক পেট্রোলও দিল। তখন আমি আবার খাসিয়া-জয়ন্তিয়া এলাকায় চলে গেলাম। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের অভ্যন্তর থেকে লোকজন এসে সীমান্ত এলাকায় বিভিন্ন ক্যাম্পে অবস্থান করছিলেন। এসব ক্যাম্প-এর যুবক ছেলেদের সাথে আলাপ করলাম। বাংলাদেশের অভ্যন্তরেও সম্পর্ক স্থাপন করলাম। দেখা গেল যে এসব যুবকদের সংঘবদ্ধ করা সম্ভব। সেখানে জেনারেল রব-এর সাক্ষাৎ পেলাম। তিনি তখন আওয়ামী লীগের এম, এন, এ ছিলেন। ঠিক করলাম তাঁর সাহায্যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আমরা একটা যোগসূত্র স্থাপন করব। এরপর আমি চলে গেলাম টেকের ঘাটে। সেখানে আমি স্থাপন করলাম আমার ক্যাম্প। এই ক্যাম্পে আমার সাথে প্রায় পনের হাজার যুবক ছিল। আমাদের কাজ ছিল গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া। সিলেটের ভাটি এলাকা এবং সুনামগঞ্জ সহ নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ এবং হবিগঞ্জের কিছু এলাকার দায়িত্ব আমি নিয়েছিলাম। শুধু শহরগুলি বাদ দিয়েছিলাম। আমাদের কাজ ছিল ঢাকা থেকে ভৈরব লাইনে পাক বাহিনীর চলাচল ব্যাহত করা আর 'হিট এণ্ড রান' অর্থাৎ শত্রু বাহিনীকে আঘাত করে দ্রুত সরে যাওয়া। ঐসব এলাকায় কোনও সেক্টর ছিল না। সেক্টর ছিল করিমগঞ্জে। জেনারেল ওসমানী সেখানে গিয়েছিলেন।

প্রঃ জেনারেল শওকত আলীকে ত তখনো সিলেট পাঁচ নম্বর সেক্টরের দায়িত্ব দেয়া হয়নি।

উঃ জেনারেল শওকত আলী আরো কিছু দিন পর এসেছিলেন। ইতিপূর্বে ঐ এলাকায় আমরা স্থানীয় জনসাধারণকে নিয়ে একটি কমিটি করেছিলাম। এখানে আর একটি কথা যোগ করা আবশ্যক যে মেজর মোতালিব (অন্য এক

বাঙালী সামরিক অফিসার) ঐ সময় ছুটিতে ছিলেন। তিনিও স্থানীয় কিছু ই-পি-আর, আনসার এবং যুবকদের নিয়ে একটি বাহিনী সংগঠন করেছিলেন। 'বাতু' এলাকার নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব তিনি নিয়েছিলেন। আর একজন বাঙালী সামরিক অফিসার সালাহউদ্দিন নিয়ন্ত্রণের ভার নিয়েছিলেন 'বালাত' এলাকার। কাজেই আমরা এই তিনজনই তিনটি পৃথক সাব-সেক্টার সংগঠন করেছিলাম।

প্রঃ জেনারেল মীর শওকত আলী এসব এলাকার নিয়ন্ত্রণ ভার কখন নিয়েছিলেন?

উঃ সম্ভবতঃ জুন '৭১ এর প্রথম ভাগে হবে। আমরা এসব এলাকা সংগঠন করার পরই মীর শওকত আলী এলেন সেক্টার কমাণ্ডার হয়ে।

প্রঃ তখন আপনার 'পজিশন' কি দাঁড়াল?

উঃ আমি আমার সাব-সেক্টারেই ছিলাম। তবে স্বাভাবিক ভাবেই কমাণ্ড-এর একটা প্রশ্ন আসে। আমার মনে একটা অনুভূতি ছিল যে আমি সামরিক ব্যক্তি ছিলাম না; যুবকদের নিয়ে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলাম শুধু মাত্র সামরিক প্রয়োজনে। উল্লেখ্য যে আমি গেরিলা পদ্ধতিতে যুবকদের নিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে সিলেটের ভাটি এলাকার প্রায় তিন চতুর্থাংশ মুক্ত রেখেছিলাম। গেরিলা পদ্ধতি ছাড়াও আমার কিছু প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বাহিনী সরাসরি হানাদার বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করেছে। আমাদের সাথে এল, এম, জি, তিন ইঞ্চি মর্টার এবং [illegible] সহ মোটামুটি অস্ত্রশস্ত্র কিছু এসে গিয়েছিল। আমার ছেলেরা পাক বাহিনীর বেশ কিছু গানবোটও ডুবিয়ে দিয়েছিল। সুরমা নদী হয়ে ঢাকা ফিরে যাওয়ার পথে আমরা পাক বাহিনীর অনেক রেশন কেড়ে নিতে সমর্থ হয়েছিলাম। এগুলি আমরা আমাদের ক্যাম্পে নিয়ে আসতে পেরেছিলাম। আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত এসব রেশন আমরা বিভিন্ন সাব-সেক্টারেও বিতরণ করেছি।

জেনারেল শওকত আলী আসার পর আমি বলেছিলাম আমার দায়িত্ব কোনও সামরিক অফিসারকে প্রদানের জন্য। কিন্তু তিনি আমাকে এ দায়িত্ব চালিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন এবং বললেন: 'আপনিই চালিয়ে যান'। তখন স্বভাবতঃই কমাণ্ডের প্রশ্ন আসে। আমি ছিলাম একজন পরিষদ সদস্য। জেনারেল ওসমানী তখন যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সুবিধার্থে আমাদের মধ্যে একটা সমঝোতা করলেন। তিনি সিদ্ধান্ত দিলেন যে এই সাব-সেক্টারে যত দিন আমি থাকি, ততদিন এটা একটি স্বাধীন সাব-সেক্টার হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সুবিধার্থে পরামর্শ এবং সমন্বয় সাধনের জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করে যাওয়ার জন্য তিনি পরামর্শ দিলেন। এ ছাড়া সাবান্ত

হ'ব হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য প্রয়োজনে পারস্পরিক অনুরোধের ভিত্তিতে আমরা উভয়ে দুই বাহিনীর ছেলেদের রিডুইজিশান করতে পারব, কিংবা সম্মিলিত ভাবেও আমরা যুদ্ধ করতে পারব। কাজেই বুঝতেই পারছেন আমাদের মধ্যে একটা সার্বক্ষণিক সমন্বয়ের দরকার ছিল এবং আমরা সেভাবে কাজও করেছি।

প্র: ইতিপূর্বে কোন প্রশিক্ষণ ছাড়াই আপনি কিভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করলেন?

উ: প্রথম থেকেই অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ আমার ছিল না। কিন্তু মাতৃভূমিকে মুক্ত করার ইচ্ছাই আমাকে আমার বাহিনী সংগঠনে উদ্বুদ্ধ করেছে। আমার বাহিনীতে ই-পি-আর এবং আনসার সহ সামরিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত লোক ছিলেন। যুদ্ধ সংগঠনে তারাই আমাকে মূলতঃ সহযোগিতা প্রদান করেছেন। কাজেই অল্প দিনের মধ্যে আমি নিজেও অস্ত্র চালনা শিখে নিয়েছিলাম। এখানে একটি কথা আপনাকে বলে রাখছি। যুদ্ধ পরিচালনার জন্য ম্যাপ রিডিং এর ট্রেনিং ছিল অপরিহার্য। এই ম্যাপ রিডিং আমি অল্প সময়ের মধ্যেই আয়ত্ত করে নিয়েছিলাম। পুরা এলাকার ম্যাপ আমার মুখস্থ ছিল। তাঁছাড়া আমি নিজে ঐ এলাকায় জন্মগ্রহণ করেছি। ওখানেই বড় হয়েছি, কাজেই যুদ্ধ পরিচালনার জন্য এলাকা ভিত্তিক প্রয়োজনীয় তথ্য আমার ভাল জানা ছিল। তাঁছাড়া আমার এলাকাটি ছিল পর্বত সঙ্কুল এবং নদীময়। ঐ এলাকায় চিরাচরিত যুদ্ধের চাইতে গেরিলা যুদ্ধ পদ্ধতি ছিল বেশী সুবিধাজনক। এখানে একটি কথা উল্লেখ করা আবশ্যক যে গেরিলা যুদ্ধে অনেক সময় সামরিক নেতৃত্ব থেকে রাজনৈতিক নেতৃত্বই বেশী কাজ করে। আমার সাব-সেক্টরটি মূলতঃই ছিল গেরিলা বাহিনী নিয়ে গঠিত। কাজেই তাদের প্রশিক্ষণ ছিল প্রধানতঃ ম্যাপ রিডিং এবং হঠাৎ আক্রমণ পদ্ধতি ইত্যাদি। আগেই উল্লেখ করেছি আমার এলাকাটি ছিল পর্বতসঙ্কুল এবং নদীময়। কাজেই গেরিলা যুদ্ধ পদ্ধতির জন্য আমার এলাকাটি ছিল অত্যন্ত উপযোগী। আমার ছেলেরা নৌকা নিয়ে আক্রমণ পরিচালনার জন্য চলে যেতো এবং তাদের অপারেশন শেষ করে আবার ফিরে আসত। কাজেই গেরিলা বাহিনী পরিচালনার কৌশলের সাথে রাজনৈতিক নেতৃত্বেরও প্রয়োজন ছিল আমারও মনে হয়, এ দুটির সমন্বয় সাধন আমি করতে পেরেছিলাম এবং এজন্যই আমি আমার সাব-সেক্টার কমাণ্ড করতে পেরেছিলাম।

প্র: অস্ত্র পরিচালনা এবং গ্রেনেড ছোঁড়ায় আপনার নিজস্ব অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে অনুগ্রহ করে বর্ণনা করুন।

উ: আমার মনে আছে আমার পাশাপাশি তাহিরপুর এবং জামালগঞ্জ এই দুই জায়গায় পাকিস্তানী সৈন্য তাদের সামরিক ঘাটি স্থাপন করেছিল। এই দুই এলাকায়ই ছিল পাকিস্তানের মিলিশিয়া বাহিনী। এলাকা দুটি উদ্ধারের জন্য আমি প্রায় পনের শত যুবক নিয়ে আক্রমণ পরিচালনা করেছিলাম। আমরা সংকল্পবদ্ধ ছিলাম যে এ দুটি থানা আমরা উদ্ধার করবই। আমার মনে আছে আমাদের আক্রমণের প্রথম রাত ছিল খুবই দুর্যোগপূর্ণ। অবশ্য এ জাতীয় আক্রমণের জন্য আমরা দুর্যোগপূর্ণ রাতই সাধারণতঃ বেছে নিতাম। প্রবল বেগে তুফানের পরই শুরু হ'ল মুষলধারে বৃষ্টি। একই সাথে হাওরগুলি হয়ে উঠল উন্মত্ত। আমরা ছৈ-বিহীন নৌকা বেছে নিতাম ইচ্ছা করে। কারণ, ছৈ-যুক্ত নৌকা দিয়ে আক্রমণ পরিচালনা ছিল অসুবিধাজনক। দিনের বেলায় আমরা এসব নৌকাকে আক্রমণ শেষে ডুবিয়ে রাখতাম। এক একখানা নৌকা ছিল সাধারণতঃ একশত থেকে দু'শত হাত এবং এতে ২৫ থেকে ৩০ খানা দাঁড় থাকত। আরো উল্লেখ্য যে আমার থানার অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধার নৌকা বাইচ-এ অভিজ্ঞতা ছিল।

আমার বাহিনীতে একদল শক্তিশালী গুপ্তচর ছিল। এ বাহিনীর কাজই ছিল বিভিন্ন এলাকার অগ্রিম খবরাদি আমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া। তারা শত্রু বাহিনীর চলাচলের পুংখানুপুংখ চিত্র আমাদের কাছে পৌঁছে দিত। তারপরই আমরা আক্রমণ পরিচালনা করতাম।

সেই দুর্যোগের রাত প্রায় তিনটার সময় আমরা শত্রু বাহিনীর ওপর আক্রমণ পরিচালনা করলাম। কচুরীপানা দিয়ে মাথা ঢেকে আমাদের চারজন ছেলে গ্রেনেড নিয়ে চলে গেল বাংকারে। অপরদিকে কাভার ফায়ারিং এর দায়িত্ব নিয়েছিলাম আমি নিজে।

আপনি দৈনিক বাংলার ফিচার এডিটার সালাহ্উদ্দিন চৌধুরীকে হয়ত চিনেন। '৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় তাঁরও অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি আমার সাব-সেক্টারে ছিলেন। তিনিও যুদ্ধে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন এবং যুদ্ধের সম্মুখ পর্যন্ত গিয়েছিলেন। আর একজন ছিলেন মাহফুজ ভুঁইয়া। বর্তমানে তিনি গণমুক্তি পার্টির প্রেসিডেন্ট। তিনিও আমার সাব-সেক্টারে যুদ্ধ করেছেন। তাঁর যুদ্ধ নৈপুণ্যে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তিনি আমার সাথে যুদ্ধের শেষ দিন পর্যন্ত ছিলেন। তাঁর বাড়ী কিশোরগঞ্জে। মূলতঃ ঐ এলাকায়ই আমি তাঁকে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য দায়িত্ব দিতাম। আমার এলাকায় আর একজন বুদ্ধিজীবী যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তিনি ছিলেন বিধু দাশ গুপ্ত।

প্র: গণপ্রতিনিধি বা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে আপনারা কতজন অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছেন?*

উ: কথাটি একবারই '৭২ সালে জাতীয় সংসদের অধিবেশনে প্রশ্নাকারে উত্থাপিত হয়েছিল। তখন জেনারেল ওসমানী এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন। '৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে যেসব সম্মানিত পরিষদ সদস্য অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছিলেন, জেনারেল ওসমানী তাঁদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করেছিলেন। আমার মনে পড়ে তাঁর উল্লেখিত পরিষদ সদস্যগণের মধ্যে ছিলেন জেনারেল রব, ক্যাপটেন সুজাত আলী এবং আমি। এ নিয়ে পরিষদে আপত্তি উঠেছিল। জবাবে জেনারেল ওসমানী বলেছিলেন: অস্ত্র হাতে যুদ্ধ পরিচালনা করা এবং সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে একজন সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করাকে এক করে দেখা যায় না। যাঁরা আপত্তি তুলেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সম্ভবতঃ লতিফ সিদ্দিকীও ছিলেন।

প্র: আপনি অস্ত্র হাতে আপনার এলাকায় কোন্ সময় পর্যন্ত যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন?

উ: সম্ভবতঃ নভেম্বরের শেষ পর্যন্ত। ঐ সময়ে মেজর মোতালেহ্‌উদ্দিনকে আমার এলাকায় পাঠানো হয়েছিল। তাঁকেই পেয়েই আমি যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর হাতে দিয়েছিলাম। তাঁকে আমি বুঝালাম, মূলতঃ রাজনীতিই আমার পেশা। শেষ পর্যন্ত তিনি আমার অনুরোধে আমার সাব-সেক্টরের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

প্র: ওখান থেকে কোথায় গেলেন?

উ: ওখান থেকে প্রথমে আমি রিফিউজি ক্যাম্পে গিয়ে অল্প কয়েকদিন থাকার পরই আমার পার্টি হেড্ কোয়ার্টারে চলে গিয়েছিলাম। ওখানে যাওয়ার অল্পদিন পর ৩রা ডিসেম্বর '৭১ পাকিস্তান হিন্দুস্থান সোচ্চার যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। এরপর আমি জেনারেল ওসমানীর সঙ্গে পরপর কয়েকবার দেখা করেছিলাম। প্রথম তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম যশোর, এরপর আগরতলা এবং সর্বশেষ দেখা করেছিলাম সিলেটে। সম্ভবতঃ ১৯শে ডিসেম্বর '৭১ আমি তাঁর সাথে সিলেটে দেখা করেছিলাম। তবে ইতিপূর্বে ১৭ই ডিসেম্বর '৭১ আমি প্রথম বাংলাদেশের অভ্যন্তরে চলে আসি। অবশ্য উল্লেখ্য যে আমি বেশীর ভাগ সময় বাংলাদেশের অভ্যন্তরেই ছিলাম। কারণ আমার সাব-সেক্টরের কেন্দ্রস্থলই ছিল বাংলাদেশের মাটিতে। টেকের ঘাট বলে আমাদের একটা বিরাট প্রোজেক্ট ছিল। এটা ছিল কয়লার প্রোজেক্ট। এটা ঠিক ভারতীয় সীমান্তের কাছাকাছি এলাকায় ছিল। সেখানেই আমি প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে এবং হেড্‌কোয়ার্টার স্থাপন করেছিলাম। মোট কথা মুক্তিযুদ্ধের শুরু এবং শেষ পর্যন্ত আমরা বাংলাদেশের মাটিতেই ছিলাম। এখানে আক্রমণ হয়েছে এবং আমরা এখান থেকেই গিয়ে যুদ্ধ করেছি।

প্র: জেনারেল মীর শওকত আলীর সঙ্গে এক সাথে যুদ্ধ করার সুযোগ আপনার কখনো হয়েছিল কি?

উ: সম্ভবতঃ নভেম্বরের শেষ দিকে আমরা একত্রে বড় রকমের একটি আক্রমণ পরিচালনা করেছিলাম। আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল ছাতক। পুরা সিলেট এলাকায় ছাতকের অবস্থান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর আগেই আমাদের একজন মুক্তিযোদ্ধা সালুটিকর বিমান বন্দরের কাছে গুলি করে একখানা পাকিস্তানী বোমারু বিমান ফেলে দিয়েছিল। সেখানে আমরা যে আক্রমণ পরিচালনা করেছিলাম, তাতে মীর শওকত আলী ছিলেন সম্মুখ ভাগে। আমরা তাঁর পিছু পিছু ছিলাম। কিন্তু পাক-বাহিনী ক্যামোফ্লেজ* করে আমাদের দুই বাহিনীকে আলাদা করে ফেলেছিল। ওরা মধ্যভাগে ওত পেতে বসেছিল। আমরা বুঝতে পারিনি। ওখান থেকে ওরা সামনে এগিয়ে গেল। তারপর হঠাৎ গুলি ছুঁড়ে আমাদের মধ্যে ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল। আমরা তখন দিশেহারা। কারণ ইতিপূর্বে আমরা বুঝতেই পারিনি যে ওরা আমাদের মধ্যভাগে ছিল। ঠিক এমনি পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র মীর শওকত আলীর কৃতিত্ব এবং সাহসিকতাপূর্ণ যুদ্ধ পরিচালনার জন্যই আমরা বেঁচে গিয়েছিলাম। এজন্য অবশ্যই তাঁর কৃতিত্ব স্বীকার করতেই হবে। তিনি তাঁর জীবনকে বিপন্ন করে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেলেন। তখন আমাদের মধ্যে যোগাযোগের জন্য 'ওয়াকী টকী' পর্যন্ত ছিলনা। এমনি অবস্থায় তিনি হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এসে আমাদিগকে শত্রু বাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে জানিয়ে গেলেন এবং বলে গেলেন আমাদের পরবর্তী রণকৌশল কি হওয়া উচিত। আমরা সম্মিলিত ভাবে পাক বাহিনীকে দূর থেকে ঘিরে ফেললাম। তখন তারা পালাতে বাধ্য হ'ন। আমরা ছাতক নিয়ে নিলাম। আমার

*অন্যতম বুদ্ধিজীবী মুক্তিযোদ্ধা ব্যারিষ্টার শওকত আলীকেও আমি একই প্রশ্ন করেছিলাম। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তাঁরা পরস্পরের ভূমিকা সম্পর্কে আজো অজ্ঞাত। এদেশের প্রায় এক লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা আজো এমনি ভাবে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন রয়েছেন। এখন স্বীকৃতিটাই বড়। প্রশ্ন হ'ল কে মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন?

*যুদ্ধ ক্ষেত্রে ছদ্মাবরণ কৌশল।

মনে হয়েছে, সমস্ত মুক্তি যুদ্ধে এটাই ছিল আমাদের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ আক্রমণ এবং এটাই ছিল চিরাচরিত যুদ্ধের একটি উল্লেখযোগ্য দিক—আমাদের এলাকার সব চাইতে সফল অভিযান।

প্র: আমার কথা শেষ করার আগে আপনাকে আরো দু'একটি প্রশ্ন করব। বাংলাদেশ ডকুমেন্ট বা অন্য কোনও ভাবে আপনার যে স্বীকৃতি, অর্থাৎ আপনি যে যুদ্ধ করেছেন, তার কোনও রেকর্ড আছে বলে মনে হয় না। এ সম্পর্কে আপনি মন্তব্য করুন।

উ: আমার কথা রাখেন। আমাদেরত অন্য পথ আছে। রাজনৈতিক দিক আছে। এই যে ছেলেগুলি আমার শহীদ হলো, দেশের জন্য প্রাণ দিল, আজ পর্যন্ত কেউ প্রয়োজনবোধ করেননি এই ছেলেগুলির নাম পর্যন্ত সংগ্রহ করার জন্য। ধরুন, মেজর মোতালিব, তিনি মুক্তিযুদ্ধ করেছেন, আজকে গিয়ে দেখুন, কোথাও কোন অজানা, অখ্যাত পরিবেশে পড়ে আছেন। কষ্ট করে জীবন যাপন করছেন তিনি।

প্র: এখন তিনি কোথায় আছেন?

উ: সিলেটেই আছেন। জানেন তার ভাগ্যে কি ঘটেছে? স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক সরকারের আমলেই তিনি জেল ছাড়া আর কিছু পাননি, ক'দিন আগেও তিনি জেল থেকে ফিরেছেন। এমনি ভাবে যে ছেলেগুলি প্রাণ দিল, তাদের পর্যন্ত হিসাব লিপিবদ্ধ করা হ'ল না।

প্র: এই স্বীকৃতি না দেয়ার বা ব্যর্থতার পেছনে কি কারণ রয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

উ: স্বীকৃতির প্রশ্ন আসে বিশ্বাস থেকে। যে কারণে আজকে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ দূরের কথা, নিজেদের অস্তিত্বই বিপন্ন। যে রাজনৈতিক দর্শনকে সামনে রেখে আমরা যুদ্ধ করেছি, সেটাও স্বনাভিষিক্ত হয়েছে এখন অন্য ভাবে। আমি পূর্ণ শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি একাত্তরের মুক্তি সংগ্রামে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের সংগ্রামী অবদানের কথা। কিন্তু আমার বক্তব্য: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ একটা রাজনৈতিক দল বিশেষ বা কোনও ব্যক্তি বিশেষ একক ভাবে করেননি। মুক্তিযুদ্ধ যখন আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হল, তখন বাংলার আপামর জনসাধারণ, তাঁতি, মজুর, কৃষকের ছেলে, মধ্যবিত্ত, শ্রমিক, চাকুরীজীবী, সাংবাদিক, লেখক প্রত্যেকেই বিভিন্ন ভাবে এই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের পর যখনই তার স্বীকৃতির প্রশ্ন এসেছে, তখনই দেখা গেল রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার বাইরে অন্য কেউ স্বীকৃতি

পেলেন না। এখানে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গী কাজ করল। ফলে বস্তুনিষ্ঠ, সত্যনিষ্ঠ না হয়ে আমরা সবাই তোষামোদ প্রিয় হয়ে গেলাম। যারা পৃষ্ঠপোষকতা পেলেন, তোষামোদ করলেন, তারা ওপরে ওঠে গেলেন। কিন্তু যারা নিষ্ঠাবান, অথচ পৃষ্ঠপোষকতা পেলেন না, কিংবা তোষামোদ করলেন না, তারা পেছনে পড়ে রইলেন।

আমার কথাই ধরুন। আমি মুক্তিযুদ্ধ করেছি। কিন্তু প্রধানত: আমি একজন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী। বাংলাদেশ হওয়ার পর পরই বাংলাদেশের গঠনতন্ত্র প্রণয়ন কালে আমি স্ব দায়িত্ব বোধে এর প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন এবং সমালোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলাম, কারণ তখন যে কনষ্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি (গঠনতন্ত্র প্রনয়ণের উদ্দেশ্যে আহুত সংসদ অধিবেশন) হয় মূলত: আমিই একমাত্র বিরোধী দলের প্রতিনিধি ছিলাম, আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে। ফলে তখন আমাদের কাছ থেকে সব সময় খুব ভাল কথা শোনানো স্বাভাবিক ছিল না। বিরোধী দলের প্রতিনিধি হিসেবে আমাকে জনগণের পক্ষে সরকারের দোষত্রুটিগুলি তুলে ধরতে হয়েছিল। এটাকে সামনে রেখে রাজনৈতিক দল বা মতের উর্দ্ধে থেকে একটা জাতীয় সম্পদ হিসেবে আমরা মুক্তি যোদ্ধাদের তুলে আনতে পারিনি। যেমন, আপনার মনে থাকতে পারে, মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি হয়েছিল। সেই কমিটিতে ন্যাপ থেকে অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ ছিলেন, মনোরঞ্জন দাস ছিলেন। সমন্বয় কমিটিতে মওলানা ভাসানী ছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই কমিটি আর থাকেনি। আপনি জানেন, '৭১ সালেই এই সমন্বয় কমিটি হয়েছিল। বরং দেখা গেল মুক্তিযুদ্ধ এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কোনও একটি বিশেষ দলের একচেটিয়া হয়ে গেল। এমনকি দেখা গেল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক, শহীদ লে: কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন সহ ঐ মামলার অন্যান্য আসামী যাঁরা হানাদার বাহিনী কর্তৃক অকথ্যভাবে নির্যাতীত হয়েছিলেন তাঁদের অবদানের পর্যন্ত কোনও মূল্যায়ন হ'ল না। এই দৃষ্টিভঙ্গী কিন্তু আমাদের জন্য অমঙ্গল ডেকে এনেছে। বেশী দূর যেতে হয়নি। '৭২ থেকে '৭৫-এ গিয়েই দেখলাম, আমরা আমাদের কতটুকু ক্ষতি করতে পেরেছি। দ্বিতীয়ত: আর একটা প্রসঙ্গ আমি এখানে উপস্থাপন করতে চাই। আমি কাউকে আঘাত করার জন্য বলছি না। '৭১-এর ন'মাসের মুক্তিযুদ্ধ বা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল নেতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তব্য, বক্তৃতা ইত্যাদি আমাদের প্রেরণা দিয়েছিল, সত্য কিন্তু শারীরিক ভাবে

এই নেতৃত্ব দেয়ার মত অবস্থা তাঁর ছিল না। তিনি তখন ছিলেন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী। তিনি যখন ফিরে এলেন, তখন দেখা গেল মুক্তিযুদ্ধ এবং তাঁর মধ্যে একটা ছোট যোগাযোগ ব্যবধান রয়ে গেল। মুক্তিযোদ্ধাগণ ছাড়াও সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং জনাব তাজুদ্দিনসহ যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছেন তাঁদের মধ্যেও ছিল এক অতি ছোট ব্যবধান। কিন্তু আমাদের মধ্য থেকে কিছু সুযোগ সন্ধানী লোক এই ছোট ব্যবধানকে বড় করার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেলেন। অনেকে সুযোগ বুঝে বঙ্গবন্ধুর কাছে গিয়ে প্রকৃত যুদ্ধের কৃতিত্ব সম্পর্কে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করলেন। বঙ্গবন্ধুকে বুঝিয়ে এলেন যে তিনিই যুদ্ধে সব কিছু করেছেন, ইত্যাদি। দুর্ভাগ্যবশতঃ বঙ্গবন্ধু তাদের অনেকের কথায় বিভ্রান্ত হলেন। কিন্তু '৭১-এর যুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধু যদি যথার্থই আমাদের সাথে থাকতেন, তা'হলে এই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হ'ত না। কথাটি যদি অন্য ভাবে বলি, তিনি যদি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী থেকেই সেই ন'মাস মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করতেন, তা'হলে মুক্তিযুদ্ধে কার কি কৃতিত্ব ছিল, কে কোথায় যুদ্ধ করেছেন, কে কি কাজের দায়িত্বে ছিলেন সবই তাঁর জানা থাকত।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সুযোগ সন্ধানীরা তাঁর ঐ অনুপস্থিতির সুযোগ নিল। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক শত্রুরা বঙ্গবন্ধুর সাথে মুক্তিযুদ্ধের ঐ ব্যবধানটাকে কাজে লাগিয়েছে। এটাকে তারা আস্তে আস্তে বড় করেছে। ফলে আমাদের মধ্যে বিভেদ এলো, আমাদের মধ্যে অবিশ্বাস এলো। যারা যথার্থ কাজ করল, মুক্তি-যুদ্ধ করল তারা নিরাশ হ'ল।

প্র: মি: সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত, এই যে আমাদের মধ্যে সর্বত্র একটা দুর্ভাগ্যজনক ব্যবধান পরিলক্ষিত হচ্ছে, এই অভিশাপ থেকে উত্তরণের জন্য এখন আমাদের কি করণীয় বলে আপনি মনে করেন?

উ: আমি আশাবাদী লোক। আমি নৈরাশ্যবাদী নই। ইতিহাসের চাকা পেছনের দিকে ঘুরে না। এটা আমি বিশ্বাস করি। এটা এগিয়ে যাবেই। যথার্থই মুক্তিযুদ্ধ ও তার আদর্শকে কিছুদিন হয়ত রাহুগ্রাস করে রাখতে পারে, কিন্তু এটাকে কেউ চিরতরে ঢেকে রাখতে পারবে না। এটা আমি বিশ্বাস করি। মূলতঃ যে রাজনৈতিক দর্শন সেদিন ছিল এবং আমরা পরবর্তীকালে এসে সং-বিধানে লিপিবদ্ধ করেছিলাম—যাতে ছিল আমরা একটি রাষ্ট্র গঠন করব, যেখানে থাকবে গণতন্ত্র, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী এবং সমাজতন্ত্র; আর এটাই ছিল আমাদের সেদিনের মুক্তিযুদ্ধের মূল কথা। এটাই আমরা সংবিধানে লিপিবদ্ধ করেছিলাম। যেমন ধরুন, আমরা সংবিধানে লিখেছিলাম মুক্তিসংগ্রাম।

কিন্তু এই মুক্তিসংগ্রামকে কেটে করা হ'ল স্বাধীনতা যুদ্ধ। অথচ মুক্তিসংগ্রাম এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান রয়েছে। এর একটা তথ্যগত দিকও রয়েছে। মুক্তি সংগ্রামের একটা ধারাবাহিকতা রয়েছে। এই ধারা-বাহিকতা দ্বিজাতি তত্ত্বের বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, একনায়কত্বের বিরুদ্ধে, এবং অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে। এই ধারাবাহিকতা ছিল বাংলার আপামর সংগ্রামের ইতিহাস। এই যে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে যে অধিকার চেতনা ঘটে, তাঁরই চূড়ান্ত পর্যায় ছিল একাত্তর। কিন্তু 'মুক্তিসংগ্রামকে' নতুন নামকরণ করা হ'ল স্বাধীনতা যুদ্ধ। কথাটি দাঁড়ায় বাংলার কোনও প্রান্ত থেকে কেউ হুইসাল দিয়েছে, আর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেল। যদি তাই হতো, তা'হলে এখানে বেঙ্গল রেজিমেন্ট সামরিক অভ্যুত্থান ঘটালেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যেতো, কিন্তু তা'হয়নি। একটা ধারাবাহিক আন্দোলনের ফলশ্রুতিই আমাদের আজকের স্বাধীনতা।

ধরুন, আপনি '৮২তে এসে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস খুঁজে বেড়াচ্ছেন। একজন সুস্থ মানুষ, যথার্থ ক্ষ্যাপা না হলে এই দিনে, এই ইতিহাস কেউ খুঁজে বেড়ায় না। হয়ত আপনি বর্তমানের কাছে কিছু আশা করছেন না, অতীতের কাছেও আপনার কিছু পাওনা ছিল না, ভবিষ্যতের কাছেও হয়ত আপনার কোথাও দাবী নেই। কিন্তু আপনি এটা সংগ্রহ করছেন এবং লিপিবদ্ধ করছেন একটা ইতি-হাসকে তুলে ধরার জন্য। আগামী উত্তরসূরীরা এখান থেকে খুঁজে পাবে ইতি-হাসের উপকরণ। এই যে প্রচেষ্টা, একে আমি মনে করছি ঐ একাত্তরের প্রেরণা, যা শুরু হয়েছিল বায়ান্ন থেকে—তাকে ফিরিয়ে আনা। আপনি একটা জীবন্ত সংগ্রাম। আপনি এটাকে শুরু করছেন কোন্ দিক থেকে? এটাকে আমি মনে করছি Subjective side (আত্মউপলব্ধির দিক) যে জিনিষটা আমাদের দেশে সাংঘাতিক অভাব। আমরা রাজনৈতিক নেতারা বাইরের কাঠামো নিয়েই আছি। কিন্তু আত্মউপলব্ধিতো তার সংস্কৃতি, তার দর্শন। এই জায়গায় যদি মুক্তি-যুদ্ধের দর্শনটা তার সাহিত্যের মধ্যে, তার স্বাধীন দেশের সংস্কৃতির মধ্যে, কবিতার মধ্যে, তার বিভিন্ন অংগনে পরিস্ফুটিত হয়, তবেই আমাদের মধ্যে সত্যিকারের জাতীয়তাবোধ ফিরে আসতে পারে। সংক্ষেপে এক কথায় বলতে হয় যে আমরা '৫২, '৬২, '৬৯ এবং '৭১-এর প্রেরণায় সংঘবদ্ধ হয়ে যে ভাবে সংগ্রাম করেছিলাম সেই সংগ্রাম আজো শেষ হয়নি। আজকের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা চিন্তা করুন। বর্তমানে এমন কোনও অর্থনীতিবিদ জীবিত নেই, বা অনাগত কালেও জন্মাবে কিনা আমার জানা নেই, যিনি সমাজতন্ত্রের পথ ছাড়া বিকল্প হিসেবে

আমাকে একটা দশশালা বা বিশশালা পরিকল্পনা দিতে পারবেন যে সমাজতন্ত্র ছাড়া অন্য কোনও বিকল্প পথে আছে। অন্তত: আমি মনে করি না। আমরা যদি '৫২, '৬২, '৬৯ এবং '৭১-এর শক্তিতে আবার ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী নিতে পারি, তা'হলে আমরা দেশের সত্যিকার উন্নতির জন্য কিছু করতে পারব; তার আগে নয়। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না যে আজ সব মহলেই একটা হতাশা বিরাজ করছে? আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না যে আজকে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তিগুলি দ্বিধা বিভক্ত? অনেকে দেখছেন যে দেশের রাজনৈতিক শক্তিগুলি দ্বিধা বিভক্ত হয়ে টুকরা টুকরা হয়ে পড়ে গিয়েছে। কিন্তু আমি মনে করি এই দ্বিধা বিভক্তিই একটা বড় রাজনৈতিক সংগঠন সৃষ্টি করার পক্ষে সাহায্য করছে। সেই সৃষ্টির মধ্যে যখন জাতীয়তাবাদী এবং অর্থনৈতিক কর্মসূচী মিশে যাবে তখন এই আন্দোলনটা একটু ভিন্নতর হবে। তখন দেশ সুখী হবে, সুন্দর হবে, সমৃদ্ধ হবে।

প্র: মিঃ সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত, আপনার কথা শুনলাম; আপনার আশাবাদ ও শুনলাম। আপনাকে ধন্যবাদ।

উ: ধন্যবাদ।

ব্যারিষ্টার শওকত আলী খান

১৯৭১ সালে ব্যারিষ্টার শওকত আলী ছিলেন মীর্জাপুর-নাগরপুর এলাকা থেকে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ দলীয় একজন এম, এন, এ। যে ক'জন মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী গণপ্রতিনিধি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন, ব্যারিষ্টার শওকত আলী খান ছিলেন তাঁদেরই একজন। বর্তমানে ইনি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টে আইন ব্যবসায়ে নিয়োজিত আছেন।

২৩শে ফেব্রুয়ারী '৮২ সন্ধ্যার পর আমরা পূর্ব নিযুক্তি অনুযায়ী তাঁর ঢাকার জনসন রোডস্থ বাস-ভবনে (রয়েল ষ্টেশনারীর ওপর তলা) এক আন্তরিক পরিবেশে আলাপ করলাম একাত্তরের রণাঙ্গনে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে। আমার সাথে ছিলেন মিঃ মনোরঞ্জন ঘোষাল।

প্র: ব্যারিষ্টার শওকত আলী সাহেব, আপনি ২৫শে মার্চ '৭১ কোথায় কি অবস্থায় ছিলেন অনুগ্রহ করে বলুন।

উ: ২৫শে মার্চ '৭১ আমি টাঙ্গাইলে আমার স্ব-গ্রাম নাউহাট্টিতে ছিলাম। তারও দু'দিন আগে অর্থাৎ ২৩শে মার্চ '৭১ রাতে আমি শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে ছিলাম। সেখানে হঠাৎ শেখ সাহেব খবর পেলেন চট্টগ্রামে গণ্ডগোল আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। তখন তিনি আমাদিগকে বললেন: তোমরা যার যার এলাকায় চলে যাও। কাজেই, ২৪শে মার্চ, '৭১ সকালে আমি আমার গ্রাম নাউহাট্টিতে চলে গেলাম এবং ঐ দিন বিকেলে সেখানে এক সভা ডাকলাম।

সেই সভাতে আমি জনসাধারণকে জানালাম যে গণ্ডগোল আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। পাকিস্তানীরা আমাদের উপর হামলা শুরু করবে। যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী।

২৬শে মার্চ '৭১ হঠাৎ খবর পেলাম যে শেখ মুজিবুর রহমানকে হানাদার বাহিনী ধরে নিয়ে গিয়েছে এবং যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। তখন আমি আমার স্ব-গ্রাম থেকে মীর্জাপুর চলে গেলাম। তারপর সেখান থেকে আমরা ঘাটাইল পাহাড় অঞ্চলে কয়েকদিন থাকলাম। আগষ্ট '৭১ পর্যন্ত আমরা লোকজনের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করলাম ও তাদের মনোবলকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য গ্রামে-গঞ্জে কাজ করলাম। আগষ্ট '৭১-এর শেষ ভাগে আমরা একখানা নৌকা নিয়ে মহেন্দ্রগঞ্জ (মাইনকারচর) গিয়ে উঠলাম। সেখানে মেজর জিয়াউর রহমানের সাক্ষাৎ পেলাম। আমি তাঁর সেক্টরে সামরিক প্রশিক্ষণ নিলাম এবং প্রশিক্ষণ শেষে মুক্তিবাহিনীর একটি কোম্পানী নিয়ে আবার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নাগরপুর-মীর্জাপুর এলাকায় চলে এলাম।

প্রঃ আপনি ছিলেন একজন এম, এন, এ। মূলতঃ মুজিব নগরে বিপ্লবী সরকার সংগঠন এবং বাংলাদেশের স্বপক্ষে বিশ্ববাসীর সমর্থন আদায়ের জন্য কাজ না করে অস্ত্র হাতে যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য যথার্থ আপনার প্রেরণার উৎস কি ছিল?

উঃ আমার সব সময় ধারণা ছিল যে আমি যুদ্ধের কাজেই বেশী সহযোগিতা করতে পারব। তা'ছাড়া আমার মনের মধ্যে একটি প্রতিক্রিয়া ও কাজ করছিল যে এই যুদ্ধ বারবার হবে না। কাজেই, এতে অংশগ্রহণের জন্য আমি মন থেকে তাগিদ পাচ্ছিলাম। আমি আরো ভেবে নিয়েছিলাম যে বাইরে যাওয়ার জন্য কিংবা মুজিব নগর সরকারের কাছাকাছি থেকে কাজ করার জন্য হয়ত অনেককে পাওয়া যাবে। অপর পক্ষে জাতীয় পরিষদ সদস্য কিংবা অন্য কোনও বুদ্ধিজীবীকে তখনো আমি অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করতে দেখিনি। কাজেই আমি মনে করলাম বুদ্ধিজীবীদেরকেও অস্ত্র হাতে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে এগিয়ে আসা উচিত। এই দৃষ্টিভঙ্গীতেই আমি অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলাম। আমি মুক্তিবাহিনীর দু'চারজন অধিনায়কের সাথেও এ প্রসঙ্গে আলাপ করলাম। তাঁরাও আমার সাথে একমত হলেন যে আমাদের মত কিছু বুদ্ধিজীবী প্রশিক্ষণ নিয়ে অস্ত্র হাতে রণাঙ্গনে এলে মুক্তিযোদ্ধাগণ উৎসাহিত হবেন। এ ছাড়া, অন্য একটি চিন্তাও আমার মনের মধ্যে কাজ করছিল। আমার ধারণা হয়েছিল আমাদের কিছু কিছু গণপ্রতিনিধিকে সুযোগ বুঝে দেশের অভ্যন্তরে যাওয়া উচিত। এতে জনগণের মনোবলকে আমরা উন্নত রাখতে সাহায্য করতে পারি।

কাজেই এসব চিন্তা করেই আমি মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করেছিলাম এবং প্রশিক্ষণ নিয়ে অস্ত্র হাতে দেশের অভ্যন্তরে চলে এসেছিলাম।

প্রঃ ব্যারিষ্টার শওকত আলী সাহেব, আপনার জানা মতে এই উদ্দীপনা বা মনোবল নিয়ে আর কোনও এম, এন, এ বা এম, পি, এ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন কি?

উঃ আমাদের সেক্টরে কেউ নেননি। তবে অন্য কোনও সেক্টরে কেউ অস্ত্র ধরেছিলেন কিনা আমার জানা নেই।*

প্রঃ যেমন আমরা শুনেছি অন্য সেক্টরে জেনারেল রব, মিঃ সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত, ক্যাপ্টেন সুজাত আলী এবং লতিফ সিদ্দিকী ছিলেন। যা'হোক, আপনিও যে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছেন, এ তথ্য জেনে আমরা খুবই উৎসাহিত বোধ করছি। এবার আপনি বলুন প্রশিক্ষণ শেষে আপনি কি করলেন?

উঃ আমি প্রশিক্ষণ শেষে মুক্তিবাহিনীর একটি কোম্পানী নিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে চলে এলাম। মীর্জাপুর-নাগরপুরসহ বিভিন্ন এলাকায় গ্রামে-গঞ্জে টহল দিলাম। জনসাধারণকে সাহস দিলাম। তাদেরকে বুঝালাম যে আমরা অস্ত্র নিয়ে ফিরে এসেছি। পাকিস্তানীরা আর আমাদের এলাকায় আসতে সাহস করবে না। কাজেই আপনারা নিশ্চিন্তে চলাফেরা করুন; আপনাদের কাজকর্ম করে যান, প্রকৃতপক্ষে হয়েছিলও তাই। পরবর্তীকালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ঐসব গ্রাম এলাকায় যেতে সাহস করেনি। অপরদিকে গ্রামবাসীরা আমাদের সাদরে গ্রহণ করেছে। থাকার জায়গা দিয়েছে, খাইয়েছে। মোট কথা তারা আমাদিগকে সব রকমের সহযোগিতা দিয়েছে।

এখানে একটি কথা যোগ করতে চাই। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে আগষ্ট '৭১ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর '৭১ পর্যন্ত আমি আমার এলাকায় কোনও পাকিস্তানী বা রাজাকার দেখিনি, যাদের আমরা প্রতিরোধ করতে পারতাম। কাজেই আমার এলাকায় আমাকে একটি গুলিও খরচ করতে হয়নি বা কারো সাথে আমাদিগকে কোনও সংঘর্ষেও আসতে হয়নি। অপরদিকে আমাদের উপস্থিতিতে গ্রামবাসীরা লাভবান হয়েছেন। অন্ততঃ আমার এলাকায় তারা নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পেরেছেন, সাহসের সাথে চলাফেরা করতে পেরেছেন। সবচেয়ে বড় লাভ যেটা হয়েছিল,

*বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে কে কোন্ সেক্টরে কি ভাবে যুদ্ধ করেছেন বা যুদ্ধে অবদান রেখেছেন, তার যথার্থ তথ্য অন্য সেক্টরে অনেক মুক্তিযোদ্ধার অজানা ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ এক দশক পরও এসব তথ্য অনুদ্‌ঘাটিত রয়ে গেছে। মুক্তিযুদ্ধের তথ্যাবলী হারিয়ে যাচ্ছে লোকচক্ষুর অন্তরালে।

সেটা ছিল, আমাদের পেয়ে আমাদের গ্রামবাসীদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী।

প্রঃ ধন্যবাদ আপনাকে। এবারে অনুগ্রহ করে নাগরপুর এলাকা সম্পর্কে আর একটু ভাল ভাবে বুঝিয়ে বলুন।

উঃ নাগরপুর এলাকাটি দক্ষিণ টাঙ্গাইলের একটি থানা। এর পরই পাশাপাশি রয়েছে মীর্জাপুর। এই দুটি থানাই দক্ষিণ টাঙ্গাইলে অবস্থিত। ঢাকা থেকে সরাসরি একটিমাত্র প্রধান সড়ক মীর্জাপুর হয়ে টাঙ্গাইল চলে গিয়েছে। কিন্তু এই রাস্তা ছাড়া এমনি আর কোনও ভাল রাস্তাঘাট নাগরপুর-মীর্জাপুর নেই। যে সব ছোট খাট রাস্তাঘাট আছে, সেগুলি বর্ষার সময় প্লাবিত হয়ে যায়। তা'ছাড়া শুকনোর সময়ও সব রাস্তা দিয়ে যান বাহন চলাচলে খুব অসুবিধা হয়। এখানে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী প্রবেশ না করার এটাও অন্যতম কারণ ছিল বলা যায়।

প্রঃ আপনার কোম্পানীর যোগাযোগের প্রধান বাহন কি ছিল?

উঃ নৌকাই আমাদের যোগাযোগের প্রধান বাহন ছিল। দেশীয় নৌকার সাহায্যেই আমরা এদিক ওদিক চলাফেরা করেছি। তা'ছাড়া আমাদিগকে অনেক সময় নৌকা থেকে নেমে পায়েও হাঁটতে হয়েছে।

প্রঃ আপনি কি কোম্পানী নিয়ে সব সময় বাংলাদেশের অভ্যন্তরেই থাকলেন?

উঃ আমি দেশের অভ্যন্তরেই বেশীর ভাগ থাকলেও আমাকে আমার সেক্টরে ফিরে যেতে হয়েছিল। এভাবে আমি মোট তিন বার দেশের অভ্যন্তরে ফিরে এসেছি। প্রতিবারই সেক্টর থেকে আমাকে একটি করে কোম্পানী দেয়া হ'ত। সাধারণতঃ এক এক কোম্পানীর সাথে একশ' থেকে দেড়শ' জন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন।

প্রঃ ইতিপূর্বে, আপনি মহেন্দ্রগঞ্জ বা মাইনকারচরের কথা বলেছিলেন, এবং বলেছিলেন প্রথমবার আপনি মেজর জিয়াউর রহমানের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি ওখানে ছিলেন না। তাঁর জায়গায় সেক্টর কমাণ্ডার হিসেবে পরে আপনি কাকে পেয়ে ছিলেন?

উঃ পরবর্তী কালে সেখানে আমি মেজর তাহেরকে পেয়েছিলাম। তিনি আমাকে যথেষ্ট সহযোগিতা প্রদান করেছেন এবং আমাকে সব সময় উৎসাহ দিয়েছেন। প্রথম দিকে অবশ্য আমার বয়স এবং গণপ্রতিনিধি হিসেবে আমার মর্যাদার কথা ভেবে আমাকে দেশের অভ্যন্তরে কোম্পানী নিয়ে যাওয়ার জন্য

তিনি বারণ করেছিলেন। কারণ তাঁর ধারণা ছিল আমি যদি দেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তানী বাহিনীর হাতে ধরা পড়তাম, তবে এতে শত্রুপক্ষ আমাদের অনেক গোপন তথ্য জেনে ফেলা ছাড়াও, আমাকে দিয়ে দেশে স্বাধীনতা বিরোধী কাজ করাতে বাধ্য করতে পারতো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি তাঁর মধ্যে বিশ্বাস জন্মাতে সমর্থ হয়েছিলাম। তাঁকে বুঝাতে পেরেছিলাম যে দেশের অভ্যন্তরে আমাদের মত দু'চারজন নেতৃস্থানীয় লোকের যাওয়া উচিত। কারণ, এতে দেশের জনগণ উৎসাহিত হবেন। যা' হউক, মেজর তাহের আমাকে কোম্পানী দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। সত্যি বলতে কি আমার ধারণা সঠিক হয়েছিল। আমাদের অবস্থিতিতে আমার এলাকার লোকের মনোবল অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

প্রঃ ইতিপূর্বে আপনি বলেছেন সর্বপ্রথম আপনি সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন মেজর জিয়াউর রহমানের সাথে। কর্ণেল তাহের আসার পর মেজর জিয়াউর রহমান কোথায় গেলেন?

উঃ ঐ সময় আমি একটি কোম্পানী নিয়ে দেশের অভ্যন্তরে গিয়েছিলাম। তখন মেজর জিয়াউর রহমান ঐ সেক্টরের কমাণ্ডার ছিলেন। আমি ফিরে এসেই জানলাম যে তিনি সিলেট চলে গিয়েছেন।

প্রঃ '৭১-এর রণাঙ্গনের কোনও একটি স্মরণীয় ঘটনা আপনার কাছে জানতে ইচ্ছে করে।

উঃ মেজর তাহেরের আহত হওয়ার ঘটনাটিই বলি। তিনি যেদিন আহত হলেন সেদিন আমি তাঁর সাথে ছিলাম। তিনি সেদিন যুদ্ধের সম্মুখভাগে গিয়েছিলেন, আমিও তাঁর সাথে সাথে গেলাম। সম্মুখভাগে যাওয়ার পর তিনি আমাকে তাঁর সাথে আর এগুতে দিলেন না। তিনি আমাকে একটা নির্দিষ্ট স্থানে থাকতে পরামর্শ দিয়ে তাঁর অন্য কয়েকজন সাথী নিয়ে আক্রমণ চালানোর জন্য দেশের অভ্যন্তরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এটা ঘটেছিল মাইনকারচর সীমান্ত এলাকায়। কিন্তু তিনি বেশীদূর এগুতে পারেননি। শত্রুবাহিনীর একটি শেল এসে তাঁর পায়ে লাগল। তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে গেলেন। তাঁর সাথীরা তখন তাঁকে তাড়াতাড়ি পেছনের দিকে নিয়ে এলেন।

প্রঃ তাঁকে কি সাথে সাথেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হ'ল?

উঃ আমাদের ক্যাম্পে ফিল্ড হাসপাতাল ছিল। সেখানে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হ'ল। কাছেই ডাক্তার মুখার্জী নামীয় একজন স্থানীয় এম-বি-বি-এস ডাক্তার ছিলেন। তিনি ঐ ফিল্ড হাসপাতালে গিয়েই মেজর তাহেরকে অস্ত্রোপচার করলেন। তারপর ওখান থেকে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল গৌহাটি হাসপাতালে।

সেখানে তিনদিন থাকার পর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হ'ল পুনা। ওখানেই তাঁকে একটি নকল পা দেয়া হয়েছিল।

প্র: মেজর তাহেরের আহত হওয়ার পরিস্থিতি আর একটু ব্যাখ্যা দান করা যায় কি?

উ: মেজর তাহের যুদ্ধের অগ্রভাগ থেকে যখন আক্রমণ পরিচালনার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, ঠিক সে মুহূর্তে পাকিস্তানী সৈন্যরাও মাইনকারচরের দিকে এগিয়ে আসছিল। কিন্তু এটা হয়ত তিনি তাৎক্ষণিক ভাবে বুঝে উঠতে পারেন নি। তা'ছাড়া পাকিস্তানী সৈন্যরা জয়বাংলা ধ্বনি দিয়ে আমাদের দিকে এমনভাবে এগিয়ে আসছিল যে তিনি হয়ত এতে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। তবে বিভ্রান্তি কাটিয়ে ওঠা মাত্রই প্রথম তিনি পাক বাহিনীকে আক্রমণ করেছিলেন। ঐ সময়ই আচমকিতে একটি শেল এসে তাঁর পায়ে লেগেছিল।

প্র: ১৬ই ডিসেম্বর '৭১ বাংলাদেশ মুক্ত হওয়ার পর মেজর তাহেরের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ হয়েছিল কি?

উ: মেজর তাহের স্বজন পরিজন সোজা আমার এই বাড়ীতেই এসেছেন। তাঁরা ভাই-বোন প্রায় ৬।৭ জন। সবাই একবার এক সাথে আমার বাড়ীতে অতিথি হয়েছিলেন।

প্র: আমরা শুনেছি মেজর তাহেরের পরিবারের প্রায় সব সদস্যই একাত্তরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন কি?

উ: মেজর তাহেরের এক ভাই সৌদী আরব থেকে সরাসরি চলে এসেছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। ইতিপূর্বে তিনি বিমান বাহিনীতে ছিলেন। যুদ্ধকালে আমরা মাইনকারচর ক্যাম্পে এক সাথে বেশ কিছুদিন ছিলাম। মেজর তাহেরের অপর দু'ভাই কলেজে পড়তো। তারাও চলে এসেছিল যুদ্ধ করার জন্য। অল্প কয়েক-দিন পরই দেখলাম তাঁর এক বোনও যুদ্ধক্ষেত্রে এসে গেছে। তার নাম ডালিয়া। তখন তার বয়স বড় জোর তের কি চৌদ্দ বছর। তখনো পুরা লম্বা হয়নি। সেও যুদ্ধক্ষেত্রে এসে গিয়েছে। মেজর তাহের বলেছিলেন একে দিয়ে তিনি একটি মহিলা বাহিনী গড়ে তুলবেন। আমি আশ্চর্য হলাম ঐ এতটুকু মেয়ে এক দিনের মধ্যে মটর সাইকেল চালানো শিখে গেল। তার উৎসাহ, তার উদ্দীপনা দেখে সত্যিই আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। সেদিনই আমি বিশ্বাস করেছিলাম যে এই যুদ্ধে আমরা কোনও দিন হারতে পারি না। সেদিন আমার বিশ্বাস জন্মেছিল যে বাংলার নারীরাও প্রয়োজনে এ যুদ্ধে পুরাপুরি অংশ গ্রহণ

করতে পারতো। আমার ধারনা বদ্ধমূল হয়েছিল যে এ যুদ্ধে তাদের সম্ভাব্য অবদানকে খাটো করে দেখা আর সম্ভব ছিল না।

প্র: মেজর তাহেরের ভাই-বোনদের মধ্যে বর্তমানে কে কোথায় আছেন, আপনি বলতে পারেন কি?

উ: ইদানিং তারা কে কোথায় আছেন সঠিক বলতে পারব না। তবে তাদের সেই বোন বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছে।

প্র: এখন অনুগ্রহ করে বলুন আপনি মাইনকারচর থাকাকালে কোনও রাজনৈতিক নেতা আপনাদের ক্যাম্প পরিদর্শনে গিয়েছিলেন কি না?

উ: যুদ্ধকালীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব কামরুজ্জামানকে আমরা একবার আমাদের ক্যাম্প পরিদর্শনের জন্য নিয়ে-ছিলাম। মেজর জিয়াউর রহমান তখন ঐ সেক্টরের দায়িত্বে ছিলেন। তিনিই আমাকে অনুরোধ করলেন জনাব কামরুজ্জামানকে কোনও রকমে সম্মত করিয়ে আমাদের ঐ ক্যাম্প পরিদর্শনে আনার জন্য। উল্লেখ্য যে ঐ সময়ে জনাব কামরুজ্জামান বিশেষ এক কাজে আমাদের কাছাকাছি একটি এলাকায় গিয়েছিলেন। আমাদের ক্যাম্পের সাথে ঐ এলাকার ভাল কোনও সংযোগ সড়ক ছিল না। আমি একখানা জীপ নিয়ে ঐ মেঠো ধুলাময় ভাঙ্গা রাস্তা দিয়ে কোনও রকমে কামরুজ্জামান সাহেবের সাক্ষাতে গেলাম। তখন আমার পরনে ছিল বহুদিনের ময়লা পাজামা পাঞ্জাবী। মুখ ভরা দাড়ি ছিল। ঐ বেশে আমাকে কামরুজ্জামান সাহেব প্রথমে চিনতেই পারেন নি। বরং শত্রু পক্ষের কেউ মনে করে প্রথমে কিছুটা ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। যা-হউক, আমি তাঁকে অনুরোধ করলাম আমাদের ক্যাম্প পরিদর্শনে যাওয়ার জন্য। তিনি আমার অনুরোধ রেখেছিলেন। তাঁর ঐ পরিদর্শনে আমাদের ছেলেরা খুবই উৎসাহিত হয়েছিল। মেজর জিয়াউর রহমানই এগিয়ে গিয়ে তাঁকে ক্যাম্পে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং ক্যাম্পে আমাদের ছেলেরা কি ভাবে থাকত সে সব ঘুরে ঘুরে দেখালেন।

প্র: আর কেউ গিয়েছিলেন কি?

উ: সেখানে হাতেম আলী তালুকদার, শামসুর রহমান খান এবং মীর্জা তোফাজ্জল হোসেন সহ আরো দু'চারজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি গিয়েছিলেন। আমাদের মুক্তিবাহিনী ক্যাম্প থেকে বেশ খানিক দূরে মেঘালয়ের অভ্যন্তরে তুরা নামক স্থানে আমাদের কয়েকজন গণপ্রতিনিধি থাকতেন। তাঁরাও মাঝে মধ্যে গিয়েছেন।

প্র: তখন আপনার শ্বশুর (মির্জাপুর হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা খ্যাতনামা সমাজ-সেবী ও দানবীর আর পি সাহা) সহ আপনার পরিবারের সদস্যগণ কোথায় ছিলেন?

উঃ তাঁরা মীর্জাপুর ছিলেন। মীর্জাপুর হাসপাতাল এলাকায় তাঁরা থাকতেন।

প্রঃ তাঁরা ঐ হাসপাতাল এলাকায় কি ভরসায় থাকলেন?

দানবীর আর, পি, সাহা

উঃ সেটাত বুঝছি না। শুনেছি অনেকে আমার শ্বশুরকে ওখান থেকে সরে যাওয়ার জন্য বলেছিলেন। কিন্তু তিনি বাংলাদেশ ছেড়ে কোথাও যাওয়ার প্রতি অনীহা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর একটা বিশ্বাস ছিল যে, হাসপাতালের অভ্যন্তরে এসে কেউ তাঁদের উপর হামলা করবে না। এই বিশ্বাসে আমার শ্বশুর, আমার স্ত্রীকেও বলতেন হাসপাতালের দেয়ালের বাইরে কোথাও না বেরুলে তাদের কেউ কোনও ক্ষতি করবে না। সেই ভরসা নিয়েই তাঁরা ওখানে ছিলেন।

প্রঃ আপনার শ্বশুরকে হানাদার বাহিনী কখন কি ভাবে নিয়ে গেল?

উঃ ২৮শে এপ্রিল '৭১ পাকিস্তানী সৈন্যরা তাঁকে নারায়ণগঞ্জ থেকে ডেকে নিয়ে যায়। সাতদিন পরে ৫ই মে তারা তাঁকে পুনরায় নারায়ণগঞ্জ পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। সেদিন বিকেলেই তিনি মীর্জাপুর চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু ওখান থেকে ৭ই মে সকাল বেলায় আবার তিনি নারায়ণগঞ্জ ফিরে গিয়েছিলেন। পাকিস্তানী সৈন্যরা ঐ তারিখেই অর্থাৎ ৭ই মে রাত ১১টার সময় তাঁকে এবং তাঁর সাথে আমার শালা ভবানী প্রসাদ সাহাকে (তাঁর একমাত্র ছেলে) তাঁদের তিনজন কর্মচারীসহ নারায়ণগঞ্জ থেকে তুলে নিয়ে চলে যায়। এরপর আর তাঁদের কোনও খোঁজ খবর পাওয়া যায়নি।

প্রঃ ব্যারিষ্টার শওকত আলী সাহেব, আপনার কাছে একাত্তরের রণাঙ্গনের অনেক তথ্য জানলাম। অনেক দুঃখপূর্ণ কথাও এসাথে শুনলাম। আপনাকে ধন্যবাদ।

উঃ ধন্যবাদ।

দ্বাদশ অধ্যায়

অধিকৃত বাংলায়ঃ দু'জন বুদ্ধিজীবী

এক

অধ্যাপক আবুল ফজল

(এদেশের একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং সুসাহিত্যিক হিসেবে অধ্যাপক আবুল ফজল অত্যন্ত সুপরিচিত। এছাড়া চিন্তার রাজ্যে একজন স্বাধীন চিন্তাবিদ হিসেবে তাঁর নাম অবিসংবাদিত। আমাদের স্বাধিকার এবং স্বাধীনতা সম্পর্কে তিনি অনেক ভাবনা চিন্তা করেছেন, অনেক নিবন্ধ লিখেছেন এবং কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থও প্রকাশ করেছেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতির একজন শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবেও তিনি কিছুদিন দায়িত্ব পালন করেছেন।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১ আমি চট্টগ্রামের কাজীর দেউড়ীতে অধ্যাপক সাহেবের বাস ভবনে গিয়েছিলাম একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর কিছু মূল্যবান বক্তব্য লিপিবদ্ধ করার জন্য। প্রসঙ্গতঃ প্রবীণ এই শিক্ষাবিদ তখন বার্দ্ধক্যজনিত নানান জটিলতায় ভুগছিলেন; দৃষ্টি শক্তিও অনেকটা হারিয়ে ফেলেছিলেন। এসব অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি আমাকে সাক্ষাৎকারটি দিয়েছিলেন। চির অতিথিবৎসল এই শিক্ষাবিদ আতিথেয়তার উষ্ণতা এবং মন খোলা হাস্য মন নিয়ে প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে একান্ত ধৈর্য্য সহকারে আমার প্রশ্নাবলীর উত্তর দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর দেশ বরেণ্য এই শিক্ষাবিদ গত ৪ঠা মে '৮৩ চট্টগ্রামে তাঁর বাস ভবনে পরলোক গমন করেন। (ইন্না লিল্লাহে ... ... রাজেউন)।

মূলতঃ একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধই আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় থাকলেও আমি একাত্তরের রণাঙ্গন পেরিয়ে আমাদের বর্তমান প্রশাসনিক এবং সামাজিক অবস্থা সম্পর্কেও তাঁর কিছু মূল্যবান বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছি। যথার্থই এসব মতামত জাতির বর্তমান এবং ভবিষ্যত চলার পথের এক মূল্যবান পথ নির্দেশ। অধ্যাপক সাহেবের সাক্ষাৎকারটি এখানে তুলে দিলাম পাঠককুলের উদ্দেশ্যে।)

প্রঃ শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সাহেব, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস কখন থেকে চিহ্নিত করা সঠিক বলে আপনি মনে করেন?

উঃ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময়কেই আমি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা কাল বলে মনে করি। তখনই আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত

হয়েছিল স্বাধিকারের চেতনা। এই স্বাধিকারের চেতনাই পরে রূপান্তরিত হয়েছে স্বাধীনতার আকাঙ্খা বা ইচ্ছায়।

প্র: '৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধকে এ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রান্তিকাল বলতে পারি কি?

উ: আমার মনে হয় আমরা এটাকে স্বচ্ছন্দেই ক্রান্তিকাল বলতে পারি। কারণ স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম তখনই হয়েছে এবং তখনই আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা রণাঙ্গনের বিভিন্ন সেক্টরে ছড়িয়ে পড়েছিলেন, অকুতোভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন শত্রুর ওপর। এই যুদ্ধ এত ব্যাপক ভাবে হয়েছে যে সারা দেশ এতে জড়িত হয়েছে। দলমত নির্বিশেষে সকলে এতে যোগ দিয়েছে। এই যুদ্ধে সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর সহানুভূতি ছিল। প্রত্যেকেই তাঁদের ছেলে-মেয়েদের যুদ্ধে পাঠিয়েছেন।

প্র: আপনি বললেন, ১৯৫২ সাল থেকে আমাদের স্বাধীনতার চেতনার সঞ্চার হয়েছে। ১৯৪৭ সালে আমরা যখন স্বাধীন হলাম, সেই স্বাধীনতা ১৯৪০-এর লাহোর প্রস্তাব ভিত্তিতে হয়নি বলেই কি আমাদের কোনও কোনও চিন্তাবিদের মধ্যে কিছু কিছু ধারণা তখন এসেছিল যে পূর্ব পাকিস্তান একদিন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে?

উ: যাঁরা ততখানি রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা করেছেন, এবং যাঁরা ভিতরে থেকে রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন, এমনি নেতৃস্থানীয় কারো কারো মনে সে রকম একটা ধারণার সঞ্চার হয়ত হয়েছিল। তবে সেটাকে নিজস্ব স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেতনা বলা যায় না।

প্র: একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ কতটুকু স্বতঃস্ফূর্ত এবং কতটুকু রাজনৈতিক প্রভাব যুক্ত বলে আপনি মনে করেন?

উ: আমার মনে হয় এটা রাজনৈতিক প্রভাব যুক্ত। তৎকালীন পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানে সৃষ্ট ব্যবধানের বিরুদ্ধে মানসিক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছিল ব্যাপক রাজনৈতিক প্রচারণার মাধ্যমে। উদাহরণ স্বরূপ আওয়ামী লীগ বিভিন্ন ভাবে পোষ্টার এবং প্রচারণার মাধ্যমে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষপাতপূর্ণ আর্থিক ব্যয়বরাদ্দের হিসাব জনসমক্ষে তুলে ধরে মানুষের মনকে তৈরী করেছিলেন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার জন্য। এই মানসিকতা সৃষ্টির মূলে ছিল রাজনৈতিক প্রচার। তারপর ৭ই মার্চ, '৭১ সহ শেখ মুজিবের বিভিন্ন সময়ের বক্তৃতার কথাই ধরুন না কেন। এগুলি সবইত রাজনৈতিক বক্তৃতা। মার্চ '৭১-এ এহিয়া-ভুট্টোর সাথে শেখ মুজিবের বৈঠকের কথাই ধরুন।

এই বৈঠকে শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের ছ' দফার ভিত্তিতে একটা রাজনৈতিক সমঝোতায় আসতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আলোচনা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হ'লেও পাশাপাশি যে গণ আন্দোলনের ঢেউ উঠেছিল, সেটিই শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়েছে। কাজেই '৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধ যে রাজনৈতিক প্রভাবযুক্ত, এটা বলাই বাহুল্য। এটা আমাদের ভুললে চলবে না যে আমাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা একদিনে হয়নি। দীর্ঘ ২৩ বছরের বঞ্চনার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রচারের ফলেই সঞ্চারিত হয়েছিল এই চেতনা।

প্র: আপনার কথায় রাজনৈতিক প্রচারণা থেকেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু যদি স্বাধীনতাই তৎকালীন আওয়ামী লীগের লক্ষ্য ছিল তবে মার্চ, '৭১-এর মাঝামাঝি সময়ে পাকিস্তান থেকে জাহাজ ভর্তি যুদ্ধ সরঞ্জাম পৌঁছার পরও এহিয়া-ভুট্টোর সাথে শেখ মুজিব আলোচনা চালিয়ে গেলেন কেন? এর পেছনে কি যুক্তি ছিল বলে আপনি মনে করেন?

উ: আমার একই প্রশ্ন। শেখ মুজিব এহিয়া খানের সাথে বৈঠকে বসেছিলেন কেন? এটার পেছনে এহিয়া খানের পক্ষে হয়ত একটা যুক্তি ছিল। কারণ তারা যেভাবে পরিকল্পনা নিয়েছিল, সে অনুযায়ী তাদের প্রস্তুতি তখনো পূর্ণাঙ্গ হয়নি। সে প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার জন্যই তারা সময় নিয়েছে এবং ওখানকার নেতাদের সামনে রেখেই তারা বাঙালী হত্যার অভিপ্রায় বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিলেন। কারণ আপনারা জানেন যে ভুট্টো অনেক পরে এসেছে। আপনারা এটাও লক্ষ্য করেছেন, এহিয়া খান মার্চ, '৭১-এর মাঝামাঝি সময় ঢাকা এসেছিলেন কয়েকজন জেনারেলকে সাথে নিয়ে। স্পষ্টতঃই যুদ্ধ ষ্ট্রাটেজি স্বচক্ষে দেখানোর জন্যই তিনি তাদেরকে সাথে নিয়ে এসেছিলেন। পরে ভুট্টোকে নিয়ে আসা হয়েছিল আসল উদ্দেশ্যকে রাজনৈতিক ভাবে ধামাচাপা দেয়ার জন্য। ইতিপূর্বে ৩রা মার্চ '৭১ যে পার্লিয়ামেন্ট ডাকার জন্য এহিয়া খান ঘোষণা করেছিলেন, ভুট্টোকে সামনেই রেখেই তিনি এই অধিবেশন বাতিল করেছিলেন। পার্লিয়ামেন্ট ডাকা হলে পরবর্তী পরিস্থিতি হয়ত অন্য রকম হতো। কাজেই এগুলি সবই রাজনৈতিক চালেরই অঙ্গ। ঢাকা থেকে (২৫শে মার্চ, '৭১) এহিয়া খান সোজা গেলেন ভুট্টোর সিন্ধুর বাড়ীতে। ভুট্টোর বাড়ীতে গিয়ে আতিথ্য গ্রহণ করলেন তিনি। স্পষ্টতঃই তারা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ২৫শে মার্চ '৭১ সহ তৎপরবর্তী কালের হত্যাকাণ্ডের স্বপক্ষে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ ও জনগণের রাজনৈতিক সমর্থন লাভের জন্য সব ধরনের ছল। চাতুরীর আশ্রয় নিয়েছিলেন।

প্র: আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ কি একেবারেই স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না?

উ: যখন পাকিস্তানীরা সৈন্যরা আক্রমণ এবং হত্যাকাণ্ড শুরু করেছে তখনই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবটা এসেছে। ধরুন, আমার এই বাড়ীর জানালা পথে দরজা ভেদ করে একটি গুলি এসে পড়েছিল। গুলিটি ছিল দু' দিক থেকেই সুঁচালো। একটুর জন্যই আমি বেঁচে গেলাম। তখন আমরা এই বাড়ী ছেড়ে চলে যাই। আমাদের মধ্যেও একটা স্বতঃস্ফূর্ত ভাব এসেছিল যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। আমার ছেলে আবুল মনসুর চলে গেল মুক্তাঞ্চলে। ওখানে সে স্বাধীনতার সপক্ষে কাজ করলো।

প্র: ২৬শে মার্চ, '৭১ চট্টগ্রাম বেতারের কয়েকজন সংগ্রামী কর্মী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু করলেন। পরদিন তাঁরা মেজর (তৎকালীন) জিয়াউর রহমানকে আনলেন। কিন্তু তখন শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে চট্টগ্রামের তৎকালীন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আবদুল হান্নান ছাড়া বাকী কেউ আগ্রাবাদে অবস্থিত চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র বা কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে সংগঠিত বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে এগিয়ে এলেন না। এ সম্পর্কে আপনার ব্যাখ্যা কি?

উ: রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের হাতে ত হাতিয়ার ছিল না। তাছাড়া ঐ সময়ে তাঁরা ছিলেন হানাদার বাহিনীর আক্রমণের অন্যতম প্রধান শিকার। কাজেই তাৎক্ষণিক ভাবে প্রতিরোধ যুদ্ধে এগিয়ে আসা ছিল তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। তাঁরা যে যেদিকে পারলেন আত্মগোপন করলেন।

প্র: বঙ্গবন্ধু আত্মগোপন করলেন না কেন?

উ: তাঁকে খোঁজার অজুহাতে হানাদার বাহিনী ঢাকাকে ধূলিস্যাত করে দেবে—এই ধারনা তাঁর ছিল। আর এমনিতেও তিনি অত্যন্ত দুঃসাহসী ছিলেন। তিনি ঠায় তাঁর বাসভবনে বসে রইলেন। পরে শুনেছি সামরিক বাহিনী তাঁকে যখন উঠিয়ে নিয়ে গেলো তখনো তিনি নৈতিক বল হারাননি, ঐ সময়ে তিনি তাঁর পাইপ টেনে যাচ্ছিলেন।

তারপর ধরুন, বঙ্গবন্ধুকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হল, তাঁকে কি জীবন্ত রাখা হ'ল, না হত্যা করা হ'ল ইত্যাদি চিন্তা প্রত্যেক বাঙ্গালীর মনে ভীষণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। অপরদিকে রাজধানী ঢাকা নগরীতে হত্যাকাণ্ডের খবর বিদ্যুৎ-বেগে ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশব্যাপী। ফলে তখন থেকেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ব্যাপক প্রতিরোধ সংগ্রামের সূত্রপাত হ'ল। ই-পি-আর, বি-ডি-আর, পুলিশ, আনসার, ছাত্র-জনতা সবাই বেরিয়ে পড়ল হানাদার বাহিনীকে রুখে দাঁড়ানোর জন্য।

কাজেই এই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবও রাজনৈতিক আন্দোলনেরই পরিণতি।

প্র: আপনার স্মৃতি থেকে '৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন যে কোনও একটি স্মরণীয় ঘটনা অনুগ্রহ করে উল্লেখ করুন।

উ: ঐ সময় আমরা পটিয়া থানার হাশিমপুর গ্রামে আমার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলাম। সেদিন ছিল শুক্রবার। আমরা জুম্মার নামাজে দাঁড়িয়েছি। ঠিক ঐ সময় হঠাৎ মসজিদের ওপর দিয়ে দক্ষিণ দিকে পাকিস্তানী জঙ্গী বিমান উড়ে গেল। মসজিদ থেকে বের হওয়ার কিছু পরেই আমরা বাস যাত্রীদের কাছ থেকে জানতে পারলাম হানাদার বাহিনী বোমারু বিমান থেকে পটিয়া থানার রাহাত আলী হাই স্কুল সংলগ্ন মসজিদের ওপর বোমা ফেলেছিল। ফলে ঐ মসজিদের ইমাম এবং মোয়াজ্জেনসহ কিছু মুসল্লী আহত হয়েছিলেন। মসজিদের দেয়ালের একাংশ ধ্বসে পড়েছিল। একাত্তরের যুদ্ধকালে এমনি অনেক ভয়াবহ খবরের জন্য আমাদের তৈয়ার থাকতে হয়েছে। পটিয়ার একটি পাড়ার নাম মুজাফ্ফরপুর। পাড়াটি হিন্দু প্রধান। খুবই উন্নত এবং শিক্ষিত লোকের বাস এই পাড়াটি। সামরিক বাহিনী এই পাড়াটি ঘেরাও করে শত শত লোককে গুলি করে হত্যা করেছিল। এসব ঘটনা আমার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে আছে।

প্র: স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র স্বাধীনতা যুদ্ধের দ্বিতীয় ফ্রন্ট হিসেবে কাজ করেছে'—এ সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?

উ: আমি বিশ্বাস করি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র না হ'লে দেশের মানুষের নৈতিক বল উন্নত রাখা সম্ভব হ'ত না। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের খবরাদি আমরা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমেই পেয়েছি। আমি দেখেছি গ্রাম দেশের চাষী মানুষ পর্যন্ত উৎকর্ণ হয়ে এই বেতার শুনতেন। আমাদের সাথেও ছোট একটি রেডিও সেট ছিল। এই সেটের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শোনার জন্যও চারিদিক থেকে লোকজন আসতেন। আমার মনে হয় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র না থাকলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া কখনো সম্ভব হ'ত না। রণাঙ্গনের ১১টি সেক্টরে কে, কোথায় কি অবস্থায় যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তাদের হার জিতের খবরাদি শুধু আমাদের জন্যই নয়, যুদ্ধে নিয়োজিত রণাঙ্গনের প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধাকে অনুপ্রেরণা যোগিয়েছে এই স্বাধীন বেতার। অন্যথায় অস্কভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হ'ত না। সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালী তাদের মনোবল হারিয়ে ফেলতেন। মুক্তিযোদ্ধারা অনুপ্রাণিত হয়েছে, উৎসাহিত হয়েছে, তারা যে আবার সংগ্রামে

অবতীর্ণ হওয়ার জন্য মনোবল ফিরে পেয়েছে, তার মূলে ছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সংবাদ এবং অনুষ্ঠানাদি।

প্র: আপনার মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ। এ দেশের স্বাধীনতা যোদ্ধাগণ যথার্থই স্বীকৃতি পাননি। এ সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?

উ: অনেকেই স্বীকৃতি পাননি। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। যেভাবে তাঁদের স্বীকৃতি পাওয়ার দরকার ছিল, সেভাবে তাঁরা স্বীকৃতি পাননি। তাঁদের সম্পর্কে সঠিক প্রামাণ্য কাগজপত্র রাখা হয়েছে কিনা সেটাও আমি জানি না।

যুদ্ধের পর পরই ঢাকাতে নতুন করে সরকার গঠিত হ'ল, কিন্তু প্রত্যেকটি কর্মসূচীকে সুষ্ঠু প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে এনে কার্য সম্পাদন করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হ'ল না। আমার মনে হয় তাঁরা ততটুকু সচেতন হতে পারেন নি। তবে যুদ্ধের পর স্বভাবতঃই কিছুটা বিশৃংখল অবস্থা হয়। এ সময় কিছু স্বার্থান্ধ লোক তাদের নিজেদের স্বার্থকেই প্রাধান্য দেয়ার জন্য এগিয়ে আসেন। কাজেই সৃষ্টি হয় সমস্যা এবং সংঘাত। এমনি পরিস্থিতিকে সঠিকভাবে চালিত করার জন্য যুদ্ধ পরবর্তী সরকারের তেমন কোনও পূর্ব পরিকল্পনা ছিল বলে মনে হয় না। দেশ পরিচালনার জন্য সার্বিক কোনও কর্মসূচী বা পরিকল্পনাও হয়ত ছিল না।

প্র: 'মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন এবং সরকারী কর্মকাণ্ডে যথাযথ ভাবে পুনর্বহাল না করার জন্যই দেশের আইন শৃংখলার দ্রুত অবনতি ঘটেছিল'— অনুগ্রহ করে মন্তব্য করুন।

উ: এটা কিছুটা সঠিক চিন্তা করেছেন। এখানে আমি একটা উদাহরণ দিয়ে প্রসঙ্গটির ব্যাখ্যা দিতে চাই। আমার আশেপাশের লোকজনের মধ্যে অনেক বিহারী ছিল। অবশ্য কোলকাতা থেকে এলেও তাদেরকে স্থানীয় লোকজন বিহারী মনে করতেন। স্বাধীনতার পর আমি দেখেছি মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরে আসা অনেক ছেলে রাইফেল নিয়ে এসব এলাকায় ঢুকে পড়ত এবং বিহারীদের ওপর প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করতো। তাদের সম্পদ লুঠ করত। পরে এটা ওসব মুক্তিযোদ্ধা যুবকদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। অনেকে ডাকাত পর্যন্ত হয়ে গেলো। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরই এদেরকে যদি কঠোর নিয়ম শৃংখলার মধ্যে রেখে চাকুরীতে বা বিভিন্ন কাজে বহাল করা হত, তা'হলে এসব অবাঞ্ছিত কাজ তারা করত না।

প্র: স্বাধীন জাতি হিসেবে বাঁচার জন্য আমাদের মূল্যবোধ কতটুকু জন্মেছে বলে আপনার ধারণা।

উ: আমার মনে হয় আমাদের মূল্যবোধ মোটেই জন্মেনি। বরং আমরা

মূল্যবোধ হারিয়েছি। যার ফলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক অঙ্গন যেদিকেই তাকাই সবদিকেই একটা অবক্ষয় দেখতে পাচ্ছি।

প্র: বাংলাদেশে কোন্ ধরনের সরকার সবচাইতে উপযোগী বলে আপনি মনে করেন?

উ: সরকারের যে গঠন সেটা গণতান্ত্রিকই রাখতে হবে। গণতন্ত্র আমাদের দেশে দীর্ঘ দিন থেকে পরিচিত। বৃটিশ আমল থেকে কোনও না কোনও প্রকারের গণতন্ত্র আমাদের দেশের লোক প্রত্যক্ষ করে এসেছে। তবে গণতন্ত্র বিকাশের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন খুব বেশী। ভোটদান পদ্ধতিতেও কিছুটা বাঁধনী থাকা আবশ্যক। যেমন ভোটারকে অবশ্যই নাম স্বাক্ষর করতে জানতে হবে। কাজেই পরোক্ষভাবে দেশের স্বাক্ষরতাও বেড়ে যাবে।

প্র: আমরা জানি গণতন্ত্রের সাথে অর্থনৈতিক মুক্তি সম্পৃক্ত। আমাদের দেশে অর্থনৈতিক মুক্তি কতটুকু আছে বলে আপনি মনে করেন?

উ: আমাদের দেশে অর্থনৈতিক অব্যবস্থা সর্বত্র। টাকা পয়সা সীমিত কিছু লোকের হাতেই সঞ্চিত হচ্ছে। এসব অব্যবস্থা দূর করার জন্য প্রয়োজন সামাজিক ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার যথাযথ বাস্তবায়নে সরকারের আন্তরিকতা। সরকার সৎ এবং কঠোর হলেই অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

প্র: অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া কি গণতন্ত্র একেবারেই অর্থহীন?

উ: অর্থহীন। বিত্তশালী লোক যার খাওয়া পড়ার অভাব নেই, তিনি স্বাধীন ভাবে ভোট দিতে পারেন। কিন্তু যার অর্থাভাব রয়েছে, তিনি পাঁচ টাকার বিনিময়েও ভোট বিক্রয় করে দেবেন। কাজেই অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার সাথে সাথে লোককে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। এই দুইয়ের সমন্বয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। একজন অশিক্ষিত লোক তার অধিকার কি করে বুঝবেন?

প্র: আমাদের বর্তমান অব্যবস্থার জন্য অশিক্ষা, কুশিক্ষা না স্বার্থপরতা দায়ী?

উ: আমার মনে হয় এসব কিছু প্রশাসনের কারণেই হচ্ছে। প্রশাসন ঠিক হলে শিক্ষা ব্যবস্থাও ঠিক করা সম্ভব। তারপর যারা শিক্ষিত তারা নিজেরাই তাদের অবস্থা উন্নত করার জন্য চেষ্টা করবেন। অবশ্য বহু শিক্ষিত লোকও দরিদ্র আছেন। কাজেই সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামোরও পরিবর্তন আবশ্যক। তবে পূর্ণ সমতা হয়ত কোথাও আশা করা যায় না। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশে আছে কিনা আমি জানি না। মানুষে মানুষে পার্থক্য থেকে যাবে। কিন্তু সুযোগ সবাইর সমান হওয়া উচিত।

প্র: আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের দেশে কুড়ি কি পঁচিশটি রাজনৈতিক দল আছে। কিন্তু বিলাতে মাত্র তিনটি রাজনৈতিক দল আছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেও আছে মাত্র দু'টি প্রধান রাজনৈতিক দল। বাকী দু'তিনটি রাজনৈতিক দল প্রাথমিক নির্বাচনেই বাদ পড়ে যায়। গণতন্ত্রকে অনুসরণ করার কথা আমরা বলি। কিন্তু কার্যতঃ আমরা গণতন্ত্রের শীর্ষে যেসব দেশ আছে, তাদের থেকে অনেক দূরে আছি। এ সম্পর্কে আপনার কি অভিমত?

উ: আমাদেরকেও সেভাবে এগিয়ে যাওয়া উচিত। তবে আপনিত আর একদিনে এগিয়ে যেতে পারবেন না। উদাহরণ স্বরূপ একটি পরিচ্ছন্ন নির্বাচনের জন্য কিছু নির্বাচন বিধি থাকা বাঞ্ছনীয়।

প্র: বাংলাদেশী সংস্কৃতি বলতে আপনি কি বুঝেন?

উ: বাংলাদেশী সংস্কৃতি বলতে আমি আর আলাদা ভাবে কি বুঝব? এখানকার ভাষাকে অবলম্বন করে যে সাহিত্য, নাটক, সঙ্গীত ইত্যাদি রচিত হচ্ছে, এদেশের মানুষ যে ভাবে তাদের নিজস্ব ধারায় জীবন যাত্রা করে আসছে —এগুলিই আমাদের সংস্কৃতি।

প্র: বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আমাদের জানা-জানির পরিধি অনেক বেড়ে গিয়েছে। আমরা ক্রমেই পরস্পরের কাছাকাছি হয়ে যাচ্ছি। এমনি পরিবেশে আমরা নিজেদের কতটুকু আলাদা রাখতে পারি?

উ: আলাদা রাখা সেটা বোধ হয় খুব সম্ভব হবে না। কারণ এখন সমস্ত পৃথিবী প্রায় পরস্পরের ওপর একভাবে না একভাবে নির্ভরশীল। উদাহরণ-স্বরূপ, আমাদের ছেলেরা যে ডাক্তারী পড়ছে, তাকে বিলাতের বই-এর ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। তেমনি ইঞ্জিনিয়ারিং যে পড়ছে, টেকনিক্যাল এডুকেশন যে নিচ্ছে তাকেও হয়ত সেখানে যেতে হচ্ছে আরো উচ্চ শিক্ষার জন্য। কাজেই একেবারে আলাদা হয়ে কোন দেশের জনগণের পক্ষেই, আমার মনে হয়, এ যুগে বাস করা সম্ভব হবে না।

প্র: কোনও দেশের সংস্কৃতিকে কি সম্পূর্ণ আলাদা রাখা সম্ভব?

উ: সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও খুব একটা আলাদা থাকা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। যেমন, এক দেশের সঙ্গীত আর এক দেশের সঙ্গীতের ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

প্র: এবার আমাদের যুব সমাজ প্রসঙ্গে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তারা আমাদের জাতির ভবিষ্যত, তাদের ওপরই আমাদের আশা ভরসা। কিন্তু আজ আমরা তাদের দেখলে ভয় পাই। রাস্তায় যখন একদল ছাত্রকে দেখি,

পাশ কেটে যাওয়ার সময় ভয় পাই হয়ত ওরা আমাদের পকেট থেকে কলমটা নিয়ে যাবে, হাত থেকে ঘড়িটা খুলে নেবে।

এই অবস্থা থেকে কি ভাবে আমরা মুক্তি পেতে পারি? এদের প্রতি আপনার কি অভিমত?

উ: এটাও অনেক কিছুর সঙ্গে জড়িত। যেমন, আর্থিক কারণ ত রয়েছেই। তার ওপর শিক্ষা। ধরুন এরা যদি স্কুল-কলেজে সুশিক্ষা পায়, শৃঙ্খলা যদি তারা সেখানে আয়ত্ত করতে পারে, তা'হলে হয়ত আমরা এগুলি থেকে ধীরে ধীরে মুক্তিলাভ করতে পারব। একদিনে, কোন সমাজকে সংস্কার করা সম্ভব হয় না। ছাত্রদের মধ্যেও এই যে স্বাধীনতার পর থেকে একটা উশৃঙ্খল ভাব এসেছে এটার পেছনে সুশিক্ষার অভাব রয়েছে এবং যারা স্কুল-কলেজ পরিচালনা করেন তাদেরও একটা দায়িত্ব বোধের অভাব রয়েছে। এসবগুলি মিলিয়ে যদি আমরা ছাত্রদের সুশিক্ষা দিতে পারি, চারিত্রিক শিক্ষা দিতে পারি, তা'হলে আমার মনে হয় এগুলির হাত থেকে আমরা মুক্তি পাবো। কেননা, কোনও মানুষই মূলতঃ খারাপ নয়। কিন্তু একজন মানুষ তাঁর পরিবেশ এবং নানা অবস্থার চাপে পড়ে খারাপের দিকে যায়, মন্দ লোকের প্রভাবে পড়ে। আর একটা বড় কথা, আমার মনে হয়, ছাত্রদেরকে এই যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অঙ্গ দল হিসেবে গঠন করা হচ্ছে, সেটাও একটা ক্ষতিকর দিক। অন্যদেশে বোধ হয় এ রকম নেই। উদাহরণ স্বরূপ, আমেরিকায় বোধ হয় কোনও ছাত্রদল আমাদের দেশের মত রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত নয়। এটা আমরা করছি, আমাদের নেতারা করছেন। তবে আমাদের দেশে ছাত্রদের রাজনৈতিক ভূমিকাকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। '৪৭-এ উপমহাদেশের স্বাধীনতা এবং '৭১-এ বাংলা-দেশের স্বাধীনতার সময় এদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ছাত্রদের প্রয়োজন ছিল। এখন আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক, কাজেই আমার মনে হয় আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ার বৃহত্তর স্বার্থে এখন তাদেরকে রাজনীতিতে টেনে না এনে পড়ালেখার প্রতি উৎসাহিত করা উচিত॥

প্র: ছাত্রদের রাজনৈতিক দলের অঙ্গদল হিসেবে এই যে ব্যবহার করা হচ্ছে, এ জন্য আমাদের নেতাদের অজ্ঞতা না স্বার্থপরতাই দায়ী।

উ: অজ্ঞতা এবং স্বার্থপরতা দু'টাই দায়ী। তাছাড়া, যাঁরা সরকার পরি-চালনা করেন, তাঁদেরও স্বার্থ রয়েছে। কারণ তাঁরা যে দল করছেন, সে দলেরও অঙ্গদল রয়েছে। তাঁদের সপক্ষে শ্লোগান দেয়ার জন্য তাঁরা ছাত্রদের রাস্তায়

নিয়ে আসেন। রাজনৈতিক সভা সংগঠনের জন্যও তাঁরা ছাত্রদের ব্যবহার করেন। তাঁদের এমনি আচরণ শৃংখলাহীনতাকেই ডেকে আনে।

প্র: স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতিকে অম্লান রাখার জন্য আমাদের করণীয় কি আছে বলে আপনি মনে করেন?

উ: স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতিকে অম্লান রাখার ত একমাত্র উপায় হচ্ছে তার সঠিক ইতিহাস রচনা করা। সেই ইতিহাসের সাথে ছাত্ররা যাতে পরিচিত হতে পারে, ছাত্রদের উপযোগী করে সেই ইতিহাসকে প্রণয়ন করা আবশ্যক। এমনিতে বৃহত্তর ইতিহাসকে দলীল হিসেবে লেখা হবে। সেগুলি ছাড়াও ছাত্রদের উপযোগী করে, সহজ ভাবে কিছু গ্রন্থ আমাদের রচনা করতে হবে। এগুলি আমরা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত পাঠ্য করতে পারি। দ্রুতপাঠ হিসেবেও পাঠ্য তালিকাভুক্ত করে এসব বই পড়ানো যেতে পারে। আর এভাবেই ছাত্ররা স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে পরিচিত হতে পারবে। তারা জানতে পারবে কিভাবে এ দেশের ছাত্ররা, এ দেশের শিক্ষক, জনতা, আনসার, মুজাহিদ, পুলিশ, মুক্তিবাহিনী এবং নিয়মিত সৈন্যগণ প্রাণ দিয়েছেন স্বাধীনতার জন্য।

প্র: আপনি এখন জীবনের অনেকটা বছর পেরিয়ে এসেছেন। বাংলাদেশের ভবিষ্যত সম্পর্কে আপনার আশীর্বাদ এবং শুভেচ্ছা কি?

উ: একটা প্রবাদ আছে মাছ যখন পঁচতে আরম্ভ করে মাথা দিয়ে পঁচে। ঠিক তেমনি যাঁরা উচ্চপদে আছেন, সরকার পরিচালনা করছেন, তাঁরা যদি সৎ হন এবং তাঁরা যদি একটা সুস্থ প্রশাসন দেশে চালাতে পারেন, সবদিকে যদি একটা সুস্থতার ভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে পারেন, তা'হলে আমার মনে হয় বাংলাদেশের ভবিষ্যত উজ্জ্বল না হওয়ার কোন কারণ নেই। আমাদের মাটি উর্ব্বরা, আমাদের নদ-নদী আছে, আমাদের সাগর আছে, আমাদের পাহার-পর্বত আছে। অনেক জিনিষের জন্য আমরা অপরের প্রত্যাশী নই। আমাদের এই যে পাহাড়ী অঞ্চলগুলি আছে, তাতে প্রচুর মূল্যবান কাঠ উৎপন্ন হয়, যা দিয়ে নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে আমরা প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে পারি। কিন্তু আমাদের শাসকদের অনভিজ্ঞতার জন্যই হোক, বা স্বার্থপরতার জন্যই হোক, আমাদের শাসন ব্যবস্থাটা সুস্থভাবে চলছে না, এমনকি আইনের ক্ষেত্রেও আমরা নানান জটিলতা দেখতে পাচ্ছি। ঠিক আইনের শাসন যেটা বলে সেটা মানুষ পাচ্ছে না। এগুলি সব নির্ভর করে, আমার মনে হয় সরকারের সুস্থ নীতির উপর; যাঁরা সরকার পরিচালনার দায়িত্বে আছেন, তাঁদের আন্তরিকতার ওপর।

তাঁরা যদি আন্তরিকভাবে দেশের মানুষকে ভালবাসেন, তবেই মঙ্গল হবে। দেশকে ভালবাসাত দেশের মাটিকে শুধু ভালবাসা নয়, দেশের মানুষকেই ভালবাসা। সেই মানুষের প্রতি যদি তাঁদের মমতা থাকে এবং কি উপায়ে সুস্থভাবে তাদের গড়ে তুলতে হবে, সেদিকে যদি তাঁদের ধারনা থাকে, সেভাবে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়, সেভাবে বাণিজ্য ব্যবস্থা চালু করা হয়, সেভাবে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়, তা'হলে এ দেশের ভবিষ্যত খারাপ হওয়ার ত কোন কথা নয়।

প্র: আপনার শরীর অসুস্থ। আপনাকে এই অসুস্থ অবস্থায় আমি এতক্ষণ বসিয়ে রেখেছি। প্রসঙ্গে আর দু'একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে আমি এই সাক্ষাৎকারের সমাপ্তি টানতে চাই।

বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে স্বাধীন হয়েছে। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট থেকে ১৯৭১ সালের ১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত কি আমরা স্বাধীন ছিলাম না?

উ: উত্তরটি সহজভাবে প্রদান করা মুস্কিল। কারণ ১৯৪৭ সালে একবার আমরা ইংরেজ থেকে আমাদের স্বাধীনতা ফিরিয়ে নিয়েছিলাম। সেই স্বাধীনতাকে সঠিকভাবে তখনকার শাসকরা আমাদের ভোগ করতে দেননি বলেই দেশ দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে গেল।

প্র: ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত বাংলার নবাবীর আমলে আমরা স্বাধীন ছিলাম কি?

উ: আমরা আজকে স্বাধীনতা বলতে যেটা বুঝি সেদিন সে রকম ছিল না। তখন রাজতন্ত্র ছিল। তখন রাজার হুকুমে রাজ্য চলত, রাজার হুকুমে যুদ্ধ হ'ত, রাজার হুকুমে সন্ধি হ'ত। তা'ছাড়া, আমরা যাঁদের বাংলার স্বাধীন নবাব বলি, তাঁরাও ত সবাই বিদেশী ছিলেন।

প্র: বাংলাদেশের মাটিতে কোন রাজা এসেছিলেন কি?

উ: তা'ত এসেছিলেন। যেমন, এসেছিলেন শশাঙ্ক, পাল বংশ, সেন বংশ, তুর্কী এবং পাঠান সুলতানগণ প্রমুখ। তাঁরা সবাই রাজ্যের অধিকর্তা বা রাজা ছিলেন। তবে আজকের স্বাধীনতার আমলকে তখনকার দিনের সাথে তুলনা করা সঠিক হবে না।

প্র: তা'হলে আমরা এটুকু বলতে পারি কি এই বাংলার অর্থাৎ বর্তমানে যে ভৌগলিক এলাকাকে আমরা বাংলাদেশ বলছি, এখানে জন্মগত সূত্রে কোনও স্বাধীন বাঙ্গালী নরপতি বা শাসক ছিলেন না? সবাই বাইর থেকে এসেছিলেন?

উ: সবাই। এই বাংলার মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছেন এমন কেউ ইতিপূর্বে অর্থাৎ ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের আগে এদেশের শাসনভার পরিচালনা করেননি। তাঁরা কেউই বাঙালী বা বাংলাভাষীও ছিলেন না।

প্র: আপনার সাথে অনেকক্ষণ আলাপ করলাম। অনেক মূল্যবান কথা আপনার কাছে শুনলাম। আপনি যে অসুস্থ শরীর নিয়ে আমাকে এতক্ষণ সময় দিয়েছেন, এজন্য আমি আপনার কাছে ব্যক্তিগত ভাবে কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্‌র কাছে মোনাজাত করি আপনি নীরোগ স্বাস্থ্য নিয়ে আরো বহুদিন বেঁচে থাকুন আমাদের মাঝে। আল্লাহ্‌ আমাদের ইচ্ছা পূরণ করুন। ধন্যবাদ।

উ: ধন্যবাদ।*

*দেশ বরেণ্য এই শিক্ষাবিদ-সাহিত্যিক দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর মে ৪, ১৯৮৩ চট্টগ্রামস্থ তাঁর বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (ইন্না লিল্লাহে ---)।

দুই

হাসান হাফিজুর রহমান

আমাদের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে হাসান হাফিজুর রহমান একটি অত্যন্ত পরিচিত ও বহুল আলোচিত নাম। বিশুদ্ধতম কবি, প্রথিতযশা সাংবাদিক ও শাণিত প্রখর বুদ্ধিজীবী হিসেবেই তাঁর পরিচয় সীমায়িত থাকেনি। সাংবাদিক জগত থেকে অধুনা তিনি ইতিহাসবেত্তায় রূপান্তরিত। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনা ও প্রকাশনার গুরুদায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত ছিল। এমন বহুধাবিস্তৃত অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশে বিরল দৃষ্টান্ত।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই উপলব্ধিক্ষত দিনগুলোতে তাঁর ভূমিকা, স্বাধীন বাংলা বেতার সম্পর্কে তাঁর অভিমত এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস রচনার অগ্রগতি সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব প্রতিবেদন তিনি উপস্থাপন করেন শ্রাবণের এক মেঘমেদুর সকালে সেগুনবাগানস্থিত তাঁর দপ্তরে গ্রন্থকার শামসুল হুদা চৌধুরী ও মামুন মনসুরের সংগে গুচ্ছ গুচ্ছ অন্তরঙ্গ সংলাপের মাধ্যমে। সাক্ষাৎকারের অংশ বিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত হলো:

স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন দিনগুলোর স্মৃতি

১৯৭১এর ২৬শে মার্চের কালো রাতে পাকিস্তানী সেনারা যখন ঘুমন্ত ঢাকা-বাসীর ওপর মারণাস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তখন আমি বাস করতুম অবাঙালী অধ্যুষিত মোহাম্মদপুর এলাকায়। সঙ্গত কারণেই জায়গাটা নিরাপদ ছিলো না। তাই ২৭শে মার্চ সান্ধ্য আইন শিথিল হলে পরিবার পরিজন নিয়ে আমি ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকায় চলে আসি। এপ্রিল, মে, জুন—এই তিন মাস আমি ঢাকাতেই ছিলাম, আত্মগোপন করে ছিলাম।

জুলাই মাসে কুমিল্লা যাই। ইচ্ছে ছিল সীমান্ত পাড়ি দেয়া। কিন্তু সীমান্ত পাড়ি দিতে পারি নি। মাস চারেক কুমিল্লার গ্রামে গ্রামে কেটেছে। নভেম্বরে আবার ঢাকা আসি। আবারো আত্মগোপন করে কাটাই। তবে এবারে ধান-মণ্ডীতে নয়। অন্যত্র।

জীবন আশংকা :

আমার বাড়ী জামালপুরে। কিন্তু সে সময়ে বাড়ী যাওয়া সম্ভব ছিলো না আমার পক্ষে। আমার দুই ভাই ও এক চাচাকে রাজাকার আলবদররা নৃশংস ভাবে হত্যা করেছিল। আমার এক ভাই স্থানীয় আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতা ছিলেন। আমাদের পরিবার প্রভাবশালী ছিলো। এসব কারণে আমাদের ওপর নির্যাতন নেমে আসে।

আমি তখন প্রেসট্রাস্ট পরিচালিত দৈনিক পাকিস্তানের সহকারী সম্পাদক ছিলাম। ২৫শে মার্চের পর আমি আর দৈনিক পাকিস্তানে যাইনি। দক্ষিণাঞ্চলে নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডব থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত দৈনিক পাকিস্তানের গণমুখী প্রগতিশীল ভূমিকা সুবিদিত। যখন অন্যান্য দৈনিকগুলো কিছুটা দ্বিধান্বিত, কিছুটা বা শংকাগ্রস্ত তখন দৈনিক পাকিস্তান স্বাধীনতার সপক্ষে অত্যন্ত নির্ভীক ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এটা সম্ভব হয়েছিল এ কারণে যে আমরা কর্মরত সাংবাদিকরা নিজেদের হাতে ক্ষমতা তুলে নেই। এ উদ্দেশ্যে যে কমিটি গঠিত হয়েছিল আমি তার চেয়ারম্যান ছিলাম।

'শত্রুর নাশ চাই' শীর্ষক কবিতা ও আমার লেখা তখনকার বিভিন্ন উপ-সম্পাদকীয় স্তম্ভ সহ আরো অনেকের কবিতা ও লেখা আমরা সে কাগজে ছাপি। সেগুলো আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তদুপরি স্বাধিকার আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে যে Writers' Action Committee গঠিত হয়েছিল তার আহ্বায়ক ছিলাম আমি। জোরালো বিবৃতি ও জঙ্গী মিছিলের মাধ্যমে আমরা তখন ছিলাম অত্যন্ত সরব।

এসব কারণেই সম্ভবতঃ বুদ্ধিজীবী হত্যার তালিকায় আমারো নাম ছিলো বলে শুনেছি। আত্মগোপন করে থাকার কারণেই হয়ত আমি বেঁচে গেছি।

নিজস্ব ভূমিকা

ঢাকা ও কুমিল্লায় আত্মগোপনের দিনগুলোতে কখনো হতাশা আমাকে আচ্ছন্ন করেনি। চারপাশের সবাইকে বলতাম : দেখবেন ঈদের পরেই দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে। ঢাকায় যখন ডিসেম্বরে ভারতীয় বিমানগুলো অভিযান চালিয়েছিলো উৎসাহের আতিশয্যে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তাম। লোকজনের সাথে তর্ক জুড়ে দিতাম 'মার্কিন' সপ্তম নৌবহরের সম্ভাব্য আগমনকে কেন্দ্র করে। এতে করে আমার আইডেনটিটি (পরিচিতি) ধরা পড়ার সমূহ আশংকা ছিল।

স্বাধীন বাংলা বেতারের ভূমিকা :

আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতারের ভূমিকা খাটো করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে যুদ্ধে জেতার পেছনে শতকরা ৫০ ভাগ কৃতিত্ব স্বাধীন বাংলা বেতারের।

আমাদের প্রস্তাবিত স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের বারোটি ভল্যুমের একটি সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন বাংলা বেতারের অবদানের ওপর নিয়োজিত করার ইচ্ছে আমাদের গোড়াতেই ছিলো। কিন্তু পর্যাপ্ত তথ্য ও পাণ্ডুলিপির দুষ্প্রাপ্যতার দরুণ আমাদের সেই পরিকল্পনা পরিত্যাগ করতে হয়েছে। তবে সাবিকভাবে Media ভূমিকার ওপর একটি ভলিউম প্রকাশিত হবে। সেখানে অবশ্যই স্বাধীন বাংলা বেতারের গৌরবো ল ভূমিকার বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হবে।*

---

*আমার আলোচ্য গ্রন্থে সাক্ষাৎকারটি প্রকাশের বছরকাল পর বরেণ্য এই ইতিহাসবিদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক কবি হাসান হাফিজুর রহমান মস্কোর সেন্ট্রাল ক্লিনিক্যাল হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন (এপ্রিল ১,১৯৮৩)। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস প্রকল্পের দায়িত্ব ছিলেন। চিকিৎসার জন্য মস্কো যাওয়ার পূর্বে তাঁর পরিচালনায় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস-এর মোট চারটি খণ্ড ছাপার কাজ শেষ হয়েছিল এবং আরো চার খণ্ড ছাপার কাজ ছিল শেষ পর্যায়ে। উল্লেখ্য যে পরবর্তীকালে এই ইতিহাস-এর মোট বার খণ্ড ছাপার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে মোট ষোল খণ্ড ছাপার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল তাঁরই জীবদ্দশায়।

উক্ত ষোল খণ্ডের মধ্যে মোট আট খণ্ড মুদ্রণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে আরো ছয় খণ্ড মুদ্রণের কাজ একই সংগে চলছে। জুন '৮৪-এর মধ্যে এই ছয় খণ্ড সহ বাকী দুই খণ্ডের ছাপার কাজও চূড়ান্ত ভাবে শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, উক্ত আট খণ্ডের পঞ্চম খণ্ড 'মুজিব নগর বেতার মাধ্যম' নাম দিয়ে একক ভাবে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ওপর নিবেদিত হয়েছে। আমাদের সাথে সাক্ষাৎকার দান কালে যথাযথ পাণ্ডুলিপির দুষ্প্রাপ্যতার কারণে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ওপর একক খণ্ড প্রকাশের চিন্তা তখন বাদ রাখা হয়েছিল।

স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস রচনা ও প্রকাশনা প্রসংগে

১৯৭৭, ১লা জুলাই স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের দায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত করা হয়।

সেপ্টেম্বরে পরিকল্পনা কমিশনের কাছে সংশোধিত বাজেট পেশ করা হয় এবং ১৯৭৮-এর পহেলা জানুয়ারী স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। ১৯৮০ সালের জুন মাসের মধ্যে ৪টি ভলিউম প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মুদ্রণ-ঝামেলার কারণে এখন অব্দি একটি ভলিউমও প্রকাশিত হয়নি। সরকারী মুদ্রণালয় থেকে এগুলো ছাপা হয়ে বেরুনোর কথা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে ১৯৭৯-র নভেম্বরেই ৫টি ভলিউমের পাণ্ডুলিপি তৈরী করা হয়। মোট বারোটি ভলিউম প্রকাশিত হওয়ার কথা।

১২ হাজার পৃষ্ঠা সম্বলিত এসব খসড়া দলিল ছাড়াও প্রায় ৩ লাখ অপ্রকাশিত তথ্য আমাদের সংগ্রহে থেকে যাবে। ফলে পরবর্তীকালে প্রয়োজনবোধে আরো ভলিউম প্রকাশের সুযোগ থাকবে। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি এতো ডকুমেণ্ট আর কোথাও সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রকাশিত বইপত্রের শতকরা ৯০ ভাগই সংগ্রহ করা হয়েছে। পৃথিবীর সব জায়গা থেকে বিভিন্ন ভাষায় রচিত তথ্যও সংগ্রহ করার কাজ চলছে। ইতিহাস যাতে বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ হয় সেজন্যে উচ্চ পর্যায়ের একটি গেজেটেড অথেনটিকেশন কমিটি রয়েছে। দেশের সব সেরা ইতিহাসবিদ এই কমিটিতে আছেন। তাঁদের অনুমোদনক্রমেই ভলিউমগুলো তৈরী করা হচ্ছে।

ইতিহাস রচনার ব্যাপারে কোন সরকারী বা রাজনৈতিক তথ্য ও তত্ত্বের ওপর নির্ভর না করে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভংগী নিয়ে আরব্ধ কাজ সমাপন করার চেষ্টা আমরা করছি। এ পর্যন্ত বাধাগ্রস্ত হইনি। মন্ত্রণালয় থেকে সব সময় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পাচ্ছি। কোনো মহল থেকে হস্তক্ষেপের সমস্যা এখনো দেখা দেয়নি। আমরা সব ধরণের রাজনৈতিক বিতর্কের উর্দ্ধে থেকে আমাদের কাজ করে চলেছি।

আমাদের ভলিউমগুলো প্রকাশিত হওয়ার পর জনমত যাচাই করা হবে এবং পরবর্তীকালে সেগুলি প্রয়োজন মত সংশোধন করা হবে।*

উপস্থাপনা : মামুন মনসুর।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

একাত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও ঢাকা বেতার কেন্দ্র

আশরাফ-উজ্-জামান খান

১৯৭১ সালের বাঙ্গালী জাতীয় জাগরণের চরম অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলিতে (জানুয়ারী—মার্চ) ঢাকা সহ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সব বেতারের বলিষ্ঠ ভূমিকা সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর প্রশংসা অর্জন করেছিল। ঐ সময়ে ঢাকা বেতারের আঞ্চলিক পরিচালক ছিলেন জনাব আশরাফ-উজ্-জামান খান। ৭ই মার্চ, '৭১ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহ্‌রা-ওয়ার্দী উদ্যান) বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ঐতিহাসিক ভাষণ দান কালে বক্তৃতা মঞ্চে ঢাকা বেতার টিম-এর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জনাব খান।

উল্লেখ্য যে জনাব আশরাফ-উজ্-জামান খান উপ-মহাদেশের একজন প্রবীণ বেতার ব্যাক্তিত্ব। ১৯৪০ সালে অল ইন্ডিয়া রেডিওতে একজন প্রোগ্রাম এসিষ্ট্যান্ট হিসেবে প্রথম চাকুরীতে যোগ দিয়েছিলেন। বাংলাদেশ বেতারের পরিচালক হিসাবে তিনি ১৯৭২ সালে চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। একজন ছোট গল্প লেখক এবং নাট্যকার হিসেবেও জনাব খান সুনাম অর্জন করেছেন।

—গ্রন্থকার

দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে বেতারের ভূমিকাকে আজ অস্বীকার করার উপায় নেই। এশিয়া মহাদেশের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত ঢাকা বেতারকে বেশ কয়েকবার জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল এই সংগ্রামের সঙ্গে।

উনিশ শ' একাত্তরের গণ অভ্যুত্থান এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের সঙ্গেও বেতারকে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের গণ নির্বাচন দেশে শান্তির বদলে অশান্তি ডেকে এনেছিল। নির্বাচন-এ জয়যুক্ত আওয়ামী লীগের আধিপত্য তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ মেনে নিতে চায়নি। নির্বাচনের পর ইয়াহিয়া খান তার বেতার ভাষণে দেশ গঠনের যে আভাস দিলেন তা বানচাল হয়ে গেল ভুট্টো এবং পাকিস্তানী সামরিক অধিনায়কদের অযৌক্তিক হস্তক্ষেপের ফলে। তৎকালীন সমস্ত পূর্ব পাকিস্তানে নেমে এলো অসন্তোষের বন্যা। সে বন্যা ধারায় প্লাবিত হয়ে গেল সমস্ত দেশ।

দেশের সেই চরম অশান্তি লগ্নে ঢাকা বেতারের ভার ছিল আমাদের ক'জনের হাতে। আওয়ামী লীগের ছ'দফা ফর্ম, সংগ্রামী ছাত্র সমাজের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবীর প্রতি ছিল আমাদের নৈতিক সমর্থন। বেতার ভবনে এক প্লাটুন পাকিস্তানী সেনা এসে তাঁবু গাড়লো। আদেশ এলো কিভাবে গঠন করতে হবে দৈনিক অনুষ্ঠান তালিকা।

তখন সংঘবদ্ধ হয়ে উঠলো বেতারের কর্মীবৃন্দ। দেশের ঐ চরম মুহূর্তে তাদের ভূমিকা কি হওয়া উচিৎ? সরকারী নির্দেশ মেনে নেয়া, না সংগ্রামী জনতার সংগে যোগ দেয়া।

এখানে বলা যেতে পারে দেশব্যাপী আন্দোলনের মুখে সরকারের ভূমিকা তখন নগণ্য হয়ে পড়েছিলো। সৈন্যরা ছিল ব্যারাকে, পুলিশ দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল ঘটনা প্রবাহ, রোজ মিছিল হচ্ছে, রাত্রে জ্বলছে মশালের আলো। এয়ারপোর্ট জড়িয়ে কুর্মিটোলা এলাকার সৈন্যরা একটা আবেষ্টনী তৈরী করছে। সমস্ত দেশ জুড়ে একটা অদ্ভুত থমথমে ভাব। আইন রয়েছে কিন্তু শাসন নেই।

বেতারকে চালু রাখতে হলে পরিস্থিতি মেনে নিতে হবে। রেডিও পাকিস্তানের বদলে "ঢাকা বেতার কেন্দ্র" নামে অনুষ্ঠান প্রচারিত হতে থাকলো। খবর প্রকাশে সরকারী প্রেসনোট ছাড়া স্থানীয় আন্দোলনের প্রাধান্য দেয়া হলো বেশী। নির্দেশ অমান্য করে আমার সোনার বাংলা রেকর্ড বাজানো হলো ঢাকা বেতার থেকে।

দেশে অসহযোগিতা আরও ব্যাপক হয়ে উঠলো। দেশের দুই অংশের মধ্যে টেলি যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেল। ঢাকা বেতার পরিচালনার সর্বময় ভার এলো আমাদের হাতে। সমস্ত বেতার কর্মী একত্রিত হয়ে শপথ নিলেন বেতারের ভূমিকা গণমুখী করে তুলতে হবে এবং দেশময় আন্দোলনের স্বপক্ষে অনুষ্ঠান তৈরী করতে হবে। এগিয়ে এলেন দেশের শিল্পীরা। রাতারাতি অনুষ্ঠানের ধারা বদলে গেল।

ইতিমধ্যে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে অনেক কিছু ঘটে গেছে। বড় বড় পদ থেকে বাঙ্গালী অফিসারদের সরিয়ে নেয়া হয়েছে। বেতারের বাঙ্গালী ডাইরেক্টর জেনারেলকে সরিয়ে বসানো হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানী এক অফিসারকে। বাঙ্গালী সচিবকে অপসারণ করে সেই পদে বসানো হলো এক সীমান্ত প্রদেশের সি, এস, পি অফিসারকে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসনের বড় রকমের রদবদল হয়ে গেল। জেনারেল টিক্কা খান সামরিক গভর্ণর নিযুক্ত হয়ে ঢাকা এলেন।

হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি জাস্টিস সিদ্দিকী টিক্কা খানের অধিষ্ঠান শপথ নিতে অসম্মতি জানালেন। ঘনিভূত হয়ে উঠলো রাজনীতি বিরোধের পটভূমি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে একটা আপোসের প্রত্যাশা আরো জটিল হয়ে উঠলো। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শেখ মুজিব ঘোষণা করলেন জনসভায় তিনি জানাবেন পার্টির পরবর্তী কর্মপন্থা।

দেশে প্রায় সম্পূর্ণ অচল অবস্থা। কোর্টে কাচারীতে মামলা দায়ের হচ্ছে না। অফিস আদালত ইচ্ছামত চলছে। পাকিস্তানী সেনারা নিজেদের সেনা নিবাসে অবরুদ্ধ হয়ে আছে। কিন্তু ঢাকা বিমান বন্দরে রাতের অন্ধকারে বিমান উড়ে আসছে ঘন ঘন। দেশে শাসন নেই, কিন্তু নৈরাজ্যও নেই। একটা অদ্ভুত ভাবান্তর সমস্ত দেশে।

ঢাকায় নিযুক্ত কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের জয়েন্ট সেক্রেটারী জহরুল হক একত্রিত হলেন বেতার কর্মীদের সাথে। রোজ একবার বৈঠক হয় তাঁর নিজ কর্মস্থানে। দৈনিক কর্মপন্থা তৈরী হয়। সরকারী প্রেসনোট কিভাবে প্রচার কর হবে তা নিয়ে আলোচনা হয়। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বেতারের নিজস্ব মতবাদ প্রচারের ব্যবস্থা নেওয়া হলো। স্থানীয় সংবাদ-এর সময় বাড়িয়ে দিনে তিন বার প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া হয়। এমনিভাবে বেতার দেশের সর্ব প্রধা পরিবাহকের স্থান গ্রহণ করে।

শিল্পীদের সহযোগিতা ও বেতারের মানকে এই সময়ে অনেক বাড়িয়ে দেয়। বেতার দেশের সবচাইতে বড় প্রচার ধর্মী এবং জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিগণিত হয়। শিল্পী কর্মীরা নতুন ভাবে অগ্নিঝরা গান রচনা করতে শুরু করেন। বেতারের প্রচার সময় আরও বাড়িয়ে দেয়া হয়। বেতারের অনুষ্ঠান বিভাগ, ইঞ্জিনিয়ার, সংবাদ বিভাগ সহ প্রত্যেক কর্মী একত্রিত হয়ে অকুণ্ঠিত ভাবে যোগ দেন তাঁদের কর্ম প্রয়াসে। বেতারের প্রত্যেক বিভাগেরই অনেক কর্মী সেই সময় প্রায় কুড়ি ঘণ্টা ধরে কাজ করে গেছেন নির্বিবাদে।

বেতার অনুষ্ঠান প্রচারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ও স্বাধীনতা তখন বেতার কর্মীদের হাতে। গণমতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই অনুষ্ঠানের ধারা নির্ণীত হচ্ছিল। লোকের মনোবলকে জাগিয়ে রাখা এবং সঠিক সংবাদ পরিবেশন করাই ছিল বেতারের মূল আদর্শ। কোন রাজনীতির আদর্শের বাহক হয়ে বেতার তখনো জড়িয়ে পড়েনি, কিংবা কোন রাজনৈতিক দলও বেতারকে প্রভাবান্বিত করতে তাঁদের দাবী জানান নি।

দেশের এই অবস্থা নিরসনের জন্যই শেখ মুজিব রেসকোর্স ময়দান ভাষণ দেবেন বলে দিন স্থির করলেন।

বেতার তখনো কোন পক্ষ নিয়ে কোন রকম প্রচারণায় যোগ দেয়নি। দেশে যা ঘটছিল তার প্রচারই ছিল বেতারের ভূমিকা। একমাত্র দেশের প্রেসিডেন্ট কিংবা প্রধানমন্ত্রী ছাড়া আর কারো রাজনৈতিক বক্তৃতা বেতার থেকে কখনও প্রচার করা হয়নি। কিন্তু দেশের সমস্যা তখন সম্পূর্ণ অন্য রকম, আর সংবিধানের ধারা মতে শেখ মুজিবই দেশে প্রধান মন্ত্রীর নির্বাচিত দাবিদার।

বেশ কদিন ধরে পরামর্শ চললো বেতার কর্মীদের ভেতর। যুগ্মসচিব আজহারুল হক সাহেবও এসে যোগ দিচ্ছেন বেতার কর্মীদের সংগে। দেশের জনগণ স্পষ্টভাবে দাবী না জানালেও সকলেরই প্রত্যাশা বেতার শেখ মুজিবের ভাষণ সরাসরি প্রচার করবে।

একটি কথা এখানে উল্লেখ করা দরকার। দেশের সামরিক এলাকা এবং বিমান বন্দর ছাড়া একমাত্র বেতার কেন্দ্রেই তখন এক দল সৈন্য রাখা হয়েছে। কাজেই কোন বড় রকম সিদ্ধান্তের ব্যাপারে বিষয়টি ভেবে দেখার ছিল। যুগ্মসচিব এই ব্যাপারে সামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে কোন সঠিক উত্তর পান নি। ছয় তারিখে সন্ধ্যায় বেতার কর্মীদের এক সভায় স্থির করা হলো দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের এই সন্ধিক্ষণে শেখ মুজিবই দেশের প্রত্যক্ষ জন প্রতিনিধি এবং তাঁর নির্দেশেই পরিচালিত হবে দেশের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা। সন্ধ্যাবেলা থেকেই প্রচারিত হতে থাকলো বেতারে সরাসরি রেসকোর্স থেকে শেখ মুজিবের বক্তৃতা প্রচারের কথা। আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠলো সমস্ত দেশ। সেই রাত্রেই অনবরত টেলিফোন আসতে থাকলো বেতার কর্মীদের অভিনন্দন জানিয়ে। রাত্রেই বেতারে কর্মীদের সভা বসলো, কার কোথায় ডিউটি সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে গেল। রাত্রেই পাঠিয়ে দেয়া হলো সাভার ট্রান্সমিটারে ইঞ্জিনিয়ারদের। বেতার ভবনেও রাত্রেই রাখা হলো কর্মরত অফিসারদের। তারা পরদিন রাঁধে শেষ করে বিকেল নাগাদ বাড়ী ফিরবেন। মাঠে বক্তৃতা মঞ্চে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাছাই করে একদল কর্মীকে নির্দেশ দেয়া হলো।

সব কিছু স্থির করে বাড়ী ফিরে আসতে রাত বারোটা বেজে গেল। সকলের মনেই একটা উত্তেজনার ভাব। মনে হলো সব বাধা অতিক্রম করে আমরা এগিয়ে এসেছি। সকালে সমস্ত শহরময় একটি চাপা উত্তেজনা। শহর গ্রাম ছাড়িয়ে দলে দলে লোক আসছে ঢাকার দিকে। একটি নতুন নির্দেশ, একটি নতুন প্রতিশ্রুতির অপেক্ষায় সমস্ত দেশ উন্মুখ।

মিছিল করে ছাত্র দল বেড়িয়ে এসেছে রাজপথে। তাদের দাবী, পুর্ব পাকিস্তানের পুর্ণ স্বাধীনতা। পথে ঘাটে অসম্ভব ভীড়। বেলা দু'টায় বঙ্গবন্ধুর ভাষণ দেয়ার কথা। বেলা সাড়ে বারোটায় আমরা যন্ত্রপাতি, রেকর্ডার, মাইক ইত্যাদি নিয়ে পৌঁছে গেছি ময়দানে। উঁচু বক্তৃতা মঞ্চের উপর উঠে যে দিকে তাকাচ্ছি মনে হচ্ছে একটা বিশাল মানুষের সমুদ্র টলমল করছে। অত লোক এক সঙ্গে ঢাকার ময়দানে দেখা যায়নি। কিন্তু সময় দু'টা পেরিয়ে গেল, আড়াইটা, তিনটা বঙ্গবন্ধুর দেখা নেই। অধীর হয়ে উঠেছে লোকজন। বঙ্গবন্ধু এলেন প্রায় চারটার কাছাকাছি সময়ে। নিস্তব্ধ হয়ে জনসমুদ্র অপেক্ষা করছে দেশ পরিচালনা সম্বন্ধে একটা নতুন নির্দেশ জানার জন্য। ভাষণের আগে কোরান তেলাওয়াত হয়ে গেল। বঙ্গবন্ধু উঠে দাঁড়ালেন। লক্ষ লক্ষ উপস্থিত জনতা হর্ষধ্বনি দিয়ে অভিনন্দন জানালো তাদের নেতাকে। হাত উঠিয়ে সকলকে থামতে বলে বঙ্গবন্ধু শুরু করলেন ভাষণ। প্রিয় দেশবাসী। সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে গেল রেডিও ষ্টুডিওর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ যন্ত্র। তখনো কিছু বুঝতে পারা যায়নি। আভ্যন্তরীণ লাইনে যোগাযোগ করে জানা গেল বেতার ভবনে প্রহরারত সৈন্যরা অস্ত্র হাতে বেতার ভবন ঘিরে ফেলেছে এবং সামরিক কর্তৃপক্ষের আদেশ এসেছে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচার না করতে।

বেয়নেট এবং নানা রকমের অস্ত্রের মুখে বেতার ভবনে কর্মরত কয়েকজন কর্মীর কিছু করারও উপায় ছিল না। চেষ্টা করে দেখা গেল বক্তৃতা মঞ্চের সঙ্গে সংযোজিত টেলিফোনের লাইনটিও কেটে দেয়া হয়েছে। সম্পূর্ণ একটা পরাজয় অবস্থা। দেশবাসীর কাছে সাড়ম্বরে প্রচার করা সত্বেও বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচার করা সম্ভব হলো না। কিন্তু মঞ্চে স্থাপিত আমাদের টেপ রেকর্ডার বঙ্গবন্ধুর ভাষণ রেকর্ড করে চলেছে। একটি চিরকুট লিখে বঙ্গবন্ধুকে জানানো হলো প্রকৃত অবস্থা। বক্তৃতা মঞ্চ থেকেই তিনি সকলকে জানালেন তাঁর ভাষণ বেতারে প্রচার হচ্ছে না, লাইন কেটে দেয়া হয়েছে। গর্জে উঠলো ময়দানের লক্ষ জনতা।

ভাষণ শেষ করার আগেই বেতার ভবন থেকে পালিয়ে এসে কর্মীরা একত্রিত হয়েছে বক্তৃতা মঞ্চের কাছে। সকলের মনেই একটা সংগ্রামী ভাব, এ পরাজয় মেনে নেয়া যেতে পারে না।

বঙ্গবন্ধু ইতিমধ্যে নির্দেশ প্রচার করেছেন সামরিক সরকারের সংগে সম্পূর্ণ ভাবে অসহযোগিতার কথা। দেশের কোন প্রতিষ্ঠান সরকারের সংগ্রামের সংগে সহযোগিতা করে কাজ চালিয়ে যেতে পারবে না, সব বন্ধ থাকবে। ব্যাংকেও নির্দেশ দেয়া হলো সরকারী কোন লেনদেন মাত্র দু'টি ব্যাংক ছাড়া করা যাবে না।

আদালত, কাচারী সরকারী অফিস সব বন্ধ থাকবে যতদিন না সামরিক সরকার দেশের জনগণের দাবী মেনে নেন।

বক্তৃতা মঞ্চের নীচেই বসলো বেতার কর্মীদের সভা। ইণ্টারনাল সাইনে দু'একজন কর্মী যারা তখনো বেতার ভবনে ছিলেন বেরিয়ে আসতে বলা হলো। বঙ্গবন্ধু নির্দেশ দিয়েছেন যে সব অনুষ্ঠান তাঁদের অনুকূলে কাজ চালিয়ে যেতে পারবে না সব বন্ধ রাখতে হবে। বেতার ভবনে সৈন্য সমাবেশ রেখে কাজ চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। সেই মঞ্চের নীচে বসেই স্থির করা হলো দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মত বেতার ও সেদিন থেকে বন্ধ থাকবে।

সভাস্থল হতে বেরিয়ে এক বেতার কর্মীর গৃহে আবার পরামর্শ সভা বসলো। বেতার কর্মী সকলেরই এক মত, হয় দেশের কর্ম ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বেতার চালিয়ে যেতে হবে নতুবা বেতার বন্ধ করে দিতে হবে।

ট্রান্সমিটারে আগে থেকেই একদল কর্মী রাখা হয়েছিল অবস্থা বিশেষে অনুষ্ঠান চালিয়ে যাবার জন্য। তারা বার বার সংগ্রামের উপর বিশেষ ভাবে রচিত গান বাজিয়ে চলেছে। অতি কষ্ট করে ট্রান্সমিটার ভবনের সঙ্গে টেলিফোন যোগাযোগ পাওয়া গেল। নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হয়ে গেল ইথার তরঙ্গে ঢাকা বেতারের শব্দ প্রবাহ।

বেতার দেশের ক্রান্তিকালে কতখানি শক্তিশালী যন্ত্র এর আগে সকলে বুঝতে পারেনি। বেতারের ধ্বনি নীরব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে সব ঘটনা ঘটেছিল তারই কিছু সংবাদ এখানে দেয়া দরকার। দেশবাসী মনে করেছিল বেতার সামরিক কর্তৃপক্ষ দখল করে নিয়েছে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে এর প্রতিক্রিয়া হয়েছিল অন্যরকম। তখন আমাদের উচ্চ শক্তি সম্পন্ন বেতারই ছিল পাকিস্তানের দুই খণ্ডের মধ্যে একমাত্র সাধিক যোগাযোগের সেতু। বেতারের ধ্বনি বন্ধ হয়ে যাওয়ার সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীরা ভেবেছিল এখানে একটা বিপ্লব ঘটে গেছে এবং পাকিস্তানের সৈন্যদের একটা বিরাট অংশ এখানে আটকা পড়ে গেছে। পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন সৈন্যদের ছাউনিতেও বেতার বন্ধ হয়ে যাওয়াতে বিরাট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। তাই স্থানীয় সামরিক প্রতিনিধিরা হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিল বেতারের কর্মচারীদের। কিন্তু বেতার ভবন এবং ট্রান্সমিটার একেবারে জনশূন্য। বাড়ীতেও কোন বেতার কর্মীকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

নতুন সংসদ সদস্য জনাব নুরুল ইসলাম সাহেবের বাড়ীতে গিয়ে জানতে পারলাম স্বয়ং জেনারেল ফারমান আলী খান আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন সমস্ত ঢাকা শহরে এবং যে কোন শর্তে বেতার ষ্টেশন খোলা রাখার আবেদন তাদের।

শর্ত ছিল আমাদের একটি। রেকর্ড করে রাখা বঙ্গবন্ধুর বাণী আমাদের প্রচার করতে দিতে হবে। সামরিক কর্তৃপক্ষ তাতেই রাজী হয়ে গেল এবং অনুরোধ জানালো সেই রাত্রেই বেতার ষ্টেশন চালু করতে।

সকলকে একত্রিত করে সে রাত্রে বেতার ষ্টেশন চালু করা সম্ভব ছিল না। স্থির করা হলো পরদিন সকালে বেতার ষ্টেশন চালু করা হবে এবং সকাল সাড়ে আটটায় বঙ্গবন্ধুর রেকর্ড করা বাণী বেতার থেকে প্রচারিত হবে।

রাতের নিস্তব্ধতা কাটিয়ে পরদিন সকাল সাড়ে ছ'টাতেই আবার শোনা গেল ইথারে বেতারের ধ্বনি। সমস্ত দেশ উন্মুখ হয়ে শুনলো রেস কোর্স প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ও নির্দেশ সকাল সাড়ে আটটায় ঢাকা বেতারের মাধ্যমে প্রচারিত হবে। অন্যান্য আঞ্চলিক বেতার তাঁর এই ভাষণ সম্প্রচার করবে।

ঢাকা বেতারের সামরিক বাহিনী আবার গিয়ে ঢুকলো তাদের তাঁবুর ভেতর। ঠিক সকাল সাড়ে আটটায় পূর্ব বাংলার সমস্ত অধিবাসী জানতে পারল বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে বাঙালীদের জন্য প্রথম সংগ্রামী আহ্বান।

এর পরের সব ঘটনা সকলের কাছে এখনো অস্পষ্ট হয়ে যায়নি। ২৬শে মার্চ সংগঠিত হয়েছিল চট্টগ্রামের কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র। এখান থেকেই ২৭শে মার্চ স্বাধীনতার বাণী শুনালেন মেজর জিয়াউর রহমান। এই বেতার কেন্দ্রেরই পরবর্তী বর্ধিষ্ণু সংযোজন মুজিব নগরে সংগঠিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র।

আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সাথে বেতারের ভূমিকা জড়িয়ে আছে সর্বতোভাবে।

উই রিভোল্ট

মেজর জিয়াউর রহমান

পরবর্তী কালে লেঃ জেনারেল এবং প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি

(বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তদানীন্তন উপ-প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, বীর উত্তম, পরবর্তী কালে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, ১৯৭৪ সালের ২৬শে মার্চ সাপ্তাহিক বিচিত্রায় 'একটি জাতির জন্ম' শীর্ষক যে নিবন্ধ লিখেছিলেন তার অংশ বিশেষ 'উই রিভোল্ট' শিরোনামে এখানে উপস্থাপন করলাম।)

লেঃ জেনারেল জিয়াউর রহমান বীর উত্তম
প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি

১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বরে আমাকে নিয়োগ করা হলো চট্টগ্রামে। এবার ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অষ্টম ব্যাটালিয়নের সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড। এর কয়েক দিন পর আমাকে ঢাকা যেতে হয়। নির্বাচনের সময়টায় আমি ছিলাম ক্যান্টনমেন্টে। প্রথম থেকেই পাকিস্তানী অফিসারেরা মনে করতো চূড়ান্ত বিজয় তাদেরই হবে। কিন্তু নির্বাচনের দ্বিতীয় দিনেই তাদের মুখে আমি দেখলাম হতাশার সুস্পষ্ট ছাপ। ঢাকায় অবস্থানকারী পাকিস্তানী সিনিয়র অফিসারদের মুখে দেখলাম আমি আতংকের ছবি। তাদের এই আতংকের কারণও আমার

অজানা ছিল না। শীঘ্রই জনগণ শাসনতন্ত্র ফিরে পাবে, এই আশায় আমরা—বাঙালী অফিসাররা তখন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম।

চট্টগ্রামে আমরা ব্যস্ত ছিলাম অষ্টম ব্যাটালিয়নকে গড়ে তোলার কাজে। এটা ছিল রেজিমেন্টের তরুণতম ব্যাটালিয়ন। এটার ঘাঁটি ছিল ষোল শহর বাজারে। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে এই ব্যাটালিয়নকে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। এজন্য আমাদের সেখানে পাঠাতে হয়েছিল দু'শ জওয়ানের একটি অগ্রগামী দল। অন্যরা ছিল একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ের সৈনিক। আমাদের তখন যেসব অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে ছিল তিনশ' পুরনো ৩'৩ রাইফেল, চারটা এল-এম-জি ও দুটি তিন ইঞ্চি মর্টার। গোলাবারুদের পরিমাণও ছিল নগণ্য। আমাদের এণ্টিট্যাংক বা ভারী মেশিনগান ছিল না।

ফেব্রুয়ারীর শেষ দিকে বাংলাদেশে যখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিস্ফোরণোন্মুখ হয়ে উঠছিল, তখন আমি একদিন খবর পেলাম, তৃতীয় কমাণ্ডো ব্যাটালিয়নের সৈনিকরা চট্টগ্রাম শহরে বিভিন্ন এলাকায় ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিহারীদের বাড়ীতে বাস করতে শুরু করেছে। খবর নিয়ে আমি আরো জানলাম কমাণ্ডোরা বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ বিহারীদের বাড়ীতে জমা করেছে এবং রাতের অন্ধকারে বিপুল সংখ্যক তরুণ বিহারীদের সামরিক ট্রেনিং দিচ্ছে। এসব কিছু থেকে এরা যে ভয়ানক রকমের অশুভ একটা কিছু করবে তার সুস্পষ্ট আভাসই আমরা পেলাম। তারপর এলো ১লা মার্চ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহ্বানে সারা দেশে শুরু হলো ব্যাপক অসহযোগ আন্দোলন। এর পরদিন দাঙ্গা হলো। বিহারীরা হামলা করেছিল এক শান্তিপূর্ণ মিছিলে। এর থেকেই ব্যাপক গোলযোগের সূচনা হলো।

এই সময়ে আমার ব্যাটালিয়নের এনসিওরা আমাকে জানাল, প্রতিদিন সন্ধ্যায় বিংশতিতম বালুচ রেজিমেন্টের জওয়ানরা বেসামরিক পোশাক পরে সামরিক ট্রাকে করে কোথায় যেন যায়। তারা ফিরে আসে আবার শেষ রাতের দিকে। আমি উৎসুক হলাম। লোক লাগালাম খবর নিতে। জানলাম প্রতি রাতেই তারা যায়। কতকগুলো নির্দিষ্ট বাঙালী পাড়ায় নির্বিচারে হত্যা করে সেখানে বাঙালীদের। এই সময় প্রতিদিনই ছুরিকাহত বাঙালীকে হাসপাতালে ভর্তি হতেও শোনা যায়।

এই সময়ে আমাদের কমাণ্ডিং অফিসার লেফটেনাণ্ট কর্ণেল জানজুয়া আমার গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখার জন্যেও লোক লাগায়। মাঝে মাঝেই তার লোকেরা গিয়ে আমার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে শুরু করে। আমরা তখন আশংকা করছিলাম, আমাদের হয়ত নিরস্ত্র করা হবে। আমি আমার মনোভাব দমন করে

কাজ করে যাই এবং তাদের উদ্যোগ ব্যর্থ করে দেবার সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা গ্রহণ করি। বাঙ্গালী হত্যা ও বাঙ্গালী দোকানপাটে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ক্রমেই বাড়তে থাকে।

আমাদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা করা হলে আমি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবো কর্ণেল (তখন মেজর) শওকতও আমার কাছে তা জানতে চান। ক্যাপ্টেন সমসের মবিন এবং মেজর খালেকুজ্জামান আমাকে জানান যে, স্বাধীনতার জন্য আমি যদি অস্ত্র তুলে নিই তাহলে তারাও দেশের মুক্তির জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠাবোধ করবেন না। ক্যাপ্টেন ওলি আহমদ আমাদের মাঝে খবর আদান-প্রদান করতেন। জেসিও এবং এনসিওরা দলে দলে বিভিন্ন স্থানে জমা হতে থাকলো। তারাও আমাকে জানায় যে কিছু একটা না করলে বাঙ্গালী জাতি চিরদিনের জন্য দাসে পরিণত হবে। আমি নীরবে তাদের কথা শুনতাম। কিন্তু আমি ঠিক করে-ছিলাম, উপযুক্ত সময় এলেই আমি মুখ খুলবো। সম্ভবতঃ ৪ঠা মার্চ আমি ক্যাপ্টেন ওলি আহমদকে ডেকে নিই। আমাদের ছিল সেটা প্রথম বৈঠক। আমি তাকে সোজাসুজি বললাম সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে। আমাদের সবসময় সতর্ক থাকতে হবে। ক্যাপ্টেন আহমদও আমার সাথে একমত হন। আমরা পরিকল্পনা তৈরী করি এবং প্রতিদিনই আলোচনা বৈঠকে মিলিত হতে শুরু করি।

৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা আমাদের কাছে এক গ্রীন সিগন্যাল বলে মনে হলো। আমরা আমাদের পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত রূপ দিলাম। কিন্তু তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে তা জানালাম না। বাঙালী ও পাকিস্তানী সৈনিকদের মাঝেও উত্তেজনা ক্রমেই চরমে উঠছিল।

১৩ই মার্চ শুরু হলো বঙ্গবন্ধুর সাথে ইয়াহিয়ার আলোচনা। আমরা সবাই ক্ষণিকের জন্য স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আমরা আশা করলাম পাকিস্তানী নেতারা যুক্তি মানবে এবং পরিস্থিতির উন্নতি হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে পাকিস্তানীদের সামরিক প্রস্তুতি হ্রাস না পেয়ে দিন দিনই বৃদ্ধি পেতে শুরু করলো। প্রতিদিনই পাকিস্তান থেকে সৈন্য আমদানী করা হলো। বিভিন্ন স্থানে জমা হতে থাকলো অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ। সিনিয়র পাকিস্তানী সামরিক অফিসাররা সন্দেহজনকভাবে বিভিন্ন গ্যারিসনে আসা-যাওয়া শুরু করলো। চট্টগ্রামে নৌ-বাহিনীরও শক্তি বৃদ্ধি করা হলো।

১৭ই মার্চ ষ্টেডিয়ামে ০ইবিআরসির লেঃ কর্ণেল এম আর চৌধুরী, আমি, ক্যাপ্টেন ওলি আহমদ ও মেজর আমিন চৌধুরী এক গোপন বৈঠকে মিলিত

০ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট সেন্টার এর সংক্ষিপ্ত রূপ।

হলাম। এক চূড়ান্ত যুদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করলাম। লেঃ কর্ণেল চৌধুরীকে অনুরোধ করলাম নেতৃত্ব দিতে।

দু'দিন পর ইপিআর-এর ক্যাপ্টেন (এখন মেজর) রফিক আমার বাসায় গেলেন এবং ইপিআর বাহিনীকে সঙ্গে নেয়ার প্রস্তাব দিলেন। আমরা ইপিআর বাহিনীকে আমাদের পরিকল্পনা ভুক্ত করলাম।

এর মধ্যে পাকিস্তান বাহিনীও সামরিক তৎপরতা শুরু করার চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। ২১শে মার্চ জেনারেল আব্দুল হামিদ খান গেল চট্টগ্রাম ক্যান্টন-মেন্টে। চট্টগ্রামে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের চূড়ান্ত পরিকল্পনা প্রণয়নই তার এই সফরের উদ্দেশ্য। সেদিন ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সেন্টারের ভোজ সভায় জেনারেল হামিদ ২০তম বালুচ রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্ণেল ফাতমীকে বললো—'ফাতমী, সংক্ষেপে ক্ষিপ্রগতিতে আর যত কম সম্ভব লোক ক্ষয় করে কাজ সারতে হবে।' আমি এই কথাগুলো শুনেছিলাম।

২৪শে মার্চ ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ঢাকা চলে এলেন। সন্ধ্যায় পাকিস্তানী বাহিনী শক্তি প্রয়োগে চট্টগ্রাম বন্দরে যাওয়ার পথ করে নিল। জাহাজ সোয়াত থেকে অস্ত্র নামানোর জন্যই বন্দরের দিকে ছিল তাদের এই অভিযান।

পথে জনতার সাথে ঘটলো তাদের কয়েক দফা সংঘর্ষ। এতে নিহত হলো বিপুল সংখ্যক বাঙ্গালী। সশস্ত্র সংগ্রাম যে কোন মুহূর্তে শুরু হতে পারে, এ আমরা ধরেই নিয়েছিলাম। মানসিক দিক দিয়ে আমরা ছিলাম প্রস্তুত। পরদিন আমরা পথের ব্যারিকেড অপসারণের কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

তারপর এলো সেই কালো রাত। ২৫শে ও ২৬শে মার্চের মধ্যে কালোরাত। রাত ১১ টায় আমার কমান্ডিং অফিসার আমাকে নির্দেশ দিলো নৌবাহিনীর ট্রাকে করে চট্টগ্রাম বন্দরে গিয়ে জেনারেল আনসারীর কাছে রিপোর্ট করতে। আমার সাথে নৌবাহিনীর দু'জন অফিসার (পাকিস্তানী) থাকবে, তাও জানানো হলো। আমি ইচ্ছা করলে আমার সাথে তিনজন লোক নিয়ে যেতে পারি। তবে আমার সাথে আমারই ব্যাটালিয়নের একজন পাকিস্তানী অফিসারও থাকবে। অবশ্য কমান্ডিং অফিসারের মতে সে যাবে আমাকে গার্ড দিতেই।

এ আদেশ পালন করা আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব। আমি বন্দরে যাচ্ছি কি না তা দেখার জন্য একজন লোক ছিল। আর বন্দরে শর্বরির মত প্রতীক্ষায় ছিল জেনারেল আনসারী। হয়তো বা আমাকে চিরকালের মতই স্বাগত জানাতে।

আমরা বন্দরের পথে বেরুলাম। আগ্রাবাদে আমাদের থামতে হলো। পথে ছিল ব্যারিকেড। এই সময়ে সেখানে এলো মেজর খালেকুজ্জামান চৌধুরী।

ক্যাপ্টেন ওলি আহমদের কাছ থেকে এক বার্তা এসেছে। আমি রাস্তায় হাঁটছিলাম। খালেক আমাকে একটু দূরে নিয়ে গেল। কানে কানে বললো, 'তারা ক্যান্টনমেন্ট ও শহরে সামরিক তৎপরতা শুরু করেছে। বহু বাঙ্গালীকে ওরা হত্যা করেছে।'

এটা ছিল একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের চূড়ান্ত সময়। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই আমি বললাম 'উই রিভোল্ট'—আমরা বিদ্রোহ করলাম। তুমি ষোলশহর বাজারে যাও। পাকিস্তানী অফিসারদের গ্রেফতার করো। অলিআহমদকে বলো ব্যাটালিয়ন তৈরী রাখতে। আমি আসছি। আমি নৌবাহিনীর ট্রাকের কাছে ফিরে গেলাম। পাকিস্তানী অফিসার, নৌবাহিনীর চীফ পেটি অফিসার ও ড্রাইভারকে জানালাম যে, আমাদের আর বন্দরে যাওয়ার দরকার নেই।

এতে তাদের মনে কোন প্রতিক্রিয়া হলো না দেখে আমি পাঞ্জাবী ড্রাইভারকে ট্রাক ঘুরাতে বললাম। ভাগ্য ভালো, সে আমার আদেশ মানলো। আমরা আবার ফিরে চললাম। ষোলশহর বাজারে পৌঁছেই আমি গাড়ী থেকে লাফিয়ে নেমে একটা রাইফেল তুলে নিলাম। পাকিস্তানী অফিসারটির দিকে তাক করে বললাম আমি তোমাকে গ্রেফতার করলাম। সে হাত তুলল। নৌবাহিনীর লোকেরা এতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো। ঐ মুহূর্তেই আমি নৌবাহিনীর অফিসারের দিকে রাইফেল তাক করলাম: তারা ছিল আট জন। সবাই আমার নির্দেশ মানলো এবং অস্ত্র ফেলে দিল।

আমি কমাণ্ডিং অফিসারের জীপ নিয়ে তার বাসার দিকে রওয়ানা দিলাম। তার বাসায় পৌঁছে হাত রাখলাম কলিং বেলে। কমাণ্ডিং অফিসার পাজামা পরেই বেরিয়ে এলো। খুলে দিল দরজা। ক্ষিপ্রগতিতে আমি ঘরে ঢুকে পড়লাম এবং গলাশুদ্ধ তার কলার টেনে ধরলাম।

দ্রুত গতিতে আবার দরজা খুলে কর্ণেলকে আমি বাইরে টেনে আনলাম। বললাম, বন্দরে পাঠিয়ে আমাকে মারতে চেয়েছিলে? এই আমি তোমাকে গ্রেফতার করলাম। এখন লক্ষ্মী সোনার মত আমার সঙ্গে এসো।

সে আমার কথা মানলো। আমি তাকে ব্যাটালিয়নে নিয়ে এলাম। অফিসারদের মেসে যাওয়ার পথে আমি কর্ণেল শওকতকে (তখন মেজর) ডাকলাম। তাকে জানালাম—আমরা বিদ্রোহ করছি। শওকত আমার হাতে হাত মিলালো।

ব্যাটালিয়নে ফিরে দেখলাম, সমস্ত পাকিস্তানী অফিসারকে বন্দী করে একটা ঘরে রাখা হয়েছে। আমি অফিসে গেলাম। চেষ্টা করলাম লেঃ কর্ণেল এম, আর, চৌধুরীর সাথে আর মেজর রফিকের সাথে যোগাযোগ করতে। কিন্তু

পারলাম না। সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো। তারপর রিং করলাম বেসামরিক বিভাগের টেলিফোন অপারেটরকে। তাকে অনুরোধ জানালাম—ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট, কমিশনার, ডি আই জি ও আওয়ামী লীগ নেতাদের জানাতে যে, ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অষ্টম ব্যাটালিয়ন বিদ্রোহ করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করবে তারা।

তাঁদের সবার সাথেই আমি টেলিফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কাউকেও পাইনি। তাই টেলিফোন অপারেটরের মাধ্যমেই আমি তাঁদের খবর দিতে চেয়েছিলাম। অপারেটর সানন্দে আমার অনুরোধ রক্ষা করতে রাজী হলো।

সময় ছিল অতি মূল্যবান। আমি ব্যাটালিয়নের অফিসার, জেসিও আর জোয়ানদের ডাকলাম। তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলাম। তারা সবই জানতো। আমি সংক্ষেপে সব বললাম এবং তাদের নির্দেশ দিলাম সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে। তারা সর্বসম্মতিক্রমে হৃষ্টচিত্তে এ আদেশ মেনে নিলো। আমি তাদের একটা সামরিক পরিকল্পনা দিলাম।

তখন রাত ২টা বেজে ১৫ মিনিট। ২৬শে মার্চ, ১৯৭১ সাল। রক্ত আখরে বাঙ্গালীর হৃদয়ে লেখা একটি দিন। বাংলাদেশের জনগণ চিরদিন স্মরণ রাখবে এই দিনটিকে। স্মরণ রাখতে ভালোবাসবে। এই দিনটিকে তারা কোনদিন ভুলবে না। কোন দিন না।

শৃংখল হলো শানিত হাতিয়ার

কামাল লোহানী

স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র।
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র।
বাংলাদেশ বেতার।
রেডিও বাংলাদেশ।

উনিশশো একাত্তরের সংক্ষুব্ধ মার্চ মাসের অসহযোগিতার দিনকালে এই বেতারের আরেকটি নাম ছিল: ঢাকা বেতার কেন্দ্র। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ নাম রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। সেদিনের পাকিস্তানী হানাদার পিশাচদের ঘৃণ্যতর সুপরিকল্পিত আক্রমণ আর এদেশের মাটিতে অন্যেও যারা বিদেশী কর্তাভজার কীর্তন গাইতে পারদর্শী ছিলেন, তাদের চৌকশ ধূর্ত পরান্নভোজী চরিত্রের দোদুল্যমানতায় কতিপয় সচেতন বাঙ্গালী কর্মচারীর দুঃসাহসী পদক্ষেপ সাময়িক হলেও ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু যেদিন চট্টগ্রামের ক'জন রাজনীতি সচেতন বেতার প্রযোজক, প্রকৌশলী, নিবন্ধক ও সংস্কৃতি কর্মীর যৌথ প্রয়াসে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের জন্ম হলো, সেদিন থেকে এদেশের পরাধীনতার শৃংখলে চিড় ধরলো। শৃংখল একদিন শানিত তরবারিতে রূপান্তরিত হলো। শীর্ণ মানুষ ন্যুব্জ দেহ টেনে ধনুকের ছিলার মতোন টনটনে বুকে টঙ্কার দিয়ে পাঁজরের হাড়ে যুদ্ধের দামামা বাজালো। গর্জে উঠলো পদ্মার প্রমত্ত ঢেউ সাত সহস্র বাসুকীর ফনা তুলে। বাঁধভাঙ্গা জলধারার মতো অনর্গল প্রতিরোধের মিছিল দুনিয়াটাকে কাঁপিয়ে দিয়ে শত্রু হননের মহা উল্লাসে ফুঁসে উঠলো। পাহাড়ে-পর্বতে, বনে-বনান্তরে, পাতালে, মর্তে প্রতিধ্বনিত হলো ইথারে ইথারে বজ্রের সংঘর্ষ আর বিদ্যুৎ বয়ে গেলো অযুত মানুষের বন্দী প্রাণে, ত্রাসে কেঁপে উঠলো ক্ষমতা মদমত্ত স্বৈরশাসনের অচলায়তন। কবির কণ্ঠ বিদ্রোহী উচ্চারণে জননী জন্মভূমির কাছ থেকে চেয়ে নিলো বৈশাখের রুদ্র জ্বালা, প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ঘোষণা করলো—'ওরা মানুষ হত্যা করছে, আসুন আমরা পশু হত্যা করি।'

আমি বলছিলাম, স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে, সশস্ত্র লড়াইয়ে যে বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র মুক্তিযুদ্ধের 'সেকেণ্ড ফ্রণ্ট' হিসেবে তার যথার্থ ভূমিকা পালন করে অধিকৃত এলাকায় শত্রুর হাতে বন্দী অগণিত বাঙ্গালী নারী-পুরুষ, আবাল বৃদ্ধ-বনিতার প্রাণকে সচকিত, উজ্জীবিত ও উচ্চকিত করেছে স্বাধীনতার জন্য লড়বার বিপুল সাহসে, সেই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কথা।

বাংলার দুরন্ত মানুষের দুর্বার মুক্তির লড়াই চলছে জলে, স্থলে, এমনকি অন্তরীক্ষেও; সেই অমিতবিক্রম মুক্তিবাহিনীর জোয়ানদের নিত্যদিনের বিজয়াভিযানের প্রদীপ্ত সংবাদ এই স্বাধীন বাংলা বেতারই তার ছোট্ট ষ্টুডিওর ঘরে বসে বিক্ষিপ্ত অবিন্যস্ত যন্ত্রপাতিতে রেকর্ড করে স্বল্প ক্ষমতা সম্পন্ন ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে পৌঁছে দিতো বাংলার ঘরে ঘরে, মা-বোনদের আঁচল ঘেরা প্রাণে, দুর্জয় সাহসে পিত্র-পুত্রকে করে তুলতো উদ্বেল। তাইতো শত্রু কবলিত পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর অধিকারে নির্মম নৃশংস হত্যার শিকারে পরিণত হবার সমূহ বিপদের সকল ঝুঁকি মাথায় নিয়েও প্রতিটি বাঙ্গালী সেদিনের লড়াইয়ের দিনগুলোতে আঁটোসাঁটো ঘরের কোণে লেপের ভিতরে কিংবা কাঁথার আড়ালে সাউণ্ডটাকে একেবারে কমিয়ে কানের কাছে ট্রানজিষ্টারটা নিয়ে বসে থাকতো ঠাসাঠাসি করে।

সত্যি কথা বলতে কি, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র যদি না থাকতো তবে কি মুক্তিযুদ্ধের পরিপূর্ণতা সম্ভব হতো সার্বিক ভাবে? বিভিন্ন রণাঙ্গনের প্রতিদিনকার খবর কে পৌঁছাতো বাংলার ঘরে ঘরে? দুরন্ত প্রাণ সৈনিকের অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ করতো যখন শত্রুর দুর্বল দিনাকে, দুশমনকে হটিয়ে মুক্তিফৌজ যখন দৃপ্তপদভারে স্বদেশকে মুক্ত করতো হায়েনার কবল থেকে, তার খবর যদি স্বাধীন বাংলা বেতার প্রচার না করতো তবে অধিকৃত এলাকার যন্ত্রণাকাতর মানুষকে কে দিতো শত্রুকে চরম আঘাত হানবার ডাক? কে শোনাতো শেষ যুদ্ধের বাদ্য?

কয়েকটি দুরন্ত জীবন পথিক সংগ্রামের যাত্রাপথে একাত্তরের ছাব্বিশে মার্চ চট্টগ্রাম বেতার থেকে যদি এমন দুঃসাহসিক পদক্ষেপ না নিতো তবে কি হতো জানি না, কিন্তু সেই ক'জন জীবন বাজী রাখা তরুণের আকস্মিক সিদ্ধান্ত সমগ্র বাঙ্গালী জাতিই কেবল নয়, বিশ্বকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিলো আর হানাদার ভাড়াটিয়া সৈনিকদেরকে পাগলা কুকুরের মতোন হন্যে করে তুলেছিলো। সেদিন থেকে শুরু করে লড়াইয়ের শেষ দিনটি পর্যন্ত যারা শব্দের হাতিয়ার হাতে সৈনিকের ভূমিকা পালন করেছে এই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে, আজ তারা যে যেখানেই থাকুক না কেন, সমগ্র জাতির সালাম রইলো তোমাদের জন্যে।

বাংলার অগণিত মানুষের আকাংখা রূপায়নের এ লড়াইয়ে চট্টগ্রামের ক'জন দুঃসাহসী তরুণের তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত মুক্তিযুদ্ধকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিলো নিজস্ব সত্তায়। স্বাধীন বাংলা বেতার কি ছিল, কেমন ছিল, কোন ধরনের ভূমিকা পালন করেছে, তা আর কেউ সঠিক মূল্যায়নে বলতে পারবে না। কারণ, এতো এখন ইতিহাসের বিষয় বস্তু হয়ে গেছে। স্মৃতির পাতা থেকে অনেক কিছুই হারিয়ে যেতে শুরু করেছে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ব্যবহৃত টেপ, যন্ত্রপাতি, স্ক্রিপ্ট, সরঞ্জাম ইত্যাদি আদৌ কি কোথাও আছে? যাদুঘরে স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতি সংগ্রহশালা পর্যায়ে এগুলো কি আগামী দিনের নাগরিকদের তাদের পূর্ব পুরুষদের অতীত ইতিহাসের গৌরবান্বিত অধ্যায়ের রূপরেখা তুলে ধরতে পারবে? ইতিহাসবেত্তারা কি পাবে কোন খোরাক এসব থেকে? --কিন্তু যারা হানাদার পাকিস্তানী বাহিনী অধিকৃত এলাকায় রেডিওর নব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হয়রান হয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র খুঁজতেন কিংবা ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে লেপের তলায় অথবা খুব নিচু ভলিউমে কানের সাথে ধরে ধরে অনুষ্ঠান শোনবার চেষ্টা করতেন, তারা বেঁচে থাকা অব্দি এই স্মৃতি বহন করবেন এবং ছোটদের কাছে মাঝে মধ্যে গল্পও করবেন হয়তো বা। এ স্মৃতি ভুলিয়ে দেবার প্রয়াস বহুদিন থেকেই শুরু হয়েছে।

—কিন্তু আমরা বাঙ্গালীরা সত্যি কি ভুলতে পারবো এই স্মৃতি? সেদিনের ঘটনাগুলো? স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র যদি সেদিনের লড়াই শুরুর সাথে সাথে অনুষ্ঠান প্রচারের প্রয়াস না নিতো তবে কি আমরা পরনির্ভরতায় মাথা কুটে মরতাম না? অন্য কোন দেশের বেতার যতই সাহায্য করুক না কেন, স্বাধীন বাংলা বেতারের চেয়ে কি তার কথা বেশী বিশ্বাসযোগ্য হতো যুদ্ধরত অধিকৃত বাংলার মানুষের কাছে? যুদ্ধের যে সংবাদ এই বেতারে প্রচারিত হত, যে নির্দেশ স্বাধীন বাংলা বেতার দিত, বাংলার মানুষ তাই পালন করতেন, শুনতেন। উদ্বুদ্ধ হতেন। লড়িয়ে মনে সাহসের যোগান দিতো স্বাধীন বাংলা বেতারই।

'আপনারা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনতে পাবেন প্রতিদিন সকাল ন'টার পর, দুপুর একটার পর এবং সন্ধ্যা সাতটার পর যে কোন সময়ে।' স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র এই ঘোষণা দিয়ে আমাদের সর্বক্ষণ উন্মুখ করে রাখতো। অবশ্য পরে নিজে যখন এই বেতারে যোগ দিয়েছিলাম তখন বুঝতে পেরেছিলাম প্রাথমিক পর্যায়ে শত্রুকে এড়িয়ে দেশের ভেতরে অধিকৃত সীমারেখায় এভাবে ছাড়া স্বাধীন বাংলা বেতার প্রচার করা সম্ভবই ছিল না।

চট্টগ্রামের কালুরঘাট ট্রান্সমিশন ভবনটিতে ছিল ছোট্ট একটি ষ্টুডিও। কেউ কেউ পরামর্শ দিলেন ওখান থেকে অনুষ্ঠান প্রচারের। নাম ঠিক করা হলো স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র।

তিরিশে মার্চ দুপুর বেলা যখন অনুষ্ঠান প্রচারের কাজ চলছিল এমন সময় পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বোমারু বিমানের আওয়াজ সবাইকে সচকিত করে তুললো। দু'টো দশ মিনিটের সময় প্রচণ্ড আওয়াজে বোমা বর্ষণ হলো —তাদের লক্ষ্যবস্তু নির্দিষ্ট করে। দশ মিনিটের নারকীয় হামলায় কালুরঘাটের দশ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন ট্রান্সমিটারের চ্যানেলগুলো ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেলো। তখন অনন্যোপায় হয়েই কালুরঘাটে রাখা এক কিলোওয়াটের একটি ট্রান্স-মিটার ওখান থেকে উঠিয়ে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা হলো। পরিকল্পনা অনুযায়ী ওটাকে ডিসমাণ্টল করে পটিয়া নিয়ে গেলেন তারা। কিন্তু এক কিলোওয়াটের অনুষ্ঠান ক্ষেপন-সীমা খুবই সীমিত এবং একে শত্রুরা খুব সহজেই খুঁজে বের করতে পারবে বলে রামগড় এলাকার দিকে ওটাকে নিয়েই সকলে রওয়ানা হলেন তেসরা এপ্রিলে। সেদিন রাত দশটায়ই তারা প্রচার করলেন এক ঘণ্টা স্থায়ী অনুষ্ঠান। মাত্র চারদিন এই বেতার শুনতে না পেয়ে মানুষ কতখানি বিপন্ন হয়ে পড়েছিলেন মানসিক দিক থেকে, তা আজও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে।

তেসরা এপ্রিল থেকে পঁচিশে মে পর্যন্ত একটানা স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়েছে একটি জঙ্গলাকীর্ণ মুক্ত এলাকা থেকে। এখানে আমার প্রয়াত আওয়ামী লীগ নেতা এম, আর, সিদ্দিকী, পার্বত্য চট্টগ্রামের ডেপুটি কমিশনার এইচ, টি, ইমাম এবং মেজর জিয়ার লোকজন আন্তরিকভাবে সাহায্য করেছেন। জঙ্গলে বসে বাঁশের মাচানের উপর কাগজের টুকরা যোগাড় করে সংবাদ লিপিবদ্ধ করা, বন্যপশুদের সাথে মিতালী পর্যায়ে বসবাস করা ছিল লোমহর্ষক অভিজ্ঞতা. কিন্তু বিদ্রোহী বেতারে এইতো যথার্থ পরিবেশ। একজন মুক্তিযোদ্ধা শব্দ-সৈনিকের কালজয়ী প্রচেষ্টার এইতো বলিষ্ঠ দুঃসাহসিক ইতিহাস।

তারপর কোলকাতার বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডের বিশাল দোতলা বাড়ীটার সবটাই আমাদের দখলে এলো ধীরে ধীরে। প্রথমে ফ্যান বন্ধ করে, যেমে-চুপসে, জানালা-দরজা আটকে দিয়ে অনুষ্ঠান রেকর্ডিং করতে শুরু করলাম আমরা। আশফাকুর রহমান আর টি, এইচ, শিকদার অনুষ্ঠান প্রযোজনা করতেন ঢাকা বেতারে, কিন্তু এখানে যন্ত্রের কৌশল আবিষ্কারে প্রাথমিক পর্যায়ে হাত লাগালেন। তারপর একটা ঘর ষ্টুডিও হিসাবে নির্দিষ্ট হল। লোক বাড়তে

লাগলো। প্রফেসর খালেদ, আওয়ামী-নেতা জিল্লুর রহমান আমাদের ওখানেই থাকতেন। এম-এন-এ জনাব এম, এ, মান্নান ছিলেন বেতারের দায়িত্বে। তিনি মাঝে মাঝে পরামর্শ দিতেন। কিন্তু কোন পলিটিক্যাল সেল ছিল না। চট্টগ্রামের বিদ্রোহী বেতার পরিচালকরা ইতিমধ্যেই এসে পৌঁছুলেন কোলকাতায়। সে থেকে ডিসেম্বর এই ক'টা মাস আমরা বেশ চালাচ্ছিলাম। কিন্তু যাদের আশ্রয়ে ছিলাম তাদের ও নিরাপত্তা এবং গোপনীতার প্রয়োজন ছিল। তাই কোলকাতার হস্তান্তর হলে পড়তাম বিপাকে। দুদিন-তিনদিনের অনুষ্ঠান, খবর সব তৈরী করে পাঠিয়ে দিতে হতো। যেখান থেকে প্রচার হতো সেইখানে আমাদের যাবার অনুমতি ছিল না। ফলে অনেক সময় পুরনো খবর শোনাতে হতো। ভারতীয় আর্মী সূত্র ছাড়াও আমরা একটা পন্থা উদ্ভাবন করেছিলাম বলে কিছুটা বাঁচোয়া। কোন্ সেক্টরে কি অস্ত্র গোলা-বারুদ ব্যবহার হয় আর কি ধরনের ক্ষতি হতে পারে এবং কখন এই ধরনের হামলা চলে—এর একটা ছক কাটা ছিল আমাদের, তা থেকেই আমরা বেশীর ভাগ সংবাদ পরিবেশন করতাম।—ধীরে ধীরে ষ্টুডিও দুটো হয়েছে। এয়ার কণ্ডিশনার মেশিন বসেছে, কার্পেট লেগেছে ষ্টুডিও মেঝে। বেতন নির্ধারণ করা হয়েছে, পদ বণ্টন করা হয়েছে। এইভাবে কোলকাতায় আমাদের সাড়ে ছ'মাসের স্বাধীন বাংলা বেতার চলেছে। একদিন হঠাৎ নির্দেশ এলো 'মার্শাল সং লাগাও', 'জোরসে শ্লোগান দো'। অর্থাৎ পাকিস্তানী বাহিনী লেজ গুটোতে শুরু করেছে। নির্দেশ পেয়ে আমরাও স্বাধীন বাংলা বেতারে জোরসে শ্লোগান, দেশাত্মবোধক গান প্রচার করতে শুরু করলাম। এরই মধ্যে একদিন ১৬ই ডিসেম্বর এলো। আমরা স্বাধীন হলাম। দু-তিন দিন চলে গেলো। অকস্মাৎ খবর এলো ঢাকা যেতে হবে আমাকে। তৈরী হতে হবে এক্ষুনি। পরিবার-পরিজনদের ফেলে, কোন কথাও বলতে পারলাম না তাদের চলে আসতে হলো।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে আমি আর মুকুল ভাই ২২শে ডিসেম্বর ঢাকা এলাম ভারতীয় বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টারে। বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার সেদিনই ঢাকা পৌঁছুবেন। তার চলতি বিবরণী প্রচার করতে হবে আমাদের দুজনকে—এ আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। পারব কি পারব না, এ আশংকায় দুলছে মন। মুকুল ভাই (এম, আর আখতার—চরমপত্র খ্যাত) বললেন "দূর, পলিটিক্স করছো, কইতে জান। ব্যাস, আর কি লাগে? যা কইবা হেইডাই ঠিক। চালাও মিয়া, চালাইয়া যাও।" মুকুল ভাইয়ের কথায় নির্ভরতা পেলাম। দেখলাম, সত্যিই। কথাগুলো যেনো এসে যাচ্ছে কোত্থেকে। এমনি এমনি জোরেই প্রথম দিনের এসিড টেষ্টে উৎরে গেলাম সফলতার সাথেই।

এসব যাক, স্বাধীনতার পর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কাজ চুকে গেছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট, খুলনা, রংপুর এসব জায়গায়ও বিধ্বস্ত হলো বিল্ডিং ষ্টুডিও পাওয়া গেছে। যন্ত্রপাতি ছিল খুব কম না। কিছুই নেই তার ভেতর থেকে যে মনোবৃত্তি নিয়ে কাজ করেছিলাম আমরা একাত্তরে, স্বাধীন দেশে সুখকর পরিবেশে আরাম-আয়েশে কাজ করতে পেয়ে আমরা অতীতকে যেনো ভুলেই যেতে বসলাম। জাতীয় দায়িত্ব পালন থেকে সরকারী চাকুরিতে পরিণত হলো আমার ক্রিয়াকর্ম। নব্য স্বাধীন বাংলাদেশের সরকারী নীতিমালা অনুসরণ করতে শুরু করলো সেই পুরানো আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন ব্যবস্থার। দেশ সেবা যখন দাসত্বে পরিণত হয়, তখন মুক্তিযোদ্ধা কোন মানুষেরই চেতনাবোধ অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে না। তবু পঁচিশে ডিসেম্বর উনিশশো একাত্তরে আমি প্রথম দায়িত্বভার গ্রহণ করলাম ঢাকা বেতার কেন্দ্রের। তখন মহাপরিচালক কেউ ছিলেন না। মনিটারিং সার্ভিস, এক্সটার্নাল সার্ভিস, বাইরের কেন্দ্রগুলির সংগেও আমাকে যোগাযোগ রাখতে হতো। কিছুদিন পরে আশরাফউজ্জামান খানকে ডিরেক্টর-ইন-চার্জ করে মহাপরিচালকের দায়িত্ব দেয়া হলো। তারপর এলেন এনামুল হক, এম, আর, আখতার। ঢাকা কেন্দ্রের গুরুত্ব অনুধাবন করে রাজনৈতিক কোণ থেকে নিম্নচাপ, ঊর্ধ্বচাপ সৃষ্টি শুরু হলো। এনামুল হকের আমলে আমি ও-এস-ডি হলাম। বেশ কিছুদিন পর এম, আর, আখতারের কালে নতুন দায়িত্ব নিয়ে বেতারের সদর দফতরে যোগ দিলাম এবং তারও বেশ কিছু পরে বাংলাদেশ বেতারের মিউজিক ও ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিসের প্রথম ডিরেক্টর নিযুক্ত হলাম। কিন্তু মানসিক দিক থেকে আমি তো বেতার ছেড়ে আবার আমার পুরানো পেশা সাংবাদিকতায় ফিরে যাবার জন্য মনস্থির করে ফেলেছি। তাই দৈনিক জনপদ পত্রিকার বার্তা সম্পাদক হিসেবে যোগ দিলাম বন্ধুবর আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর অনুরোধে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের সকলেরই—দশ বছর পেরিয়ে আমরা উন্নতি থেকে উন্নতির শিখরে ধাবিত হওয়ার বাসনা পোষণ করছি মনে, প্রকাশ্যে ঘোষণা করছি সেকথা আর তোষণে দোহন করছি যতটা সম্ভব।

—মুক্তিযুদ্ধে সত্যিকার অংশ গ্রহণের সুবাদে কে কি পেয়েছেন এই এক দশকে, তার হিসেব কেউ কষেছে কিনা জানি না। তবে একটা দিক কারও নজরেই পড়েনি, সেটা হলো—স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালিয়েছিলেন তাদের কথা। অন্ততঃপক্ষে শব্দ-সৈনিক হিসেবে আজও কেউ জাতীয়ভাবে সম্মানিত হননি। যারা সেদিন চট্টগ্রাম বেতার থেকে ছিটকে বেরিয়ে বলিষ্ঠ চেতনায় উদ্বুদ্ধ

হয়ে সাহসিকতার সাথে বিপ্লবী কেন্দ্র চালু করেছিলেন তাদের অবদান এদেশের স্বাধীনতার, এদেশের মানুষের মুক্তিতে কতখানি, তা অনুধাবন করা আজ আর সম্ভব হবে না। স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র বাংলার মানুষের প্রাণে যে কী আশার সঞ্চার করেছিল, মুক্তিযোদ্ধাদের বুকে লড়বার কত যে দুর্জয় সাহস জুগিয়েছিল, অবিকৃত বাংলার বন্দী মানুষকে শক্তি দিয়েছিল শত্রুকে রুখবার— সে ইতিহাস লেখা না হলেও প্রতিটি মানুষের মনে চিরস্থায়ী আসনে প্রতিষ্ঠিত।

মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় ফ্রন্টের দায়িত্ব পালন করেছে দুর্ধর্ষ মুক্তিবাহিনীর পাশে পাশে, ইথারে ইথারে প্রথমে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র, তারপর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক ও কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেবার পর হলো বাংলাদেশ বেতার। কিন্তু পঁচাত্তরের পট পরিবর্তনের পর থেকে সেই যে ডাকলো "রেডিও বাংলাদেশ" বলে আজো তাই চলেছে।

—এ পরিবর্তনের সাথে সাথে মুক্তিযুদ্ধের শব্দ-সৈনিকদেরও ভাষা পরিবর্তিত হতে চলেছে। কে কোথায়, কেমন আছে, কে জানে? কেউ হয়তো মরেই গেছেন, কেউ চাকুরী খুইয়েছেন, কেউ রাস্তাবাবুর হচ্ছেন দিনরাত। —রণ-সৈনিক আর শব্দ-সৈনিক এদের ভুলে গেলে আমরা নিজ অস্তিত্বকেই কি ভুলে যাব না?

প্রথম প্রকাশ: মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি অক্টোবর-নভেম্বর '৮১
নিবন্ধকারের অনুমোদনক্রমে সংকলিত।

স্মৃতি থেকে

দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

উনিশশো একাত্তরের এপ্রিলের শুরু থেকে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি—এই সময়ে রক্তমাখা পায়ে অন্ধকার মাড়িয়ে, আত্মীয়-স্বজনের কঙ্কাল করোটির চিহ্ন হাতড়ে অনেক রাত্রির মতো দিন আর রাত্রির সীমানা পেরিয়ে বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি মানুষকে আলোয় ফিরতে দেখেছিলাম। কর্মক্লান্তির খণ্ডখণ্ড অবসরে যখনই আত্মস্থ হওয়ার সুযোগ পাই, সেই দিনগুলোর কথা আজও মনে পড়ে যায়। সেই দুঃস্বপ্ন সাড়ে আট মাসের অনেক স্মৃতি ভাঁটার সময় জেগে ওঠা চরের বালুডাঙার মতো চিক্‌চিক্ করে ওঠে।

বাংলাদেশের তল্লাটি জুড়ে তখন সর্বনাশের আগুন জ্বলছে, ধ্বংস আর হত্যার তাণ্ডব চলছে। মৃত্যুতাড়িত মানুষের আদি অন্তহীন ঢল নেমে এল আমাদের পূর্ব সীমান্তে। দেখতে দেখতে সীমান্তের বেড়া গেল ভেঙে; কৃষ্ণনগর—বনগাঁ—কল্যাণী—নবদ্বীপ ছাপিয়ে বাস্তুচ্যুত জনতার স্রোত, অবশেষে, এই শহরের বুকেও আছড়ে পড়ল। নিরাশ্রয় মানুষ আসছেন কাতারে কাতারে, তাঁদের মুখে মুখে পাশবিকতার নিত্য নতুন বীভৎস কাহিনী শুনছি, আর আমরা শিউরে উঠছি, বুকের মধ্যে জ্বালা ধরছে, যন্ত্রণার সমব্যথায় প্রাণ ককিয়ে উঠছে।

যতটুকু সম্বল তাই নিয়ে এই সব দুঃখ শোক জর্জরিত মানুষের সেবায় এগিয়ে এলেন আমাদের সরকার। দেশের সাধারণ নিরক্ষর মানুষ, উচ্চশিক্ষাভিমানী মানুষ, অতিবিত্তশালী মানুষ, কর্মঠ মানুষ, বিত্তবান মানুষ, দরিদ্র মানুষ—সকলেই সরকারের পাশে এসে দাঁড়ালেন। গড়ে উঠল বহু বেসরকারী সাহায্য সংস্থা। স্বেচ্ছাসেবীর দল পরিচর্যার হাত বাড়িয়ে দিলেন। কলকাতার মাঠে, ময়দানে, সভাকক্ষে, মিছিলের গণকণ্ঠে ধিক্কার ধ্বনিত হয় নরঘাতী, শিশুঘাতী নারীঘাতী বীভৎসার বিরুদ্ধে।

মনে পড়ছে এপ্রিলের গোড়ার দিকে একদিন সকাল বেলায় এমনি এক সভার আয়োজন করেছিলেন 'গ্রামীণ গীতি সংস্থার' শিল্পীবন্ধুরা। নিতান্ত ঘরোয়া সভা। সভাকক্ষ, আমারই ফ্ল্যাটের বৈঠকখানা। হৃদয়ের আবেগ আর উত্তাপ নিয়ে সেদিনকার সভায় যাঁরা উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন লোক সংগীত শিল্পী পূর্ণদাস বাউল, দিনেন্দ্র চৌধুরী ও অংশুমান রায় এবং গীতিকার

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার আর হাজির ছিলেন 'সংবাদ বিচিত্রা'র প্রযোজক উপেন তরফদার।

সভা তখনও চলছে, এমন সময় আগন্তুকের হাতের স্পর্শে কলিং বেলটা কয়েকবার বেজে উঠল। দরজা খুলে শিল্পী খালেদ চৌধুরীকে দেখে আনন্দে হৈ চৈ করে উঠলাম। হাত ধরে তাঁকে টেনে নিয়ে এলাম সভার একেবারে মাঝখানে। তাঁর সংগী ভদ্রলোকটিকেও সভা কক্ষে আহ্বান করে নিয়ে এলাম। খালেদদা তাঁর সংগীর সংগে পরিচয় করিয়ে দিলেন। নাম বলতেই চমকে উঠলাম। বাংলাদেশের প্রখ্যাত শিল্পী কামরুল হাসান। মানুষটিকেই দেখিনি, কিন্তু তাঁর সংগে পরিচয় বহু দিনের।

মনে পড়ছে সত্তরের প্রলয়ংকর ঘূর্ণিঝড়ের পর ঢাকার দৈনিক পত্রিকায় দেখেছি কালো বিশাল ফেস্টুনে লেখা 'কাঁদো দেশবাসী কাঁদো', আর সেই ফেস্টুনের পেছনে নগ্নপদ শিল্পী সাহিত্যিক সাংবাদিকদের নীরব শোক-মিছিলের ছবি। শোকের জমাট স্তব্ধতা নিয়ে সেই মিছিল শহীদ মিনারের পাদদেশে পৌঁছলে কয়েকজন শিল্পী সাহিত্যিক সাংবাদিক তাঁদের শোকার্ত হৃদয়ের কথা বলতে গিয়ে যেসব মন্তব্য করেছিলেন, পত্র-পত্রিকায় তার বিবরণ ছাপা হয়েছিল।

মনে পড়ছে, সবচেয়ে বেশী অভিভূত হয়েছিলাম চিত্রশিল্পী কামরুল হাসানের কথায়। তিনি বলেছিলেন, 'শুধু কাঁদলেই চলবে না, শুধু শোক প্রকাশ করলেই চলবে না। ইতিপূর্বেও এদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষ অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ করেছে, আমরা কেঁদেছি, শোকাকুল হয়েছি, সভা করে শোক প্রকাশ করেছি, শোক প্রস্তাব গ্রহণ করেছি।——এবার শুধু কাঁদলেই চলবে না—কান্নার আওয়াজ কেউ শুনতে পায় না, বাতাসে মিশে যায়, এবার অন্য আওয়াজ তুলতে হবে—বলিষ্ঠ শপথে দীপ্ত অন্য কোনো আওয়াজ যা মানুষকে অসহায় মৃত্যুবরণ থেকে রক্ষা করবে।'

পঁচিশে মার্চের রাত থেকে বাংলাদেশে যখন নির্বিচার হত্যাকাণ্ড শুরু হল, তিনি তখন ঢাকায়। কামরুল হাসান সাহেব পটুয়াদের ("চিত্রশিল্পী'র চেয়ে 'পটুয়া' শব্দটা বেশী তাঁর পছন্দ) নিয়ে আন্দোলনে নেমেছেন বহুবার, স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামের সমর্থনে পথে পথে মিছিল করে বেড়িয়েছেন, পটুয়া সমাজের মুখপাত্র হিসেবে অনেক সভা সমিতিতে ভাষণ দিয়েছেন, সেই সব সভার সচিত্র বিবরণ পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। এছাড়া, শুধু শিল্পী হিসেবেই নয়, সংগ্রামী শিল্পী হিসেবেও তাঁর নাম ডাক আছে। তাই, নিজের বাড়ী থাকা নিরাপদ মনে করলেন না, গা ঢাকা দিলেন। আজ এ বাড়ি, কাল ও বাড়িতে করে লুকিয়ে বেড়িয়ে ফিরলেন বন্ধু বান্ধবদের বাড়িতে। ঢাকা ছেড়েছেন ৪ঠা এপ্রিল। ফরিদপুর হয়ে পদ্মা পেরিয়ে দীর্ঘ পথে পথে অনেক মৃত্যুফাঁদ এড়িয়ে কলকাতায় এসে পৌঁছেছেন গতকাল।

আমার গৃহিণী চা-জলখাবার নিয়ে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়তেই কামরুল হাসান সাহেব থেমে গেলেন। সুগঠিত দেহ, বলিষ্ঠ গড়ন। সঠিক বয়স আন্দাজ করা কঠিন, তবে মনে হয়, চল্লিশের উর্ধে। ভরাট তেজী কণ্ঠস্বর। চায়ের পাট চুকলে তিনি আবার বলতে আরম্ভ করলেন, এবার খানিকটা যেন আত্মগতভাবে।

—'কে কোথায় আছে সকলকে খুঁজে পেতে নিয়ে একজোট হয়ে এখনই আমাদের কাজে নেমে পড়তে হবে। ইসলামকে বাঁচাবার দোহাই দিয়ে পাকিস্তান তার এই জঘন্য গণহত্যার সাফাই গেয়ে বেড়াচ্ছে। পাকিস্তানী সামরিক চক্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে আমাদেরও প্রচারে নামতে হবে, দেরী করলে চলবে না। সারা পৃথিবীর মানুষকে এটা বোঝাতে হবে, বাংলাদেশে ওরা শুধু নিরীহ মানুষই মারছে না, ইসলাম ধর্মের আদর্শকেও ওরা হত্যা করছে। ওরা বলছে, আমরা নাকি দুষ্কৃতিকারী। আমাদের জিজ্ঞাসা, সদ্যোজাত শিশুও কি দুষ্কৃতিকারী? গৃহস্থ বধূও কি দুষ্কৃতিকারী? মসজিদের ইমাম, মন্দিরের পুরোহিত, গীর্জার ধর্মযাজক—তাঁরাও কি দুষ্কৃতিকারী?'

বন্ধুবর উপেন তরফদার কখন যে তাঁর টেপ রেকর্ডারের মাইক্রোফোনটা কামরুল হাসান সাহেবের মুখের কাছে তুলে ধরেছিলেন, লক্ষ্যই করিনি। টের পেলাম, যখন তাঁর কথা শেষ হলে নির্বাক নিস্তব্ধতার মধ্যে খুট করে শব্দ করে উপেনবাবু তাঁর মেশিনটা বন্ধ করে দিলেন। কামরুল হাসান সাহেবের শেষ কথাগুলো তারপরেও অনেকক্ষণ আমাদের বিষণ্ণ মনের ভিতর মহলের কক্ষে কক্ষে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকল—'এতো অন্যায়, এতো অত্যাচার স্থায়ী হতে পারে না, স্বাধীন আমরা হবই।'

সভার কাজ শেষ হলে স্থির হল, শিল্পীরা গান শোনাবেন। গান বাজনার কোন সরঞ্জাম আমার বাড়িতে নেই। কী করি, আমার প্রতিবেশী বিশিষ্ট রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী শ্রী অশোকতরু বন্দোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে হারমোনিয়াম বয়ে নিয়ে এলাম। আর আলমারী থেকে একটা বক্সফাইল টেনে নিয়ে সেটাকেই তবলার বিকল্প করে সংগত করলেন দিনেন্দ্র চৌধুরী। একটি নতুন গান শোনালেন অংশুমান, গৌরীদার লেখা গান, মাত্র কয়েকদিন আগে লিখেছেন আর অংশুমান নিজেই সুর আরোপ করেছেন তাতে। কোথাও কোনো আসরে এ গান

এখনো পর্যন্ত গাননি। আমরা সত্যিই ভাগ্যবান শ্রোতা, একটি অসাধারণ গান প্রথম শুনলাম। উপেন বাবু গানটি রেকর্ড করে নিয়ে গেলেন। তারপর 'সংবাদ বিচিত্রা'য় প্রচারিত হওয়ার সংগে সংগে মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল সেই অবিস্মরণীয় গান :—

'শোন একটি মুজিবরের থেকে
লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি
প্রতি ধ্বনি
আকাশে বাতাসে ওঠে রণি
বাংলাদেশ, আমার বাংলাদেশ।'

মনে পড়ছে, সেদিনকার আসর ভাঙতে দুপুর অনেকটা গড়িয়ে গিয়েছিল। সবাই চলে গেলে স্নানাহারের উদ্যোগ করছি, এমন সময় কলিং বেল আবার বেজে উঠল। দরজা খুলতেই, এবার যে ভদ্রলোকের দেখা পেলাম তিনি বিধান সভা-ভবনের একজন কর্মী, আমার পরিচিত। কিন্তু তাঁর সংগী ভদ্রলোকটিকে চিনতে পারলাম না।

পরিচয় পেয়ে সসম্ভ্রম নমস্কার জানালাম ডক্টর এবনে গোলাম সামাদকে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। সুরেন ব্যানার্জি রোডে ওয়াই, এম, সি, এতে দাদার কাছে উঠেছেন। দাদা—আকবর সাহেবও বিধানসভা-ভবনের কর্মী। ডক্টর সামাদ পড়াশুনো করেছেন ফ্রান্সে। যে কোনো ফরাসীর মতোই ফরাসী ভাষায় তাঁর স্বচ্ছন্দ দখল। আক্রমণের মধ্যেই স্ত্রীকে ফ্রান্সে তাঁর পিতৃগৃহে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছেন। এই পাশবিক দুর্যোগ যতোদিন না কাটে ততোদিন বেগম সামাদ শিশু সন্তানদের নিয়ে সেখানেই থাকবেন। বিকেল পাঁচটা নাগাদ ডক্টর সামাদকে অফিসে আসবার অনুরোধ জানালাম। কারণ, কামরুল হাসান সাহেবও ওই সময়েই আসবেন। উপেনবাবু ইংরেজীতে তাঁর ইণ্টারভিউ নেবেন।

ডক্টর সামাদকে দেখে মনে হল, কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। কিন্তু কামরুল হাসান সাহেবের মনোবল একটুও ভাঙেনি, অন্ততঃ বাইরে থেকে তাঁকে বিন্দুমাত্র বিচলিত দেখিনি। তাই ভাবলাম, হাসান সাহেবের সংগে আলাপ হলে ডক্টর সামাদ হয়তো মনে কিছুটা বল-ভরসা পাবেন। আগেই জেনে নিয়েছি, হাসান সাহেবের সংগে ডক্টর সামাদের চাক্ষুষ পরিচয় নেই, পরিচয় আছে শুধু নামে।

বিকেলে তাঁরা এলেন এবং উপেনবাবুও সাক্ষাৎকার রেকর্ড করলেন। যেসব আত্মীয়স্বজন তখনও বাংলাদেশে রয়েছেন, পাকিস্তানী সামরিক কর্তারা তাঁদের ওপর অত্যাচার চালাতে পারে আশংকা ক'রে দুজনেই তাঁরা নাম গোপন রাখতে অনুরোধ জানালেন এবং তাঁদের সে অনুরোধ রাখাও হয়েছিল। ঠিক মনে করতে পারছি না, সেই দিন কি তার পরদিন, ফরাসী টেলিভিশন সংস্থা এবং ফরাসী সংবাদপত্র "Le Monde" ডক্টর এবনে গোলাম সামাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর অনুরোধে, টেলিভিশন সাক্ষাৎকারের সময়ে এমন কৌশলে ছবি তোলা হয়েছে যাতে কোনো দৃষ্টিকোণ থেকেই তাঁকে সনাক্ত করা না যায়, যান্ত্রিক চাতুর্যে তাঁর কণ্ঠস্বরও কিছুটা বদলে দেওয়া হয়েছে। "Le Monde" পত্রিকাও সাক্ষাৎকারে তাঁর নাম উহ্য রেখেছিলেন।

দু'একদিন পরে, আগড়তলার কোনো একটি আশ্রয় শিবির থেকে কামরুল হাসান সাহেবের ভাইয়ের একখানা চিঠি পেলাম। কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজের কৃতি অধ্যাপক জনাব বদরুল হাসান কপর্দকশূন্য অবস্থায় ভারত ভূমিতে পৌঁছে তাঁর অগ্রজের সন্ধান প্রত্যাশায় আমার শরণাপন্ন হয়েছেন। চিঠি পেয়ে সেই রাত্রেই খালেদদার বাড়িতে ফোন ক'রে কামরুল হাসান সাহেবকে খবরটা জানিয়েছিলাম এবং পরদিন চিঠি খানা তাঁর কাছে পাঠিয়েও দিয়েছিলাম।

ডক্টর এবনে গোলাম সামাদের সংগে আর একবার মাত্র দেখা হয়েছিল, কিন্তু কামরুল হাসান সাহেবের সংগে ট্রামে বাসে বা বিশেষ জমায়েতে পরেও অনেকবার দেখা হয়েছে, কাছে এগিয়ে গেছি, নমস্কার জানিয়ে বলেছি,—'কেমন আছেন ভালো তো?'

মনে পড়ছে, একদিন রাত্রে অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে ট্রামে দেখা হয়ে যেতেই, কুশল প্রশ্ন বিনিময়ের পর জানালাম, হাসান মুরশিদের বইএর প্রচ্ছদ খুব ভাল লেগেছে। শিল্পী কামরুল হাসান সলজ্জ হাসির রক্তিম আভায় মুখ রাঙিয়ে নিরুত্তর থেকেছেন।

শিল্পী কামরুল হাসান জনাব হাসান মুরশিদের লেখা যে গ্রন্থটির প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন সেই গ্রন্থটির নাম 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাংস্কৃতিক পটভূমি।' হাসান সাহেব এবং ডক্টর সামাদ যে কারণে নাম গোপন রাখতে চেয়েছিলেন গোলাম মুরশিদও সেই কারণেই 'হাসান মুরশিদ' ছদ্মনামের আশ্রয় নিয়েছিলেন। একখানা বই লেখক আমাকে উপহার দিয়েছিলেন এবং উপহার নামার গোলাম মুরশিদ স্বনামেই স্বাক্ষর করেছিলেন।

মনে পড়ছে, পঁচিশে মার্চের পর প্রতিটি মুহূর্ত যখন আমরা খবরের জন্য রুদ্ধশ্বাস উৎকণ্ঠায় ছট্‌ফট্ করছিলাম, তখন প্রথম চিঠি পেলাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জনাব গোলাম মুরশিদের কাছ থেকে। পোষ্ট কার্ডে লেখা কয়েক ছত্রের ছোট্ট চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন, 'কলকাতায় আসছি। ঠিকানা রইল। যোগাযোগ করলে খুশি হব।' গোলাম মুরশিদের সংগে সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। অপ্রত্যক্ষ পরিচয়ের সূত্র হল তাঁর সম্পাদনায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য সংসদ থেকে প্রকাশিত কয়েকটি গবেষণামূলক প্রবন্ধের অসামান্য সংকলন গ্রন্থ 'বিদ্যাসাগর'।

মনে পড়ছে, একাত্তরের জানুয়ারীতে কোনো একদিন, অফিসে গিয়ে ডাকে পাঠানো একটি প্যাকেট হাতে পেলাম। প্যাকেটের মোড়ক খুলেই 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থটি পেয়ে আমি প্যাকেটটি নেড়েচেড়ে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম, সবগুলিই ভারতীয় ডাক টিকিট। পশ্চিম বাংলার কোন অঞ্চল যতদূর মনে পড়ছে, বসিরহাট থেকে কেউ পাঠিয়েছেন। কিন্তু 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থটি রাজশাহী থেকে পশ্চিম বাংলার কি করে পৌঁছেছিল, সে রহস্য আজও আমার কাছে অনুদ্‌ঘাটিত।*

---

*রেডিও বাংলাদেশের পাক্ষিক মুখপত্র বেতার বাংলার সৌজন্যে। (প্রথম প্রকাশ কাল, বেতার বাংলা ১৯৭৩, মার্চ ২য় পক্ষ)।

১

পার্থ চট্টোপাধ্যায় · ডেটলাইন ঢাকা

ইণ্টারকণ্টিনেণ্টাল হোটেলের পাশেই ঢাকা রেডিওর অফিস—এতদিন যার নাম ছিল, রেডিও পাকিস্তান। সীমান্তের দুয়ারে যেদিন থেকে কাঁটা পড়ল সেদিন থেকে আকাশবাণী কলকাতা আর রেডিও পাকিস্তান ঢাকাই ছিল দুই দেশের জানালা।—অবশ্য সরকারী কবজায় রেডিও পাকিস্তান বরাবরই ভারত-বিরোধী প্রচারের যন্ত্রে পরিণত হয়েছিল। তার মধ্যে থেকেও যেটুকুর জন্য ঢাকা রেডিও আমরা নিয়মিত খুলতাম, তা হল সুশ্রাব্য এবং সুগীত কিছু সঙ্গীত। কিন্তু ২৫শে মার্চের পর থেকে সেই সব সঙ্গীতও গিয়েছিল বন্ধ হয়ে। তার বদলে শ্রোতাদের দিবারাত্র শোনানো হত পাকিস্তানী সঙ্গীত। ইসলামের দোহাই দিয়ে পূর্ব পশ্চিমকে একসূত্রে গাঁথার দুরূহ প্রচেষ্টা। আর হাস্যকর ভারত বিরোধী প্রচার। যুদ্ধের গতি যখন দুর্বার, যখন মুক্তি ও মিত্রবাহিনী এগিয়ে আসছে তখন ঢাকা রেডিওর ভাড়াটিয়া ঘোষকেরা বলে যাচ্ছেন, পাকিস্তানী বীর জওয়ানদের হাতে কী ভাবে নাজেহাল হচ্ছে তাদের দুশমনেরা।

মার্চ '৭১-এ ঢাকা রেডিও থেকেই আমরা প্রথম শুনেছিলাম শেখ মুজিবুরের বজ্রকণ্ঠ। স্বাধীনতা ঘোষণার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে বেশ কিছুদিনের জন্য ঢাকা রেডিওর ভূমিকা ছিল সংগ্রামী ভূমিকা। তারপর ২৫শে মার্চের ক্র্যাক ডাউন। সামরিক বাহিনীর হাতে চলে গেল রেডিও। ন'মাস পরে যুদ্ধ বিজয়ের পূর্ব মুহূর্তে সামরিক কর্তৃপক্ষ প্রাণভয়ে ঢাকা রেডিও ষ্টেশন বন্ধ করে পালিয়ে যায়। সেদিনটি ছিল ১৫ই ডিসেম্বর।

১৭ই ডিসেম্বর থেকে আবার চালু করা হয় ঢাকা বেতার কেন্দ্র। চালু করেন ঢাকা বেতারেরই কিছু কর্মী।

প্রথমেই তাই ঠিক করে নিলাম ঢাকা রেডিও নিয়ে একটি ষ্টোরি করব। ইণ্টারকণ্টিনেণ্টাল থেকে বেরিয়ে রেডিও ষ্টেশনের সামনে গিয়ে দেখি মুক্তি-বাহিনীর ছেলেরা পাহাড়া দিচ্ছে অফিসের সামনে। পরিচয় দিতেই আমাকে একজন নিয়ে গেল দোতলার অস্থায়ী ষ্টেশন ইনচার্জের অফিসে।

অস্থায়ীভাবে রেডিও ষ্টেশন চালাবার দায়িত্ব নিয়েছেন সাইফুল বারি। তিনি ছিলেন অন্যতম নিউজ এডিটর।

বারি সাহেব শোনালেন ঢাকা বেতার কেন্দ্রের সংগ্রামের দিনগুলির কথা। গত ন'মাস ধরে তিনি ঢাকাতেই ছিলেন। বললেন, ২৫শে মার্চের পর আমাদের বার্তা বিভাগ নিজস্ব প্রতিনিধি পাঠিয়ে কখনও নিউজ কভার করেনি। আমরা শুধু এজেন্সির খবর প্রচার করতাম। এমন কি প্রেস কনফারেন্সে পর্যন্ত যোগ দেইনি আমরা।

ঢাকা বেতার কেন্দ্রের ষ্টেশন ডিরেক্টর ছিলেন আশরাফ-উজ-জামান খান। মার্চের পর সামরিক কর্তৃপক্ষ নিজস্ব বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে ষ্টেশন ডিরেক্টর করে নিয়ে আসেন, নাম তাঁর জিল্লুর রহমান।

রহমান সাহেব এখন কোথায়?

বারি সাহেব বললেন, তিনি আসছেন না। (পরে খবর পেয়েছিলাম, পাক বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতার অপরাধে তিনি গ্রেফতার হয়েছেন)।

আমরা যেভাবে রেডিও ষ্টেশন খুলেছি আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন। আমরা গুটি কয়েক কর্মীই মুক্তিবাহিনীর সহযোগিতায় এখন ষ্টেশন চালাচ্ছি। ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে সামরিক কর্তৃপক্ষ রেডিও ষ্টেশন বন্ধ করে যায়। আমরাও তারপর থেকে আর এদিকে আসিনি। শুধু আমাদের রেডিও ষ্টেশনের ক্যান-টিনের মালিক আজিজ একমাত্র রেডিও ষ্টেশনে ছিলেন।

ঢাকা মুক্ত হবার পর আমরা ঠিক করলাম যে করেই হোক এই মুক্তির খবর ঢাকা রেডিও ষ্টেশন থেকে বিশ্ববাসীকে জানাতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে ওয়াপদার প্ল্যানিং ডিরেক্টর মিঃ নুরুলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হল। যোগাযোগ করলাম আমাদের পূর্বতন রিজিওন্যাল ডিরেক্টর *শামসুল হুদা চৌধুরীর সঙ্গে। রেডিওর ট্রান্সমিশন লাইন মীরপুরে। মুক্তিফৌজের ছেলেরা কিছু ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে গেল

* পরবর্তী কালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একজন প্রাক্তন মন্ত্রী। এই গ্রন্থের লেখক এবং ইনি একই ব্যক্তি নহেন।

ট্রান্সমিশন লাইন চেক করতে। কিন্তু গিয়ে দেখে ক্রিস্টাল নেই। পাকিস্তানীরা করেছিল কি, ক্রিস্টালটা খুলে নিয়ে গিয়েছিল। এটা আমরা জানতাম না।

কি করা যায়। শাহবাগে হাই-পাওয়ার ট্রান্সমিশনের গো-ডাউন আছে। সেখানে ইনষ্টলেশান ইঞ্জিনিয়ার মিঃ আবাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। বললাম, আপনার স্টকে ক্রিস্টাল আছে?

উনি বললেন, আছে।

আমরা বললাম, তাহলে শিঘ্রী চলে আসুন মীরপুরে। তিনি চলে এলেন। ১৭ই ডিসেম্বর বেলা ২টা ৪৮ মিনিটে ঢাকা বেতারের লাইন ঠিক হয়ে গেল। এবার প্রোগ্রামের ব্যাপার। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, যেসব শিল্পী ২৫শে মার্চের পর থেকে রেডিওতে অংশ নিয়েছেন তাদের আপাতত প্রোগ্রাম দেওয়া হবে না। মুক্তিবাহিনীর ছেলেমেয়েরাই আপাতত প্রোগ্রাম করবেন।

২৫শে মার্চের মিলিটারী ক্র্যাক ডাউনের পর আমরা বেশ কিছু রবীন্দ্র সঙ্গীত ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের টেপ মাটিতে পুঁতে রেখেছিলাম। মাটি খুঁড়ে আমরা ছ'টি টেপ বের করলাম। প্রথম দিন পাঁচ ঘণ্টার মত প্রোগ্রামে আমরা মনের আনন্দে রবীন্দ্র সঙ্গীতের রেকর্ড বাজিয়েছি। ২৫শে মার্চ ঢাকা বেতারে শেষ রবীন্দ্র সঙ্গীত হয়েছিল। গতকাল আমরা ঢাকার মুক্ত মাটিতে রবীন্দ্র সঙ্গীত দিয়ে আবার অনুষ্ঠান শুরু করলাম—'তাই তোমার আনন্দ আমি—।'

বারি সাহেবের ঘরে আলাপ হল ঢাকার চলচ্চিত্র অভিনেতা ও প্রযোজক আবদুল মতিনের সঙ্গে। মতিন সাহেব ঢাকা রেডিও থেকে স্ক্রিপ্ট পড়তেন। ২৫শে মার্চের পরও তাঁকে স্ক্রিপ্ট পড়তে বাধ্য হতে হয়েছে। স্ক্রিপ্ট লিখতেন দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক আখতার ফারুক।

ঢাকা বেতার কেন্দ্রের সংগ্রামের ইতিহাস আরও যা সংগ্রহ করেছি তা হল এই: যদিও বেতারের ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ ছিল ষোল আনা, তবু শেখ সাহেবের ডাকে অসহযোগ আন্দোলন যখন শুরু হল তখন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সর-কারের সমস্ত বাঙালী কর্মচারী সেই অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। বেতার কেন্দ্রগুলি সেই প্রথম সরকারী নিষেধের বেড়াজাল ভাঙতে সুরু করে। ৭ই মার্চ শেখ সাহেব রমনা মাঠে যে বক্তৃতা দেন ঢাকা বেতার থেকে তা রীলে করবার জন্য জনসাধারণ চাপ দিতে থাকে। অবশেষে ঢাকা বেতার সিদ্ধান্ত নেন, হ্যাঁ রীলে করা হবে। এ ব্যাপারে তাঁরা তখনও সরকারের কোন অনুমোদন নেননি।

শেষ পর্যন্ত বেতার কর্তৃপক্ষ আশা করেছিলেন যে শেখ সাহেবের বক্তৃতা

প্রচারের অনুমতি সরকারের কাছ থেকে আদায় করা যাবে। সেই মনে করে তাঁরা যথারীতি রীলের ব্যবস্থা রেখেছিলেন।

রমনার মাঠে বেতার ঘোষকরা গিয়েছেন। স্টুডিওতে প্রস্তুতি রাখা হয়েছে। আগে বার বার ঘোষণা করা হয়েছে রিলের কথা। তিনটে বেজে গেছে। ঢাকা রেডিওতে বাজছে দেশাত্মবোধক সঙ্গীত। কিন্তু শেষ মুহূর্তে অনুমোদন পাওয়া গেল না। তিনটে সতের মিনিটে ডিউটি অফিসার আশফাকুর রহমান একটি চিরকুট পেলেন, অধিবেশন বন্ধ করে দিন।

ঢাকা বেতারে তখন গান চলছে,—'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।' গানটি শেষ হল। বেতারের লক্ষ লক্ষ শ্রোতা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন এইবার রীলে শুরু হবে। কিন্তু কিছুক্ষণ বাজল যন্ত্রসঙ্গীত। একসময় থামল। শ্রোতারা শুনলেন ঘোষকের কণ্ঠ—আমাদের অধিবেশন এখনকার মত এখানেই শেষ হল।

না, বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠস্বর সেদিন আর শোনা যায়নি ঢাকা বেতার থেকে। প্রতিবাদে ঢাকা বেতারের কর্মচারীরা একযোগে বেতার ভবন ত্যাগ করে বাড়ি চলে যান। ঢাকায় বিক্ষোভ ফেটে পড়ে। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে সামরিক কর্তৃপক্ষ পরদিন সকালে শেখ সাহেবের বক্তৃতার টেপ বাজাবার অনুমতি দেন।

তারপর আসে ২৫শে মার্চ। মধ্যরাতের দিকে সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী এসে দখল করে নিল ঢাকা বেতার কেন্দ্র। কিছু কর্মী আগেই গা ঢাকা দিয়েছিলেন। কেউ কেউ আটকা পড়লেন বেতার কেন্দ্রের মধ্যে।

পরদিন কিছু কর্মীকে বাড়ি থেকে ধরে আনা হল।

সে সময় চট্টগ্রাম রেডিও থেকে ঘোষণা হচ্ছে—বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম। ২৫শে মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধু তাঁর শেষ নির্দেশ জারি করে দিয়েছেন—বীর বাঙালী অস্ত্র ধর। বাংলাদেশ স্বাধীন কর।

২৫ ও ২৬শে মার্চে প্রচণ্ড হত্যাযজ্ঞের মধ্যেও ঢাকা বেতারের কিছু কর্মী মুক্তি সংগ্রামের ওপর লেখা গানের কিছু টেপ নিয়ে ঢাকা ত্যাগ করে ভারতে পালিয়ে যান। চট্টগ্রাম, রাজশাহী থেকেও বেশ কিছু কর্মী পরে এইভাবে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

সেদিন এইসব বেতার কর্মীরা নিজেদের জীবন তুচ্ছ করে পালিয়ে আসতে পেরেছিলেন বলেই পরবর্তী কালে মুজিব নগরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জন্ম হতে পেরেছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে অর্দ্ধেক এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে এই স্বাধীন বাংলা বেতার। এই স্বাধীন বেতার বাংলাদেশের আশাহত মানুষের বুকে দিনের পর দিন জ্বেলে রেখেছে আশ্বাসের দীপশিখা।

সত্যি কথা বলতে কি স্বাধীন বাংলা বেতারের পথ প্রদর্শক চট্টগ্রাম বেতারের কর্মীরা। ২৫শে মার্চের পর বেলাল মোহাম্মদের পরিচালনায় দশ জনের একটি দল চট্টগ্রাম থেকে সরে গিয়ে কালুরঘাটে প্রথম স্বাধীন বাংলা বেতারের পত্তন করেন। কালুরঘাট পাকিস্তানী দখলে এলে তাঁরা অন্যত্র সরে যান।

২রা মে-র মধ্যে রাজশাহী বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান সংগঠক *শামসুল হুদা চৌধুরী, ঢাকা টেলিভিশনের ঘোষক মনোয়ার, জামিল চৌধুরী, চিত্রশিল্পী কামরুল হাসান, চিত্রাভিনেতা হাসান ইমাম, সাংবাদিক এম, আর, আখতার মুজিব নগরে এসে পৌঁছলেন। আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক আবদুল মান্নানের সঙ্গে তাঁরা আলোচনায় বসলেন কী ভাবে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র তৈরি করা যায়। তাঁরা যোগাড় করলেন ৫০ কিলোওয়াটের এক ট্রান্সমিটার। ইতিমধ্যে ঢাকা বেতার থেকে এসে গেছেন আশফাকুর রহমান, তাহের সুলতান আর টি, এইচ, শিকদার। তাঁরা কেউই খালি হাতে আসেননি, সঙ্গে করে আনেন কিছু না কিছু টেপ।

অবশেষে একটি আবাসিক বাড়িকে স্টুডিও করে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কাজ শুরু হয়েছিল। সেটা ২৫শে মে। ক্র্যাক ডাউনের ঠিক দু'মাস পরে।

এইসব ইতিবৃত্তের মধ্যে হয়তো কিছু কিছু ফাঁক আছে। যে কোন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লেখা দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। যেটা সাধারণতঃ হয়ে থাকে সেটি হল, অনেকের মধ্যেই নিজেকে জাহির করে অপরকে খাটো করার প্রবণতা দেখা যায়। সঠিক তথ্য বাছতে গিয়েও অনেকের নাম বাদ পড়ে যায়। চিরদিন ধরে শুনে এসেছি শোনা কথায় কদাচ বিশ্বাস কর না। কিন্তু আমাদের সাংবাদিকদের চোখের দেখা যেটুকু, শোনা কথা তার চেয়ে তিনগুণ।

কথার মাঝে মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা এসে ঢুকল বারি সাহেবের ঘরে। প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা হবে। বারি সাহেব তাদের সঙ্গে দু'একটি প্রয়োজনীয় কথা সেরে আবার আমাকে নিয়ে পড়লেন।

আপনার কাজের ডিসটার্ব করছি।

না, না, কিছুমাত্র না। বলুন, আর কি জানতে চান।

যারা, ক্র্যাক ডাউনের পরে কাজ করেছেন তাঁরা কি খুব সুখে ছিলেন?

---

*আমার প্রসঙ্গে উল্লেখিত তারিখটি সঠিক নয়। মুজিবনগরে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে আমি যোগাযোগ করতে পেরেছিলাম ১১ই মে '৭১ থেকে। তবে আমি সীমান্ত অতিক্রম করেছিলাম ১৪ই এপ্রিল '৭১।

মোটেই না। কাজ করেও নিস্কৃতি ছিল না। একটু সন্দেহ হলেই গ্রেফতার হতে হতো। আমাদের এ্যাসিস্ট্যান্ট রিজিওন্যাল ডাইরেক্টর নফিজুল হক এভাবে গ্রেফতার হয়েছিলেন। আমাদের আর একজন কর্মী হামিদুল ইসলামকে গ্রেফতার করা হয়েছিল রেকর্ড পাচারের অভিযোগে, টেলিভিশনের প্রডিউসার মইনুল হককেও গ্রেফতার করা হয়েছিল।

কথায় কথায় বেলা বাড়ছে। বারি সাহেব বললেন উঠতে হবে আমাকে।

কোথায় যাবেন?

সেক্রেটারিয়েটে। তথ্য সচিব এসেছেন মুজিব নগর থেকে। মিটিং আছে।

চলুন, আমিও যাব।

সেক্রেটারিয়েটে যাবার পথে গাড়িতে টেলিভিশনের নিউজ এডিটর হুমায়ুন চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন বারি সাহেব। আর একজন সুপ্রতিভ সুদর্শন তরুণ। তিনি বললেন, টেলিভিশনও আমরা খুলে নিয়েছি। দেখেছেন ঢাকার টেলিভিশন?

আমি বললাম, না, টি, ভি, দেখবার সুযোগ ও সময় এখনও হয়নি।

হুমায়ুন জানালেন, মেজর সালেক নামে একজন আর্মি অফিসার টি, ভি, আর রেডিওর ওপর খবরদারি করতেন। উনি আমাদের ডাকতেন চীফ মিসক্রিয়েন্ট বলে।

সেটি ছিল অন্ধকারের যুগ। অপমান হতাশা আর বিষাদে জর্জরিত হবার যুগ। ওঁরা অপেক্ষা করতেন কবে পুরো মেঘ কেটে যাবে। জ্যোতির্ময় সূর্যের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে তাঁদের জীবন।

সেগুনবাগিচায় ঢাকার সেক্রেটারিয়েটে এসে থামলাম। বারি সাহেবকে বললাম, আমি ঘুরে আসছি। আমাকে কিন্তু পৌঁছে দেবেন ইন্টারকণ্টিনেণ্টালে।

সেদিন মুজিব নগর থেকে চীফ সেক্রেটারি এসে পৌঁছেছেন ঢাকায়। যুদ্ধ বিধ্বস্ত শহরের অসামরিক প্রশাসন বলতে তখন কিছুই নেই শহরে। সেক্রেটারি-য়েট বন্ধ। পুলিশী ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। মুক্তিবাহিনী শহরের শান্তি শৃংখলা রক্ষা করছেন।

সেই অবস্থায় মুজিব নগর থেকে ফিরলেন রুহুল কুদ্দুস। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী ছিলেন এই ভদ্রলোক। বাঙালী জাতীয়তাবোধের ধারণায় উদ্বুদ্ধ সি, এস, পি অফিসারদের তিনি অগ্রণী। তাঁর ওপর সামরিক বাহিনীর কোপ ছিল সর্বাধিক। আত্মগোপন না করলে তাঁকেও নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হত।

মুজিব নগর থেকে রুহুল কুদ্দুস বাংলাদেশ সরকারের চীফ সেক্রেটারি হিসাবে কাজ করেছেন এতদিন।

সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংএ দেখলাম পুলিশ ও প্রশাসনিক অফিসারদের ডাকা হয়েছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর জেনারেল বি, এন, সরকার বাংলাদেশ অফিসার-দের সঙ্গে মিটিং করছেন। কী ভাবে দ্রুত অসামরিক প্রশাসন চালু করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা।

বৈঠকের শেষে রুহুল কুদ্দুসকে জিজ্ঞাসা করলাম। বৈঠকের ফলাফল বললেন, কাল থেকে সেক্রেটারিয়েট খুলছে। রবিবারেও কাজ হবে পুরোদমে। শহরের শান্তি রক্ষার কাজে ইণ্ডিয়ান মিলিটারিরাও সাহায্য করবেন।

সেক্রেটারিয়েটের চত্বরে অপেক্ষা করছি। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বারি সাহেবের দেখা নেই। শুনতে পাচ্ছি চারিদিক থেকে গুলির আওয়াজ। রোজ সন্ধ্যা হলেই এই আওয়াজ হয় এখনও, ইতস্ততঃ গুলি চলে। বহু লোকের হাতে অস্ত্র। কেউ ছোঁড়ে মজা করার জন্য। কেউ বিশেষ মতলবে।

কিন্তু যাব কি করে, ইণ্টারকণ্টিনেণ্টালের রাস্তায় রিক্শা এখনও বের হয়নি। যানবাহন বলতে কিছু নেই। পথও অচেনা। মুশকিলে পড়লাম। এমন সময় দেখি তথ্য সচিব নামছেন। পরিচয় দিয়ে বললাম, জায়গা হবে গাড়িতে?

না। লোক আছে। বেরিয়ে গেল তাঁর গাড়ি।

আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দেখি বারি সাহেব আর হুমায়ুন সাহেব আসছেন। আমাকে দেখে বললেন, এখনও দাঁড়িয়ে আছেন?

আপনারা না এলে সারারাত দাঁড়িয়ে থাকতে হত।

চলুন, চলুন। তাঁরা গাড়িতে তুলে নিলেন আমাকে।

কী হল মিটিংয়ের?

ডিসিসন হয়েছে প্রোগ্রাম বন্ধ রাখতে হবে। স্বাধীন বাংলা রেডিওর লোকজন ফিরবেন শীঘ্রি। আপাতত এখানকার রেডিও ও টেলিভিশন প্রোগ্রাম বন্ধ।

মনে মনে ভাবলাম, হয়তো সরকার আশঙ্কিত যে রেডিও টেলিভিশনের মত শক্তিশালী প্রচার যন্ত্র বেসরকারী ব্যক্তিদের হাতে যাওয়া উচিত নয়। তাছাড়া দেশের অভ্যন্তরে সকলেই এখন সশস্ত্র।

রাতে হোটেলে ফিরতেই পণ্ডিত এক চাঞ্চল্যকর খবর দিল। চারজন দালালকে প্রকাশ্যে বিদ্ধ করা হয়েছে রমনার মাঠে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, টাঙ্গাইলের বাঘা সিদ্দিকীর মিটিং ছিল আজ। এই মিটিংয়েই চারজনকে লিঙ্ক করা হল। বিদেশী সাংবাদিকরা, টি, ভি. ক্যামেরাম্যানরা সবাই দৃশ্যটি দেখেছেন।

বাঘা সিদ্দিকির নাম আগেই শুনেছিলাম। টাঙ্গাইলে তিনি গড়ে তুলেছেন গেরিলা বাহিনী। তাঁর বাহিনী টাঙ্গাইলকে মুক্ত করেছে অনেক আগেই। ভারতীয় বাহিনীকে পথ দেখিয়ে তিনিই নিয়ে এসেছেন ঢাকা পর্যন্ত।

সেই বাঘা সিদ্দিকীকে দেখতে পেলাম না। মনটা খারাপ হয়ে গেল।

কিন্তু এক মাঘে শীত যায় না। তাঁকে দেখেছিলাম আরও পরে।*

*কোলকাতা থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা 'প্রসাদ' এর সৌজন্যে (১৩৭৯ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা)।

অন্তরঙ্গ আলোকে

আবু মোহাম্মদ আলী বলছি

আলী যাকের

"আলোর ভুবন ভরা"। যে দিকে তাকাই মুক্তির আলোর বন্যা। ঢাকার ছায়াঘেরা অর্জুন আর অশোক শোভিত বীথি দিয়ে অথবা নিয়নশোভিত কোন পিচমোড়া রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে অকারণেই মনটা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে। মুক্ত বাতাসে গাঢ় নিশ্বাস নিয়ে উচ্ছ্বাসে গুণগুণিয়ে উঠি --

"একবার তোরা মা বলিয়া ডাক
জগতজনের শ্রবণ জুড়াক"।

হঠাৎ—হ্যাঁ হঠাৎই কেমন শূন্য ঠেকে কয়েক মুহূর্তের জন্য। কোথায় যেন হারিয়ে ফেলি নিজেকে।

অনেকটা একই মানসিকতায় ভুগছিলাম একাত্তরের মার্চ মাসে যখন হানাদার বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নিরস্ত্র ঢাকা বাসীর ওপর। রাজারবাগে পঁচিশে মার্চ স্বাধীন বাংলার গান ছাপিয়ে যখন অনেকগুলো নিরীহ প্রাণ আত্মাহুতি দিলো বুলেট আর শেলের পৃথিবীতে, সেই তখন এক রাতের নরক বাসের পর ভবিষ্যতের কর্মপন্থা ঠিক করতে করতে একই রকম শূন্য ঠেকছিল আমার।

তারপর? বিশ্বাস করুন আর নাই করুন স্বাধীনতা আন্দোলনের কয়েক মাস কোথাও তারিখ লিখতে হলে কেবল মার্চ মাস বেরিয়েছে আমার কলম থেকে।

পঁচিশে মার্চে আমার—আমাদের জীবনে দিনগুলি থেমে গিয়েছিল যেন। পঁচিশে মার্চ রাত্রি এগারোটায় বাংলার মানুষের জীবনের একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি। ১৬ই ডিসেম্বর বিকেল চারটে, আরেকটি অধ্যায়ের শুরু। এর মাঝের অধ্যায়টি "ভরা থাক নিরেট অশ্রুবিন্দু দিয়ে।"

কিন্তু এই অশ্রুবিন্দুই গত নয় মাসের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে রূপান্তরিত হয়েছে মুক্তোয়। সংগ্রামের, ত্যাগ-তিতিক্ষায় গাঁথা স্বাধীনতার মুক্তোর মালা।

আবাল্য সঙ্গী ঢাকা শহর ছেড়ে চলেছি—হয়তো, হয়তো এ জীবনে আর আমার ঢাকা দেখা হবে না। ২৭শে মার্চ অর্গলমুক্ত বন্যার স্রোতের মত ছুটছে মানুষ। জীবনের অন্বেষণে মৃত্যুর দুয়ার থেকে পলায়ন।

শীতলক্ষ্যায় নৌকায় ট্রানজিষ্টারের কাঁটা ঘুরাতে ঘুরাতে হঠাৎ কানে এলো, "আমি মেজর জিয়া বলছি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নির্দেশে আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি, চট্টগ্রাম মুক্ত—আমরা ঢাকার দিকে এগুচ্ছি। আপনারা আশাহত হবেন না।" হঠাৎ চমকে উঠলাম। ইতিহাসের পাতায় পাতায় অতীতের অধ্যায় চোখের সামনে ভেসে উঠলো, "আমি সুভাষ বলছি"। ভারতের অবিসংবাদিত নেতাজী এই ভাবেই এক সময় ভারতবাসীর মনে জাগিয়েছিলেন আশার স্ফুরণ।

ঢাকা ত্যাগের উদ্যত অশ্রু চেপে উন্মুখ হয়ে শুনলাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ডাক। মন স্থির করলাম। সব শেষ নয়, কেবল শুরু।

তারপর অনেক ঘটনা—অনেক দুর্ঘটনার মধ্যে দিয়ে, অনেক জলপথ—জনপদ ছাড়িয়ে, অনেক মৃত্যুর সান্নিধ্যে—মৃত্যুভয়ের জগতে অবগাহন করে অবশেষে বাংলা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেবার মহান সুযোগ এলো আমার মত এক সাধারণ প্রাণের ভাগ্যে।

মনে আছে আমার এক বিদেশী সাংবাদিক বন্ধু একবার আমার ঠাট্টা করে বলেছিলেন, "Oh you are the Goeble of Bangladesh" তুমি বাংলাদেশের গোয়েবলস। উক্তিটা factually মিথ্যে। কারণ জার্মানীর গোয়েবলসের মত আমি বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে স্নায়ু যুদ্ধের পুরোধা ছিলাম না। আমি ছিলাম ঐ যুদ্ধের একজন নগণ্য কর্মী কেবল। আর, এর থেকেও বড় কথা হল, আমি আর দশটা সভ্য জগতবাসীর মতই ফ্যাসিবাদ বিরোধী।

তবে, একথা অনস্বীকার্য যে, যে কোন যুদ্ধে "স্নায়ু যুদ্ধ" বিভাগটি শক্তিশালী না হলে যুদ্ধে জয়লাভ করা সুদূর পরাহত হয়ে পড়ে। বিশেষতঃ আমাদের যুদ্ধের ঝুঁকি-ঝুকি প্রক্রিয়া স্বভাবতঃই আমাদের প্রচার বিভাগকে শক্তিশালী করতে বাধ্য করেছিল। প্রথমতঃ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে আমাদের গণচেতনামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করতে হ'ত দখলীকৃত এলাকার অধিবাসীদের অনুপ্রেরণা জোগাতে, মুক্তিযুদ্ধের খবর প্রচার করতে হ'ত এবং মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহ ও আনন্দ দানের চেষ্টা করতে হ'ত। দ্বিতীয়তঃ আন্তর্জাতিক এবং অবাঙালী শ্রোতাদের জন্য বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের প্রেক্ষিতে কিছু কিছু বৃহৎ শক্তির কূপমণ্ডুকতা সম্পর্কে আলোচনা পরিবেশন করতে হ'ত ও plain truth জাতীয় পাকিস্তানী অপপ্রচারের যথাযোগ্য জবাব দেবার চেষ্টা করতে হ'ত।

ইংরেজী বিভাগে আমার স্থান নির্দেশিত হল। আমরা দুজন। আহমেদ চৌধুরী (আলমগীর কবির) এবং আমি আবু মোহাম্মদ আলী (আলী যাকের)।

প্রতিদিন বাংলাদেশ সময় রাত আটটায় আপনারা অনেকেই হয়তো শুনেছেন, We are calling on 361. 44 metres medium wave 830 kilo cycles per second. This is Radio Bangladesh. Programme for our listeners, Overseas. তারপর রাজনৈতিক ভাষ্য, পৃথিবীর বিভিন্ন সংবাদপত্রের মতামত এবং পরিশেষে সঙ্গীত। সপ্তাহে দু'দিন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরাসরি টেপকৃত ইন্টারভিউ অথবা কোন বিদেশী, সাংবাদিক এবং রাজনীতিকের সাক্ষাৎকার। আমরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সাথে এইসব অনুষ্ঠান প্রযোজনা করতাম।

যুদ্ধ বেতার—কাজেই সব কাজই আমাদের নিজেদের করতে হত। ভয়েস অব আমেরিকা, বি, বি, সি, রেডিও পিকিং, আকাশবাণী, রেডিও মস্কো, রেডিও পাকিস্তান শোনা এবং (প্রায়শঃই) টেপ করা, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পত্রপত্রিকা জোগাড় করা, যুদ্ধক্ষেত্র ভ্রমণ করা এবং এসব মাল-মসলার ওপর নির্ভর করে রাজনৈতিক ভাষ্য (political commentary), আন্তর্জাতিক পত্র-পত্রিকার মতামত ও 'naked truth' (এ অনুষ্ঠানটি plain truth কে প্রতিরোধ দেবার জন্যে শুরু করেছিলাম) লেখা এবং পড়া। অর্থাৎ ইংরেজী Overseas Service এর সম্পূর্ণ দায়িত্বই ছিল আমাদেরই উপর। পরবর্তী কালে এই বিভাগে এসেছিলেন ঢাকার তরুণ আইনজীবী মওদুদ আহমেদ। ইনি জাকির আখতার নামে এই বিভাগ থেকে সংবাদ ভাষ্য প্রচার করতেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম জাতির উদ্দেশ্যে যেসব বেতার ভাষণ দিতেন তার ইংরেজী অনুবাদ করে পড়ার কাজও ছিল আমার ওপর ন্যস্ত। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিন আহমদের বেতার ভাষণের ইংরেজি অনুবাদও আমাদের পড়তে হত।

একাত্তরের ন'মাসে আমি কম পক্ষে শ'পাঁচেক রাজনৈতিক ও সংবাদ ভাষ্য লিখেছি। এই নিবন্ধে সেগুলির কয়েকটির কথা এখানে উল্লেখ করছি:

যেমন "Unique Revolution" শীর্ষক একটি ভাষ্যে আমি লিখেছিলাম: বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ প্রকৃতিগত ভাবে অভূতপূর্ব। কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমি বলেছিলাম: পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে যে স্বাধীনতা যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে তার পেছনে কোন প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ কারণ এককভাবে কাজ করেছে। যেমন ধরুন সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পেছনে ছিল সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের প্রশ্ন এবং অর্থনৈতিক শোষণ মুক্তির চেতনা। ভিয়েতনামের ব্যাপারেও তাই ঘটেছে। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে আমরা দেখতে পাই একাধিক চেতনার সংঘবদ্ধ উপস্থিতি—

যেমন আঞ্চলিক জবরদখল, সাংস্কৃতিক দমন নীতি, অর্থনৈতিক শোষণ, এক নায়কত্বের অবসান, ভাষার অপনোদন। এইসব কারণে বাংলাদেশের বিভিন্ন শ্রেণীর আওতাভুক্ত জনগণ স্বাধীনতার প্রশ্নে ঐক্য এবং সংহতি বজায় রেখেছিলেন। তাই আমরা দেখি বাঙালী উচ্চপদস্থ আমলা, বেসরকারী কর্মচারী, ব্যবসায়ী,কৃষক, মজুর, পুলিশ এমনকি মিলিটারী অফিসাররা পর্যন্ত ঐ সংগ্রামে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছেন।

আবার হালকা রসিকতাময় ভাষায়ও আমরা প্রচার করেছি অনেকবার। যেমন, আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন যখন চরমলগ্নে পৌছল তখন আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক মঞ্চে শুরু হল Ping Pong diplomacy র দৌরাত্ম্য। চীন তার নীতি-নৈতিকতায় জলাঞ্জলি দিয়ে মার্কিন প্রেমে গদগদ হয়ে উঠলো। স্বাধীন বাংলা বেতারের ইংরেজী অনুষ্ঠানে প্রচারিত হল "আন্তর্জাতিক রঙ্গমঞ্চে একটি পরিণয় সংঘটিত হতে চলেছে।" আমি লিখেছিলাম, "The groom is fair, tall and volatile and the bride is short, yellow and insolent". O. B. অর্থাৎ Outstation Broadcasting এর কাজ সর্বাপেক্ষা উত্তেজনা-পূর্ণ হত। রণক্ষেত্রের হৃদয় হতে প্রচার করা হত Sector অথবা Sub-Sector এর Commander দের সাথে সাক্ষাৎকার। চারদিকে তখন গোলা-বারুদ, রক্ত-মৃত্যুর বেসাতি।

এইভাবে চলেছিল আমাদের প্রতিটি দিন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সাথে সংযুক্ত প্রত্যেক কর্মী গড়ে ১২ থেকে ১৪ ঘন্টা পরিশ্রম করত প্রতিদিন।

উন্মুখ হয়ে থাকতাম আমরা যুদ্ধক্ষেত্র অথবা আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সফলতার প্রশ্নে।

এর মধ্যেই এলো স্বাধীনতা---স্বীকৃতি। আমার মনে আছে সেইদিনের কথা যেদিন ভারত আমাদের স্বীকৃতি দিলো, সেদিন কি আনন্দ উত্তেজনা। আমরা শিশুর মত হয়ে গিয়েছিলাম আনন্দের আতিশয্যে।

আজ স্বাধীন বাংলা বেতারের কথা লিখতে বসে ঐ শূন্যবোধ ফিরে আসছে বারবার। আমার মনে হচ্ছে আমি অপরাধী। কই, মায়ের ডাকে জীবনতো দিতে পারলাম না ? কত লক্ষ বীর সন্তান ধন্য করেছে বাংলার মাটিকে তাঁদের রক্তের পবিত্রতায়, আমি কেন তাঁদের একজন হতে পারলাম না ?

আর শূন্য বোধ হচ্ছে আমার শ্রোতাদের কথা ভেবে। অনেক অদেখা শ্রোতাকে নিজের কল্পনার রঙে আপন করে রাঙিয়েছিলাম। তাঁদের আমি চিনি না, তাঁরা আমায় চেনেন না। কিন্তু রেডিওর মাউথপিসে মুখ রেখে তাঁদের আমিতো

আত্মীয়ই ভাবতাম। "And with that we end our English Language programme for today. This is your host Abu Mohammad Ali saying good night, JAI BANGLA"।

আবু মোহাম্মদ আলীর সমাপ্তি হয়েছে সমাপ্তি হয়েছে জামিল আখতার ও আহমেদ চৌধুরীর। এখন আমরা স্বাধীন বাংলার নতুন নামে, নতুন সংগ্রামে উদ্যোগী হব। এই সংগ্রাম দেশ গড়ার। এই সংগ্রাম জীবন দর্শনের। এই সংগ্রাম আত্মজিজ্ঞাসার।*

---

*শহীদুল ইসলাম সম্পাদিত 'শব্দ সৈনিক' সংকলনে প্রথম প্রকাশ। নিবন্ধকার কর্তৃক সংকলিত।

জল্লাদের দরবার—

সৃষ্টি যেখানে পেলো হৃদয়ের তাগিদ

কল্যাণ মিত্র

চারিদিকে তখন মৃত্যু ধাওয়া করে ফিরছে জীবনকে। শিকারী কুকুরের মতো মাটি শুঁকতে শুঁকতে এগিয়ে আসছে পাকিস্তানের বর্বর হানাদার বাহিনী। বাংলার চতুর্দিকে শুধু রক্ত---মৃত্যু—বারুদের সোঁদা গন্ধ আর স্বজনহারা, সর্ব-হারাদের বুক ফাটা কান্না। জল্লাদ ইয়াহিয়া খানের হার্মাদ ফৌজের বুলেটে যখন আকাশ মাটি প্রকম্পিত--নিরস্ত্র বাঙ্গালীর আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার হৃৎপিণ্ড উপড়ে আনছিলো, নারীর ইজ্জত লুট করা হচ্ছিল নিষ্ঠুরভাবে---'৭১-এর সেই দুঃসময়ে স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পরবাসী হলাম। আমার নামে তখন গ্রেফতারী পরোয়ানা। আমার অপরাধ আমি বাঙ্গালী বিশেষ করে স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন সামান্য সৈনিক।

বাংলাদেশের সূর্যসৈনিকেরা যখন স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে লিপ্ত, তখন অনিশ্চিত ভবিষ্যতকে সামনে নিয়ে শরণার্থী হলাম। দিনের পর দিন শুধু হতাশা আর আর্থিক সমস্যার আবর্তে নিজের সত্ত্বাকে হারিয়ে ফেলেছি মনে হলো। বিশাল জনসমুদ্রের মাঝে একটা অবলম্বন খুঁজছি—ঠিক এমনি সময়ে হাসান ইমাম ও জহির রায়হান সাহেবের সঙ্গে দেখা। তাঁরা আমার দিকে সহযোগিতার হস্ত

বাড়িয়ে দিলেন। আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। হাসান ইমাম সাহেব জানালেন খুব শীঘ্র 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের' পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠান শুরু হবে।

জাতির ঐ ক্রান্তি লগ্নে নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকা একটি চরম লজ্জার ব্যাপার মনে করলাম। একটা কিছু করতে হবে। প্রতিটি বাঙ্গালীর জীবনকে শাণিত তরবারির মতো গড়ে তুলতে হবে। একটি মশাল থেকে লাখো মশাল জ্বালতে হবে।

একদিন কলকাতার বাংলাদেশ দূতাবাসে আমিনুল হক বাদশার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। সে আমাকে নিয়ে গেল আওয়ামী লীগের এম, এন, এ ও বিশিষ্ট নেতা জনাব আবদুল মান্নান সাহেবের কাছে। তিনি তখন প্রেস, তথ্য, বেতার ও ফিল্ম-এর দায়িত্বে নিয়োজিত। জনাব মান্নান আমাকে স্বাগত জানালেন—সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন। পরবর্তীকালে আমি তাঁর সহযোগিতায় উপকৃত ও কৃতজ্ঞ।

'৭১-এর জুলাইর প্রথম সপ্তাহে আমিনুল হক বাদশা আমাকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে নিয়ে গেলেন। দেখলাম পূর্ব বাংলার বেশ কয়েকটি বেতার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত কতো কবি, সঙ্গীত শিল্পী, অভিনেতা, যন্ত্রী, লেখক ও কর্মী-কুশলীবৃন্দ স্বাধীন বাংলা বেতারের দ্বি-তল কক্ষে একটা বালিশ আর সতরঞ্চি সম্বল করে ভবিষ্যতের শুভ দিনের প্রত্যাশায় নিজেদের সর্বশক্তি দিয়ে জল্লাদ বাহিনীর বিরুদ্ধ সংগ্রামে রত। এদের হাতিয়ার লেখনী আর কণ্ঠ। গর্বে, আনন্দে আমার বুকটা ভরে গেল। আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান হলাম। বাংলার এইসব সূর্য সৈনিকদের ত্যাগ, আত্মবলিদান বৃথা যাবে না। এই প্রত্যয় নিয়ে ঘরে ফিরে এলাম। পরের দিন হঠাৎ বাংলার প্রথিতযশা নট রাজু আহমেদ আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। তার সঙ্গে প্রসেনজিৎ বোস। আবেগে, আনন্দে আমরা একে অপরকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। এ যেন আমাদের পুনর্জন্ম। কত কথা, কত স্মৃতি আজও বুকের নিভৃত থেকে ভেসে ওঠে।

রাজু বলল, আপনাকে স্বাধীন বাংলা বেতারের জন্যে কিছু লিখতে হবে। আমার মানসিক প্রস্তুতির কথা তাকে জানালাম। শুধু সুযোগের প্রতীক্ষায় আছি। চতুর্দিকে ছুটে বেড়াচ্ছি। রাজু বললে, সেই ব্যাপারেই এসেছি। আপনি কালই শামসুল হুদা চৌধুরীর সাথে দেখা করুন। তিনি আপনাকে দেখা করতে বলেছেন।

শামসুল হুদা চৌধুরী সাহেব আমার পূর্ব পরিচিত ও আমার শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে অন্যতম। চৌধুরী সাহেব এসেছেন শুনে আনন্দিত হলাম এবং আশান্বিতও হলাম।

পরের দিন স্বাধীন বাংলা বেতারের দ্বিতলের একটি ছোট্ট কক্ষে চৌধুরী সাহেবের দেখা পেলাম। তিনি বললেন, আমি আপনারই প্রতীক্ষায় আছি। বেতারের জন্য ধারালো, শাণিত স্ক্রিপ্ট চাই। আমার বিশ্বাস আপনি আগুন ঝরাতে পারবেন।'' আমি তাঁকে পূর্ণ, সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিলাম। তাঁকে আরও জানালাম, আমার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে পশুশক্তির গায়ে যদি একটা ছোট্ট চিমটিও কাটতে পারি—তাতেও আমি গর্ব অনুভব করবো।

জনাব চৌধুরী জানালেন, বেতারের জন্য রাজনৈতিক ব্যঙ্গ জীবন্তিকা চাই। বলিষ্ঠ বক্তব্য এবং শাণিত সংলাপ রচনা করতে হবে। যার মাধ্যমে একদিকে হানাদার বাহিনীর বিবেককে আঘাত করতে হবে—অন্যদিকে বাংলার মানুষকে মুক্তিযুদ্ধে প্রেরণা জোগাতে হবে। তিনি তাঁর পরিকল্পনার একটা আউট লাইন আমাকে দিলেন এবং দুদিনের মধ্যে স্ক্রিপ্ট রচনা করে তাঁর কাছে পৌছে দেবার গুরুদায়িত্ব আমাকে দিলেন। বললেন এই স্ক্রিপ্ট অভিনয় করার জন্য তিনি কিছু শিল্পীও নির্বাচন করেছেন। তাঁদের মধ্যে মুখ্য চরিত্রে রাজু আহমেদ থাকবেন।

এক রাশ চিন্তা নিয়ে বাসায় ফিরে গেলাম। আজও মনে পড়ে জল্লাদের দরবারের জন্ম কাহিনী। গৃহহারা, স্বজনহারা, সর্বহারার বেদনার মাঝে বুকেতে আগুন জ্বলছে।

সারারাত শুধু চিন্তা, এলোমেলো চিন্তা। কোন টাইপের স্ক্রীপ্ট করবো, কি ধরনের উপস্থাপনা, কি ধরনের বক্তব্য রাখবো আর কি ধরণেরই বা চরিত্র-গুলোকে রং মাখিয়ে জন্ম দেবো। অনেকগুলি চরিত্র স্কেচের মাঝে হঠাৎ করেই প্রথমে দুর্মুখ খানের চরিত্রের জন্ম দিলাম। একজন সত্যান্বেষী অথচ সেই হচ্ছে বিবেক। পরবর্তীকালে কেল্লাফতে খান, নবাবজাদা ও অন্যান্য চরিত্রের জন্ম হলো। আমি জানতাম, রাজুর কণ্ঠে কি ধরনের সংলাপ মানুষের মনকে স্পর্শ করবে। ঠিক সেই ধাঁচের সংলাপ দিয়ে প্রথম স্ক্রিপটি আমি শামসুল হুদা চৌধুরী সাহেবের হাতে তুলে দিলাম। তিনি আনন্দিত হলেন।

কয়েকদিন পরে শুনলাম, জীবন্তিকাটি নাকি চৌধুরী সাহেবের মনোমত হয়েছে এবং তিনিই জীবন্তিকাটির নামকরণ করেছেন ''জল্লাদের দরবার''।

'৭১ এর ১১ই জুলাই রাত্রে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ইথারের বুকে ছড়িয়ে দেওয়া হলো ঐতিহাসিক 'জল্লাদের দরবারের' অভিনয়। গোটা বাংলাদেশের শ্রোতৃমণ্ডলীর অন্তরের গভীরে স্থান পেলো এই স্মরণীয় জীবন্তিকা।

এরপর ধারাবাহিকভাবে *'জল্লাদের দরবার' রচনার দায়িত্ব দেওয়া হলো আমাকে। প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ দু'টি স্ক্রিপট আমাকে লিখতে হতো। এক-ঘেঁয়েমীর ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে নতুন চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আমাকে প্রায় ষাটটি স্ক্রিপট রচনা করতে হয়েছিল। সব সময়েই আমি জনাব চৌধুরী, অভিনেতা ও কলাকুশলীবৃন্দ ও শ্রোতৃমণ্ডলীর মতামত ও সুচিন্তিত নির্দেশ গ্রহণ করতাম। প্রতিদিন বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে তাজা খবর সংগ্রহ করে তার ওপর কাহিনী দাঁড় করাতাম। সেই সঙ্গে থাকতো আগামী শুভদিনের নিশ্চয়তা। এতো উৎসাহ ও হৃদয়ের তাগিদ আমি অন্য কোন রচনার ক্ষেত্রে পাইনি। ভাল লাগতো খুব ভালো লাগতো, বিশেষ করে যখন শুনতাম বাংলাদেশের মানুষ শত্রুপক্ষের কান বাঁচিয়ে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই অনুষ্ঠান নিয়মিত শুনে থাকেন। তখন গর্বে, আনন্দে আমার বুক ভরে যেতো। জানিনা, বাংলার সেই দুঃসময়ে জল্লাদের দরবার স্বাধীনতা যুদ্ধে কতটুকু প্রেরণা জোগাতে পেরেছে। ইতিহাস তার বিচার করবে।

আমার সৃষ্ট চরিত্রের সার্থক রূপায়ন ও পরিবেশনা আমার সৃষ্টিকে সার্থক করেছিল। শৃঙ্খলিত ছিল জন্মভূমি। মায়ের শৃঙ্খল মোচনের সংগ্রামে প্রতিটি শিল্পী সেদিন সৈনিকের ভূমিকা নিয়েছিলেন। এইসব কণ্ঠসৈনিকদের দুর্বার আঘাতে সেদিন পিণ্ডি আর ঢাকার রাজ দরবার কেঁপে উঠেছিল, যা বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

"জল্লাদের দরবার" রচনার ক্ষেত্রে জনাব শামসুল হুদা চৌধুরীর সহযোগিতা আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি। জনাব আবদুল মান্নান সাহেবের ঋণও অ-পরিশোধ্য। আর যেসব সংগ্রামী শিল্পী সেদিন 'জল্লাদের দরবারে" সার্থক অভিনয় করে বাংলার মুক্তি সংগ্রামে প্রেরণা জুগিয়েছিলেন, তাঁদের জানাই আমার আন্তরিক সংগ্রামী অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা।

---

*ঠিক একই সময়ে খ্যাতনামা চলচ্চিত্র প্রযোজক মিঃ নারায়ণ ঘোষকেও ভিন্নভাবে ভার দিয়েছিলাম এমনি একটি জীবন্তিকা রচনার জন্য। তিনিও যথা-সময়ে আমার হাতে একটি পাণ্ডুলিপি জমা দিলেন। আশ্চর্যজনক ভাবে লক্ষ্য করেছি যে আমার মূল বিষয় বিধৃতিতে উভয়েই প্রায় সমান পারদর্শিতা দেখাতে পেরেছিলেন। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলাম কল্যাণ মিত্রের পক্ষে। নারায়ণ ঘোষ থাকলেন অন্যতম প্রধান চরিত্র 'দুর্মুখ' এর ভূমিকায়। উল্লেখ্য যে মিঃ নারায়ণ ঘোষ উপস্থাপিত পাণ্ডুলিপিটিও 'জল্লাদের দরবার' শিরোনামে পরবর্তী সপ্তাহ অর্থাৎ ১৮ই জুলাই '৭১ প্রচার করেছিলাম।

জল্লাদের দরবারের বিভিন্ন চরিত্রে যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তাঁদের মধ্যে *রাজু আহমেদ, নারায়ণ ঘোষ (মিতা), নাজমুল হুদা মিঠু, প্রসেনজিৎ বোস, অমিতাভ বোস, জহুরুল হক, ইফতেখারুল আলম, বুলবুল মহালনবীশ, করুণা রায় প্রমুখ।

জানিনা ইতিহাস সেই সংগ্রামী অতীতকে যথার্থভাবে নিজের বুকে ঠাঁই দেবে কিনা। আমার বিশ্বাস সত্য সূর্যের আলোর মতো। তাই ইতিহাস অবশ্যই তার নিজের পথ ধরেই চলবে।

---

*জল্লাদের দরবারের মুখ্য চরিত্র কেল্লা ফতেহ্ আলী খানের চরিত্রে অভিনয় করে বিস্ময়কর আবেদন সৃষ্টি করেছিলেন শিল্পী রাজু আহমেদ। আমাদের দুর্ভাগ্য যে একাত্তরের এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী সংগ্রামী শিল্পী স্বাধীনতা প্রাপ্তির মাত্র বৎসর কাল পরে ১৯৭২ সালের ১১ই ডিসেম্বর আততায়ীর গুলিতে শাহাদত বরণ করেছেন। (ইন্নালিল্লাহে----রাজেউন)।

পরিত্যক্ত স্মৃতি

অনু ইসলাম

১৯৭১ সালের এক বিষণ্ন সন্ধ্যায় কলকাতার পার্ক সার্কাসের নির্জন গৃহে একাকী বসে আছি। পাশের বাড়ির মেয়েটার দিকে আজ আর দৃষ্টি নেই। নিষ্প্রভ দৃষ্টি খুঁজে বেড়ায় এক অভাগী বোনের গুলি খাওয়া দেহটাকে। না এত অশ্রু কোথায় রাখি। এত বেদনা আমার কাকে বলি।

এক বুড়ো লোক হাতে ধরা এক কিশোর। অন্য হাতে বহু ব্যবহৃত জীর্ণ-শীর্ণ একটি মাদুর। এসেছেন মাটিতে শুয়ে একটি রাত আমার অতিথি হবার বাসনা নিয়ে। স্মৃতির ভাণ্ডারে আজো ভুলিনি কুষ্টিয়ার ডেপুটি কমিশনার শামসুল হক সাহেবের সেই মুখ।

জয়বাংলা পত্রিকা ছিল সে সময়কার সরকারের মুখপত্র। সে মাসের ঐতি-হাসিক দিনে কলকাতার লক্ষ জনতার ভীড়ে ভরা একটি কাপুরুষ মুখ যেন

চেতনার সন্ধান খুঁজে পেল। শুরু হলো পার্কসার্কাসের জীবন। জীবন মানে তেলাপোকা ইঁদুরের খাবার খেয়ে স্বপ্ন দেখতাম নতুন দেশের,—যে দেশে সোনা ঝরবে ভোরের রোদ ঝলমল কুড়ে ঘরের ছাদে অথবা কিশোরীর রূপোলী স্বপ্নে।

পার্ক সার্কাসের তিন কামরার ঐ কক্ষে অফিস ও গণসংযোগ বিভাগ ছিল। মুক্তিযুদ্ধে গিয়ে ঐ অফিসে যেতে হয়নি কিংবা দেখেনি এমন মানুষ নগণ্য হবে। জয়বাংলা অফিসের সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য হিসাবে একটি পত্রিকার এ হেন কাজ নেই যে করিনি। উপরন্তু আজকে দেশে এমন শীর্ষে অনেকে বসে আছেন যাঁদের আতিথেয়তার জন্যে চা-সিগ্রেট দৌড়ে গিয়ে হৈন থেকে নিয়ে আসতাম। তখনকার দিনে অতি তুচ্ছ-নগণ্য কাজকে মনে করতাম এ যেন বুলেট হয়ে হানছে। দেশ এগিয়ে যাচ্ছে আকাংখিত লক্ষ্যের দিকে।

জয়বাংলার সঙ্গে যাঁরা ছিলেন, এঁদের দু'জন প্রায়ই আমার দু'পাশে বসতেন। তাঁরা হলেন দৈনিক বার্তার কার্যকরী সম্পাদক জনাব আবদুর রাজ্জাক চৌধুরী এবং জাতীয় সংসদের গণসংযোগ বিভাগের পরিচালক জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ্ চৌধুরী। কিছুদিন হলো এঁরা ছেড়ে গেছেন পৃথিবী। আমরা যারা আজও পৃথিবীর বাসিন্দা তারা মুক্তিযুদ্ধের এই দুই সৈনিককে ভুলে গেলে ঠিক হবে না।

আজ দশ বছর পর হঠাৎ করে বুকের ভেতর দুর্বল হয়ে পড়ে। স্মৃতির বারান্দা থেকে অনেকে চলে গেছে। সম্ভবতঃ ৪ঠা জানুয়ারী স্বদেশের পথে রওয়ানা হয়েছিলাম। জনাব আবদুল মান্নান আমার হাত ধরে বলেছিলেন জীবনে কোন-দিন সুযোগ পেলে কারো জন্যে কিছু না করলেও তোমার জন্যে আমি কিছু করবো। মান্নান সাহেব স্বরাষ্ট্র ও পরে স্বাস্থ্য দফতরের মন্ত্রী হয়েছিলেন। তিনি দুদিনের কথা কখনও ভুলে যাননি এটাই আমার জন্য সবচেয়ে বড় সম্মান ছিল, যে সম্মান পেয়েছিলাম ৮ই জানুয়ারী ১৯৭২ এর গোধুলী লগ্নে এক কিশোরীর তুলে দেয়া পুরাতন কাগজের মালা দিয়ে স্বদেশে বরণ করে নেয়ার মাঝানে। আজ দশ বছরে এর চেয়ে বেশী পাবার প্রয়োজন হয়নি।

হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি মোর

কাজী জাকির হাসান

১৯৭১ সাল। ২৬শে মার্চের বারুদের গন্ধ লাগল তারুণ্যে। কানে এলো শিকল ভাঙ্গার গান। বেড়িয়ে পড়লাম ঘর থেকে। ভারতে সামরিক ট্রেনিং নিয়ে চলে এলাম বাংলার মাটিতে। ক্যাম্প গাড়লাম ৬নং সেক্টরের মোগলহাট গীতাল-দহ-এর মাঝখানে। ১লা জুন থেকে ২রা জুলাই এই এক মাস এক দিনে মোট নয়টি অপারেশনের মধ্য দিয়ে করলাম মুক্তিযুদ্ধ। নয়টি অপারেশনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে আহত অবস্থায় ঘুরলাম ভারতের বিভিন্ন সামরিক বেসামরিক হাসপাতালে। এই অভিজ্ঞতার কাহিনী সামান্য দু'এক পৃষ্ঠায় লিখে শেষ করা যাবে না। তবুও আজ লিখতে বসে একটি অপারেশনের কথা বার বার আমার মনে পড়ছে। সৈনিক জীবনের প্রথম বিজয় ও বিসর্জন বলেই হয়ত তা মনের আঙ্গিনায় দাগ কেটে বসে আছে। দিনটির কথা আজ আর মনে নেই। মনে পড়ে শুধু দুর্যোগ ঘন সেই রাতটির কথা। সে রাত আমার কিশোর

জীবনের সব দুর্বলতার ছাপ মুছে দিয়ে এক নতুন জীবনের কিনারায় পৌছে দিতে সক্ষম হয়েছিল। সে বাস্তব অনুভূতি আজ আমার প্রেরণা যোগাচ্ছে, তা হয়ত সেই রাতেরই অভিজ্ঞতার। আমাদের ডিউটি পড়েছিল লালমনিরহাট ও মোগলহাটের মাঝামাঝি রেল ব্রীজ ও রোড ব্রীজ ভেঙ্গে দিয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার। ক্যাম্পে বসে তখন কাজটাকে খুব সহজ বলেই মনে হয়েছিল, কিন্তু যখন কর্তব্যকে কাঁধে নিয়ে বাস্তব কর্মের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালাম, তখন কেবলই মনে হতে লাগল, পায়ের নীচের মাটিগুলো বুঝি

ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে দূরে বহু দূরে। ত্রিশ জন মুক্তি-যোদ্ধাকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল সেই রাতের অপারেশন গ্রুপ। দলপতি ছিলেন মেজু ভাই। শুরু হলো আমাদের কর্মসূচী।

শুরুতেই মেজু ভাই ও বন্ধুবর আকরাম "রেকি" করে এলো ব্রীজে। রাতটি ছিল কনকনে শীতের। পাকিস্তান আর্মি সে রাতে হয়ত মধুচন্দ্রিমায় ব্যস্ত ছিল, কাজেই আমাদের পবিত্র কাজে বাধা দিতে প্রবৃত্তি হয়নি তাদের। পনের জনের একটি গ্রুপ নিয়ে মেজু ভাই নিজেই গেলেন রোড ব্রীজ অপারেশনে, আর বাকি পনেরজন থাকলাম আমরা রেল ব্রীজ অপারেশনে। উভয় ব্রীজের মধ্যে দূরত্ব অবশ্যি খুব বেশী একটা ছিল না। রাত দুটোর সময় শুরু হলো আমাদের ব্রীজ অপারেশনের কাজ। তিন রাইফেলসহ এক এল, এম, জি পাঠানো হলো ব্রীজের ওপারে, আর চার রাইফেল এক এল, এম, জি নিয়ে থাকলাম আমরা এপারে। বাকি দু'জনের মিলিত 'ডেমুলিশন পার্টি' শুধু ব্রীজের বারুদ ব্যবহারে নিয়োজিত হলো। ধীরে ধীরে রাত বাড়তে লাগল। অন্ধকারে ঝিঁ ঝিঁ পোকার বিশ্রী একটানা শব্দ চারিদিকে কেমন যেন এক অসহ্য যন্ত্রণার পরিবেশ সৃষ্টি করে পরমানন্দে মাথার ওপরে বিচরণ করতে লাগল। ব্রীজ থেকে প্রায় তিনশ গজ দূরে 'কভারিং ফায়ারে' নিয়োজিত হয়েছি আমি আর আমার শহীদ বন্ধুবর শামসুল কিবরীয়া। জঙ্গলের মাঝখানে এল, এম, জি'র বাটের ওপর হাত রেখে পজিশন নিয়ে আছি। এমনি সময় পাশ থেকে চাপা কণ্ঠে কিবরীয়া আমায় বললে —তুই সজাগ থাকিস, আমি দৌড়ে গিয়ে দেখে আসি ব্রীজের কাজ কতদুর হলো। ওর কথা শুনে অজান্তেই বুকখানা একবার কেঁপে উঠল। অস্ফুট কণ্ঠে বেরিয়ে এলো "কি বললি"? ওর শীতল হাতখানা আমার পেটের ওপর রেখে বললে কি রে ভয় পেলি? নিজের দুর্বলতা প্রকাশ পাবার ভয়ে সঙ্গে সঙ্গে বললাম কি যে বলিস, যা না তুই এইত আমি বেশ আছি। মুখে লম্বা লম্বা কথা যদি বলি না কেন ও চলে গেলে পর সত্যিই একটু ভয় পেলাম। অমন পরিস্থিতিতে পড়লে কে না ভয় পায় বলুন। নানা রকমের উদ্ভট কল্পনা আমার মনকে বিচলিত করে তুললো। একবার মনে হলো লম্বা পা'য় কে যেন সামনে দাঁড়িয়ে মুষ্টিতে আমার কেশাগ্র ধরতে চেষ্টা করছে। চোখ বুজে আবার মনে হলো কারা যেন আমার পিঠের ওপর ঠাণ্ডা পাথর তুলে দিচ্ছে। ডান হাতে এল, এম, জি, টা ধরে বাম হাতখানা পিঠের ভিতর রাখলাম। সর্বনাশ, বেশ কয়েকটা চিনা জোঁক জেঁকে বসে আছে। হাত দিয়ে কোন রকমে সরাবার চেষ্টা করে চুপ করে শুয়ে রইলাম। এইভাবে মিনিট পনের কেটে যাবার পর কিবরীয়া এসে হাজির হলো। তারপর ওকে রেখে আমি আবার চলে গেলাম ব্রীজের কাছে। কিন্তু একি?

রাত সাড়ে তিনটে বাজে অথচ ব্রীজের কাজ এখনও ২৫ ভাগ অসম্পূর্ণই পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি করে আমি লেগে গেলাম পি, কে (ব্রীজ ভাঙ্গা বারুদ) লাগাতে। রাত চারটের সময় বারুদ লাগানোর কাজ শেষ হয়ে গেল। এখন অবশিষ্ট থাকলো শুধু আগুন ধরিয়ে দেয়ার কাজ। মেজু ভাই এসে দাঁড়ালেন দুই ব্রীজের মাঝখানে কমাণ্ড দিতে।

কমাণ্ড শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে রোড ব্রীজ উড়ে গেল খড় কুটার মত। ঝড়ো বাতাস প্রবল হওয়ার দরুন রেল ব্রীজ উড়াতে প্রায় দু'মিনিট সময় লাগল। (তখনকার দু'মিনিটের মূল্য বর্তমানে একটা জীবনের মূল্যের চেয়েও বেশী)। কিন্তু কে জানতো সেই সঙ্গে হারিয়ে যাবে আমাদের একজন সহকর্মী। কভারিং ফায়ারে ডিউটি দিতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল হতভাগা। আর উড়ন্ত ব্রীজের একখণ্ড লোহা উড়ে এসে দেহ থেকে মাথাটা তার বিচ্ছিন্ন করে অনন্ত নিদ্রায় শুইয়ে দিল তাকে ব্রীজের পারে। সহকর্মীর লাল খুনে ব্রীজের পার রঞ্জিত হলো আমার প্রথম অপারেশনের সেই রাতটি।

এইভাবে সাফল্যজনিতভাবে একত্রিশ দিনে আটটি অপারেশন হয়ে গেল আমার। ২রা জুলাই ১৯৭১ সাল। এল নবম অপারেশন, আমার জীবনের চরম অভিশাপ ও আশীর্বাদ রূপে। ঐদিন ভোর সাড়ে পাঁচটায় শত্রুপক্ষকে এ্যাম্বুশ করতে গিয়ে শত্রুরই পাতিয়ে রাখা মাইনে চিরদিনের মত হারালাম আমার ডান পা'র একাংশ।

মনে পড়ে ঠিক সেই মুহূর্তের অনুভূতিটুকু। যা' মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আমার হৃদয়ে ঘণ্টার মত প্রতিধ্বনি হতে থাকবে। যা' ভাবতে গেলে আজকের এই সুপরিবেশে অন্তর আত্মা কেবল কাঁপতে থাকে ভূমিকম্পের মত। তবুও নিজ অভিজ্ঞতা থেকে সেই মুহূর্তের অর্থাৎ পা উড়ে যাবার ত্রিশ চল্লিশ সেকেণ্ডের মধ্যে আমার যা মনে হয়েছিল (আপনারা বিশ্বাস করুন বা নাই করুন) তা হলো ভাই বোনের কথা ও মা'র দরামরী মুখখানা। চোখ ফেটে তপ্ত অশ্রু নেমে এলো, "হায় খোদা" ভাই বোনের সঙ্গে তাহলে কি আর দেখা হবে না—? এই কি আমার শেষ পরিণতি?"

ছাব্বিশে মার্চের আমি

বেলাল মোহাম্মদ

(বাংলাদেশ-এর স্বাধীনতা যুদ্ধের দ্বিতীয় ফ্রণ্ট হিসেবে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র কোটি বাঙ্গালীর হৃদয়ে আজো অম্লান, আজো ভাস্বর। ২৬শে মার্চ, ১৯৭১-এ আকস্মিকভাবে চট্টগ্রামের কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে সংগঠিত যে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র ইথারে কাঁপন সৃষ্টি করেছিল, তারই সংগঠনের প্রথম উদ্যোক্তা তৎকালীন চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের নিজস্ব শিল্পী বেলাল মোহাম্মদ। তাঁর সেদিনের অবদানের মূল্যায়ন আজো হয়নি। এ দেশের লক্ষ দেশ প্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা আজো তেমনি অবহেলিত। তাঁরা করুণার পাত্র হয়ে ক্ষমতাসীন কর্তা ব্যক্তি এবং সুবিধাভোগীদের দ্বারে দ্বারে আজো ঘুরে বেড়াচ্ছেন জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তার জন্য, সম্মানের সাথে বাঁচার ন্যুনতম স্বীকৃতির জন্য। তাঁদের আবেদন নিবেদন পরিষদ দলের কক্ষভেদ করে উঁচু প্রাসাদের কর্তার কাছে পৌঁছাতে পারে না। বেলাল মোহাম্মদ স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের প্রথম উদ্যোক্তাই শুধু নন, তিনি একজন কবিও। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর স্মৃতিচারণ নয়, মানসিক প্রতিক্রিয়া উপস্থাপন করেছেন একটি কবিতার মাধ্যমে। একজন দুঃসাহসী ও নিবেদিত মুক্তিযোদ্ধা বেলাল মোহাম্মদেরই শুধু নয়, এ দেশের লক্ষ অবহেলিত মুক্তিযোদ্ধারই যথার্থ করুন আর্তি মূর্ত হয়েছে এই কবিতায়। পাঠক কূলের উদ্দেশ্য কবিতাটি ইংরেজী রূপান্তরসহ হুবহু নিম্নে পত্রস্থ করলাম। ইংরেজী রূপান্তরও তাঁরই স্বরচিত।)

যা বলি অলীক কি না অথবা বাস্তব,
এই প্রশ্নে আজকাল মানি নে বিস্ময়।
গোয়েবল্স্ কালে কালে ধরে অবয়ব।
যে যায় লঙ্কায় সে তো দশানন হয়।
ছাব্বিশে মার্চের আমি কোন্ অধিকারে
সত্যের প্রবক্তা হবো দশকের প্রান্তে
আমিও তো স্মৃতিভ্রষ্ট এই অন্ধকারে
হতে পারি নৈর্বাক্তিক সভয়ে একান্তে।

হায় আমি ট্রান্সমিটার যন্ত্রের মতন
কলের পুতুল যদি হতাম মুখর,
হতাম বিবর্ণ শোভা সুবর্ণ রতন
প্রদর্শনী যুগান্তক ঢাকা যাদুঘর।
লোকে বলে, ইতিহাস রুদ্র ক্ষমাহীন
কালচক্রে থাকুক সে সত্যে অন্তরীন॥

SAY AS I

Say as I if false or fact.
Wonder not for now-a-days.
At times GOEBLES does so act
LANKA raises RAVANA's base.
Authorised as a truth-teller
After years I how can be,
May be we a memory-degrader.
A mute out of fear, and flee.
Oh a transmitter if I were
A relic all for times to come
And it must be handled with care
Oft exhibited by Dhaka Museum.
But for long exists no miracle,
Let facts be fictioned at a cycle.

(যথার্থই যে সব নিবেদিত বীর সৈনিক স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ-এর জন্য দিয়েছেন বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে, যাঁরা জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন দেশ মাতৃকার স্বাধীনতার জন্য, সেই দুঃসাহসী দেশপ্রেমিকদেরকে ইতিহাস এবং কার্পেট বিছানো যাদুঘরে ঠেলে দিয়েই আমরা দায়িত্ব এড়াতে পারি না। জাতির এসব নিবেদিত সন্তানদের প্রতি আবশ্যিক দায়িত্ব হিসেবে সরকার এবং জনগণকে যে কোনও তোষামোদ, প্রভাব, ব্যক্তিকেন্দ্রীকতা বা দলমতের উর্ধ্বে থেকে তাঁদের অবদানের যথার্থ মূল্যায়ন এবং স্বীকৃতি দানের জন্য উদার এবং বাস্তব পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।)

আমার স্মৃতি

রন্তকার

২৬শে মার্চ, '৭১ চট্টগ্রাম বেতারের দুঃসাহসী শব্দ সৈনিকগণ যখন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সংগঠনের মাধ্যমে গণসংযোগের এক কঠিন ঐতিহাসিক দায়িত্ব নির্বাহ করছিলেন, তখন আমরা ছিলাম বিচ্ছিন্নভাবে স্ব স্ব বেতার এলাকায়। তৎকালীন রাজশাহী বেতারের একজন অনুষ্ঠান সংগঠক হিসেবে আমি ২রা এপ্রিল, '৭১ পর্যন্ত ক্রমশিথিল কর্ম দায়িত্ব পালন করেছি। মার্চ, '৭১-এ বঙ্গবন্ধু আহুত অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে রাজশাহী বেতারও পিছিয়ে ছিল না। ঐ সময়ে রোজ সকালে বেতারের নির্ধারিত অনুষ্ঠান সভা পরিচালনা করতে হয়েছে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আমাকেই। প্রতিদিনের সভায় আমরা পূর্ব নির্ধারিত উর্দু অনুষ্ঠান কেটে তদস্থলে বাংলা অনুষ্ঠান বসিয়ে দিতাম। ঐ কেন্দ্রে তখন দু'জন উর্দু ভাষী অনুষ্ঠান প্রযোজক ছিলেন। তারা মুখে কোনও প্রতিবাদ করতেন না। কিন্তু তারা যে মনে মনে সাংঘাতিকভাবে ক্ষুব্ধ ছিলেন, এটা আমরা বুঝতাম।

২১শে মার্চ, '৭১ ছিল রোববার। রাজশাহী বেতার থেকে প্রতি রোববার সকাল ৯টায় আমরা প্রচার করতাম শিশুদের জন্য অনুষ্ঠান 'সবুজ মেলা'। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করতেন রাজশাহীর তৎকালীন পুলিশ সুপারিনটেন্ডেণ্ট জনাব মামুন মাহমুদ-এর স্ত্রী বেগম মোশফেকা মাহমুদ। শুক্রবার দিন সকালে সিদ্ধান্ত নিলাম বাচ্চাদের ঐ অনুষ্ঠানও অসহযোগ আন্দোলনের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রচার করব। বেগম মোশফেকা মাহমুদকে টেলিফোনে আমাদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিলাম। টেলিফোনটি ধরিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর স্বামী জনাব মামুন মাহমুদ, সুসাহিত্যিক এবং শিক্ষাবিদ বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ-এর জ্যেষ্ঠপুত্র। ভদ্রলোককে দেখিনি কখনো। কিন্তু টেলিফোনে সেই কয়েক মুহূর্ত আলাপে মনে হয়েছে কত আপন জন ছিলেন তিনি। ২৬শে মার্চ দিবাগত রাতে কিংবা ২৭শে মার্চ পূর্বাহ্ণে হানাদার বাহিনী মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে মামুন মাহমুদকে তাঁর পদ্মাপারের সরকারী বাসভবন থেকে নিয়ে যায়। তিনি আর কখনো ফিরে

আসেন নি। আর ফিরে আসবেন না তিনি তাঁর স্ত্রী, পুত্র-কন্যা এবং প্রিয়জনের কাছে।

৬ই এপ্রিল '৭১ থেকে ১২ই এপ্রিল '৭১ সন্ধ্যা পর্যন্ত রাজশাহী শহর ছিল হানাদার বাহিনী মুক্ত। আমিও তখন আরো অনেকের ন্যায় রাজশাহী শহরময় ঘুরে বেড়িয়েছি শঙ্কা এবং স্বাধীনতার শিহরণ বুকে নিয়ে। হানাদার মিলিটারী বাহিনী ছিল তখন ক্যান্টনমেন্টে রাজশাহী শহর থেকে তিন মাইল দূরে তৎকালীন ই-পি-আর এর বেষ্টনীর মধ্যে। ক্যান্টনমেন্টকে প্রায় মাইল খানেক ব্যবধানে রেখে ট্রেঞ্চ খুঁড়ে রাইফেল হাতে প্রহরায় নিযুক্ত থাকতে দেখেছি ই-পি-আর এর দুঃসাহসী দেশপ্রেমিক জোয়ানদের। শহর থেকে অদূরে কাজী হাটার গ্রেটার রোড-সার্কিট হাউজের সংযোগ স্থলে মেশিনগানে সজ্জিত দেখেছি তাদের এমনি এক চেক পোষ্ট। এসব দেখে সাহসে বুক ভরে উঠত। কিন্তু রাত ভারী হওয়ার সাথে সাথে ক্যান্টনমেন্ট এলাকা থেকে যখন গোলা-গুলির শব্দ কানে আসত তখন স্বাভাবিক ভাবে মন ও ভারী হয়ে উঠত।

৭ই এপ্রিল '৭১ পূর্বাহ্ণে আকস্মিকভাবে সারদা পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের তৎকালীন জনৈক হাবিলদার জনাব ফজলুল হকের (পরবর্তীকালে ঢাকার রাজার-বাগ পুলিশ লাইন থেকে একজন সহকারী পুলিশ পরিদর্শক—'এ, এস, আই, হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত) নেতৃত্বে এক ট্রাক পুলিশ রাজশাহী শহরের সাহেব বাজারস্থ আমার সরকারী বাসভবনের সামনে এসে নামলেন। ফজলুল হক সাহেব ছিলেন আমার পূর্ব পরিচিত এবং আত্মীয়। কাজেই ভয় পাইনি। তাঁরা আমাকে তাঁদের সাথে তাৎক্ষণিকভাবে যাওয়ার জন্য চাপ দিলেন। উদ্দেশ্য, রাজশাহী বেতার কেন্দ্র চালু করতে হবে। আমি ছিলাম তখন রাজশাহী বেতারের একজন অনুষ্ঠান সংগঠক মাত্র। স্বভাবতই এ জাতীয় ঘটনার আকস্মিকতা এবং ঝুঁকির সম্মুখীন হওয়ার জন্য আমার সাধারণ মানসিক প্রস্তুতিও ছিল না। বেতার কেন্দ্র চালু করার ব্যাপারে আমার ক্ষমতা যে খুবই সীমিত ছিল, সেকথাটি বহু কষ্টে বুঝিয়ে তাঁদের আমি রাজশাহী বেতারের তৎকালীন আঞ্চলিক পরিচালক জনাব সাইদুল্লাহ্ সাহে-বের বাসভবনে (পদ্মার পারে বোয়ালিয়া ক্লাবের সন্নিকট) পাঠিয়ে দিলাম। আঞ্চলিক পরিচালকের অজান্তে তাঁর বাসভবনের ঠিকানা প্রদান করে তাঁকে অপ্রস্তুত করা হবে এই ভেবে আমি কিছুটা বিব্রতও বোধ করেছিলাম। পরে জেনেছি আঞ্চলিক পরিচালক সাহেব তাঁদের সাথে বেতার ভবনে যাওয়ার জন্য কিছুদূর এগিয়েছিলেনও। কিন্তু আকস্মিক ভাবে শত্রুর বিমান থেকে এলোপাথারি শেলিং শুরু হয়ে যাওয়ায় তাঁরা আর অগ্রসর হননি।

১৩ই এপ্রিল '৭১-এর সকালে রাজশাহী শহরময় বয়ে এনেছিল এক কালো শোকের ছায়া। ঐদিন সূর্য ওঠার আগেই হানাদার বাহিনী আকস্মিকভাবে পৌঁছে গিয়েছিল রাজশাহী শহর এলাকায়। আমি স্ব-পরিবারে আটকা পড়ে গেলাম ঐ শহরেরই ঠিক মধ্যস্থলে সরকার বরাদ্দকৃত বাসভবনে।

রাজশাহী ক্যান্টনমেন্টে আটক মিলিটারী দোসরদের মুক্ত করার উদ্দেশ্যে বাইর থেকে আগত এই অতিরিক্ত বাহিনী রাজশাহী শহরে ঢুকে পড়েছিল আমাদের অজান্তে সকাল ৭টায়। রোজ সকাল সাড়ে পাঁচটার মধ্যেই সাধারণতঃ আমি গাত্রোত্থান করতাম এবং সকাল ছ'টার মধ্যে বের হয়ে যেতাম পদ্মার ধারে বেড়াতে। কিন্তু সেদিন আমার ঐ প্রাত্যহিক রুটিনের ব্যতিক্রম হয়েছিল। যথা নিয়মে বাসভবন থেকে বের হয়ে কেবল নাটোর রোডে পা ফেলতেই রাজশাহীর ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের বিভাগীয় প্রধান অফিসের জনৈক কর্মচারী আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। তাঁর মন ছিল খুবই অশান্ত, সারা রাত দুঃস্বপ্ন দেখেছেন। তদুপরি সকালে উঠেই শুনেছেন—হানাদার বাহিনী প্রায় মাইল দু'য়েকের ব্যবধানে রাজশাহী বিশ্ব বিদ্যালয়ের কাছাকাছি এসে গিয়েছে। তাই সান্ত্বনা খুঁজে পাওয়ার জন্য এসেছেন আমার কাছে। ক'রাত থেকে আমারও তেমন ঘুম হয়নি। ভয় ছিল স্থানীয় বিহারীদের। ওদের সাথে যোগসাজশ ছিল হানাদার বাহিনীর। শহরময় একটা আতঙ্ক ছিল: একান্তে ওদের সামনে পড়লেই আর রক্ষা নেই। ওরা আমাদের বাড়ী-ঘর চিনত। কাজেই ক্যান্টনমেন্ট থেকে হানাদার বাহিনী একবার ছাড়া পেলেই তারা ঐ অকৃত্রিম দোসরদের সহায়তায় বাঙ্গালী হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করতে পারত যে কোনও মুহূর্তে।

ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক-এর সেই কর্মচারীর কথায় তেমন গুরুত্ব দিলাম না। ভাবলাম এমনিতেই কয়েকদিন ধরে এ জাতীয় গুজব শুনে আসছি,—হানাদার বাহিনী পুঠিয়া-বিড়ালদহ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, এই বুঝি রাজশাহী শহরে এসে ঢুকল, ইত্যাদি। কাজেই তাঁকে কয়েকটি সান্ত্বনা বাক্য শুনিয়েই ঘরে ফিরে এলাম। একখানা চাদর মুড়ি দিয়ে আবার বিছানায় শুয়ে পড়লাম রাতের ঘুম পুষিয়ে নেয়ার মিথ্যা প্রচেষ্টায়। দশ মিনিট পার না হতেই একখানা জীপ-এর কড়া ব্রেক কষানোর শব্দেই সচকিত হ'লাম। তৎকালীন ই-পি-আর এর জোয়ানরা পূর্বদিন এমনি জীপ নিয়ে কত এদিক ওদিক যাতায়াত করেছে ওপথে। ওদেরই কোনও জীপ ভেবে তখনো চুপচাপ শুয়ে থাকলাম। পাশের বাসায় থাকতেন এক হিন্দু পরিবার। ঐ পরিবারেরই একজন প্রৌঢ়া মহিলা আমার পার্শ্ববর্তী কক্ষে বসে গল্প করছিলেন। তিনি ত্রস্তে এসে আমাকে খবর দিলেন

অস্ত্র হাতে গাড়ী থেকে কারা যেন নামছে। বিছানা সংলগ্ন জানালাটিকে খানতো করে এক নজর দেখেই বুঝতে বাকী থাকল না যে দুশমন আমার দোর গোড়ায়। ওদের চোখ এড়িয়ে কোনও রকমে জানালাটি বন্ধ করে দিলাম। আমরা ঘর ছেড়ে পেছনে সরে গেলাম বিহারীদের সম্ভাব্য আক্রমনকে ফাঁকি দেয়ার জন্য। দু'দিন আগে থেকেই আমি আমার বাসভবনের প্রধান দরজার বাইর থেকে একটি তালা ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম। সবাইকে আগে দিয়ে আমি ঘর থেকে শেষ পদক্ষেপ বাইরে ফেলার সাথেই দুশমন ঘরের প্রধান দরজায় জোরে আঘাত হানল। কিন্তু কোনও প্রত্যুত্তর পেল না। তালাবদ্ধ ঐ ঘরে কেউ নেই নিশ্চিত হয়ে ওরা পুনরায় চলে গেল রাস্তার দিকে। বুঝলাম দুশমন সরে গিয়েছে। কিন্তু ওদের গতিবিধি লক্ষ্য করা আবশ্যক। তাই অতি সন্তর্পণে প্রধান দরজার সন্নিকটে এলাম। কপাটের ছিদ্রপথে দৃষ্টি ফেলতেই মহা দানবীয় তৎপরতা দেখে শিউরে উঠলাম। হানাদার বাহিনী দু'জন পথচারীকে আমার বাসভবনের রাস্তা সংলগ্ন গেটের ঠিক উল্টো পাশে ধরে এনে দাঁড় করালো। তারপর আমার দৃষ্টির সামনেই দু'জনকে পর পর গুলি করে হত্যা করল। পরে জেনেছি হতভাগা পথচারীদের একজন ছিলেন স্থানীয় দুর্নিতি দমন বিভাগের উপ-পরিচালক। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে আমার হৃদ্‌কম্পন দ্রুত বেড়ে গেলো। এমনি হতভাগা পথচারীদের একজনত আমিও হতাম। কিন্তু তখনো কি বেঁচে গেছি? চোখ ফিরিয়ে কিছুক্ষণ ঐ দরজার ভিতরের দোর গোড়ায় পড়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। বাম হাত দিয়ে ডান হাতের শিরা দেখলাম। অনুভব করলাম শিরা কত দ্রুত উঠানামা করছিল। মাথার চুল, হাতের পায়ের সব লোম অস্বাভাবিক ভাবে দাঁড়িয়ে গেল। অল্প ক্ষণের মধ্যেই মনকে শক্ত করে নিলাম। আসন্ন মৃত্যুকে স্বাভাবিক ভাবে নেয়া ছাড়া উপায় কি? পুনরায় বাইরে চোখ ফেলার জন্য তৈরী হতেই বুটের শব্দ কানে এলো। এবার নিশ্চিত মৃত্যুর জন্য তৈরী হয়ে গেলাম। দরজা-জানালা বন্ধ ঐ অন্ধকার ঘরের এক কোণে সরে গেলাম। দশ মিনিট ওভাবে ছিলাম। বুঝলাম দুশমন এবারও ফিরে গিয়েছে। আস্তে আস্তে আবার সেই প্রধান দরজার কাছে এসে বাইরে দৃষ্টি ফেললাম। এবারে তিনটি দৃশ্য চোখে পড়ল। একজন সিপাহী রাইফেল হাতে আমার সামনের আঙ্গিনায় পায়ের ওপর ভর করে বসে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। তারপর দেখলাম অন্য একজন সিপাহী আমার বাসভবনে বরাবর রাস্তা সংলগ্ন কটক ঘেঁসে সামান্য আড়ালে একটি এল, এম, জি তাক করে পজিশন নিয়ে শুয়ে আছে। তার পড়ন্ত ক্যাপটি মাথায় উঠিয়ে নিতেই সে আমার নজরে পড়েছিল। বুঝলাম এরা আমাদের ঐ এলাকায় প্রহরায় নিযুক্ত রয়েছে। তৃতীয় দৃশ্যটি দেখলাম আরো ভয়াবহ। বাঁয়ে এবং পিঠে পাইপগান

ঝুলিয়ে ওয়্যারলেস সেটকে বেল্টের সাথে এঁটে দৃপ্ত পায়ে মার্চ করে আসছে। চার-পাঁচ জনের গ্রুপ করে এগিয়ে আসছে অগণিত হানাদার সৈন্য। চোখে ওদের জিঘাংসার আগুন। ওরা বুঝি রাজশাহী শহরকে গ্রাস করবে। মুহূর্তে ধূলায় মিশিয়ে দেবে ঐ শহরের নিরস্ত্র মানুষগুলিকে।

পেছনের একটি দ্বিতল বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিল আমার পরিবারের সদস্য-বৃন্দ। বেলা প্রায় অপরাহ্ন ১টায় তারা ফিরে এলো। রাজশাহী শহর তখন জ্বলছে। জ্বলছে আমার পার্শ্ববর্তী ন্যাশনাল ব্যাংক-এর প্রধান অফিস, গফুর মিঞার চালের আড়ত, হীরা স্টুডিও। জীবন মৃত্যুর এমনি সন্ধিক্ষণে রাত দশটা পর্যন্ত আমরা আটকা পড়ে থাকলাম রাজশাহী শহরের সরকার বরাদ্দকৃত ঐ বাসভবনে। আকাশ তখন লাল, চারিদিকে আগুন। গরম অসহ্য। রাত প্রায় ন'টা থেকে শুরু হ'ল তুফান। তারপরই মুষলধারে বৃষ্টি। হানাদার বাহিনীর অপারেশন তখন কিছুক্ষণের জন্য থেমেছিল। ত্বরিতে সিদ্ধান্ত নিলাম। বৃষ্টি কমতেই ঘর ছেড়ে পেছনের দরজা দিয়ে চলে গেলাম পদ্মার পারে। আপাতঃ লক্ষ্য প্রেমতলী। তারপর সুযোগ বুঝে সীমান্ত অতিক্রম। সেই প্রৌঢ় হিন্দু মহিলাও ছিলেন আমাদের সাথে।

পরবর্তী সপ্তাহের মধ্যে রাজশাহী শহরময় খবর ছড়িয়ে পড়েছিল হানাদার বাহিনীর হাতে আমরা স্বপরিবারে নিহত হয়েছি। অনেকে বলেছেন পদ্মার ধারে আমাদের লাশ দেখতে পেয়েছেন। তবে রাজশাহী বেতার কর্তৃপক্ষ কয়েক দিনের মধ্যেই জানতে পেরেছিলেন আমার নিরাপদ সীমান্ত অতিক্রম করার সংবাদ। ঐ সংবাদ পরিবেশক ছিলেন রাজশাহীর ন্যাশনাল ব্যাংক-এর বিভাগীয় প্রধান অফিসের সেই কর্মচারী। তিনিও প্রেমতলী পর্যন্ত আমাদের সাথে ছিলেন। কিন্তু কি বুঝে আবার ফেরত চলে এসেছিলেন।

১৪ই এপ্রিল '৭১ বিকেলে পৌছলাম মুর্শিদাবাদের চরকুঠি বাড়ী। সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা। সাথে ছিল মাত্র আশীটি টাকা। তবু কিছুটা স্বস্তি পেলাম। অন্ততঃ জীবন ত বাঁচল। কিন্তু যাই কোথায়? চরকুঠি বাড়ীর জনৈক চায়ের দোকানদারের কাছ থেকে নিকটবর্তী এক হিন্দু জোতদারের ঠিকানা নিয়ে ওখানে উঠলাম।

বিকেল পাঁচটা বেজে গিয়েছে। আমরা সবাই তখন ভীষণ ক্ষুধার্ত। কিন্তু জোতদার খেতে দেবেন কি করে। আমাদের পরিচয় 'মুসলমান'। জোতদারের ছেলে মাধবের হাতে ১০টি টাকা দিলাম। সে আমাদের জন্য চাল, ডাল, লবণ,

পিঁয়াজ, মরিচ, আলু এবং একটি হাড়ি নিয়ে এলো। বারান্দায় কলাপাতা বিছিয়ে খিচুরী খেলাম। তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। স্থানীয় জনৈক পঞ্চায়েত তাঁর ঘরে নিয়ে চা খাওয়ালেন। অনেক সান্ত্বনা বাক্য শুনালেন। তাঁর সাথে আলোচনা ক্রমেই ভগবানগোলা যাওয়া সাব্যস্ত হ'ল। ভগবানগোলার স্থানীয় জোতদার হাজী মইমুদ্দিন সরকার বিত্তবান এবং দয়ালু ব্যক্তি। তাঁর এক ছেলে জনাব কাজেম উদ্দিন ভগবানগোলা উচ্চ বিদ্যালয়ের অন্যতম সহকারী শিক্ষক। রাজনীতি সচেতন; পশ্চিম বঙ্গের মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির একজন স্থানীয় উদীয়মান নেতা। ইতিপূর্বে প্রাদেশিক পরিষদের সিটের জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। তবে হেরে গিয়েছেন। ঠিক করলাম কাজেম সাহেবের সাথে একবার দেখা করি। তারপর অন্য ভাবনা, অন্য চিন্তা। রাত কাটালাম চরকুঠি বাড়ীর সেই হিন্দু জোতদারের পরিত্যক্ত একটি ভাঙ্গা বেড়ার ঘরে। তবু ত আশ্রয় পেয়েছিলাম। তাঁদের কাছেও আমরা চির ঋণী।

পরদিন অর্থাৎ ১৫ই এপ্রিল, '৭১ সকালে পঞ্চায়েত বাবু আমাদিগকে পৌঁছিয়ে দিলেন নিকটবর্তী খেয়াঘাট পর্যন্ত। স্থানীয় লোকে একে বলে 'খরচা ঘাট'। ঘাট পেরিয়েই পেলাম ভগবানগোলার বাস। প্রায় সাড়ে এগারটায় ভগবানগোলা উচ্চ বিদ্যালয়ের কাছাকাছি এলাকায় গিয়ে নামলাম। বিদ্যালয়ের মাঠ সংলগ্ন একজন শিক্ষকের বাসভবনের বারান্দায় কিছুক্ষণের জন্য ঠাঁই নিলাম। ছেলে পিলেদের ওখানে রেখে আমি একা স্কুলে গিয়ে কাজেমুদ্দিন সাহেবের সাথে দেখা করলাম।

ভগবানগোলায় আমরা হলাম প্রথম শরণার্থী। সৌভাগ্য বলতে হবে, জামাই সুলভ আদর পেয়ে গেলাম। কাজেম সাহেব ঐদিনের বাকী সময়ের জন্য স্কুল থেকে ছুটি নিলেন। তাঁর ভাই, ভাই-পো সবাই আমার ছেলেদের (দুই ছেলে) কোলে করে, হাত ধরে আমাদের সামান্য পাটরী-পেটারা সহ সোজা নিয়ে গেলো তাঁদের বাড়ী। ঐ পাটরী-পেটারার মধ্যে ঠাঁই পেয়েছিল আমার তিন ব্যাণ্ডের একটি 'পাই' ট্রানজিষ্টার রেডিও। রেডিও সেটটি ছিল আমার কাছে এক অবিচ্ছেদ্য মহা মূল্যবান সম্পদ। যুদ্ধ শেষে ঐ সেটটিও বিজয়ী হয়ে ফিরে এসেছিল আমার সাথে। আজো আছে এবং মনে করিয়ে দিচ্ছে আমার সেই ফেলে আসা স্মৃতি বিজড়িত দিনগুলির কথা।

কাজেম সাহেব আমাকে নিয়ে গেলেন মূল বাড়ী থেকে অদূরে প্রধান সড়ক সংলগ্ন নির্মাণাধীন তাঁদেরই নতুন একটি পাকা বাড়ীতে। বাড়ীর

ছেলেরা সবাই লেখাপড়া করতো ওখানে। বাড়ীর বয়স্কদের আড্ডার স্থলও ছিল ওটি।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আমার জন্য খাবার এলো। তারপর বিকেল পর্যন্ত একটানা বিশ্রাম। মনে তখন নানা চিন্তা। বিকেলে স্থানীয় লোকজনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন কাজেম সাহেব। সত্যেন ডাক্তার, দিলীপ চক্রবর্তী প্রমুখ-এর অনুসন্ধিৎসু কুশলাদি বিনিময়ে ছিল অপরিসীম সহানুভূতি, যা আমার মনে আজো অম্লান। তাঁদের সবাইকে জানাই আমার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা।

জনাব কাজেমুদ্দিন সমভিব্যাহারে কোলকাতা পৌঁছেছিলাম ১৮ই এপ্রিল ভোরবেলায়। তিনি নিয়ে গেলেন ৪নং লেরসীন পার্কে (বালিগঞ্জ)—মার্কসবাদীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি থেকে নির্বাচিত এম. এল. এ বীরেন্দ্র নারায়ণ রায়ের বাড়ীতে। বিশাল বিতল পাশাপাশি দুটি বাড়ী। তাঁর পিতা রাজা বীরেন্দ্র নারায়ণ রায় তখনো জীবিত ছিলেন। প্রথম বাড়ীতেই থাকতেন রাজা সাহেব। তাঁর সাথে পরিচয় হয়েছিল এবং তাঁর আশীর্বাদও পেয়েছিলাম।

বীরেন বাবুর আপ্যায়নে মুগ্ধ হ'লাম। চা-মিষ্টি খাওয়ালেন। তাঁদেরই গুরু ভারতবর্ষের কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের জনক কমরেড মুজফ্ফর আহমদ যে আমাদেরই পার্শ্ববর্তী গ্রাম সন্দ্বীপের মুসাপুরের সন্তান। সে কথায় পড়ে আসছি।

ঐদিনই অর্থাৎ ১৮ই এপ্রিল '৭১ বেলা আনুমানিক ৩টার সময় বীরেন বাবু এবং কাজেম সাহেব সহ ছুটে গেলাম ৯নং সার্কাস এভিনিউতে অবস্থিত সদ্য ঘোষিত বাংলাদেশ হাই কমিশন ভবন দেখার জন্য। গাড়ী বীরেন বাবুর। তিনি নিজেই গাড়ী চালিয়ে নিলেন। উল্লেখ্য যে মাত্র ঐদিনই দ্বিপ্রহর ১২টা ৪১মিঃ সময়ে নবরাষ্ট্র বাংলাদেশ-এর সোনালী মানচিত্র খচিত বিশাল পতাকা উত্তোলন করেছিলেন তৎকালীন ডেপুটি হাই কমিশনার জনাব হোসেন আলী এবং তাঁর দুঃসাহসী বাঙালী সহকর্মীবৃন্দ। হাজারো লোকের ভীড়ে আমিও এক নজর দেখে নিলাম নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের সেই বিশাল ঐতিহাসিক পতাকা।

পশ্চিম বঙ্গের তৎকালীন এম. এল. এ প্রখ্যাত পার্লিয়ামেন্টারিয়ান সৈয়দ বদরোদ্দোজা থাকতেন ১৯ নম্বর ইউরোপীয়ান এসাইলাম লেনে। ৯নং সার্কাস এভিনিউ থেকে আমরা সরাসরি ওখানে গিয়ে সাক্ষাৎ করলাম বর্ষীয়ান এই ভারতীয় পার্লিয়ামেন্টারিয়ান-এর সাথে। প্রায় এক ঘণ্টাকাল থাকলাম তাঁর সাথে। তখন তিনিও ছিলেন মানসিক দুশ্চিন্তায় উদ্বিগ্ন। তাঁর সর্ব কনিষ্ঠ ছেলে সৈয়দ আশরাফ আলী ঐ সময়ে ছিলেন চট্টগ্রাম বেতারের শ্রোতা গবেষণা অফিসার

(বর্তমানে রেডিও বাংলাদেশের কৃষি বিষয়ক কার্যক্রম-এর পরিচালক)। বড় ছেলে সৈয়দ মোহাম্মদ আলী ছিলেন করাচী। তাঁদের কুশল চিন্তায় তিনি ছিলেন অস্থির। সন্ধ্যার কিছু আগেই আমরা বালিগঞ্জে ফিরে গেলাম।

১৯শে এপ্রিল '৭১ সকাল ৯টায় পূর্ব দিনের নিযুক্তি অনুযায়ী দেখা করলাম কমরেড্ মুজফ্ফর আহমদের সাথে। বীরেন বাবু এবং জনাব কাজেমুদ্দিন ছিলেন আমার সাথী। ভারতবর্ষের প্রবীণ এই সমাজবাদী নেতা প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে বিশ্লেষণ করলেন বাংলাদেশের তৎকালীন পরিস্থিতি। আশীর্বাদ দিলেন তিনি। সেই আশীর্বাদ নিয়েই পরদিন ফিরে গেলাম মুর্শিদাবাদ।

কিন্তু তারপর? স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্য ত যোগসূত্র চাই। কোথায়, কার সাথে কি ভাবে দেখা করবো কিছুইতো জানা নেই। ওদিকে রাজশাহী বেতার থেকে ঘোষণা শুনতে পাই ২১শে মে, '৭১-এর মধ্যে কর্মস্থলে ফেরত গেলে সব মাপ। হাতের শেষ সম্বল পঁচাত্তরটি টাকা কাজেম সাহেবের কাছে দিয়েছি। এ পর্যন্ত তিনি খরচ নির্বাহ করে যাচ্ছেন। এমনিভাবে তাঁদের পরিবারের বোঝা হয়ে কত দিন চলা যাবে? রাজশাহীর খবর সংগ্রহ করে যা, শুনলাম তাতে আরো দমে গেলাম। ঐ বেতারের নিজস্ব শিল্পী জনাব হাবিবুর রহমানের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। হানাদার বাহিনী কর্তৃক তাঁর হত্যার খবর পরে পেয়েছিলাম। না, রাজশাহী ফেরত যাবো না। মরতে হয় তো ভারতের মাটিতেই মরবো। কিন্তু তার আগে সর্বশক্তি দিয়ে নিজেকে নিয়োজিত করব দেশকে শত্রুমুক্ত করার কাজে।

সম্ভবতঃ ৬ কি ৭ই মে, '৭১ দৈনিক আনন্দবাজার কিংবা যুগান্তর পত্রিকায় ছোট্ট একটি খবরে আনন্দ উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিলাম বিপ্লবী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার একটি উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বেতার কেন্দ্র চালু করার পরিকল্পনা নিয়েছেন জেনে। দ্বিতীয় বারের মত কোলকাতা যাওয়ার জন্য মন স্থির করে ফেললাম।

১০ই মে '৭১ বিকেলে দ্বিতীয় বার কোলকাতা পৌঁছলাম। পরদিন অর্থাৎ ১১ই মে '৭১ একাই গেলাম বাংলাদেশ হাই কমিশন ভবনে। ৯নং সার্কাস এভিনিউতে অবস্থিত সদ্য ঘোষিত এই বাংলাদেশ হাই কমিশনই ছিল তখন বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের প্রধান প্রাণ কেন্দ্র। সেখানে দেখা পেলাম প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক জনাব জহির রায়হান (মরহুম), জনাব হাসান ইমাম এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনের তৎকালীন প্রোগ্রাম ম্যানেজার জনাব মোস্তফা মনোয়ার সহ চেনা-অচেনা অনেক

শিল্পী ও কুশলীর। অদ্ভুত প্রাণ চাঞ্চল্য লক্ষ্য করলাম সবাইর মধ্যে। জনাব মোস্তফা মনোয়ারের সাথে আলাপে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বেতার কেন্দ্র প্রসঙ্গে খবরের কাগজে পরিবেশিত সংবাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই তিনি আমাকে জানালেন জনাব আবদুল মান্নান এম. এন. এ-র ওপর প্রস্তাবিত ঐ বেতার কেন্দ্র সংগঠনের ভার অর্পিত হয়েছে। আমাকে ঠিকানা দিলেন: ২১-এ, বালু-হাক্কাক্ লেন।

ঐদিনই অর্থাৎ ১১ই মে '৭১ হাই কমিশন ভবনে নির্ধারিত শপথ নামায় স্বাক্ষর করেই চলে গেলাম মান্নান সাহেবের সাথে দেখা করতে। ছোট্ট একটি একতলা বাড়ী। কক্ষের সংখ্যা ছিল বারান্দা সহ সাকুল্যে ৫টি। লক্ষ্য করলাম মধ্যের কামরায় অনেক লোকজনের ভীড়ে মান্নান সাহেব শলাপরামর্শে ব্যস্ত। এটি ছিল মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত 'জয়বাংলা' পত্রিকার অফিস। মান্নান সাহেব ছিলেন প্রেস, তথ্য, বেতার ও ফিল্ম-এর ভারপ্রাপ্ত এম, এন, এ। আমার পরিচয় দিলাম। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সংগঠনে সার্বিক সহযোগিতার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম তাঁর কাছে। বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধে অংশ নেবার জন্য আমি যে শপথ নামায় স্বাক্ষর করেছি সে কথাও তাঁকে জানালাম। খুশী হলেন তিনি।

বেতার পরিচালনার জন্য সম্ভাব্য কম খরচের পরিকল্পনা চেয়েছিলেন মান্নান সাহেব। ১৭ই মে, '৭১ আমি একটি পরিকল্পনা তাঁর হাতে দিয়েছিলাম। ইতিপূর্বে রাজশাহী বেতারের অন্যতম অনুষ্ঠান সংগঠক জনাব মেসবাহ্উদ্দিন আহমদও আমার সাথে কাজে যোগ দিলেন। সম্ভবতঃ তিনি ১৩ই মে, '৭১ কাজে যোগ দিয়েছিলেন। তবে মুক্তাঞ্চলে তিনি এসেছিলেন আমারো আগে। বেতার কর্মীদের মধ্যে মুজিব নগরে আমাদের সবাইর আগে কাজে যোগ দিয়েছিলেন রাজশাহী বেতারের তৎকালীন অনুষ্ঠান প্রযোজক জনাব অনু ইসলাম। ভারপ্রাপ্ত এম, এন, এ সাহেবের ইচ্ছায় তিনি মুজিব নগরে প্রকাশিত 'জয় বাংলা' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদকের দায়িত্ব নির্বাহ করেছিলেন যুদ্ধের শেষ দিন পর্যন্ত।

১৪ই মে '৭১ জনাব আবদুল মান্নানের কাছ থেকে দুই শত টাকা নিয়ে আমি ঢাকার পাইওনিয়ার প্রেসের মালিক জনাব এম,এ, মোহায়মেন এবং সহকর্মী জনাব মেসবাহ্উদ্দিন সমভিব্যাহারে ধর্মতলা ষ্ট্রীট থেকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জন্য কিছু বাঁধানো রেজিষ্টার এবং কাগজ-কলম কিনে আনলাম। জয় বাংলা অফিসে বসেই ঐদিন বিকেলে আমরা মুক্তাঞ্চলে আগত শিল্পী কুশলীদের একটি তালিকা প্রস্তুত করলাম। জনাব অনু ইসলামও আমাদের সাথে কাজ করলেন। বলাবাহুল্য স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সংগঠনের কাজ ইতিপূর্বেই

শুরু হয়েছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সংগঠনে আমি যাঁদেরকে পেয়েছিলাম তাঁরা ছিলেন সর্ব জনাব এম, আর, আখতার, আমিনুল হক বাদশা এবং বিশিষ্ট শিল্পী জনাব কামরুল হাসান।

উচ্চ শক্তিসম্পন্ন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র উদ্বোধনের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলল। জনাব আবদুল মান্নান জানালেন সপ্তাহ কালের মধ্যেই তিনি প্রস্তাবিত বেতার কেন্দ্র চালু করতে চান। সবাই উদ্দাম গতিবেগ এবং প্রাণ চাঞ্চল্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। শুরু হ'ল নতুন বেতার কেন্দ্র উদ্বোধনের কাজ। এম, এন, এ জনাব আবদুল মান্নানের পরামর্শক্রমে সর্ব জনাব এম, আর, আখতার এবং আমিনুল হক বাদশা প্রমুখ ২১শে মে '৭১-এ উদ্বোধনের জন্য একটি খসড়া অনুষ্ঠানপত্রও তৈরী করলেন। মাত্র চারদিন পর অর্থাৎ ২৫শে মে '৭১ ছিল বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম-বার্ষিকী। পরিবর্তিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঐদিন থেকেই শুভ সূচনা হয়েছিল দ্বিতীয় পর্যায়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দৃপ্ত পথ যাত্রা। ইতিমধ্যে ২৩শে মে '৭১ কিছু গানের টেপ নিয়ে মুজিব নগরে এসে পৌঁছলেন ঢাকা বেতারের অন্যতম অনুষ্ঠান সংগঠক জনাব আশফাকুর রহমান এবং অন্যতম অনুষ্ঠান প্রযোজক সর্ব জনাব টি, এইচ, শিকদার ও তাহের সুলতান। মূলতঃ ২৫শে মে '৭১ পুনর্বিন্যস্ত অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ও প্রচারে তাঁরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন। ঐদিন আমি মুজিব নগরে ছিলাম না। পূর্বদিন সকালে এম, এন, এ সাহেবের অনুমোদনক্রমে আমাকে চলে যেতে হয়েছিল মুর্শিদাবাদ, আমার দ্বিতীয় ছেলের অসুখের টেলিগ্রাম পেয়ে। ফিরে এসেছিলাম দু'দিন পর অর্থাৎ ২৭শে মে, '৭১। দু'এক দিনের ব্যবধানে আগরতলা থেকে ফিরে এলেন বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রধান উদ্যোক্তা বেলাল মোহাম্মদ সহ দশজন প্রাথমিক সংগঠন কর্মী। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রসঙ্গে এই গ্রন্থের ৬০-৭৫ পৃষ্ঠায় আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। কাজেই এখানে সে সব কথার আর পুনরুল্লেখ করলাম না।

আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছি এক অসম শক্তির বিরুদ্ধে। ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকার ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে হানাদার বাহিনীর আনুষ্ঠানিক আত্ম-সমর্পণের মাধ্যমে শেষ হ'ল এ যুদ্ধ। আমরা বিজয়ী হ'লাম। এবার দেশে ফিরে আসার পালা। ১৭ই ডিসেম্বর থেকে ২২শে ডিসেম্বরের মধ্যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কয়েকজন কর্মী কুশলী ঢাকা ফিরে এলেন। বেলাল মোহাম্মদ ম, মামুন, মেসবাহ্উদ্দিন, টি, এইচ, শিকদার, আশরাফুল আলম সহ আমরা অনেকে থেকে গেলাম। ২রা জানুয়ারী '৭২ পর্যন্ত আমাদিগকে প্রচার করতে হয়েছে

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিপ্লবী মন্ত্রী পরিষদ ২২শে ডিসেম্বর '৭১ ঢাকা ফিরে এলেন। কিন্তু তারপরও ২রা জানুয়ারী '৭২ পর্যন্ত মুজিব নগর থেকে এই বেতারের অনুষ্ঠান প্রচারের পেছনে কি যুক্তি ছিল সেই রহস্য আজো আমার কাছে বোধগম্য নয়। ম, মামুন, মেসবাহ্ উদ্দিন, টি. এইচ. শিকদার, অনু ইসলাম এবং আশরাফুল আলম সহ প্রায় পঁচিশ জন শব্দ সৈনিক সমভিব্যাহারে আমরা স্বদেশের মাটিতে ফিরে এলাম ৫ই জানুয়ারী '৭২। কামাল লোহানী আমাদের সাথে ছিলেন না। তিনি এসেছেন জলপথে, প্রায় একই সময়ে 'এম্. এম্. সাত্ত্রা' জাহাজ যোগে। আমরা ফিরে এসেছিলাম স্থল পথে মুর্শিদাবাদ-রাজশাহী হয়ে। ঐ রাজশাহী শহর থেকেইত

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে তোলা গ্রন্থকারের ছবি
(১৯শে ডিসেম্বর '৭১)

আট মাস আগে আমাকে রাতের আঁধারে স্বপরিবারে পালাতে হয়েছিল প্রাণ ভয়ে। বিজয়ীর বেশে ওখান হয়েই আবার ফিরে এলাম স্বদেশে। কত তফাৎ ছিল ঐ দুটি দিনে। রাজশাহী বেতারের তৎকালীন শ্রোতা গবেষণা অফিসার জনাব ফখরুল ইসলামের অতিথি হয়েছিলেন আমার সহকর্মিগণ। আমিও সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁদের সাথে ছিলাম। তারপর রাত কাটালাম আমার সেই স্মৃতিময় ফেলে

যাওয়া বাসভবনে। উল্লেখ্য যে জনাব ফখরুল ইসলাম একাত্তরের ন'মাস আত্ম-গোপন করে থেকেছেন দেশের অভ্যন্তরে। দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি দপ্তরে যাননি। সম্প্রতি ঢাকা বেতারের আঞ্চলিক পরিচালক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন।

রাজশাহী পৌঁছেই জানলাম বেতারের অন্যতম প্রকৌশলী বন্ধু জনাব মোহসীন আলীর নিখোঁজ হওয়ার সংবাদ। হানাদার বাহিনী তাঁকে কর্তব্যরত অবস্থায় ধরে নিয়ে আর ফেরত দেয়নি। আর ফেরত আসবেন না তিনি স্ত্রী, পুত্র-কন্যা পরিজনের কাছে। রাজশাহী সহ অন্যান্য বেতারের যেসব কর্মী-কুশলীকে আমরা এমনি শোচনীয় ভাবে হারিয়েছি, তাঁদের কথা এই গ্রন্থের পঞ্চম পরিচ্ছেদে আমি উল্লেখ করেছি।

পরদিন অর্থাৎ ৬ই জানুয়ারী, '৭২ সকালে রাজশাহী বেতারের একখানা মাইক্রোবাস ও একখানা জীপ নিয়ে আমরা রওয়ানা দিলাম রাজধানী ঢাকার পথে। ঢাকা বেতার চত্বরে যখন এসে পৌঁছি, তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। ঢাকা বেতারের কয়েকজন উর্ধ্বতন অফিসার এবং শিল্পী-কুশলী সহ অনেকেই ঐ সন্ধ্যায় বেতার চত্বরে উপস্থিত ছিলেন। কুশল বিনিময় করলাম তাঁদের সাথে।

উল্লেখ্য যে আত্ম-সমর্পণের আগেই হানাদার বাহিনী মীরপুর থেকে ক্রিস্টাল সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। কাজেই বিজয়ের পর পরই ঢাকা থেকে অনুষ্ঠান প্রচার সম্ভব হয়নি। পরদিন অর্থাৎ ১৭ই ডিসেম্বর বেলা ২টা ৪৮ মিঃ এ ঢাকা বেতারের লাইন ঠিক হয়েছিল। তবে যথা নিয়মে অনুষ্ঠান প্রচার শুরু হয়েছিল মুজিব নগর থেকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রাথমিক দল ঢাকা ফিরে আসার পর।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ফিরে আসা দ্বিতীয় দলটি সহ আমিও ঢাকা পৌঁছার পর দিন অর্থাৎ ৭ই জানুয়ারী '৭২ থেকে ঢাকা বেতারেই শুরু করলাম স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে আমার কর্মময় জীবনের পরবর্তী অধ্যায়। পেছনে রেখে এলাম একটি রণাঙ্গন।

অনেক অনেক স্মৃতি-বিজড়িত একাত্তরের রণাঙ্গন। অনেক কথা, অনেক বীরত্ব, অনেক বেদনাময় এই একাত্তর। আমরা হারিয়েছি অনেক। সেই হারানোর মাঝেই ফিরে পেয়েছি আমাদের মাতৃ ভূমিকে। একাত্তরের লক্ষ শহীদের মাঝে আমার অন্তরের গভীরে বেদনা হয়ে মিশে আছে যার ছবি,

সে আমার হারানো ভাই জসীম। সে ছিল আমার কনিষ্ঠ সহোদর। এমনি ভাবে জীবন দিয়েছে এ দেশের লক্ষ দেশ-প্রেমিক—মুক্তিযোদ্ধা, মা-বোন, ক্ষেতের চাষী, নায়ের মাঝি, কুলি-মজুর, শিশু-কিশোর, যুবক-বৃদ্ধ এবং ছাত্র-শিক্ষক-জনতা। তারা বুকের রক্ত দিয়ে লিখে গেছে একটি নাম—একটি স্বাধীন স্বদেশ—'বাংলাদেশ'।

চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র জসীম একাত্তরে ছিল চট্টগ্রাম রণাঙ্গনে। মুক্তিযুদ্ধে গ্রামের যুবকদের সংগঠনের দায়ে ১৩ই মে, '৭১ সন্দীপ থেকে প্রথম কারারুদ্ধ হয়েছিল। এক মাস পর চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি পেয়েই সে পুনরায় চলে গেলো রণাঙ্গনে। মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে শত্রুর গোপন তৎপরতার খবর জানিয়ে দেয়ার দায়িত্ব পালন করত সে নিবিড় নিষ্ঠায় সংগোপনে। কিন্তু বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে এসে ১৯শে নভেম্বর '৭১ ধরা পড়ল হানাদারের দোসরদের হাতে। ওরা তাকে নিয়ে গেলো চট্টগ্রামের স্থানীয় নির্যাতন শিবির ডালিম হোটেলে। কিন্তু জসীম ছিল নির্ভীক, আপোষহীন। সেই স্বাক্ষর রেখে গেলো সে জীবন দিয়ে। মাত্র ২৬ দিন পর ১৬ই ডিসেম্বর '৭১ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ বিজয়মালা পড়ল। কিন্তু ঐ বিজয় মালা জসীম দেখে যেতে পারেনি, যেমন পারেনি এ দেশের লক্ষ নির্ভীক প্রাণ সন্তান এবং বহু ভাগ্যাহত আবালবৃদ্ধবণিতা।

শহীদ জসীম উদ্দিন

প্রার্থনা করি একাত্তরের আরো, শহীদের সাথে জসীমের স্মৃতিও অম্লান থাকুক কৃতজ্ঞ জাতির অন্তরে, তাদের ত্যাগ মহিমায় প্রদীপ্ত হোক এ দেশবাসী।

উপসংহার

আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছি, স্বাধীনতা এনেছি, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ আজ বাস্তব সত্য। বঙ্গোপসাগর বিধৌত পাললিক শিলায় গঠিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাংলা নামের ব-দ্বীপ বিশ্বের স্বাধীন জাতিসমূহের সাথে সংযুক্ত হয়েছে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর।

আমরা বাঙ্গালী (বর্তমানে বাংলাদেশী)। বাংলা এবং বাঙ্গালীত্ব আমাদের গর্ব। কালের বিবর্তনে পৃথিবীর উন্নত জাতিসমূহের পাশে একদিন এ জাতি লাভ করবে গৌরব জনক আসন। এ দেশের উত্তরসূরীগণ সুখী হবেন, সুন্দর হবেন। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, শিল্প-সংস্কৃতিতে তাঁরা এক দিন পৌঁছাবেন সাফল্য এবং সৌভাগ্যের স্বর্ণ শিখরে। তখন আমরা থাকব না; প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে চলে যাবো দূরে বহুদূরে,—যেখান থেকে মানুষ আর কখনো ফিরে আসে না। কিন্তু বাংলা থাকবে, বাঙ্গালী থাকবে, থাকবে চির শ্যামল, চির সবুজ বাংলা, অবহমান বাংলা, চিরায়িত বাংলা, শ্বাশত বাংলা—হয়ত বা ভৌগলিক বা রাজনৈতিক পরিবর্তনে অনেক অনেক পরিবর্তিত রূপে বা, আজ অকল্পনীয়।

ন'মাস নয়, দু'শ বছর নয়, দু'হাজারের বছরের উর্দ্ধকালের সংগ্রাম শেষে আমরা লাভ করেছি আমাদের অনেক প্রতীক্ষিত লাল সূর্য, স্বাধীনতার লাল সূর্য। বাংলার স্বাধীন নবাবীর আমলকে যথার্থই বাংলাদেশের স্বাধীনতার অধ্যায় বলে চিহ্নিত করা হলে নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার শোচনীয় পরাজয়ে সাথে পলাশীর প্রান্তরে অস্তমিত বাংলার হারানো স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে আমাদের সময় লেগেছে পুরো দু'শ চৌদ্দ বছর পাঁচ মাস তেইশ দিন। দীর্ঘ এ সংগ্রামে আমরা হারিয়েছি অনেক দেশপ্রেমিক বীর সন্তানকে, যাঁরা অকাতরে বিলিয়ে দিয়ে গেছেন তাঁদের মূল্যবান জীবন। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষতম রণাঙ্গনের মহান নায়ক এবং আজকের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও রাতের আঁধারে হারিয়ে গেলেন আমাদের মাঝ থেকে। দেশের স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের অনেক অগ্র পথিককেই আমরা হারিয়েছি এমনি শোচনীয় ভাবে। আমরা পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি তাঁদের মহান আত্ম-ত্যাগের কথা। আমাদের মহান পূর্বপুরুষ যাঁরা এই স্বাধীনতার ফল ভোগ করে যেতে পারেন নি, তাঁদের অবদান আমরা বিস্মৃত হতে পারি না।

আমাদের দীর্ঘদিনের সংগ্রাম এবং ত্যাগ হোক স্বাধীন সার্বভৌম জাতি হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে সম্মানের সাথে মাথা উঁচু রেখে বেঁচে থাকার প্রেরণা। অতীতের সব গ্লানি, সব তিক্ত অভিজ্ঞতা হোক আমাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যত চলার পথের দিশারী।

নির্ঘন্ট ঃ

ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও যুদ্ধের ঘটনাবলী, সংগঠন, অনুষ্ঠান, ব্যক্তিত্ব এবং শিল্পী-কুশলীর বর্ণানুক্রমিক সূচী।

জ

ট

ড

ঢ

ত

দ

ন

প

ফ

ব

ভ

ম

য

হ

একাত্তরের রণাঙ্গন গ্রন্থের সম্মানিত পৃষ্ঠপোষকগণ

প্রতিষ্ঠান :

১। বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ করপোরেশন
২। অগ্রণী ব্যাংক
৩। ব্যাংক অব ক্রেডিট এণ্ড কমার্স
৪। বাংলাদেশ সেনা কল্যাণ সংস্থা
৫। বাংলাদেশ টোব্যাকো কোম্পানী লিমিটেড
৬। সাধারণ বীমা করপোরেশন
৭। সোনালী ব্যাংক
৮। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন
৯। বাংলাদেশ রেলওয়ে
১০। যমুনা ওয়েল কোম্পানী লিমিটেড
১১। কৃষি ব্যাংক
১২। ঢাকা জেলা প্রশাসন
১৩। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
১৪। শক্তি ঔষধালয় ঢাকা (প্রাইভেট) লিমিটেড
১৫। জীবন বীমা করপোরেশন
১৬। বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় শিল্প সমিতি লিঃ
১৭। আরেনকো পরিবহণ লিমিটেড, ঢাকা
১৮। ফেক্‌টো গ্রুপ অব ইণ্ডাষ্ট্রিজ, ঢাকা
১৯। নীহারিকা ঔষধালয়, ঢাকা
২০। জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তর, ঢাকা
২১। তিতাস গ্যাস, ঢাকা
২২। জনতা ব্যাংক
২৩। বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল সংস্থা, ঢাকা
২৪। পূবালী ব্যাংক

সুধীজন ঃ

তথ্য সংগ্রহ ও বিভিন্নভাবে যাঁরা সহযোগিতা প্রদান করেছেন :

১। ডক্টর কামাল হোসেন, একাত্তরে বঙ্গবন্ধুর অন্যতম বিশ্বস্ত সহযোগী এবং বিশিষ্ট আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

২। জনাব এম, আর, সিদ্দিকী, মুক্তি যুদ্ধের অন্যতম বিশিষ্ট সংগঠক

৩। জনাব আবদুল মান্নান. প্রাক্তন এম, এন, এ-ইনচার্জ, প্রেস তথ্য ও বেতার, মুজিবনগর এবং সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।

৪। জনাব জিল্লুর রহমান, প্রাক্তন নির্বাহী সম্পাদক, সাপ্তাহিক জয় বাংলা, মুজিবনগর এবং প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

৫। জনাব আব্দুর রাজ্জাক, মুজিব বাহিনীর অন্যতম প্রধান এবং সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশকৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ

৬। সর্দার আমজাদ হোসেন, প্রাক্তন প্রচার সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ

৭। ব্যারিষ্টার শওকত আলী খান, বিশিষ্ট মুক্তি যোদ্ধা ও আইনজীবী বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এবং বেগম আলী খান

৮। মিঃ সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত, বিশিষ্ট মুক্তি যোদ্ধা ও আইনজীবী বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট।

৯। জনাব মোশাররফ হোসেন, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ করপোরেশন।

১০। ডক্টর নজরুল ইসলাম, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল সংস্থা

১১। জনাব আবদুল জব্বার খান, বিশিষ্ট চলচ্চিত্র প্রযোজক

১২। মিঃ বি, কে. ভট্টাচার্য, ঢাকা

১৩। জনাব তফাজ্জল আলী, ঢাকা

১৪। মিঃ অমলেন্দু বিশ্বাস, চট্টগ্রাম

১৫। জনাব হোসেন মীর মোশাররফ, জন সংযোগ ম্যানেজার, জীবন বীমা করপোরেশন

১৬। জনাব কামাল লোহানী (শব্দ সৈনিক), বিশিষ্ট সাংবাদিক

১৭। জনাব ফখরুল ইসলাম, রেডিও বাংলাদশ।

১৮। জনাব মোবারক হোসেন খান, রেডিও বাংলাদেশ।

১৯। জনাব বেলাল মোহাম্মদ, প্রধান উদ্যোক্তা, বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, বর্তমানে উপ-পরিচালক, বহিবিশ্ব কার্যক্রম, রেডিও বাংলাদেশ।

২০। সৈয়দ আব্দুস শাকের অন্যতম উদ্যোক্তা, বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, বর্তমানে উর্দ্ধতন প্রকৌশলী রেডিও বাংলাদেশ

২১। জনাব ম, মামুন (শব্দ সৈনিক), অন্যতম বার্তা সম্পাদক, রেডিও বাংলাদেশ

২২। জনাব মুস্তাফিজুর রহমান (শব্দ সৈনিক), সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক রেডিও বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম।

২৩। জনাব আলী যাকের (শব্দ সৈনিক), অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, ঢাকা নাগরিক নাট্য গোষ্ঠি।

২৪। মিঃ মনোরঞ্জন ঘোষাল (শব্দ সৈনিক), ঢাকা বেতারের সঙ্গীত শিল্পী।

২৫। কাজী জাকির হাসান, সদস্য, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কমাণ্ড কাউন্সিল ও নিজস্ব শিল্পী, রেডিও বাংলাদেশ, ঢাকা।

২৬। জনাব অনু ইসলাম (শব্দ সৈনিক), অন্যতম সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক, রেডিও বাংলাদেশ।

আলোচ্য গ্রন্থটির তথ্য সংগ্রহ এবং বিভিন্ন ভাবে আরো যাঁদের সহযোগিতা আমি পেয়েছি তাঁদের সবাইর নাম এই তালিকায় ছাপানো সম্ভব হ'ল না বলে দুঃখীত। আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা রইল তাঁদের প্রতি। প্রসঙ্গতঃ আমার ভুমিকাতেও উল্লেখ করেছি যে, ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকা সত্বেও অনেকের সাথে যোগাযোগ করা ছিল আমার সাধ্যের বাইরে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সব আনুষ্ঠানিকতা রক্ষা করে তাৎক্ষণিক ভাবে যোগাযোগ করা যেমন সম্ভব ছিল না, তেমনি সঠিক ঠিকানার অভাবেও অনেকের সাথে যোগাযোগ সম্ভব হয়ে উঠেনি।

আমি মনে করি, এই গ্রন্থ প্রকাশে যাঁরা আমাকে সামান্যতমও সহযোগিতা প্রদান করেছেন. তাঁরা সহ এদেশের ইতিহাস সচেতন যে কোনও দেশ প্রেমিক নাগরিক মাত্রই আমার এই গ্রন্থের সম্মানিত পৃষ্ঠপোষক।

—গ্রন্থকার